ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

উনবিংশ শতকের

গীতিকবিতা সংকলন
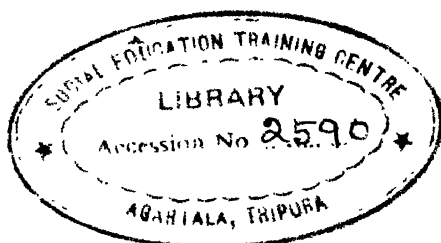
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., পি. এইচ্-ডি.

ও

প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, এম. এ., ডি-ফিল্.

কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত
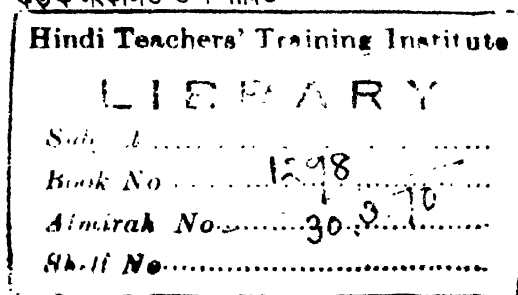
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা ১২
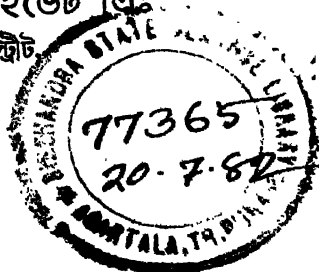
প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

॥ এক ॥

হিন্দু শাস্ত্র বলেন, মানুষ এক জন্মের দেহ ত্যাগ করে, গ্রহণ করে নূতন জন্মের দেহ। তেমনি মানুষের মন ধরা দেয় নব-নবায়মান পরিবর্তনশীল সংস্কারে, ভাবনায়, দিনচর্যায়, শিল্পকৃতিতে, সাহিত্য ও দর্শন-সাধনায়। পর্বে পর্বে প্রাণ আপন আবরণ যেমন রচনা করে তেমন মোচনও করে। সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া কাব্যে, প্রাণের এই নব নব রূপান্তর প্রতিভাত হয়। বাঙালি মানসের প্রকাশ বিশেষরূপে দেখা গিয়াছে গীতিকাব্যে। বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্নে এই গীতিকাব্যধারার যে যাত্রা শুরু হইয়াছিল, তাহা আজও অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে।

ঊনবিংশ শতক বাঙালির নবজাগরণের যুগ। এই যুগটি অত্যন্ত জটিল ও বিক্ষুব্ধ। নানা বিরোধী-ভাবের তরঙ্গ নানাপথে আসিয়া এই যুগটিকে আবর্তসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই শতকের প্রথমার্ধে গদ্যের চর্চাই প্রধান; জ্ঞানের বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালির মানস-পরিভ্রমণের পরিচয় এই পর্বে পাই। রামমোহন রায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ মনীষীরা এই পর্বে (১৮০০—১৮৫৮) গদ্যপ্রধান সাহিত্য রচনাতেই সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তারপর নবজাগরণের সুফল দেখা দিল ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বস্তুতঃ, প্রথমোক্ত পর্বটি পরবর্তী পর্বের রস-সম্ভোগের প্রস্তুতি-পর্ব, শুষ্ক গদ্যের ক্ষেত্রে আগামী রসবন্যার আয়োজন।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের বাধাবন্ধহারা প্রকাশ বাংলাদেশে কখনোই দেখা যায় নাই। অপ্রাপণীয়ের জন্য সুদূর রোমান্টিক স্বপ্নসাধনা, প্রাচীনের পুনরুজ্জীবন ও মানবীয় বৃত্তিসমূহের নিরঙ্কুশ বিকাশসাধনের অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততা ইউরোপীয় রেনেসাঁসে ছিল। বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতকে রেনেসাঁসের সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ দেখা যায় নাই পিছুটানের ফলে। এই পিছুটান হইল মানসিক হীনমন্যতা, মোহগ্রস্ত অনুকরণ, তাহার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গপ্রবণ সমালোচনা, স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে

অনতিক্রমণীয় ব্যবধান, আত্মরক্ষার প্রয়াস ও অতিনৈতিক প্রবণতা। তথাপি জগৎ ও জীবনকে রোমান্টিক দৃষ্টিতে অবলোকন, প্রাচীনের পুনরুজ্জীবন, নিত্য নব নব পরীক্ষা, প্রচলিত ধারা বর্জন, বিস্ময় ও আনন্দবোধের উদ্বোধন এবং সর্বোপরি জাতির, দেশের ও সাহিত্যের সম্প্রসারণের আন্তরিক অভিলাষ ও তাহার সম্ভাবনায় গভীর বিশ্বাস: এই লক্ষণগুলি গত শতকের কাব্যসাহিত্যে নিশ্চিতরূপে বর্তমান। আর সেখানেই বাঙালি-মানস নিজেকে আবিষ্কার ও প্রকাশ করিয়াছে। ইউরোপীয় সাহিত্যের দক্ষিণ পবনে বাঙালির প্রাণ মুক্তিলাভ করিয়াছে, চিরাচরিত সাহিত্য-প্রথার শাসন হইতে মুক্ত হইয়া রোমান্সের আকাশে উধাও হইয়াছে, মধ্যবিত্ত বাঙালি-মানসে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে এবং তাহারই ফলে অন্তর্মুখী আধুনিক গীতিকবিতার উদ্ভব।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা ঊনবিংশ শতকের বাঙালি-মানসের বিদ্রোহ ও স্বীকৃতি, প্রতিবাদ ও সমর্থন, আনন্দ ও বেদনার মূর্ত প্রকাশ। তাঁহার 'আত্মবিলাপ' (১৮৬১), 'বঙ্গভূমির প্রতি' (১৮৬২) ও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে (১৮৬৬) সেদিনের অন্তর্দ্বন্দ্ব-মথিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বাঙালী-মানসের সত্য পরিচয়টি প্রকাশিত হইয়াছে। আধুনিক বাংলা লিরিকের জন্মলগ্নে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের বেদনা। মধুসূদনে তাহার প্রথম প্রকাশ, তাই এখানেই তাহার যাত্রারম্ভ।

রেনেসাঁসের আঘাতে বাংলা কাব্যজগতে প্রথম প্রতিক্রিয়া হইল প্রাচীনের নব প্রতিষ্ঠা। আমাদের ইতিহাস-চেতনা রোমান্সের স্বপ্নলোকে জাগরিত হইল, অবহেলিত অবজ্ঞাত প্রাচীন ইতিহাস নবরূপে দেখা দিল। নবজাগ্রত রোমান্স-উত্তেজিত বাঙালি রাজস্থানের গৌরবময় শৌর্যবীর্যগাথা (পদ্মিনী উপাখ্যান ও কর্মদেবী), পুরাণকাহিনী (তিলোত্তমাসম্ভব, বৃত্রসংহার, দশমহাবিদ্যা), রামায়ণকথা (মেঘনাদবধ) এবং মহাভারতকথার (রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস) প্রতি প্রবল অনুরাগ দেখাইল।

নবজাগ্রত কাব্যরসপিপাসু বাঙালি চিত্তের উদ্বোধন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে। মধুসূদন দত্তের অন্তর্মুখী গীতিকবিতার রোমান্টিক বিষাদের সুরটি কিন্তু তখনো প্রাধান্য লাভ করে নাই। তাহার জন্য আরো কয়েক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ১৮৫৮ হইতে ১৮৬৭: নবজাগরণের প্রথম দশ বৎসরে প্রকাশিত গ্রন্থতালিকা লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, তাহাতে মহাকাব্য, আখ্যায়িকাকাব্য, রোমান্টিক ইতিহাসরসমিশ্রিত

কাব্য, তত্ত্ব ও যুক্তিপ্রধান কাব্য, নাটক, প্রহসন, উপন্যাস, নক্‌শা, গান, সনেট—সব কিছুরই দেখা মিলিতেছে, লিরিক বা গীতিকবিতা বাদে।

রোমান্টিক গীতিকবিতার এই বিলম্বিত আবির্ভাবের ও ক্লাসিকধর্মী মহাকাব্য-আখ্যায়িকা কাব্যের সহিত তুলনায় জনপ্রিয়তা ও প্রসারের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ-থাকার কারণ কি ?

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির জাতীয় জীবনের সর্বব্যাপী সংগঠন-যজ্ঞ শুরু হইয়াছিল। চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলা (১৮৬৭), ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭২), বাংলার নীলচাষী-বিদ্রোহ (১৮৫৯), উড়িষ্যার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (১৮৬৬), শিশিরকুমার ঘোষের ইণ্ডিয়ান লীগ (১৮৭৫), ভারতসভা ও ভারতীয় বিজ্ঞানসভা (১৮৭৬), ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) প্রভৃতি আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া যে দেশাত্মবোধ বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছিল ও বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে যুগব্যাপী জড়তা ও কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করা হইয়াছিল, তাহারই ফলে দেশের আকাশে-বাতাসে একটি সুতীব্র আবেগ ও উন্মাদনা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই আবেগ ও উন্মাদনা প্রকাশের উপযুক্ত বাহন খুব স্বাভাবিক কারণেই গীতিকবিতা হইতে পারে না ; গুরুভারবহন-ক্ষম আখ্যায়িকা-কাব্যই সে আবেগ ও উন্মাদনার যোগ্য আধার হইতে পারে। গীতিকবিতা-রচনার জন্য যে প্রশান্তি ও ধ্যানের অবসর প্রয়োজন, তাহা সেই দায়িত্ব-ভারাবনত পরিবেশে লাভ করা সম্ভব ছিল না। জাতীয় জীবনে শান্তি ও স্থিতি ও ইহার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্মুখী জীবনচর্যা না আসিলে গীতিকবিতা সর্বহৃদয়সংবাদী হইয়া উঠিতে পারে না বলিয়াই এই পর্বে গীতিকবিতার আবির্ভাব বিলম্বিত হইয়াছিল ও তাহার পদক্ষেপে কুণ্ঠা ও দ্বিধা লক্ষ্য করা গিয়াছিল। এইজন্য গীতিকবিতার রস-আত্মা সে যুগের রসিকের নিকট পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয় নাই। সে-যুগের কাব্যপিপাসা রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের জাতীয়-ভাবোদ্দীপক মহাকাব্যের মধ্যেই চরিতার্থ হইয়াছে। যে সৈনিক যুদ্ধে যাইতেছে, রোমান্টিক কবির সূক্ষ্ম ভাবকল্পনা তাহার চিত্তকে উদ্দীপ্ত করিতে পারে না ; ক্লাসিক কাব্যের বীরগাথা, অস্ত্রের ঝনৎকার, যুদ্ধযাত্রার উন্মাদনা ও যুদ্ধজয়ের উল্লাস তাহাকে অনুপ্রাণিত করে। সেই কারণে উঁচুস্বরে বাঁধা আখ্যায়িকা-কাব্য ও মহাকাব্যই এই পর্বের মুখ্য কাব্যধারা ; গীতিকবিতার যাত্রা শুরু হইয়াছে, তবে তাহা তখনো যুগচিত্তের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করে নাই।

আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার ধারাম্নুসরণে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। এই বৎসরের পূর্বে বলদেব পালিত, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু সে সকল কাব্য গীতিকবিতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থনিচয়ে আধুনিক গীতিকবিতার সুরটি নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হইল। বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গসন্দর্শন', 'বন্ধুবিয়োগ', 'প্রেমপ্রবাহিণী' কাব্য, হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' প্রথম খণ্ড, গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'প্রসূন' কাব্য, বলদেব পালিতের 'কাব্যমালা' ও 'ললিত কবিতাবলী' এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'কাব্যকলাপ' ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইল ও গীতিকবিতার প্রতিষ্ঠা হইল। এই প্রসঙ্গে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বিহারীলালের 'সঙ্গীতশতক' কাব্যটি রোমান্টিক গীতিকাব্যের নিঃসঙ্গ অগ্রপথিকরূপে স্মরণযোগ্য।

ঊনবিংশ শতকের শেষপাদে বাংলা কাব্যজগতে এক বিরাট পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে: ক্লাসিক কাব্যধারাই বজায় থাকিবে, না, রোমান্টিক কাব্যধারার জয় হইবে? শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক গীতিকবিতার জয় হইয়াছে এবং বিহারীলালের ব্যতিক্রমই সর্বসম্মত নিয়মে পরিণত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথে এই গীতিকাব্যধারার জয় ঘোষিত হইয়াছে। মধুসূদনের মহাকাব্যের বিপুল ধারা দুর্বল অক্ষম অনুকারকদের হাতে পড়িয়া ব্যর্থতার মরুবালুতে শুষ্ক হইয়াছে; বিহারীলালের সংকীর্ণ রোমান্টিক গীতিকাব্যধারা রবীন্দ্রগীতিসমুদ্রে পতিত হইয়া বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করিয়াছে। বাংলাকাব্য মহাকাব্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া গীতিকবিতার ধারাকেই আপন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এখানে লক্ষণীয় এই যে, ঊনবিংশ শতকের শেষপাদে আখ্যায়িকা-কাব্য ও গীতিকাব্য—এই দুই ধারাই পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়াছে; শেষ পর্যন্ত আখ্যায়িকা-কাব্য পরাজয় স্বীকার করিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলা কাব্যের এই ক্লাসিক পর্বটিতে বিশুদ্ধির অভাব আছে; রোমান্টিক গীতিধারা ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ইহাকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে।

॥ দুই ॥

বর্তমান সংকলনে ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দিবার প্রয়াস করা হইয়াছে এবং এই ধরণের প্রয়াস যতদূর জানি ইহাই প্রথম। এই

সংকলন হইতে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কারণ, প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতার সংকলন এই পরিসরে সম্ভব নহে, উচিতও নহে। দ্বিতীয়তঃ, উনবিংশ শতকের বাংলা গীতিকাব্যের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথকে দেখাইতে হইলে তাঁহাকে দূরে রাখাই প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা যে অমূল তরু নহে, তাহা গত শতকের গীতিকাব্যভূমি হইতেই প্রাণরস আহরণ করিয়াছে, তাহারই পরিচয় পাই এই সংকলনে। বর্তমান সংকলনে ধৃত কবিদের সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনাত্মক আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, গত শতকের গীতিকাব্যের বিভিন্ন ধারার সমন্বয় রবীন্দ্রকাব্যে হইয়াছে, এই সমন্বয় হইতে এক উন্নততর কবিকৃতির উদ্ভব হইয়াছে এবং শতাব্দীর সাধনার পূর্ণ ফল তাঁহাতেই প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

বর্তমান সংকলনে আমরা সতর্কভাবে দুই শ্রেণীর কাব্য পরিহার করিয়াছি: মহাকাব্য ও দীর্ঘ আখ্যায়িকা-কাব্য। রঙ্গলাল-মধু-হেম-নবীন ও তদনুসারী কবিদের প্রধান কীর্তিগুলি বাদ দিয়াছি; অবশ্য তাঁহাদের মহাকাব্যের অন্তর্ভুক্ত লিরিকাংশ ও স্বতন্ত্র গীতিকবিতা গ্রহণ করিয়াছি। আর দীর্ঘ আখ্যায়িকা-কাব্য —যাহা সেকালের প্রচলিত সাহিত্যিক-প্রথা ছিল—বাদ দিবার ফলে অক্ষয় চৌধুরী, স্বর্ণকুমারী দেবী, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামদাস সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, অধরলাল সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, নবীনচন্দ্র দাস, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির প্রধান কীর্তিগুলি বাদ দিয়াছি।

বর্তমান সংকলনে পঁচাত্তর জন কবির প্রায় পাঁচশত গীতিকবিতা গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন কাব্যধারার শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে আর মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ' কবিতা প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে। ঈশ্বর গুপ্তের 'আত্মবিলাপ' ও মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ'-এ ব্যবধান দু-এক বৎসরের নহে, একটি যুগের ব্যবধান। ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রেম, প্রকৃতি, বিষাদ, তত্ত্ব ও সমকালীন বিষয়ের উপরে রচিত পদ্যের ব্যর্থতাই পরবর্তী সাফল্যের ইঙ্গিত বহন করে। এইজন্যই ঈশ্বর গুপ্তের উপরি-উক্ত বিষয়নিচয়ে রচিত পদ্য এই সংকলনে গৃহীত হইয়াছে। আর রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে (১৮৫৮) রোমান্সরসের উদ্বোধন হয় —পরবর্তী দেশপ্রেমের কবিতার বীজ সেখানেই নিহিত আছে। তাই এই

সংকলনের এক দিকের সময়সীমা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ। প্রাক্-রবীন্দ্রযুগের কাব্যজগতের নেতা নবীনচন্দ্রের শেষ উল্লেখযোগ্য কাব্য 'প্রভাস' প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে। আর রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা হয় 'মানসী' কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে। গত শতকে যে-সকল রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত কবি ছিলেন, তাঁহাদের কবিতা পরবর্তী শতকেও প্রকাশিত হইয়াছে। আর যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী ছিলেন, তাঁহাদের কবিতাও গত শতকের শেষ দশক অতিক্রম করিয়া বর্তমান শতকের প্রথম দশকে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাই উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন করিতে গিয়া বিংশ শতকের প্রথম দশকেও পদার্পণ করিতে হইয়াছে। সেইজন্য বর্তমান সংকলনের অপর সময়সীমা ১৯১০ খৃষ্টাব্দ। স্থূলদৃষ্টিতে বিচার করিলে বলা যায় ইহা ১৮৬০ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ : এই অর্ধ শতাব্দী কাল-পরিসরে বাংলা গীতিকবিতার প্রতিনিধিত্বমূলক সংকলন।

এ' কথা সত্য যে, প্রথম শ্রেণীর গীতিকবিতা গত শতকে খুব কমই লেখা হইয়াছে। আধুনিক গীতিকবিতা কবির ব্যক্তিপুরুষের প্রকাশ। তাহা আত্ম-ভাবনামূলক, মানব-মনের একান্ত অনুভূতির বাহক। ভাবাবেগের অনুশীলন ও প্রকাশের অনবদ্যতাবিধান, এতদুভয়ই উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কোমল ভাবরসসিক্ত, অনুভূতির গভীরে অবতরণশীল মন এবং এই ভাবতন্ময়তা প্রকাশের উপযোগী, অমৃতনিঃস্যন্দী সৌন্দর্যপরিমণ্ডল-রচনানিপুণ ভাষা—এতদুভয়ের সংযোগ না ঘটিলে শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার উদ্ভব হয় না। গীতিকবিতা চরম সার্থকতা লাভ করে কখন? যখন কবিকল্পনা উদ্দীপিত হয়, তখন কার্যকারণ-শৃঙ্খলাকে অতিক্রম করিয়া একটি নিগূঢ়তর ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায়; উদ্বেলিত ভাবকল্পনা পাঠকমনকে এক নূতন অপ্রত্যাশিত স্তরে পৌঁছাইয়া দেয়। ইহাকেই বলে 'লোকোত্তর চমৎকারিত্ব'। গীতিকবিতা ভাষার উপরেও নির্ভরশীল। ভাষার নমনীয়তা, পরিপাটিত্ব, সংযম, স্নিগ্ধতা ও ব্যঞ্জনায় ধরা পড়ে কবির ভাবোচ্ছ্বাস কতটা আন্তরিক। গীতিকবিতার ভাষা ইহার আন্তরিকতার মানদণ্ড। তাই আধুনিক লিরিকে ভাবের আবেগ ও ভাষার প্রসাধন এবং এতদুভয়ের সুপরিণয় ও সর্বোপরি কবিচিত্তের প্রক্ষেপণ একান্ত আবশ্যক। এখানেই তাহার আধুনিকতা। বহির্বিশ্বের সংঘাতে উত্তেজিত কবিমনের সর্ববিধ প্রকাশ-ব্যাকুলতার উপযোগী বাহনরূপেই আধুনিক লিরিকের

প্রতিষ্ঠা। কেবল পদ্য নহে, গান ও গীতিকবিতার পার্থক্য-সন্ধানও প্রয়োজন। অবশ্য এতদুভয়ের স্বাতন্ত্র্য সর্বত্র রক্ষা করা যায় না। গান ও গীতিকবিতার মধ্যে পার্থক্য হইতেছে এই যে, গানে কবি তাঁহার ভাবকে যথাসম্ভব লঘু তুলির টানে, কল্পনাপ্রয়োগকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া ও সুরের অন্তরঙ্গ সহযোগিতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রকাশ করেন। গীতিকবিতায় কল্পনার ঐশ্বর্য, বহুচারিতা ও অনুভূতির নিবিড়তা ধ্বনিসমৃদ্ধ ছন্দোপ্রবাহের মাধ্যমে রূপলাভ করে। দেশপ্রেমের কবিতা-সংকলনে সর্বত্র এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা যায় নাই। বহু দেশপ্রেমের গান উৎকৃষ্ট গীতিকবিতারূপে পাঠকমনের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। সেগুলিকে বর্জন করা কতদূর সঙ্গত, তাহা বিবেচ্য।

॥ তিন ॥

বর্তমান সংকলনে আমরা গীতিকবিতার বিষয়ানুক্রমিক ছয়টি খণ্ডে কবিতাগুলিকে যথাসম্ভব কালপারম্পর্য রক্ষা করিয়া বিন্যস্ত করিয়াছি। আশা করা যায় এই ছয়টি খণ্ডের প্রায় পাঁচশত কবিতার মাধ্যমে ঊনবিংশ শতকের নবজাগ্রত বাঙালি-মানসের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত ছয়টি খণ্ডে কবিতাগুলি বিন্যস্ত করা হইয়াছে :

(১) প্রেম-কবিতা
(২) দেশপ্রেম-কবিতা
(৩) গার্হস্থ্যজীবন-কবিতা
(৪) প্রকৃতি-কবিতা
(৫) বিষাদ-কবিতা
(৬) তত্ত্ব-কবিতা

বর্তমান সংকলনে বিধৃত এই ছয় খণ্ডের পাঁচশত কবিতা পাঠে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, গত শতকের বাঙালি-মানস প্রেম ও দেশপ্রেমের কাব্যভাবনায় আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছে। এই দুই শ্রেণীর কবিতার যে অনায়াস সাফল্য তাহা প্রকৃতি-কবিতা ও বিষাদ-কবিতায় দেখা যায় না; তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতাও খুব সার্থকতা লাভ করে নাই। বোধ করি, বাঙালি-প্রকৃতিই এজন্য দায়ী। গার্হস্থ্যজীবনের কবিতার সাফল্য বাঙালির গৃহগতপ্রাণতার পরিচায়ক।

উপরি-উক্ত ছয় শ্রেণীর কবিতার স্বরূপ-সন্ধানেই বর্তমান সংকলনের সামগ্রিক পরিচয়টি ফুটিয়া উঠিবে। এই আশায় বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

॥ চার ॥

মানবিক অনুভূতিনিচয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রেম এবং প্রেমের বিচিত্র পরিচয় দানে উনবিংশ শতকের বাঙালি কবি-মানস আপনাকে উৎসারিত করিয়া দিয়াছে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। আধুনিককালে প্রেম-কবিতা প্রাচীন পথরেখার অনুসরণ না করিয়া নূতন পথে যাত্রা করিয়াছে। বৈষ্ণবী-প্রেমের অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনা বা কবিওয়ালার গানে প্রেমের ইতর প্রকাশ, এই দুই বৈশিষ্ট্য বর্জন করিয়া পাশ্চাত্ত্য প্রেমসাধনার ইন্দ্রিয়াশ্রয়িতা, রূপ-বিহ্বলতা ও রহস্য-সন্ধানের পথে গত শতকের বাংলা প্রেম-কবিতা যাত্রা করিয়াছে ; আজ 'যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল'—এই বলিয়া কবিরা সন্তুষ্ট হইতেছেন না। আধুনিক মন আর প্রেমের সহজ সরল মর্মভেদী অনাড়ম্বর আবেদনে সাড়া দিতে চাহে না। ইহার রহস্যময় অনুভূতিকে নানা জটিল ভাবগ্রন্থির মধ্য দিয়া, নানা দুষ্প্রবেশ্য বনবীথির স্বল্পালোকিত অবসর-পথে, জীবনের দুশ্ছেদ্য প্রশ্নসংকুলতার আবরণ-জালের অন্তরালে অনুসরণ করাতেই ইহা তৃপ্তিলাভ করে। আধুনিককালে প্রেম-কবিতার ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুতে মানব-হৃদয়ের অপরিমেয় রহস্য প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

উনবিংশ শতকের প্রেম-কবিতায় প্রেমের এই বিচিত্র রূপ ধরা পড়িয়াছে। অবশ্য বর্তমান শতকের কবিতায় হৃদয়-চাঞ্চল্যের যত নূতন স্পন্দন, আত্মানুভূতির যত অনাস্বাদিত-পূর্ব গভীরতা, যত জটিল বাতাবরণের অন্তরাল হইতে তির্যক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তত বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি গত শতকের প্রেম-কবিতায় ছিল না, একথা স্বীকার্য। তথাপি গত শতকের বাঙালি-মানস প্রেমের বিচিত্র রূপায়ণে ও বিশ্লেষণে যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার বিবরণ বর্তমান সংকলনের প্রথম খণ্ডে বিধৃত হইয়াছে।

গত শতকের প্রেমকবিতার চারিটি উপবিভাগ সহজেই করা যায়: (ক) গার্হস্থ্য, (খ) ইন্দ্রিয়াশ্রিত, (গ) আদর্শায়িত এবং (ঘ) প্লেটোনিক প্রেম-কবিতা।

গার্হস্থ্যপ্রেমের কবিতা বর্তমান সংকলনের তৃতীয় খণ্ডে [গার্হস্থ্যজীবনের কবিতা] বিধৃত হইয়াছে ও প্রাসঙ্গিক মন্তব্য সেই খণ্ডের অপেক্ষায় রাখিয়া দিয়া বাকি তিনটি উপবিভাগের আলোচনা করা যাক্।

ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেম-কবিতার সাফল্য এইখানে যে, প্রেমের আধ্যাত্মিক 'ঊর্ধ্বায়ন, যাহা বৈষ্ণব কবিতায় দেখা যায় এবং প্রেমের ইন্দ্রিয়াসক্তি (sensuality) ও ইতরতা (vulgarity) যাহা কবিগান ও টপ্পায় প্রকট : এই দুই চরম সীমা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ইন্দ্রিয়াশ্রয়িতার (sensuousness) শোভন ও সুরুচি-সম্পন্ন অবলম্বন এই প্রথম বাংলা কবিতায় দেখা গেল। এক্ষেত্রে ইংরেজি প্রেম-কবিতার প্রভাব অবশ্যস্বীকার্য। বায়রন, শেলী ও কীট্স্ : এই তিন ইংরেজ কবির প্রবল রূপতৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয়াশ্রিতা এখানে উৎসস্বরূপ বর্তমান। মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেম-কবিতার সূচনা, বলদেব পালিতের কবিতায় তাহার পরিপুষ্টি এবং দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, স্বর্ণকুমারী দেবী, মুন্শী কায় কোবাদ, আনন্দচন্দ্র মিত্র, বরদাচরণ মিত্র, প্রিয়নাথ মিত্র, কুঞ্জলাল রায়, হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির কবিতায় তাহার বিচিত্র বিকাশ। বর্তমান সংকলনে বিধৃত মধুসূদন দত্তের 'সখী', বলদেব, পালিতের 'চুম্বন', 'পয়োধর', 'ভুল না আমায়', 'প্রিয়তমা শ্রীমতী—র প্রতি', 'নারীর প্রেম', গোপালকৃষ্ণ ঘোষের 'হাসি', 'উপমা', 'বিগত', মুন্শী কায়কোবাদের 'কে তুমি', 'প্রেমপ্রতিমা', 'প্রণয়ের প্রথম চুম্বন' ও 'বিদায়ের শেষ চুম্বন', হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর 'নিপীড়ন', 'হাসিও না'. 'প্রেম-পূর্ণিমা', 'বিদায়' ও 'অমৃতে গরল', গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'রমণীর মন', 'পরনারী', 'শত্রু' ও 'সে বুঝেছে ভুল' ; এবং এই শ্রেণীর কবিতায় যাঁহার সাফল্য সর্বাধিক, সেই দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'দর্পণ-পার্শ্বে', 'অশোকফুল', 'বকুল', 'ভালবেস না', 'যাদুকরি এত যাদু শিখিলি কোথায়', 'দাও দাও একটি চুম্বন' প্রভৃতি কবিতায় আধ্যাত্মিকতা-বর্জিত অথচ লালসা-মুক্ত মানবিক আবেগ, বলিষ্ঠ দেহানুগত্য ও প্রবল রূপ-তৃষ্ণার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য সর্বত্র সংযম রক্ষিত হয় নাই ; কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র দাসের অসংযত ভাবোচ্ছ্বাসের পাশেই দেবেন্দ্রনাথ সেনের কীট্সীয় রূপচেতনা (তু—'And what is love', 'I cry your Mercy', 'You say you love') কবিপ্রেরণার বিষয়ীভূত হইয়াছে।

আদর্শায়িত প্রেম-কবিতার সাফল্য আরো নিশ্চিত ; দৃঢ় প্রত্যয়ভূমিতে তাহার

অধিষ্ঠান। বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সংগীত-শতক' কাব্যে প্রেম ও প্রেয়সীর মহনীয় ভাবধ্যানে ও বন্দনায় ইহার সূচনা, তাঁহার 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা' কাব্যে পরিপুষ্টি এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমারী দেবী, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতির কবিতায় বিকাশ সাধিত হইয়াছে। 'সংগীত-শতক' কাব্য গুরুত্বপূর্ণ এ-কারণে যে, এই কাব্যে বাস্তব জগতে প্রেমের কোনো লৌকিক প্রতিষ্ঠাভূমি নাই, আদর্শ-লোকেই তাহার স্থান—এই প্রত্যয়ভূমিতে কবি উপনীত হইয়াছেন এবং আদর্শায়িত প্রেমের সুরটিকে চড়া তারে বাঁধিয়া দিয়াছেন। 'সংগীত-শতক' ও 'প্রেমপ্রবাহিণী' কাব্যে 'সারদামঙ্গলে'র আগমনী সুর ধ্বনিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সে সুরের মহত্তম পরিণতি। তবে বিহারীলালের কবিতায় কল্পনার সঙ্গে প্রকাশের সার্থক সমন্বয় সব সময় হয় নাই।

আদর্শায়িত প্রেম-কবিতার আবার কয়েকটি উপবিভাগ করা যায়: নারী-বন্দনা, নারীপ্রেমের তত্ত্ব ও মাধুর্যের আলোচনা, নারীরূপের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা। নারীবন্দনার ধারাটি কেবল গীতিকাব্যে নহে, মহাকাব্যেও লক্ষ্য করা যায়। উনবিংশ শতকে নবজাগরণের প্রথম প্রহরে বাঙালি-মানস নারীমহিমা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। রেনেসাঁসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই নারীবন্দনা ও নারী-জাগরণ। বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে, সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা' কাব্যে, দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'নারীমঙ্গল' কবিতায় ও অক্ষয় বড়ালের 'এষা' কাব্যে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রিয়াপ্রেমই জীবনসাধনার শ্রেষ্ঠ ফল এবং এই প্রেমলাভের পর বিহারীলালের প্রশ্ন: "হেন ধরাধাম থাকিতে সমুখে, সুরলোকে লোকে কেন রে ধায়" এবং সিদ্ধান্ত: ধরণী স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কেননা, এখানে আছে "নারীর মতন সুখশান্তিময়ী অমৃতলতা" (বঙ্গসুন্দরী)। এই ধরণী-প্রীতি ও নারীপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার অনুস্থতি লক্ষ্য করি 'মহিমা' কাব্যে; সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নারীবন্দনার ভিত্তিভূমি অতিশয় প্রাকৃত প্রেমচেতনা। দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'নারীমঙ্গল' কবিতার উপজীব্য সৌন্দর্যপ্রতিমা গৃহলক্ষ্মী, অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা' কাব্যে তাহারই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি: "মানবীর তরে কাঁদি, যাচি না দেবতা"। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে নারীর প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই দৃষ্টিভঙ্গিরই অনুসৃতি, 'চিত্রাঙ্গদা', 'কাহিনী', 'ক্ষণিকা', 'বলাকা',

'পলাতকা', 'মহুয়া' কাব্যের নারীবন্দনাসূচক কবিতাগুচ্ছ তাহার পরিচায়ক। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য 'ক্ষণিকা' কাব্যের 'কল্যাণী' কবিতাটি। সেখানে যে শান্তিদায়িনী গৃহলক্ষ্মীর বন্দনা, তাহা উপরি-উক্ত কবিতানিচয়ে বন্দিতা নারী অপেক্ষা ভিন্নতর নহে।

আদর্শায়িত প্রেম-কবিতার মূলধারা—নারীপ্রেমের তত্ত্ব ও মাধুর্য আলোচনার ধারা। এখানে রোমান্টিক সৌন্দর্যলোকে কবিকল্পনার অবাধ বিস্তার—প্রেমের মহিমা-খ্যাপন ও প্রেমসৌন্দর্যের প্রতিমা নারীর আরতি। ইহার প্রথম সার্থক পরিচয় পাই বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'শরৎকাল' কাব্যের 'নিশান্ত-সঙ্গীত' কবিতাটিতে। এখানে "শুধুই দাম্পত্য-প্রেমের পূর্ণ সুখ-সম্ভোগ নয়; এ প্রেম বিশ্বজীবনের সঙ্গে কবিহৃদয়কে যুক্ত করিয়াছে; কবির চিত্তাকাশে দিগন্ত-ব্যাপিনী উষার সমারোহে মঙ্গল-আরতি গানের সঙ্গে সঙ্গে নিশি অবসান হইতেছে।" (মোহিতলাল, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য')। এ-কাব্যের আরেকটি কবিতা সমান গুরুত্বপূর্ণ: 'নিশীথ-সঙ্গীত'। এখানে প্রেমসাধনায় কবির অবিচল নিষ্ঠা ও অনন্যমুখিতা বিহারীলালের রোমান্টিক প্রেমধ্যানকে বিশিষ্টতা দিয়াছে। কবি বাস্তবচ্যুত হন নাই, একান্ত অবাস্তবে তাঁহার আস্থা নাই, এ-প্রেম তাঁহার জীবনে ধ্রুবসত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত।

দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অশোকগুচ্ছ' কাব্যে (পূর্বোল্লিখিত কবিতাগুলিতে) ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের জয়-ঘোষণা, সেখানে তীব্র তৃষা ও অসহ্য আবেগ, আর 'গোলাপগুচ্ছ' কাব্যে বিহারীলালের পথে আদর্শায়িত প্রেমের কাব্যরূপায়ণ—এখানে পিপাসার পরিবর্তে তৃপ্তি, বিরহের স্থানে মিলন, উন্মত্ত হাহাকারের পরিবর্তে শান্ত সম্ভোগ। দেবেন্দ্রনাথের এই কাব্যে আদর্শায়িত প্রেম বিশেষে ধরা দিয়াছে, তাহার প্রমাণ 'পরশমণি', 'দীপ হস্তে যুবতী', 'প্রথম চুম্বন' ও 'শেষ চুম্বন'। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রিয়তমার প্রতি' ও 'কোন একটি পাখীর প্রতি' কবিতাদ্বয়ে এই আদর্শায়িত প্রেমের কাব্যরূপায়ণের ব্যর্থ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অপরপক্ষে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভুলে যাও না বলিলে ভুলিতাম তায়' কবিতাটিতে প্রেমের স্থূল ইন্দ্রিয়োপভোগকে অতিক্রম করিয়া আদর্শলোকে উত্তরণের প্রয়াস লক্ষ্য করি।

আদর্শায়িত প্রেমের সাধনায় গত শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথের তিনজন সহযাত্রী ছিলেন। 'মানসী' ও 'সোনার তরী' কাব্যে সর্বজগদ্‌গত প্রেমের

যে অভিযাত্রা সূচিত হইয়াছে, তাহার অনুরূপ সাধনার পরিচয় পাই সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দোলা', বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্রাবণ' ও প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'পদ্মা' ও 'গীতিকা' কাব্যে। রোমান্টিক প্রেমসাধনায় আদর্শায়িত রূপের মহত্তম প্রকাশ উক্ত রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে সঙ্গে সদ্যোল্লিখিত কাব্যগুলিতেও পাওয়া যায়। বর্তমান সংকলনের প্রথম খণ্ডে ধৃত এই তিনজনের কবিতায় তাহার সমর্থন পাই। রবীন্দ্রকাব্যভাবনায় বিধৃত মানসসুন্দরী ইঁহাদের কাব্যকল্পনাতেও ধরা দিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই কবিতানিচয়ে রহিয়াছে।

মহিলা-কবিদের কবিতায় এই আদর্শায়িত প্রেমেরই পরিচয় পাই—যদিও তাহা সার্থকতার উচ্চস্তরে উপনীত হইতে পারে নাই। আর হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের খণ্ডকাব্যে আদর্শায়িত প্রেমের যে কাব্যরূপায়ণ লক্ষ্য করি, তাহাও খুব সার্থক নহে। অক্ষয়কুমার বড়ালের 'কনকাঞ্জলি' ও 'এষা' কাব্য হইতে গৃহীত কবিতানিচয়ে ইহার সার্থক পরিচয় লাভ করি। অক্ষয়কুমার যে প্রেমের সাধনা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবে ধরা দেয় না। অশরীরী রোমান্টিক সৌন্দর্যের অসীমতা, গভীরতা, সূক্ষ্মতা ও দেহাতীত ছায়া তাঁহার ধ্যানে রূপ লাভ করিয়াছে। অক্ষয়কুমারের 'স্বপ্ন-রাণী', 'শত নাগিনীর পাকে' ও 'হৃদয় সমুদ্রসম' কবিতার সহিত তুলনায় রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয়যমুনা' ও 'ঝুলন' (সোনার তরী) এবং সুধীন্দ্রনাথের 'ভিখারী' (দোলা) কবিতা স্মর্তব্য। এগুলিতে মৃত্যুর সহিত প্রেমরহস্য এক হইয়া গিয়াছে। এই সংকলনে ধৃত সরোজকুমারী দেবীর 'হাসি ও অশ্রু' কাব্যের কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরীর' কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সরোজকুমারীর 'সাধনা' কবিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' (চিত্রা) কবিতার আশ্চর্য সাদৃশ্য প্রমাণ করে, প্রেমের রহস্যময় রূপধ্যানে এবং তাহার অতিবাস্তব পরিণতি-চিত্রণে, সংসারে প্রেমলাভের ব্যর্থতা-প্রদর্শনে এবং জীবনাধিষ্ঠাত্রীর চরণে আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতায় গত শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রীর অভাব ছিল না।

ইন্দ্রিয়াশ্রিত এবং আদর্শায়িত প্রেম-কবিতায় প্রায়শঃই দাম্পত্য-রসের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। গত শতকের বাঙালির গৃহগতপ্রাণতা ও গৃহের সীমানায় অনন্ত সৌন্দর্য-দর্শনের প্রয়াসরূপে এই বৈশিষ্ট্যটি আমাদের মনোযোগ দাবি করে। বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজের কবিতায় দাম্পত্য-রসের কবিতা পাওয়া যায়। কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন

চট্টোপাধ্যায়, পরিমলকুমার ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, অপরাজিতা দেবী প্রমুখের কবিতায় ইহার পরিচয় মিলে। সাম্প্রতিককালে দাম্পত্য-রসের কবিতা আর লিখিত হয় না, তাই প্রেম-কবিতার বিগত বৈশিষ্ট্যরূপেই ইহা বিচার্য।

প্রেম-কবিতার চতুর্থ বিভাগ: প্লেটোনিক প্রেম-কবিতা। বিশ্বসৃষ্টিরহস্য-ভেদকারী কল্পনার উচ্চস্তরাশ্রিত এই শ্রেণীর কবিতা কেবল বিহারীলাল চক্রবর্তী ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পাই। প্লেটোনিক প্রেমের শ্রেষ্ঠ কবি শেলী। তাঁহার 'Alastor', 'The Revolt of Islam', 'Prometheus Unbound', 'Epipsychidion' কাব্যগুলি ইহার পরিচয়স্থল। প্লেটো তাঁহার বিখ্যাত 'Symposium' গ্রন্থে প্রেমের স্বরূপব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, প্রেম কেবল মানুষের জৈবিক সম্বন্ধ নহে, ইহা সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত নীতি। এই প্রেম আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য-ও-শক্তি-বিশিষ্ট। এই সৌন্দর্যের একটি বাস্তবাতিরিক্ত শক্তি ও মাহাত্ম্য আছে। 'Epipsychidion' কাব্যে প্লেটোনিক প্রেমের চরম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এ-কাব্যের নায়িকা অনন্ত সৌন্দর্যের প্রতিমা; শেলীর জীবনবোধ ইহার অধ্যাত্মদীপ্তিতে ভাস্বর; তিনি এই অপসরণশীল চঞ্চল অস্থির জ্যোতির্ময় সৌন্দর্যের প্রেমধ্যানে বিভোর হইয়াছিলেন। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' ও 'সাধের আসন' কাব্যে এবং রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' কাব্যে প্লেটোনিক প্রেমের সার্থক পরিচয় বিধৃত হইয়াছে। এই ঐশী, বিশ্বব্যাপী অধ্যাত্ম-সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রেম ও বাংলা কাব্যে ইহার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা "উনবিংশ শতকের বাংলা গীতিকাব্য" গ্রন্থে [অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়-প্রণীত] করা হইয়াছে।

॥ পাঁচ ॥

দেশপ্রেমের কবিতার উদ্ভব উনবিংশ শতকের মধ্যবিন্দুতে, তাহার বিস্তার বর্তমান শতক পর্যন্ত। আধুনিক যুগেই বাঙালি কবি স্বদেশপ্রেমের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়াছেন। গত শতকের পূর্বে স্বদেশকে পৃথকভাবে বন্দনা করা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "স্বাদেশিক ঐক্যের মাহাত্ম্য আমরা ইংরেজের কাছে শিখেছি। জেনেছি এর শক্তি, এর গৌরব।" ('বাংলাভাষা পরিচয়')। ইংরেজি দেশপ্রেমের কবিতার উপজীব্য সামরিক দেশপ্রেম, বাংলা কবিতায় অতীত

শৌর্যগাথার বন্দনা ও দেশমাতৃকার রূপধ্যান। দেশপ্রেমের প্রথম ইঙ্গিত পাই ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে। কিন্তু তাহা সংকীর্ণ আঞ্চলিক দেশপ্রেম ; তাঁহার বিরোধ ইংরেজ রাষ্ট্রশক্তির সহিত নহে, ইংরেজি সভ্যতা-সংস্কৃতির সহিত। তথাপি স্বদেশ-প্রেমের কথা প্রথম তিনিই উচ্চারণ করিয়াছেন :

স্বদেশের প্রেম যত সে-ই মাত্র অবগত
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাবতুলি ধ্যানে ধরে চিত্রপটে চিত্র করে
স্বদেশের সকল ব্যাপার।

মাতৃভাষা, মাতৃভূমি ও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রেম গৃহগত, তাহা যুযুধান-মনোবৃত্তি সম্পন্ন ছিল না। স্বাধীনতার সচেতনতা হয়ত তাঁহার ছিল, কিন্তু সেজন্য ব্যাকুলতা ও ক্ষুধা ছিল না। আর রামমোহন হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত কেহই ইংরেজ শাসনের বিরোধী ছিলেন না, এ-কথাও স্বীকার্য। বস্তুতঃ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যেই আধুনিক দেশপ্রেমের প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে রোমান্স-রসের মধ্য দিয়া বাহির-বিশ্ব ও সংগ্রামী দেশপ্রেমের চেতনার সহিত রঙ্গলাল আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। রাজপুত জাতির শৌর্যগাথার বর্ণনা ও মধ্যযুগস্মৃতিচারণার পথে রঙ্গলাল আমাদের দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বোধিত করিলেন। তাঁহার স্মরণীয় চরণ 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' যতই উচ্ছ্বাসবহুল হোক, যতই কাব্যমূল্যে অকিঞ্চিৎকর হোক, ইহার মধ্যেই বাঙালির দেশপ্রেম প্রথম সার্থক প্রকাশ লাভ করিয়াছে। ইংরেজ কবি Moore-রচিত 'From Life without freedom. Oh! who would not fly' কবিতার প্রভাব এখানে অতিস্পষ্ট। এখান হইতেই দেশপ্রেমের কবিতার যাত্রা শুরু হইয়াছে। ইংরেজি দেশপ্রেমের দার্ঢ্য ও সংগ্রামী চেতনা, দম্ভ ও আত্মবিশ্বাস হয়ত সেদিন বাংলা দেশপ্রেমের কবিতায় ছিল না, কিন্তু তাহার ক্ষতিপূরণ হইয়াছে দেশমাতৃকার রূপধ্যানে—বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্‌' গানে তাহার সার্থক প্রকাশ লক্ষ্য করি। রঙ্গলাল-মধুসূদনের কাব্যে দেশপ্রেমের যে প্রকাশ, জাতীয় গৌরববোধের যে অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়, তাহা মহাকাব্যের আনুষঙ্গিক সুরমাত্র। স্বতন্ত্র মর্যাদায় দেশপ্রেমের গান রচিত হইয়াছে হিন্দুমেলার যুগে (১৮৬৭)। বর্তমান সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ডে দেশপ্রেমের যে কবিতাগুলি গৃহীত হইয়াছে, সেগুলি গত শতকের শেষপাদে ও বর্তমান শতকের

প্রথমপাদে রচিত। দেশপ্রেমের কবিতা ও গানের শ্রেষ্ঠ ফসল রবীন্দ্রনাথের, তাহা স্বীকার করিয়াই অন্যান্য কবির রচনা এখানে সংকলিত হইয়াছে। আলোচ্যমান কবিতানিচয়ের পাঁচটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়—(ক) বঙ্গভূমির চিন্ময়ী মাতৃরূপে বন্দনা, (খ) অখণ্ড ভারতবর্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতজননীর বন্দনা, (গ) পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভের জন্য বিলাপ, (ঘ) দেশসেবায় জীবনোৎসর্গের উৎসাহ ও প্রেরণা দান, এবং (ঙ) মাতৃভাষার বন্দনা।

॥ ছয় ॥

গার্হস্থ্যজীবনের কবিতা গত শতকের কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। রোমান্স-রসের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত পরিবেশে নবীন সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস রূপেই এই বিভাগের কবিতা বিচার্য। ইংরেজি কাব্যপাঠান্তে সেদিন বাঙালি কাব্য-রসিক জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিপুলতা ও বৈচিত্র্যের, সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রকাশ দেখিয়াছিল; তখন জীবনের অতি তুচ্ছ বিষয়ও অপরূপ মহিমামণ্ডিত হইয়াছিল। তাই সেদিনের গার্হস্থ্যচিত্রের সৌন্দর্যও নব-উদ্বোধিত বিস্ময় ও আনন্দ-দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল। সেদিন বাঙালির গার্হস্থ্যজীবন সুখ, শান্তি ও আনন্দের নিকেতন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। সেই সুখস্বপ্নের পিছনে ছিল সামাজিক দৃঢ়-সংস্থিতি ও মানসিক আনন্দবোধ। এই সংস্থিতি ও আনন্দবোধ, প্রথম আবিষ্কারের কৌতূহল ও বিস্ময় পরবর্তী যুগে গার্হস্থ্য-বন্ধন শিথিল হইবার ফলে, চিত্তের সর্বগণ্ডীমুক্ত মানসবিহারপ্রবণতার জন্য, আর বিশেষ দেখা যায় নাই।

গার্হস্থ্যজীবনের আলেখ্য-রচনায় গত শতকের মহিলা-কবিরাই নন, সেই সঙ্গে খ্যাতনামা পুরুষ কবিরাও অগ্রসর হইয়াছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কুসুমকুমারী দাস, মানকুমারী বসু, কামিনী রায় প্রমুখ মহিলা-কবিদের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, নিত্যকৃষ্ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় গার্হস্থ্যচিত্র অংকন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠিক গার্হস্থ্যচিত্র আঁকেন নাই। তবে তাঁহার প্রথমযুগের কোন কোন কবিতায় গার্হস্থ্যজীবন হইতে বিচ্ছুরিত কল্পনাদীপ্তি বিধৃত হইয়াছে। এই শ্রেণীর কবিতায় দাম্পত্যরস, বাৎসল্যরস, সখ্যরস এবং গৃহজীবনের সম্রাজ্ঞী বধূ-বন্দনাভিত্তিক মধুর রসের কাব্য-রূপায়ণ লক্ষ্য করি। বর্তমান শতকের

প্রথমপাদে রমণীমোহন ঘোষ, রজনীকান্ত সেন, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, পরিমলকুমার ঘোষ ও যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতায় গার্হস্থ্যজীবনালেখ্য পাওয়া যায়। বাংলা কাব্যসংসার হইতে এই শ্রেণীর কবিতা প্রায় অপসৃত হইয়াছে।

গার্হস্থ্যচিত্রমূলক যে গীতিকবিতা বর্তমান সংকলনের তৃতীয় খণ্ডে পাই, সেগুলি চারটি উপবিভাগে বিভক্ত করা চলে: (ক) বাঙালির শান্তি-নিকেতন সংসারের আলেখ্য; (খ) জননীর প্রতি সন্তানের ভালবাসা, (গ) সন্তানের প্রতি জননীর ভালবাসা—ঘরে ও বাহিরে, ও (ঘ) শিশুসৃষ্ট জগতের ও শিশুর স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার আলেখ্য। এক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অপূর্ব শিশুমঙ্গল' ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মন্দ্র', 'আলেখ্য' ও 'আর্যগাথা' (২য়) কাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ সাত ॥

উনবিংশ শতকের বাংলা প্রকৃতি-কবিতা পাশ্চাত্ত্য কাব্য-পরিচয়জাত। বৈষ্ণব কাব্যে যে প্রকৃতি-বর্ণনা আছে, তাহা আধুনিক প্রকৃতি-কবিতার পুরোধার সম্মান দাবি করিতে পারে না এজন্য যে, সেখানে প্রকৃতি বিশিষ্ট চরিত্ররূপে দেখা দেয় নাই। বৈষ্ণব কাব্যে প্রকৃতি রাধাকৃষ্ণের প্রেমের পটভূমি, উদ্দীপন-বিভাব মাত্র, তাহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। অধ্যাত্ম-অনুভূতি বা ভীতি-শাসিত কবিমানসে প্রকৃতির প্রাধান্য লাভের কোনো সুযোগ ছিল না, সেখানে প্রকৃতি রূপকাত্মক নিসর্গচিত্র মাত্র। বৈষ্ণব কবির ব্যাকুলতা বৃহৎ গোষ্ঠীর ব্যাকুলতা, ব্যক্তিগত পরিচয় সেখানে ক্ষীণ। আধুনিক ব্যক্তিপ্রধান গীতিকাব্য এখানেই স্বতন্ত্র। বৈষ্ণব কবিতার গোষ্ঠীচেতনা সার্থক প্রকৃতি-কবিতা-রচনার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈষ্ণব কবির প্রকৃতি-প্রীতি রাধাকৃষ্ণপ্রেমের দিব্যলীলার দ্যুতি-উদ্ভাসিত; তথাপি যেন মনে হয় এই লীলাকে উপলক্ষ করিয়াই কিছুটা প্রকৃতি-সৌন্দর্য-মোহ কবিচিত্তে জাগিয়াছে।

ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা কাব্যে বহু নূতনত্বের প্রবর্তনা করেন, তাহার অন্যতম নিসর্গ-বর্ণনা। ঈশ্বর গুপ্তের 'ঋতু-বর্ণন' ছয় ঋতুর ব্যবহারিক সুখ-দুঃখের বর্ণনামাত্র। কিন্তু নিসর্গ যে কবিতার বিষয়বস্তু হইতে পারে, তাহার যে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় আছে, তাহার প্রথম স্বীকৃতি এখানেই পাই।

মধুসূদন দত্তের কাব্যে প্রকৃতি-বর্ণনা আছে। কিন্তু তাহা বহিরঙ্গমূলক, অন্তরের অনুভূতির সহিত নিঃসম্পর্ক। ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও মেঘনাদবধ কাব্যে প্রকৃতিতে ব্যক্তিত্ব-আরোপ আলংকারিক রীতিতেই পরিসমাপ্ত। প্রকৃতির সহিত আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপনে মধুসূদনের নায়িকারা মহাকবি কালিদাসের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। অবশ্য চতুর্দশপদী কবিতাবলীর কোনো কোনো কবিতায় (যেমন, 'দেবদোল', 'বটবৃক্ষ', 'বিজয়াদশমী') প্রকৃতি কবির অনুভূতি ও বেদনার স্পর্শে চেতনাময়ী হইয়া উঠিয়াছে।

মধুসূদন পর্যন্ত বাংলাকাব্যে নিসর্গ-চেতনা ভাবনিষ্ঠতার নিবিড়তায় বিশেষ দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। হেমচন্দ্র বিহারীলালের কবিতায় নিসর্গ চেতনা পূর্ণতর রূপের দিকে অগ্রসর হইল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তিনটি কাব্যে নিসর্গ-চেতনা প্রথম সার্থক কাব্যরূপে দেখা দিল; সে তিনটি কাব্যের নাম—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবিতাবলী', বিহারীলালের: 'নিসর্গ-সন্দর্শন' ও 'বঙ্গসুন্দরী'। অবশ্য ইহারই পূর্বে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সংগীত-শতক' কাব্যে বিহারীলাল আত্মলীন দৃষ্টিতে অনুভূতিশীল নিসর্গচিত্র অংকন করেন, ৯৯ সংখ্যক কবিতাটি তাহার প্রমাণ। সেখানে বিহারীলাল বলিয়াছেন: 'প্রণয় করেছি আমি প্রকৃতি-রমণী সনে, যাহার লাবণ্যচ্ছটা মোহিত করেছে মনে': ইহা বিশুদ্ধ পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি।

এই দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারি এইভাবে—অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ প্রকৃতির মধ্যে রহস্য-সন্ধানের নিরন্তর প্রয়াস, অপরিচয়ের রহস্য মিশাইয়া প্রকৃতি-রমণীর সৌন্দর্যোপভোগের ব্যাকুলতা, মানব ও প্রকৃতির মধ্যে দূরত্বের আবিষ্কার ও তাহা উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াস, রোমান্টিক অস্পষ্টতার মধ্য দিয়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত এবং অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া প্রকৃতি-সুন্দরীর সহিত পরিচয়-স্থাপন ও প্রেম-সাধন।

এই দৃষ্টিভঙ্গির সার্থক পরিচয় পাই বিহারীলালের 'নিসর্গ-সন্দর্শন' ও 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে; 'সারদামঙ্গল' ও 'সাধের আসন' কাব্যে তাহার পূর্ণ পরিণতি। 'নিসর্গ-সন্দর্শন' কাব্যে বিহারীলাল শেলী ও বায়রণের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন আর 'কবিতাবলী'তে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঋণ শেলীর নিকট। 'নিসর্গ-সন্দর্শন' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের সমুদ্র-বর্ণনার মূল বায়রণের Childe Harold কাব্যের চতুর্থ সর্গের Ocean কবিতাংশ, আর হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী'র 'চাতক পক্ষীর

প্রতি' কবিতার মূল শেলীর 'To a Skylark'। নবীনচন্দ্র সেনও তাঁহার 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যে ইংরেজি রোমান্টিক প্রকৃতিদৃষ্টির অনুসরণ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ 'কে তুমি' কবিতাটি, ওয়ার্ডস্‌ওঅর্থের Lucy কবিতাটি ইহার উৎস।

বর্তমান সংকলনের চতুর্থ খণ্ডে বিধৃত প্রকৃতি-কবিতানিচয়ে কয়েকটি বিশেষ ধারা লক্ষ্য করা যায়: রূপকাত্মক নিসর্গ, প্রকৃতিতে ব্যক্তিত্ব-আরোপ, অনুভূতিশীল নিসর্গ, প্রকৃতিতে নীতি-আরোপ। ইহার মধ্যে বলাই বাহুল্য, অনুভূতিশীল নিসর্গচিত্রণই সর্বোত্তম প্রকৃতি-কবিতা; তাহাতে গত শতকের বাঙালি কবিদের সাফল্য নগণ্য নহে। বিশেষ উল্লেখ দাবি করিতে পারেন—দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও মানকুমারী বসু।

প্রকৃতি-কবিতা যে ক্রমশঃ পরিণত, পরিপক্ব ও রসগাঢ় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এই চারজনের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতি-কবিতায় উদ্বেল বর্ণবৈভব, প্রখর ইন্দ্রিয়চেতনা ও চটুল কল্পনাবিলাস দেখা যায়। বর্তমান সংকলনের চতুর্থ খণ্ডে ধৃত কবিতাগুলি তাহার পরিচায়ক। অক্ষয়কুমারের প্রকৃতি-কবিতায় অনুগ্র, অনুচ্ছ্বসিত, বর্ণবিরল পটভূমিতে রোমান্টিক বিষাদের প্রতিমা প্রকৃতি-রমণীর সাক্ষাৎ মিলে। আধ-আলো-ছায়াময়ী সন্ধ্যা ও রহস্যরূপিণী জ্যোৎস্না-যামিনী অক্ষয়কুমারের কবিকল্পনার অনুকূল, আর দেবেন্দ্রনাথের পরিকল্পনা চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্র-মদিরা-পানে বিভোর অশোকের রঙে, চম্পকের সৌরভে, গোলাপের রক্তরাগে অসহ উল্লাসে আত্মপ্রকাশ করে। অক্ষয়কুমার বর্ষা ও সন্ধ্যার কবি, দেবেন্দ্রনাথ গ্রীষ্ম ও দ্বিপ্রহরের কবি।

এ-প্রসঙ্গে আর দুইজনের নাম অবশ্য উল্লেখ্য। একজন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—তাঁহার 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের যে নিসর্গ-বর্ণনা, তাহার স্বতন্ত্র বর্ণনাভঙ্গি ও প্রকৃতির রহস্যময় আলেখ্য-অংকন-নৈপুণ্য রসিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অপরজন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—তাঁহার 'মন্দ্র' ও 'আলেখ্য' কাব্যের প্রকৃতি-চিত্রণে যে অনন্যসুলভ স্বাতন্ত্র্য—প্রত্যক্ষতার প্রতি ঝোঁক ও ভাবালুতার বিরোধিতা, তাহা বিশেষ মনোযোগ দাবি করে।

গত শতকের কবিরা প্রকৃতি-চিত্রণে কিরূপ দক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা বর্তমান সংকলনের চতুর্থ খণ্ডের কবিতাপাঠে বোঝা যায়। প্রাথমিক শিশুসুলভ মুগ্ধ দৃষ্টি ও সরল বিস্ময়বোধ ত্যাগ করিয়া কবিরা প্রকৃতিতে নীতি ও মানবতা

আরোপ করিয়াছেন। তারপর, আপন হৃদয়-বীণার তন্ত্রীতে প্রকৃতির সুরটি বাঁধিয়া লইয়াছেন। সেখানে প্রকৃতি আর অনায়ত্ত নহে, সে মানুষের সখী হইয়াছে। কবিরা প্রকৃতিতে কেবল আনন্দ সন্ধান করেন নাই, হৃদয়বেদনার সমর্থনও পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রকৃতি-কবিতা নবীন অর্থগৌরবে ও নবতর ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হইয়াছে। পূর্ববর্তী কবিদের প্রকৃতি-উপাসনার সকল সুফল তাঁহার কাব্যে ধরা দিয়াছে। 'সোনার তরী' কাব্যের 'বসুন্ধরা' কবিতায় যে প্রকৃতি-প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা গত শতকের প্রকৃতি-সাধনার চূড়ান্ত ফল। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর-সাধনের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়াই তাহার দিকে আলিঙ্গনের ব্যগ্রবাহু বিস্তার করিয়াছেন। এই প্রেমের প্রকাশেই প্রকৃতি-কবিতা নবজন্ম লাভ করিয়াছে।

॥ আট ॥

আধুনিক গীতিকবিতার জন্মলগ্নেই হাহাকার ও বিষাদের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। নবযুগের দ্বারী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় ইহার প্রথম সাক্ষাৎ মিলে। বর্তমান সংকলনের পঞ্চম খণ্ডে ধৃত বিষাদ-কবিতাগুচ্ছের প্রথম কবিতা ঈশ্বর গুপ্তের 'আত্মবিলাপ'। এখানে দেখি, গুপ্ত-কবি জীবনের ব্যর্থতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, ব্যর্থতার ক্রন্দনধ্বনি এ কবিতায় শোনা যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা কবিওয়ালার হাতে শব্দক্রীড়ায় পরিণত হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যর্থতার পরই পাই মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ'। গত শতকের মধ্যবিন্দুতে বাঙালি সমাজের দ্বিধাবিভক্ত আন্দোলিত তরুণ মানসের আন্তরিক বেদনা ও হাহাকার এই কবিতায় ধ্বনিত হইয়াছে। আর এই বেদনাতেই আধুনিক গীতিকবিতার জন্ম হইয়াছে। মধুসূদনের ব্যাকুল আত্মবিলাপে বিষাদ-কবিতারও সূচনা।

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের বিষাদ-কবিতায় অনুরূপ সাফল্য ঘটে নাই, এজন্য দায়ী হেমচন্দ্রের তথ্যসঞ্চয়ন ও তত্ত্বপ্রবণতা এবং নবীনচন্দ্রের তরল ভাবোচ্ছ্বাস ও দীর্ঘ বক্তৃতা। পঞ্চম খণ্ডে ধৃত হেমচন্দ্রের 'বিভু কি দশা হবে আমার', 'জীবন-সঙ্গীত', 'পরশমণি' ও নবীনচন্দ্রের 'একটি চিন্তা', 'হতাশ' কবিতা ইহার পরিচয়স্থল।

বাংলা কাব্যে রোমান্টিক বিষাদ প্রবর্তনের কৃতিত্ব বিহারীলাল চক্রবর্তীর

প্রাপ্য। 'সংগীতশতক' ও 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে তাহার প্রথম পরিচয় মিলে। 'সারদামঙ্গল' কাব্যে ইহার পরিণতি ঘটিয়াছে। সেখানে বাস্তব ও আদর্শের অনতিক্রমণীয় ব্যবধান, অপ্রাপণীয় সৌন্দর্যের মরীচিকা-আহ্বানে পথভ্রান্তি, বিষাদ-ছুরিকায় কবিহৃদয়কে শতধা বিদীর্ণ করার ব্যাকুলতা কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। স্বপ্নভঙ্গের বেদনাই ['সারদামঙ্গল'] কাব্যের বেদনা, রোমান্টিক বিষাদের যাত্রারম্ভ এখানেই। আশার ছলনায় প্রতারিত জীবনের বেদনা ও প্রিয়জন-বিচ্ছেদে শূন্যতাবোধের হাহাকার অপ্রধান কবিদের রচনায় লক্ষ্য করা যায়।

গত শতকের বিষাদ-কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য—মহিলা-কবিদের কবিতায় বিষণ্ন সুর। তাহাই মহিলা-কবিদের রচনার প্রধান সুর। গত শতকের মহিলা-রচিত কাব্য প্রায় গোটাটাই উৎসারিত হইয়াছে কোনো শোকবিধুর সান্দ্র-উপত্যকা হইতে। মহিলা-কবিদের ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতাই ইহার মূল। জীবনের শোকতাপ ইহাদের কবিতায় একটি অকপট আন্তরিকতা দান করিয়াছে। রূপকর্মে ও কাব্যপ্রসাধনে দক্ষা না হওয়া সত্বেও আন্তরিকতার জোরেই হৃদয়াবেগকে ইহারা সফলতার স্তরে উত্তীর্ণ করিয়াছেন। গত শতকের পুরুষ-কবিদের অপেক্ষা মহিলা-কবিদের আন্তরিকতা এক্ষেত্রে বেশি ছিল বলিয়াই মনে হয়। বর্তমান সংকলনের পঞ্চম খণ্ডে ধৃত কবিতা হইতে ইহার প্রমাণ মিলিবে।

উনবিংশ শতকের শেষ পাদে কবিতার বিষয়বস্তুরূপে বিষাদ ও শোকের বহুল ব্যবহার হইয়াছে, একথা এখানে স্মর্তব্য। অন্ততঃ পঁচিশটি দীর্ঘ শোকগাথা কাব্য রচিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, ইহা সাহিত্য-প্রথারূপে প্রচলিত হইয়াছিল।

প্রিয়জনবিচ্ছেদজনিত শোকজাত দুইটি কাব্যের উল্লেখ এখানে কর্তব্য : অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা' ও রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ'। এ দুই কাব্যে দেখি শোকাঘাতে কবির নবদৃষ্টিলাভ—ব্যক্তিগত শোককে বিশ্বগত সর্বসঞ্চারী বিষাদে পরিণত করার ব্যাকুলতা। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আলেখ্য' কাব্যের তিনটি কবিতা—'হতভাগ্য' 'বিপত্নীক' ১, ২—এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

বিশুদ্ধ রোমান্টিক বিষাদ বিহারীলালের কাব্য [সংগীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, সারদামঙ্গল] উৎসারিত হইয়াছিল। তারপর আর কেহ এ সুরের সদ্ব্যবহার

করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ এই সুরে কাব্যবীণা ঝংকৃত করিলেন। 'কবিকাহিনী' হইতে 'সন্ধ্যাসংগীত' পর্যন্ত পর্বে রোমান্টিক বিষাদের বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়। এই কাঁচা রোমান্টিকতার দিন শেষ হইয়াছে 'মানসী' কাব্যে। তবে বিষাদ রবীন্দ্র-কাব্যে বরাবরই বর্তমান। অল্প বয়সে রবীন্দ্রনাথের বিষাদের মূল—'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ'—এ-ক্রন্দন বিকাশের ও প্রকাশের জন্য। পরিণত বয়সে তাঁহার বিষাদের মূলে আছে—'আমি সুদূরের পিয়াসী' —সুদূরের পিয়াসার মূলে রহিয়াছে অসীমের জন্য সীমার ক্রন্দন। একদিকে এই পূর্ণতার জন্য ক্রন্দন ও বিষাদ, আরেক দিকে আছে উপনিষদের আনন্দবাদ—'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'—তখন আনন্দ-বচন— 'যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি, ধন্য এ মোর ধরণী'। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই দুই ধারাই পাশাপাশি চলিয়াছে গঙ্গা-যমুনার মতো; আনন্দ ও বিষাদ, মিলন ও বিরহ চলিয়াছে আলো-আঁধারের মতো।

॥ নয় ॥

গীতিকবিতার উপাদান কি কেবল সূক্ষ্ম রোমান্টিক কাব্যভাবনা ও সুকুমার গীতিধর্মী হৃদয়বেদনা? তাহা কি তত্ত্বের ভার বহনে সক্ষম? কবিচিত্তের তত্ত্বভাবনা কি গীতিকাব্যের সার্থক রূপ লাভ করিতে পারে? গীতিকবিতা কি কেবল আত্মগত? তাহা কি বহির্জগতের তত্ত্বকে বিশুদ্ধ ভাবোচ্ছ্বাসের স্তরে উত্তীর্ণ করিতে সক্ষম?

তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতার আলোচনায় উপরোক্ত সংশয় কাব্যপাঠকের মনে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক।

এ-সকল প্রশ্নের কোন সহজ সমাধান নাই। সমাধান দিতে পারে কেবল কবিপ্রতিভা, যাহা 'অলৌকিকবস্তুনির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞা'। তত্ত্বের গুরুভারকে গীতিকাব্যের লঘুতা, সৌকুমার্য ও চারুতা দান করা একমাত্র প্রতিভার পক্ষেই সম্ভবপর। বাহির হইতে কোনো পন্থানির্ণয় দুঃসাধ্য।

গীতিকবিতা সার্থকতা লাভ করে কখন? যখন কবিকল্পনা উদ্দীপিত হয়, তখন কার্যকারণশৃঙ্খলা ও তথ্য-তত্ত্বের বেড়াজাল অতিক্রম করিয়া একটি নিগূঢ়তর ব্যঞ্জনা ও নবতর সৌন্দর্য প্রকাশ লাভ করে, তখন কবিকল্পনা

পাঠকমনকে একটি নূতন অপ্রত্যাশিত আনন্দের স্তরে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। সুতরাং তত্ত্বাশ্রয়ী গীতিকবিতাও সার্থক হইতে পারে, ইহা স্বীকার্য।

ওয়ার্ডস্ওঅর্থ তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা প্রচুর লিখিয়াছেন, কখনো তাহা সম্পূর্ণ সার্থক, কখনো তাহা আংশিক সার্থক। 'Tintern Abbey' ও 'Ode to Immortality', দুইটিই তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা, কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রথমটির মত সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে নাই। শেলীর 'Adonais' বা 'Sensitive Plant' কবিতার সব কয়টি স্তবকই সম্পূর্ণ সার্থক নহে। আসল কথা, কবি যদি তত্ত্বের সার নিষ্কাশন করিয়া তাহাকে অনুভূতিলব্ধ সত্যে পরিণত ও গীতিসৌকুমার্যে জারিত করিতে পারেন, তবে তাহা সার্থকতা লাভ করিবে।

বাংলা তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতার প্রথম ভাণ্ডারী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। পারমার্থিক ও নৈতিক বিষয়ে তিনি প্রচুর কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহার কেনোটাই সার্থক গীতিকবিতার মর্যাদা দাবি করিতে পারে না। এগুলিতে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা আছে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে কোন তীব্রতা বা গভীরতা নাই; এগুলি সাধারণ কৌতূহলমাত্র, কোনো তীব্র আবেগ কবিচিত্তকে উদ্বেলিত করে নাই। তাই ঈশ্বর গুপ্তের 'নির্গুণ ঈশ্বর'-চিন্তা প্রত্যক্ষ অনুভূতি-জাত কাব্যসত্য নহে, তত্ত্বজিজ্ঞাসু মনের কৌতূহলমাত্র। বর্তমান সংকলনের ষষ্ঠ খণ্ডে ধৃত ঈশ্বর গুপ্তের 'কবি' ও মধুসূদন দত্তের 'কবি'—এ দুই কবিতার প্রতিতুলনায় উপরোক্ত মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে; ঈশ্বর গুপ্তে যাহা আবেগবর্জিত শুষ্ক তত্ত্বালোচনা মাত্র, মধুসূদনে তাহা অনুভূতিপ্রধান সত্যদিদৃক্ষা। আবার কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'ঈশ্বরই আমার একমাত্র লক্ষ্য' কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তের 'নির্গুণ ঈশ্বর' কবিতায় ধৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসা আছে। রামপ্রসাদ সেনের শাক্ত পদাবলীতে বা রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যে ভগবৎসাধনার যে সার্থক কাব্যরূপায়ণ আছে, তাহা ঈশ্বর গুপ্ত বা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কবিতায় নাই। আসল কথা, হৃদয়ের ব্যাকুলবেদনা হইতে যদি ভগবৎ-জিজ্ঞাসা উত্থিত না হয়, তবে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাধান্য লাভ করে, কাব্যোৎকর্ষের হানি ঘটে। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'ঈশ্বর-প্রেম' কবিতা তত্ত্বের দ্রবীভূত ছন্দোরূপমাত্র। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, অতুলপ্রসাদ সেনের ভগবৎসাধনার কবিতা সার্থক গীতিকবিতা; কেননা, সেখানে তত্ত্ব কাব্যপ্রেরণার অগ্নিতে শুদ্ধ হইয়া কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। শেষোক্ত কবিদের এই ধরণের কবিতায় আবিষ্কৃত অধ্যাত্ম-সত্য

ও তত্ত্ব, ঐ দুইয়ের মধ্যে সেতুযোজনা করিয়াছে কবিহৃদয়ের প্রবল গভীর আবেগ। এ প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতকের ইংরেজি কাব্যের তত্ত্বাভিমানী কবিগোষ্ঠীর (Metaphysical Poets) কথা স্মরণযোগ্য।

. উনবিংশ শতকের শেষ পাদেই বাংলাকাব্যে এই তত্ত্বাশ্রয়ী মননপ্রধান কবিতার সাক্ষাৎ মিলে। জড়বাদ, বিবর্তনবাদ, প্রকৃতির সহিত মানবের সম্পর্ক : গত শতকের সকল বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাই বাংলা কাব্যে আশ্রয় সন্ধান করিয়াছে; বর্তমান সংকলনের ষষ্ঠ খণ্ডে ধৃত কবিতাগুচ্ছ তাহার প্রমাণ। এখানে লক্ষণীয়, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র যেখানে তত্ত্বের কাব্যরূপ দানে ব্যর্থ হইয়াছেন, সেখানে বলদেব পালিত, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদাচরণ মিত্র, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতি অপ্রধান কবিরা সফল হইয়াছেন। গত শতকের শেষ দশক মহিলা-কবি-রচিত তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতার ঐশ্বর্য-যুগ। বর্তমান সংকলনই তাহার প্রমাণ।

॥ দশ ॥

উনবিংশ শতকের বাংলা গীতিকাব্যের যে পঁচাত্তরজন কবির কবিতা ছয় খণ্ডে বিধৃত হইয়াছে, তাঁহাদের কাব্যসাধনার সামগ্রিক পরিচয় বর্তমান সংকলনে পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ভূমিকার শেষে এই পঁচাত্তরজন কবির বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল। ১৮৬০ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ : অর্ধ-শতাব্দীর পর্বে রচিত কবিতা এই সংকলনে স্থানলাভ করিয়াছে। বর্তমান সংকলনে ধৃত পাঁচশত গীতিকবিতার মানস-পটভূমি ও কাব্যমূল্যের বিচার শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের "উনবিংশ শতকের বাংলা গীতিকাব্য" গ্রন্থে করা হইয়াছে।

এই সংকলন কাব্যানুরাগী পাঠকসমাজের তৃপ্তিসাধন করিলে আমরা শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা।
১ বৈশাখ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।
১৫ এপ্রিল, ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ॥

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

বর্তমান সংস্করণে বারোটি নূতন কবিতা সংযোজিত হইল: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মৃণাল', 'শ্যামবিলাসিনী', 'শ্রীমুখপঙ্কজ' ও 'বাজিয়ে যাব মল', মুন্সী কায়কোবাদের 'প্রেমের স্মৃতি', নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'স্বপ্ন', দীনবন্ধু মিত্রের 'প্রবাসীর বিলাপ', 'প্রভাত' ও 'মাণিকপীর', প্রিয়নাথ সেনের 'মানসী', 'শ্মশান' ও 'অচিরবসন্ত'। প্রথম সংস্করণের সংযোজন-অংশভুক্ত কবিতাগুলিকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। কবির সংখ্যা পঁচাত্তরের স্থলে আটাত্তর হইল।

প্রিয়নাথ সেনের কবিতা কবি-পুত্র শ্রীপ্রমোদনাথ সেন এবং শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে।

প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই সংস্করণ কাব্যানুরাগী পাঠকসমাজের তৃপ্তিসাধনে সক্ষম হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

॥ কবিদের বর্ণানুক্রমিক নাম-তালিকা ॥

(১) অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০—১৮৯৮)
(২) অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬৫—১৯১৮)
(৩) (রাজকুমারী) অনঙ্গমোহিনী দেবী
(৪) অন্নদাসুন্দরী ঘোষ (১৮৭৩—১৯৫০)
(৫) অন্নদাসুন্দরী দাসী
(৬) অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১—১৯৩৪)
(৭) আনন্দচন্দ্র মিত্র (১৮৫৪—১৯০৩)
(৮) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২—১৮৫৯)
(৯) ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬—১৮৯৭)
(১০) (মুন্‌শী) কায় কোবাদ (১৮৫৮—১৯৫২)
(১১) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১—১৯০৭)
(১২) কামিনীকুমার ভট্টাচার্য
(১৩) কামিনী রায় (১৮৬৪—১৯৩৩)
(১৪) কুঞ্জলাল রায়
(১৫) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৭—১৯০৬)
(১৬) কুসুমকুমারী দাশ (১৮৮২—১৯৪৮)
(১৭) গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪—১৯১২)
(১৮) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮—১৯২৪)
(১৯) গোপালকৃষ্ণ ঘোষ
(২০) গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫—১৯১৮)
(২১) গোবিন্দচন্দ্র রায় (১৮৩৮—১৯১৭)
(২২) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯—১৯২৫)
(২৩) দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪—১৮৯৮)
(২৪) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০—১৯২৬)
(২৫) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩—১৯১৩)
(২৬) দীনবন্ধু মিত্র (১৮১৯—১৮৭৩)

(২৭) দীনেশচরণ বসু (১৮৫১—১৮৯৮)
(২৮) দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮—১৯২০)
(২৯) নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর (১৮৫৩—১৯১৪)
(৩০) নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩—১৯২২)
(৩১) নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭—১৯০৯)
(৩২) নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১—১৯৪০)
(৩৩) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী (১৮৭৮—১৯০৬)
(৩৪) নিত্যকৃষ্ণ বসু (১৮৬৫—১৯০০)
(৩৫) নিস্তারিণী দেবী
(৩৬) পঙ্কজিনী বসু (১৮৮৩—১৯০০)
(৩৭) প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২—১৯৪৯)
(৩৮) প্রমীলা নাগ (বসু) (১৮৭১—১৮৯৬)
(৩৯) প্রভাবতী রায়
(৪০) প্রিয়নাথ মিত্র
(৪১) প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৪—১৯১৬)
(৪২) প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১—১৯৩৫)
(৪৩) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৮৯৪)
(৪৪) বরদাচরণ মিত্র
(৪৫) বলদেব পালিত (১৮৩৫—১৯০০)
(৪৬) বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০—১৮৯৯)
(৪৭) বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১—১৯৪২)
(৪৮) বিরাজমোহিনী দাসী
(৪৯) বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫—১৮৯৪)
(৫০) বিনয়কুমারী ধর (১৮৭২—)
(৫১) মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—১৮৭৩)
(৫২) মনোমোহন বসু (১৮৩১—১৯১১)
(৫৩) মানকুমারী বসু (১৮৬৩—১৯৪৩)
(৫৪) মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়
(৫৫) মৃণালিনী সেন (১৮৭৯—)

(৫৬) যোগেন্দ্রনাথ সেন

(৫৭) যোগীন্দ্রনাথ বসু

(৫৮) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭—১৮৮৭)

(৫৯) রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫—১৯১০)

(৬০) রমণীমোহন ঘোষ

(৬১) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫—১৮৮৬)

(৬২) রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯—১৮৯৪)

(৬৩) লজ্জাবতী বসু (১৮৭৪—১৯৪২)

(৬৪) (কাঙাল) হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩—১৮৯৬

(৬৫) হরিশ্চন্দ্র মিত্র (১৮৩৮—১৮৭২)

(৬৬) হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী (১৮৫৪—১৯৩০)

(৬৭) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০৩)

(৬৮) হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৭০—১৯২৫)

(৬৯) শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭—১৯১৯)

(৭০) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২—১৯২৩)

(৭১) সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫—১৯২৬)

(৭২) স্বর্ণলতা বসু

(৭৩) স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৭—১৯৩২)

(৭৪) সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯—১৯২৯)

(৭৫) সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮—১৮৭৮)

(৭৬) সুরমাসুন্দরী ঘোষ (১৮৭৪—১৯৪৩)

(৭৭) সরলাবালা সরকার (১৮৭৫—১৯৫৮)

(৭৮) সরলাদেবী চৌধুরাণী (১৮৭২—১৯৪৫)।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড ঃ প্রেম-কবিতা

বিষয়				পৃষ্ঠাঙ্ক

দ্বিতীয় খণ্ড : দেশপ্রেম-কবিতা

তৃতীয় খণ্ড : গার্হস্থ্যজীবন-কবিতা

বিষয় — পৃষ্ঠাঙ্ক

চতুর্থ খণ্ড ঃ প্রকৃতি-কবিতা

পঞ্চম খণ্ড : বিষাদ-কবিতা

ষষ্ঠ খণ্ড : তত্ত্ব-কবিতা

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

প্রথম খণ্ড ঃ প্রেম-কবিতা

প্রেম-কবিতা

সখী

মধুসূদন দত্ত

(১)

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—

মধুর বচন !

সহসা হইনু কালা ; জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,

আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ?

হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,

আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ ?

(২)

কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মরুভূমিতে

কুসুমকানন ?

জলহীনা স্রোতস্বতী, হবে কি লো জলবতী,

পয়ঃ সহ পয়োদে কি বহিবে পবন ?

হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,

আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারঞ্জন ?

(৩)

হায় লো সয়েছি কত, শ্যামের বিহনে—

কতই যাতন !

যে জন অন্তরযামী সেই জানে আর আমি

কত যে কেঁদেছি তার কে করে বর্ণন ?

হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,

আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকামোহন ?

(৪)

কোথা রে গোকুল-ইন্দু, বৃন্দাবন-সর—
কুমুদ-বাসন !
বিষাদ-নিশ্বাস-বায়, ব্রজ, নাথ, উড়ে যায়,
কে রাখিবে, তব রাজ, ব্রজের রাজন !
হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ ?

(৫)

শিখিনী ধরি, স্বজনি, গ্রাসে মহাফণী—
বিষের সদন !
বিরহ-বিষের তাপে শিখিনী আপনি কাঁপে,
কুলবালা এ জ্বালায় ধরে কি জীবন !
হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারতন ?

(৬)

এই দেখ্ ফুলমালা গাঁথিয়াছি আমি—
চিকণ গাঁথন।
দোলাইব শ্যাম-গলে, বাঁধিব বঁধুরে ছলে—
প্রেম-ফুল-ডোরে, তাঁরে করিব বন্ধন !
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন ?

(৭)

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর-বচন !
সহসা হইনু কালা ; জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন !
মধু—যার মধুধ্বনি— কহে কেন কাঁদ, ধনি,
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন ?

(ব্রজাঙ্গনা কাব্য, ১৮৬১)

চুম্বন

বলদেব পালিত

সুধাংশু-বদনে ! তবে সুধাংশু বদন,
বহুদিন পরে আজি করি দরশন,
এ অধীন চকোরের মনে বড় আশা
অধর-অমিয়া-পানে মিটাবে পিয়াসা ;
হেন সাধে প্রণয়িনি, কেন সাধি বাদ
"না না না না" বলে, মনে ঘটাও বিষাদ ?
অম্বরেতে মুখ-শশী ঢাকিয়া কি কাজ ?
নায়কে চুম্বন দিতে বল কিবা লাজ
বারেক বদন তুলে দেখ সরোবরে,
নলিনী চুম্বন দান করে মধুকরে ;
সমুখেতে দেখ ওই চন্দ্র-মল্লিকায়
কীটেরে কৃতার্থ করি অধর পীয়ায় ;
হৃদি-রাজ্যে প্রজাপতি করি প্রজা, পতি,
চুম্ব-কর লয় দেয় সেঁওতী যুবতী।
এইরূপ দেখ যত রমণী, রমণ ;
চুম্বন-রসেতে মত্ত সবাকার মন।
প্রকৃতির যদি এই হইল নিয়ম,
তুমি আর কেন তার কর ব্যতিক্রম ?

তা নয় লো ধনি, তব বুঝিয়াছি ভাব,
চতুরা নবোঢ়াদের এমনি স্বভাব।
আগ্রহ বাড়াতে সুধু না না না না কহে,
ফলে তাহা মনোগত অভিপ্র... নহে।
গোলাবের কলি যথা এ সুখ-প্রভাতে,
যত্ন করি স্বীয় শোভা গুপ্ত রাখে পাতে ;

নিকটে আইলে পর নায়ক-পবন,
মাথা নাড়ি, করে ধনী অনেক বারণ ;
কিন্তু সে চতুর কান্ত না হয়ে নিরাশ,
ছলে বলে পূর্ণ করে নিজ অভিলাষ ;
তাহার চুম্বনে কলি প্রীতি পেয়ে অতি
হৃদয় খুলিয়া গন্ধ দেয় হৃষ্ট-মতি ;
অধরেতে ধরে আরো গাঢ়তর রাগ,
রমণের মনে যাতে বাড়ে অনুরাগ।
তেমনি রমণি! হেরি তোমার কৌশল,
সোহাগ বাড়াতে সুধু করিতেছ ছল ;
না না ধ্বনি ধনি তব শুনিব না আর,
মানিব না কোন মতে নিষেধ তোমার :
তবে কেন সদয় হৃদয়ে রসবতি,
অধীনে চুম্বন দান কর না সম্প্রতি ?

(কাব্যমালা, ১৮৭০

পয়োধর

বলদেব পালিত

অঞ্চলেতে ঢাকা, প্রিয়ে, তব পয়োধর
মেঘাবৃত গিরি প্রায় ছিল শোভাকর ;
উপরেতে তরলিত মুকুতার হার
বিহার করিতেছিল বিদ্যুৎ-আকার।
এখন অম্বর মুক্ত করি মনঃসাধে,
অপূর্ব মোহন ঠাম নিরখি অবাধে ;

পীনোন্নত, সুকঠিন, রজতবরণ,
জিনিয়া ধবল-গিরি মনোজ্ঞ গঠন।
পুনঃ ভাবি ধরাধর বন্ধুর বিষম,
পয়োধর নধর, চিকণ, মনোরম।
তাই যুক্তি করি মনে, কাম-বায়ু ভরে,
উঠিছে তরঙ্গ তব বক্ষঃ-সরোবরে ;
অথবা মানস সরঃ করি পরিহার,
দিব্য দুই হংস আসি করিছে বিহার।
আবার মৃণাল তুল্য ভুজ বিলোকনে,
কুচ পদ্ম-কলি বলি ভ্রম হয় মনে ;
যৌবন-প্রভাতে কিবা নব বিকসিত।
চুচুক ভ্রমর তায় পতিত মোহিত।
কভু ভাবি, মুগ্ধ হয়ে তব কেশপাশে,
কাদম্বিনী ভ্রমে বুঝি কদম্ব বিকাশে।
কভু রম্ভা-তরু সম উরু হেরি প্রাণ,
কুচ নয়, মোচাদ্বয় করি অনুমান।
কভু ভাবি তব রূপ-ক্ষীরোদ-মন্থনে,
ঐরাবত-কুম্ভ-যুগ উঠিছে গগনে।
কখন বা মনে মনে করি অনুভব,
ত্রিভুবন পরাভব করি মনোভব,
আপনি দুন্দুভি-যুগ অহঙ্কার করি,
রেখেছে উলটি তব বক্ষঃস্থলোপরি।
এইরূপ বিবিধ কল্পনা করি মনে,
অবশেষে এই স্থির করি, চন্দ্রাননে,

হৃদে তব মনোমত পাইয়া সদন,
সমাগত হয়েছেন আপনি [illegible] ;
তাই তাঁর পূজা হেতু ওখানে নিশ্চিত,
পূর্ণ-কুম্ভ পয়োধর হয়েছে স্থাপিত।

চন্দনে উহাতে লিখি মকর আকার,
চৌদিগ বেড়িয়া দিব কুসুমের হার ;
পল্লবস্বরূপ ধনি এ কর-পল্লবে,
রাখিব ঘটের মুখে কাম-মহোৎসবে।
সিন্দূরের বিনিময়ে নখক্ষত-ছটা
অপূর্ব শোভিবে, যেন প্রবালের ঘটা।

(কাব্যমালা, ১৮৭০)

ভুল না আমায়

বলদেব পালিত

১

ভুল না আমায় নাথ, ভুল না আমায়,
নিরুদ্বেগে যাও তুমি যেখানে মনন ;
প্রশস্ত হৃদয়ে আমি দিতেছি বিদায়,
যদিও বলিতে ইহা ঝরে দু-নয়ন।
না চাহি প্রণয়-ডোরে করিয়া বন্ধন,
পুরুষার্থ হতে করি বঞ্চিত তোমায় ;
কেবল তোমার কাছে এই আকিঞ্চন,
ভুল না আমায় নাথ, ভুল না আমায়।

২

এ মম কুন্তল হতে—সর্বদা যাহারে
বলিতে কামের ফাঁদ সহাস্য বদনে—
লও এ অলক প্রিয় দিতেছি তোমারে,
পিরীতির চিহ্ন বলি রাখিও যতনে।

কখন কখন যদি ইহার ঈক্ষণে,
স্মৃতিপথে এ অধীনী পড়ে পুনরায়,
শুনিলে কৃতার্থ আমি মানিব হে মনে :
ভুল না আমায় নাথ, ভুল না আমায়।

৩

বিদেশে, প্রাণেশ, তুমি করিয়া ভ্রমণ,
দেখিবে নূতন দৃশ্য প্রত্যেক দিবস ;
পাইবে অনেক বন্ধু হৃদয়-রঞ্জন ;
নব অনুরাগে পূর্ণ হইবে মানস।
কিন্তু সে সময় সপে, হয়ে পরবশ,
আমোদে ভুল না পূর্ব-কথা সমুদয় :
নব নব প্রেমে পেয়ে নব নব রস,
ভুল না আমায় নাথ, ভুল না আমায়।

৪

বরঞ্চ তখন ভুল, ক্ষতি তাহে নাই ;
সে সুখ-প্রবাহ-রোধে নাহি কোন ফল ;
মনের আহ্লাদে থাক এই আমি চাই ;
দুখিনীর দুখে কেন হইবে বিকল ?
কিন্তু যদি হয় হায়! কু-গ্রহ প্রবল,
সেবিকা না পাও যদি এ দাসীর ন্যায়,
মন যদি দুখী হয়, শরীর দুর্বল,
ভুল না আমায় নাথ, ভুল না আমায়।

৫

এহেন অশুভ কথা কেন এল মুখে ?
হায়! আমি বড় অভাগিনী দম্পতি।
সুক্ষণে বিদায় হও, সদা থাক সুখে ;
অক্ষয় সৌভাগ্য তোমা দিন বিশ্বপতি।

তাঁর কাছে এ দাসীর কাতরে মিনতি,
মনোরথ পূর্ণ তব করুন ত্বরায় ;
অচিরে আবার বাসে কর প্রত্যাগতি ;
ভুল না আমায় নাথ, ভুল না আমায়।

(কাব্যমালা, ১৮৭০)

প্রিয়তমা শ্রীমতী—র প্রতি

বলদেব পালিত

বড় বড় কবি যাঁরা, বীর-রস-ভক্ত তাঁরা,
সে রসে মজিতে ধনি, পারে কি সবাই ?
বহিতে গাণ্ডীব-ভার, পার্থ বিনা সাধ্য কার ?
আমি প্রেম-ফুলধনু কেবল নোয়াই।
মধুর পিরীতি রস— আমি ত ইহারি বশ,
অন্য রস কটু বলে স্পর্শিতে না চাই।
আশা করি ভালবাসা, গাঁথিয়া কোমল ভাষা,
আদি-রসে ডুবাইয়া তোমারে যোগাই।
মূর্খ পণ্ডিতাভিমানী, কত জন আছে জানি,
এ রসের নাম শুনি বিরক্ত সদাই ;
তুষিতে তাদের মন, বৃথা মম আকিঞ্চন,
অন্ধ জনে তব রূপ বুঝান বালাই।
তোমারে এ কাব্য-হার, দিই আমি উপহার
রত্নহার পরাবার সাধ্য মম নাই।
প্রেম-সূত্রে গাঁথা মালা, তব যোগ্য বটে, বালা,
তুমি নিলে মনোমত বাঞ্ছা-ফল পাই।

যদিও এ ফুলচয়, সমুদয় নব নয়,
রসপূর্ণ বটে কিনা তোমারে শুধাই ?
তুমি যদি হৃষ্ট মনে ভাল বল সুলোচনে,
খল ছলগ্রাহিগণে আমি কি ডরাই ?

(কাব্যমালা, ১৮৭০)

বিচ্ছেদ

বলদেব পালিত

সাধের পিরীতে সই ঘটিল বিষাদ ;
তীরেতে লাগিয়া হায় ! ডুবিল তরণী ;
গ্রাসিল আসিয়া রাহু পূর্ণিমার চাঁদ ;
ঝড়েতে ফলন্ত তরু ভাঙ্গিল, সজনি ;
যে শুকপাখীরে, পাতি প্রণয়ের ফাঁদ,
প্রাণপণে ধরিলাম ক্লেশ তুচ্ছ গণি,
মাস পূর্ণ না হইতে, বিধি সাধি বাদ
উড়াইয়া দিল তারে প্রবাসে অমনি !
সে বিনা আঁধার দেখি এ মহী-মণ্ডল,
সে গেল চলিয়া, কেন গেল না জীবন ?
মনোরথ সব মম হইল বিফল,
বিফল হইল হায় ! এ নব যৌবন,
বৃথা কেন করি আর আশার সম্বল ?
আর কি পাইব সেই প্রাণাধিক ধন !

(কাব্যমালা, ১৮৭০

নারীর প্রেম

বলদেব পালিত

একদিন অস্তগামী দিবাকর-করে,
স্নানান্তে বসিয়া কোন সরসীর ধারে,
দেখিলাম এক নারী, নম্রা কুচ-ভারে,
ভাঙ্গিল মৃণাল এক মৃণালিনী-করে ;
জলে তারে পুনরায় ডুবায়ে সাদরে,
সোপানে বসিয়া ধনী, স্বেচ্ছা অনুসারে,
লিখিল একটি কথা দেখায়ে আমারে,
'যাক প্রাণ তবু প্রেম থাকুক অন্তরে।'
সে লেখা পড়িয়া, তার রূপ-রত্নাকরে
মগ্ন হয়ে, তারে আমি সঁপিলাম মন ;

কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! তারি দু-দিনের পরে,
আমারে ত্যজিয়া বালা করিল গমন ;
উভয় সমান জ্ঞান হইল তখন,
নারীর পিরীতি আর বারির লিখন।

(কাব্যমালা, ১৮৭০)

প্রেমের প্রতি

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

"O, God ! O, God !
How weary, stale, flat, and unprofitable
Seem to me all the uses of this world !
Fie on't ! O, fie ! 't is an unweeded garden,
That grows to seed ; things rank and gross
in nature
Possess it merely."

—Shakespeare.

হায় রে সাধের প্রেম কত খেলা খেল,
মানুষে কোথায় তুলে কোথা নিয়ে ফেল !
প্রথমে যখন এলে সমুখে আমার,
কেমন সুন্দর বেশ তখন তোমার !
হাসি হাসি মুখখানি কথা মধুময়,
গলিল মজিল মন, খুলিল হৃদয় !
যত দেখি, ততই দেখিতে সাধ যায়,
যত শুনি, ততই শুনিতে মন চায় ।
ডুবিয়াছি যেন আমি সুধার সাগরে,
আসিয়াছি রতনের লুকান আকরে :
আহা কিবে ভাগ্যোদয়, ভাল ভাল ভাল !
হাসিয়ে চাহিয়ে দেখি চারিদিক্ আলো !
লতা সব নৃত্য করে, ফুল সব হাসে,
সুখের লহরীমালা খেলে চারি পাশে :
পাখী সব সুললিত স্বরে ধোরে তান,
মনের আনন্দে গায় প্রণয়ের গান ;
মেদুর সমীর হরি' কুসুম-সৌরভ,
বেড়াইছে প্রণয়ের বাড়ায়ে গৌরব ।
চারিদিকে যেন সব চারু ইন্দ্রধনু,
বিলসে প্রেমের প্রিয় রসময়ী তনু ;
ও তো নয় প্রভাতের অরুণের ছটা,
অভিনব প্রণয়ের অনুরাগ-ঘটা ।
প্রণয় প্রণয় বই আর কথা নাই,
হায় রে প্রণয়, তোর বলিহারি যাই ।
যাহা কই, প্রণয়ের কথা পড়ে এসে,
যাহা ভাবি, প্রণয়ের ভাবে যাই ভেসে ।
ঘুমায়ে স্বপনে দেখি প্রণয়ের রূপ,
জাগিয়ে নয়নে দেখি প্রেম-প্রতিরূপ ।

প্রেম ধ্যান, প্রেম জ্ঞান, প্রেম প্রাণ, মন,
প্রেমেরি জন্তেতে যেন রয়েছে জীবন।
যেথা যাই, দিয়ে যাই প্রেমের দোহাই,
যাহা গাই, প্রণয়ের গুণ-গান গাই।
হৃদয়ে বিরাজ করে প্রেমের প্রতিমা,
শ্রবণে সঞ্চরে সদা প্রেমের মহিমা।
পূর্ণিমার মনোহর পূর্ণ সুধাকরে,
প্রেমেরি লাবণ্য যেন আছে আলো ক'রে।
মেঘের হৃদয়ে নয় বিজলীর খেলা,
ঝলমল প্রণয়ের হাবভাব হেলা।
সূর্য্য বল, চন্দ্র বল, বল তারাগণ,
এরা নয় জগতের দীপ্তির কারণ;
প্রেমের প্রভায় বিশ্ব প্রকাশিত রয়;
তাই ত প্রেমের প্রেমে মজেছে হৃদয়!

(প্রেম-প্রবাহিনী, দ্বিতীয় সর্গ, প্রথম স্তবক। ১৮৭০)

নারীবন্দনা

বিহারীলাল চক্রবর্তী

(নির্বাচিত স্তবক)

১২

যেমন মধুর স্নেহে ভরপূর,
নারীর সরল উদার প্রাণ;
এ দেব-দুর্লভ সুখ সুমধুর,
প্রকৃতি তেমতি করেছে দান।

১৩

আমরা পুরুষ, পরুষ নীরস,
নহি অধিকারী এ হেন সুখে ;
কে দিবে ঢালিয়ে সুধার কলস,
অসুরের ঘোর বিকট মুখে !

১৪

হৃদয় তোমার কুসুম-কানন,
কত মনোহর কুসুম তায় ;
মরি চারিদিকে ফুটেছে কেমন,
কেমন পাবন সুবাস বায় !

১৫

নীরবে বহিছে সেই ফুলবনে,
কিবা নিরমল প্রেমের ধারা ;
তারকা খসিল উজল গগনে,
আভাময় ছায়াপথের পারা !

১৬

আননে, লোচনে, কপোলে, অধরে,
সে হৃদি-কানন-কুসুম-রাশি
আপনা আপনি আসি থরে থরে,
হইয়ে রয়েছে মধুর হাসি ।

১৭

অমায়িক দুটি সরল নয়ন,
প্রেমের কিরণ উজল তায় ;
নিশান্তের শুকতারার মতন,
কেমন বিমল দীপতি পায় !

১৮

অয়ি ফুলময়ী, প্রেমময়ী সতী,
সুকুমারী নারী, ত্রিলোক-শোভা,

মানস-কমল-কানন-ভারতী
জগজন-মন-নয়ন-লোভা!

১৯

তোমার মতন সুচারু চন্দ্রমা,
আলো করে আছে আলয় যার;
সদা মনে জাগে উদার সুষমা,
রণে বনে যেতে কি ভয় তার?

২০

করম-ভূমিতে পুরুষ সকলে,
খাটিয়ে খাটিয়ে বিকল হয়;
তব সুশীতল প্রেম-তরু-তলে,
আসিয়ে বসিয়ে জুড়ায়ে রয়।

২১

তুমি গো তখন কতই যতনে,
ফল জল আনি সমুখে রাখ;
চাহি মুখ-পানে স্নেহের নয়নে,
সহাস আননে দাঁড়ায়ে থাক।

২২

ননীর পুতুল শিশু সুকুমার,
খেলিয়ে বেড়ায় হরষে হেসে;
কোন কিছু ভয় জনমিলে তার,
তোমারি কোলেতে লুকায় এসে।

২৩

স্থবির স্থবিরা জনক জননী,
তুমি স্নেহময়ী তাঁদের প্রাণ;
রাখ চোখে চোখে দিবস-রজনী,
মুখে মুখে কর আদর দান।

২৪

নবীনা নন্দিনী কেশ এলাইয়ে,
রূপেতে উজলি বিজলী যেন ;
নয়নের পথে দুলিয়ে দুলিয়ে,
সোনার প্রতিমা বেড়ায় যেন।

২৫

রোগীর আগার, বিষাদে আঁধার,
বিকার-বিহ্বল রোগীর কাছে,
পাখাখানি হাতে করি অনিবার,
দয়াময়ী দেবী বসিয়ে আছে।

২৬

নাই আগা-মূল কত বকে ভুল,
শুনে উড়ে যায় তরাসে প্রাণ ;
হেরি ঢলঢল হৃদয় ব্যাকুল,
নয়নের নীরে ভাসে বয়ান।

২৭

সতত যতন, সদা ধ্যান জ্ঞান,
কিরূপে সে জন হইবে ভাল ;
বিপদের নিশি হবে অবসান,
প্রকাশ পাইবে তরুণ আলো।

২৮

দুখীর বালক ধূলায় ধূসর,
ক্ষুধায় আতুর, মলিন মুখ ;
ডাকিয়া বসাও কোলের উপর,
আঁচলে মুছাও আনন বুক।

২৯

পরম-করুণ জননীর মত,
ক্ষীর সর ছানা নবনী আনি,

মুখে তুলে দাও আদরিয়ে কত,
গায়েতে বুলাও কোমল পাণি।

৩০

স্নেহ-রসে তার গলে যায় প্রাণ,
অচলা ভকতি জনমে চিতে ;
ভেসে ভেসে আসে জলে দু'নয়ান,
পদধূলি চায় মাথায় দিতে।

৩১

আহা কৃপাময়ি, এ জগতীতলে,
তুমিই পরমা পাবনী দেবী ;
প্রাণীরা সকলে রয়েছে কুশলে,
তোমার অপার করুণা সেবি।

৪৫

বাঁচিতে প্রার্থনা নাহিক আমার,
যে ক'দিন বাঁচি তবু গো নারি,
উদার মধুর মূরতি তোমার,
যেন প্রাণ ভ'রে আঁকিতে পারি !

(বঙ্গসুন্দরী, ২য় সর্গ ; ১৮৭০)

সুরবালা

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

(নির্বাচিত স্তবক)

৭৩

সহসা মানস-তামস-মন্দিরে,
বিকসিল এক নূতন আলো ;
ভেদ করি অমা-নিশির তিমিরে,
প্রাচী দিশা যেন হইল লাল।

১৪

প্রকাশ পাইল সে আলো-মালায়,
অমরাবতীর বিনোদ বন ;
কত অপরূপ তরু শোভে তায়,
চরে অপরূপ হরিণীগণ ।

১৫

বিমল সলিলা নদী মন্দাকিনী,
দুলে দুলে যেন মনেরি রাগে ;
ভাঁজি কুলুকুলু মধুর রাগিণী,
খেলা করে তার মেখলাভাগে

১৬

নিরবিল এক তীর-বৃক্ষতলে,
সে সুররূপসী উদাস প্রাণে,
বসিয়ে কোমল নব-দূর্বাদলে,
চাহিয়ে আছেন লহরী-প্রাণে

১৭

বাম-করতলে কপোল কমল,
আকুল কুন্তলে আনন ঢাকা ;
নয়নে গড়ায়ে বহে অশ্রুজল,
পটে যেন স্থির প্রতিমা আঁকা ।

১৮

অঙ্গের ওড়না ভূতলে লুটায়,
লুটায় কবরী-কুসুমমালা ;
পারিজাত-হার ছিঁড়েছে গলায়,
প'লে পড়ে করে রতনবালা ।

১৯

ঘুমায় অদূরে বীণা বিনোদিনী,
বাঁধা আছে সুর, বাজে না তান ;

এই কতক্ষণ যেন এ মানিনী,
গাহিতেছিলেন খেদের গান।

৮০

ঝোরে ঝোরে পড়ে তরু থেকে ফুল,
ঠেকে ঠেকে গায় ছড়িয়ে যায়;
মধুকরকুল আকুল ব্যাকুল,
গুনু গুনু রবে উড়ে বেড়ায়।

৮১

স্বভাব-সুন্দর চারু-কলেবরে,
বিকসে সুষমা কুসুম রাজি;
সুর সীমন্তিনী অভিমান ভরে,
কেমন মধুর সেজেছে আজি!

৮২

মধুর তোমার ললিত আকার,
মধুর তোমার চাঁচর কেশ;
মধুর তোমার পারিজাত-হার,
মধুর তোমার মানের বেশ!

৮৩

পেয়ে সে ললনা মধুর মূরতি,
দেহে যেন ফিরে আসিল প্রাণ;
হেরিয়ে সবার হয় না তৃপতি,
নয়ন ভরিয়ে করেন পান।

(বঙ্গসুন্দরী, ৩য় সর্গ। ১৮৭০।)
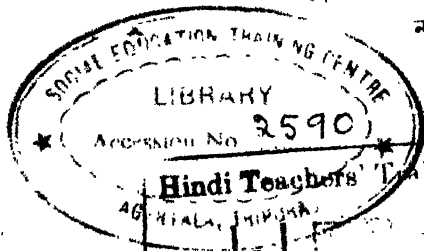
যোগেন্দ্রবালা

বিহারীলাল চক্রবর্তী

১

অধরে ধরে না হাস,
আঁধার কেশের রাশ,
করুণ কিরণে আর্দ্র বিকসিত বিলোচন ;
প্রফুল্ল কপোলে আসি
উথলে আনন্দ-রাশি,
যোগানন্দময়ী-তনু, যোগীন্দ্রের ধ্যানধন ।

২

পীনোন্নত পয়োধরে
কোটি চন্দ্র শোভা হরে,
বিন্দু বিন্দু ক্ষীর ক্ষরে, স্নেহে স্নিগ্ধ চরাচর,
আর্দ্রিয়া হিমাদ্রিমালা
সুরধুনী করে খেলা,
সুধাকরে
সুধা ক্ষরে,
পিয়া প্রাণে বাঁচে প্রাণী, অমর, দানব, নর ।

৩

তরল দর্পণ-ভাস,
দশ দিক সুপ্রকাশ ;
দশ দিকে কার সব হাসিমাখা প্রতিমা ;
রাজে যেন ইন্দ্রধনু !
তোমার মতন তনু,
তোমার মতন কেশ,
তোমার মতন বেশ,
তোমারি মতন দেবি ! আনন-মধুরিমা ।

তোমারি এ রূপরাশি
আকাশে বেড়ায় ভাসি ;
তোমার কিরণ-জাল
ভুবন করেছে আলো,
গ্রহ তারা শশী রবি,
তোমারি চিহ্নিত ছবি ;
আপন লাবণ্যে তুমি বিভাসিত আপনি
মোহিত হইয়া দেখে ভক্তিভাবে ধরণী ।

৪

অধরে ধরে না হাস,
মনে ওঠে কি উল্লাস ?
অখিল ব্রহ্মাণ্ড বুঝি উদয় হয়েছে প্রাণে ?
ক্ষণে ক্ষণে অভিনব
মহান্ মাধুর্য্য তব !
কি যেন মহান্ গীতি বাজিয়াছে ঐক্যতানে

৫

অমৃত-সাগরে হাসে ধূমস্থ জ্যোছনা জল,
আহা কি হৃদয়হারী বায়ু বহে অবিরল !
ফুলের বেলার কোলে
সুধীর লহরী দোলে,
অতি দূর দৃষ্টিপথে অতি ধীর ঢল ঢল ;
ঈষৎ দোদুল্যমান প্রফুল্ল কমল বনে
কে তুমি ত্রিদিবরাণী বিহর' আপন মনে ?

৬

কে এঁরা সঙ্গিনী সব ?
লোচনের মহোৎসব,
উদার অমৃত-জ্যোতি, সুধাংশু-কলিত কায়া,
বেড়িয়ে বেড়ায় যেন তোমার প্রাণের ছায়া ।

৭

আকুল কুন্তলজাল,
আননে অপূর্ব্ব আলো,
নয়ন করুণাসিন্ধু, মূর্ত্তিমতী দয়াময়ী ;
বেড়িয়ে বেড়ায় যেন তোমারি প্রাণের ছায়া

৮

অমৃত-সাগরে ভাসি,
মৃদুমন্দ হাসি হাসি
আদরে আদরে তুলি' নীল নলিনী আনি,
মিটায়ে মনের সাধ সাজাইছে পা দুখানি।

৯

আমিও এসেছি বালা!
প্রেমের প্রফুল্ল মালা,
সৌরভে আকুল হয়ে পারি নে পরাতে গায় ;
সজল নয়নে শুধু চেয়ে আছি রাঙা পায়।

(সাধের আসন, ৩য় সর্গ ; ১৮৮৮)

বিষাদ

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

(নির্বাচিত স্তবক)

১

কেন গো ধরণী-রাণি,
বিরস বদনখানি ?
কেন গো বিষণ্ণ তুমি উদার আকাশ ?

কেন প্রিয় তরুলতা,
ডেকে নাহি কহ কথা ?
কেন রে হৃদয়—কেন শ্মশান উদাস ?

১০

কোন সুখ নাই মনে,
সব গেছে তার সনে ;
খোলো হে অমরগণ স্বরগের দ্বার !
বল, কোন্ পদ্মবনে
লুকায়েছ সংগোপনে ?—
দেখিব কোথায় আছে সারদা আমার !

১১

অয়ি, একি, কেন, কেন,
বিষণ্ণ হইলে হেন ?
আনত আনন-শশী, আনত নয়ন,
অধরে মধুরে আসি
কপোলে মিলায় হাসি,
থর্ থর্ ওষ্ঠাধর, স্ফোরে না বচন।

১২

তেমন অরুণ-রেখা
কেন কুহেলিকা ঢাকা,
প্রভাত-প্রতিমা আজি কেন গো মলিন ?
বল, বল, চন্দ্রাননে,
কে ব্যথা দিয়েছে মনে,
কে এমন—কে এমন হৃদয়-বিহীন !

১৩

বুঝিলাম অনুমানে,
করুণা কটাক্ষ-দানে
চাবে না আমার পানে, ক'বেও না কথা !

কেন যে ক'বে না, হায়,
হৃদয় জানিতে চায়,
সরমে কি বাধে বাণী, মরমে বা বাজে ব্যথা !

১৪

যদি মর্ম্ম-ব্যথা নয়,
কেন অশ্রুধারা বয় ?
দেববালা ছল-কলা জানে না কখন ;
সরল মধুর প্রাণ,
সতত মুখেতে গান,
আপন বীণার তানে আপনি মগন !

১৫

অয়ি, হা, সরলা সতী
সত্যরূপা সরস্বতী !
চির-অনুরক্ত ভক্ত হয়ে কৃতাঞ্জলি
পদ-পদ্মাসন কাছে
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে—
কি করিবে, কোথা যাবে, দাও অনুমতি !
স্বরগ-কুসুম মালা,
নরক-জ্বলন-জ্বালা,
ধরিবে প্রফুল্লমুখে মস্তকে সকলি !
তব আজ্ঞা সুমঙ্গল,
যাই যাব রসাতল,
চাইনে এ বরমালা, এ অমরাবতী !

১৬

নরকে নারকী-দলে
মিশিলে মনের বলে,
পরাণ কাতর হ'লে ডাকিব তোমায় ;
যেন দেবী, সেইক্ষণে—

অভাগারে পড়ে মনে,
ঠেল না চরণে, দেখো, ভুল না আমায় !

১৭

অহহ ! কিসের তরে
অভাগা নরকে পড়ে,
মরু—মরু-মরুময় জীবন-লহরী !
এ বিরস মরুভূমে—
সকলি আচ্ছন্ন ধূমে,
কোথাও একটিও আর নাহি ফোটে ফুল !
কভু মরীচিকা-মাঝে
বিচিত্র কুসুম রাজে,
উঃ ! কি বিষম বাজে, যেই ভাঙে ভুল !
এত যে যন্ত্রণা-জ্বালা,
অবমান, অবহেলা
তবু কেন প্রাণ টানে ! কি করি, কি করি !

(সারদামঙ্গল, ২য় সর্গ । ১৮৭৯)

ভুল

বিহারীলাল চক্রবর্তী

(নির্বাচিত স্তবক)

১০

তবে কি সকলি ভুল ?
নাই কি প্রেমের মূল ?—
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা-লতার ?
মন কেন রসে ভাসে—

প্রাণ কেন ভালবাসে
আদরে পরিতে গলে সেই ফুল-হার ?

২১

শত শত নর-নারী
দাঁড়ায়েছে সারি সারি
নয়ন খুঁজিছে কেন সেই মুখখানি ?
হেরে হারা-নিধি পায়,
না হেরিলে প্রাণ যায়,
এমন সরল সত্য কি আছে না জানি !

২২

ফুটিলে প্রেমের ফুল
ঘুমে মন ঢুল্ ঢুল্,
আপন সৌরভে প্রাণ আপনি পাগল ;
সেই স্বর্গ-সুধা-পানে
কত যে আনন্দ প্রাণে,
অমায়িক প্রেমিকে তা জানেন কেবল

২৩

নন্দন-নিকুঞ্জবনে
বসি শ্বেত শিলাসনে,
খোলা প্রাণে রতি-কাম বিহরে কেমন
আননে উদার হাসি,
নয়নে অমৃতরাশি,
অপরূপ আলো এক উজলে ভুবন !

২৪

পারিজাত-মালা করে,
চাহি চাহি স্নেহভরে
আদরে পরস্পরে গলায় পরায়
মেজাজ্ গিয়েছে খুলে,

বসেছে দুনিয়া ভুলে,
সুধার সাগর যেন সমুখে গড়ায় !

২৫

কি এক ভাবেতে ভোর,
কি যেন নেশার ঘোর,
টলিয়ে ঢলিয়ে পড়ে নয়নে নয়ন ;
গলে গলে বাহুলতা,
জড়িমা-জড়িত কথা,
সোহাগে সোহাগে রাগে গল-গল মন !

২৬

করে কর থরথর,
টলমল কলেবর,
গুরু গুরু দুরু দুরু বুকের ভিতর ;
তরুণ-অরুণ-ঘটা
আননে আরক্ত ছটা,
অধর-কমল-দল কাঁপে থরথর !

২৭

প্রণয় পবিত্র কাম,
সুখ-স্বর্গ-মোক্ষ-ধাম !
আজি কেন হেরি হেন মাতোয়ারা বেশ
ফুলধনু ফুলছড়ি
দূরে যায় গড়াগড়ি ;
রতির খুলিয়ে খোঁপা আলুথালু কেশ !

২৮

বিহ্বল পাগল প্রাণে
চেয়ে সতী পতি-পানে,
গলিয়ে গড়িয়ে কোথা চলে গেছে মন ;
মুগ্ধ মত্ত নেত্র দুটি,

আধ ইন্দীবর ফুটি,
ঢুলু ঢুলু ঢুলু ঢুলু করিছে কেমন

২৯

আলসে উঠিছে হাই,
ঘুম আছে, ঘুম নাই,
কি যেন স্বপন-মত চলিয়াছে মনে ;
সুখের সাগরে ভাসি
কিবে প্রাণ-খোলা হাসি !
কি এক লহরী খেলে নয়নে নয়নে !

৩০

উথলে উথলে প্রাণ
উঠিছে ললিত তান,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে গান গায় দুই জন ;
সুরে সুরে সম রাখি
ডেকে ডেকে ওঠে পাখী,
তালে তালে চলে চলে চলে সমীরণ

৩১

কুঞ্জের আড়াল থেকে
চন্দ্রমা লুকায়ে দেখে,
প্রণয়ীর সুখে সদা সুখী সুধাকর
সাজিয়ে মুকুল ফুলে
আহ্লাদেতে হেলে দুলে
চৌদিকে নিকুঞ্জ-লতা নাচে মনোহর

সে আনন্দে আনন্দিনী,
উথলিছে মন্দাকিনী,
করি করি কলধ্বনি বহে কুতূহলে !

৩২

এ ভুল প্রাণের ভুল,
মর্ম্মে বিজড়িত মূল,
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী ;

এ এক নেশার ভুল,

অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল,

স্বপনে বিচিত্ররূপা দেবী যোগেশ্বরী।

(সারদামঙ্গল, ৩য় সর্গ। ১৮৭৯)

আকাঙ্ক্ষা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুন্দরী

(১)

কেন না হইলি তুই, যমুনার জল,

রে প্রাণবল্লভ!

কিবা দিবা কিবা রাতি, কূলেতে আঁচল পাতি,

শুইতাম শুনিবারে, তোর মৃদুরব ॥

রে প্রাণবল্লভ!

(২)

কেন না হইলি তুই, যমুনাতরঙ্গ,

মোর শ্যামধন!

দিবারাতি জলে পশি, থাকিতাম কালো শশি,

করিতাম নিত্য তোর, নৃত্য দরশন ॥

ওহে শ্যামধন!

(৩)

কেন না হইলি তুই, মলয় পবন,

ওহে ব্রজরাজ!

আমার অঞ্চল ধরি, সতত খেলিতে হরি,

নিশ্বাসে যাইতে মোর হৃদয়ের মাঝ ॥

ওহে ব্রজরাজ!

(৪)

কেন না হইলি তুই, কাননকুসুম,
রাধার প্রেমাধার :
না ছুঁতেম অন্য ফুলে, বাঁধিতাম তোরে চুলে,
চিকণ গাঁথিয়া মালা, পরিতাম হার ॥
মোর প্রাণাধার !

(৫)

কেন না হইলে তুমি চাঁদের কিরণ,
ওহে হৃষীকেশ !
বাতায়নে বিষাদিনী, বসিত যবে গোপিনী,
বাতায়নপথে তুমি, লভিতে প্রবেশ ॥
আমার প্রাণে

(৬)

কেন না হইলে তুমি, চিকণ বসন,
পীতাম্বর হরি !
নীলবাস তেয়াগিয়ে, তোমারে পরি কালিয়ে,
রাখিতাম যত্ন করে' হৃদয় উপরি ॥
পীতাম্বর হরি !

(৭)

কেন না হইলে শ্যাম, যেখানে যা আছে,
সংসারে সুন্দর !
ফিরাতেম আঁখি যথা, দেখিতে পেতেম তথা,
মনোহর এ সংসারে, রাধামনোহর ।
শ্যামল সুন্দর !

সুন্দর

(১)

কেন না হইনু আমি, কপালের দোষে
যমুনার জল !

লইয়া কম কলসী, সে জল মাঝারে পশি,
হাসিয়া ফুটিত আসি, রাধিকা-কমল—
যৌবনেতে ঢল ঢল ॥

(২)

কেন না হইনু আমি, তোমার তরঙ্গ,
তপননন্দিনি !
রাধিকা আসিলে জলে, নাচিয়া হিল্লোল-ছলে,
দোলাতাম দেহ তার, নবীন নলিনী—
যমুনাজলহংসিনী ॥

(৩)

কেন না হইনু আমি, তোর অনুরূপী,
মলয় পবন !
ভ্রমিতাম কুতূহলে, রাধার কুন্তলদলে,
কহিতাম কানে কানে, প্রণয় বচন—
সে আমার প্রাণধন ॥

(৪)

কেন না হইনু হায় ! কুসুমের দাম
কণ্ঠের ভূষণ।
এক নিশা স্বর্গ সুখে, বঞ্চিয়া রাধার বুকে,
ত্যজিতাম নিশি গেলে জীবন-যাতন—
মেখে শ্রীঅঙ্গচন্দন ॥

(৫)

কেন না হইনু আমি, চন্দ্রকরলেখা,
রাধার বরণ।
রাধার শরীরে থেকে, রাধারে ঢাকিয়ে রেখে,
ভুলাতাম রাধারূপে, অজ্ঞজনমন—
পর ভুলান কেমন ?

(৬)

কেন না হইনু আমি চিকণ বসন,
দেহ-আবরণ।
তোমার অঙ্গেতে থেকে, অঙ্গের চন্দন মেখে,
অঞ্চল হইয়ে দুলে, ছুঁতেম চরণ,—
চুম্বি ও চাঁদবদন॥

(৭)

কেন না হইনু আমি, যেখানে যা আছে,
সংসারে সুন্দর।
কে হতে না অভিলাষে, রাধা যাহা ভালবাসে,
কে মোহিতে নাহি চাহে, রাধার অন্তর—
প্রেম-সুখরত্নাকর?

("কবিতা-পুস্তক", ১৮৭৮)

মৃণাল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে॥
রাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন।
চরণ বেড়িয়া তারে, করিল বন্ধন॥
বলে হংসরাজ কোথা করিবে গমন।
হৃদয়কমলে মোর তোমার আসন॥
আসিয়া বসিল হংস হৃদয়কমলে।
কাঁপিল কণ্টক সহ মৃণালিনী জলে॥
হেনকালে কাল মেঘ উঠিল আকাশে।
উড়িল মরালরাজ, মানস-বিলাসে॥
ভাঙ্গিল হৃদয়পদ্ম তার বেগভরে।
ডুবিয়া অতল জলে, মৃণালিনী মরে॥

('মৃণালিনী' উপন্যাস, ১৮৬৯)

শ্যামবিলাসিনী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মথুরাবাসিনী, মধুরহাসিনি, শ্যামবিলাসিনি রে।
কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাসিনী রে॥
বৃন্দাবনধন, গোপিনীমোহন, কাহে তু তেয়াগী রে।
দেশ দেশ পর, সো শ্যামসুন্দর, ফিরে তুয়া লাগি রে॥
বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে, বহুত পিয়াসা রে।
চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী, না মিটিল আশা রে॥
সা নিশা সমরি, কহ লো সুন্দরি, কাঁহা মিলে দেখা রে।
শুনি যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী, বনে বনে একা রে॥

('মৃণালিনী' উপন্যাস, ১৮৬৯)

শ্রীমুখপঙ্কজ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমুখপঙ্কজ—দেখবো বলে হে,
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে।
মানের দায়ে তুই মানিনী,
তাই সেজেছি বিদেশিনী।
এখন বাঁচাও রাধে কথা কয়ে।
ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে।
দেখবো তোমায় নয়ন ভরে,
তাই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে।

যখন রাধে বলে বাজে বাঁশী,
তখন নয়ন জলে আপনি ভাসি।
তুমি যদি না চাও ফিরে।
তবে যাব সেই যমুনাতীরে।
ভাঙ্গবো বাঁশী তেজ্‌ব প্রাণ।
এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান।
ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জলে,
বিকাইনু পদতলে।
এখন চরণনূপুর বেঁধে গলে,
পশিব যমুনা-জলে॥

(' বিষবৃক্ষ' উপন্যাস, ১৮৭৩)

কামিনী-কুসুম

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

কে খোঁজে সরস মধু বিনা বঙ্গ-কুসুমে ?—
কোথায় এমন আর
কোমল কুসুম-হার,
পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে ?
কোথা হেন শতদল
হৃদে পুরে পরিমল
থাকে প্রিয়মুখ চেয়ে মধুমাখা সরমে ?—
বঙ্গনারী-পুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে ?

(২)

কি ফুলে তুলনা দিব, বল, চূতমুকুলে ?
কোথায় এমন স্থল,
খুঁজিলে এ ধরাতল,
যেখানে এমন মৃদু মধু ঝরে রসালে ?
যেখানে এমন বাস
নব রসে পরকাশ,
নবীন যৌবনকালে মধু ওঠে উথুলে ?
বঙ্গকুলবালা বিনা মধু কোথা মুকুলে ?

(৩)

মধুর সৌরভময়, ভাব দেখি, চামেলি
ঢালে কি অতুল বাস
ফুল্ল মুখে মৃদু হাস,
তরু-কোলে তনু রেখে, অলিকুলে আকুলি।
কি জাতি বিদেশী ফুল
আছে তার সমতুল,
রাখিতে হৃদয় মাঝে ক'রে, চিত্তপুতুলি ?—
বঙ্গকুলনারী এর তুলনাই কেবলি !

(৪)

আছে কি জগতে বেল-মতিয়ার তুলনা ?—
সরল মধুর প্রাণ,
সুধাতে মিশায়ে ঘ্রাণ,
ভুলায় মুনির মন নাহি জানে ছলনা ;
না জানে বেশ-বিন্যাস,
প্রস্ফুটিত মুখে হাস,
অধরে অমিয়া ধরি হৃদে পূরি বাসনা—
বঙ্গের বিধবা-সম কোথা পাব ললনা !

(৫)

কে দেয় বিলাতি "লিলি" নলিনীতে উপমা ?
দেশে যে কুমুদ আছে
আসুক তাহারি কাছে,
তখন দেখিব বুঝে কার কত গরিমা !
বিধুর কিরণ কোলে
কুমুদ যখন দোলে,
কি মাধুরী মরি তায় কে বোঝে সে মহিমা !
কোথায় বিলাতি "লিলি" নলিনীর উপমা ?

(৬)

কি ফুলে তুলনা তুলি বল দেখি চাঁপাতে ?
প্রগাঢ় সুবাস যার
প্রেমের পুলকাগার,
বঙ্গবাসী রঙ্গরসে মত্ত আছে যাহাতে।
কোথায় ঈরাণী "গুল"
এ ফুলের সমতুল ?
কোথা ফিকে "ভায়োলেট", গন্ধ নাহি তাহাতে
কি ফুল তুলনা দিতে আছে বল চাঁপাতে ?

(৭)

কতই কুসুম আরো আছে বঙ্গ-আগারে—
মালতী, কেতকী, জাঁতি
বান্ধুলি, কামিনী, পাঁতি,
টগর মল্লিকা নাগ নিশিগন্ধা শোভা রে
কে করে গণনা তার—
অশোক, আতস আর,
কত শত ফুলকুল ফোটে নিশি-তুষারে—
সুধার লহরীমাখা বঙ্গগৃহ-মাঝারে !

(৮)

কিবা সে অপরাজিতা নীলিমার লহরী !
লতায়ে লতায়ে যায়,
ভ্রমরে তুষি সুধায়,
লাজে অবনত-মুখী, তনুখানি আবরি।
তাই এত ভালবাসি
মেঘের চপলা হাসি—
কে খোঁজে রে প্রজাপতি, পেলে হেন ভ্রমরী ?
মরি কি অপরাজিতা নীলিমার লহরী !

(৯)

এ মাধুরী, সুধারস কোথা পাব কুসুমে,
কোথায় এমন আর
কোমল কুসুম যার,
পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে,
কোথা হেন শতদল
হৃদে পূরি পরিমল,
থাকে প্রিয়মুখ চাহি মধুমাখা সরমে —
বঙ্গনারী-পুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে ?

(কবিতাবলী, ১৮৭০-৮০)

প্রিয়তমার প্রতি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

প্রেয়সি রে, অধীনেরে জনমে কি ত্যজিলে ?
এত আশা ভালবাসা সকলি কি ভুলিলে ?
অই দেখ নব ঘন, গগনে আসিয়ে পুনঃ,
মৃদু মৃদু গরজন গুরু গুরু ডাকিছে,

দেখ পুনঃ চাঁদ আঁকা, ময়ূর খুলিয়ে পাখা,
কদম্বের ডালে ডালে কুতূহলে নাচিছে !
পুনঃ সেই ধরাতল, পেয়ে জল সুশীতল,
স্নেহ করে তৃণদল বুকে ক'রে রাখিছে !
হের প্রিয়ে পুনরায়, পেয়ে প্রিয় বরষায়,
যমুনা-জাহ্নবী-কায়া উথলিয়া উঠিছে ।
চাতক তাপিত-প্রাণ, পুলকে করিয়ে গান,
দেখ রে জলদ কাছে পুনরায় ছুটিছে !
প্রেয়সি রে সুখোদয়, অখিল-ব্রহ্মাণ্ডময়,
কেবলি মনের দুঃখে এ পরাণ কাঁদিছে ।

(২)

এই পুনঃ জলধরে বারিধারা ঝরিল !
লতায় কুসুমদলে, পাতায় সরসী-জলে,
নবীন তৃণের কোলে নেচে নেচে পড়িল ।
শ্যামল সুন্দর ধরা, শোভা দিল মনোহরা,
শীতল সৌরভ-ভরা বাসে বায়ু ভরিল ।
মরাল আনন্দ-মনে, ছুটিল কমলবনে,
চঞ্চল মৃণালদল ধীরে ধীরে দুলিল ।
বক হংস জলচর, ধৌত করি কলেবর,
কেলি হেতু কলরবে জলাশয়ে নামিল ।
দামিনী মেঘের কোলে, বিলাসে বসন খোলে,
ঝলকে ঝলকে রূপ আলো করে উঠিল ।
এ শোভা দেখাব কারে, দেখায় সন্তোষ যারে,
হায় সেই প্রিয়তমা অভাগারে ত্যজিল !

(৩)

ত্যজিবে কি প্রাণ-সখি ? ত্যজিতে কি পারিবে ?
কেমনে সে স্নেহ-লতা এ জনমে ছিঁড়িবে ?

সে যে স্নেহ সুধাময়, ঘেরিয়াছে সমুদয়,
প্রকৃতি-পরাণ-মন, কিসে তাহা ভুলিবে ?
আবার শরৎ এলে, তেমনি কিরণ ঢেলে,
হিমাংশু গগনে ফিরে আর নাহি উঠিবে ?
বসন্তের আগমনে, সে রূপে সন্ধ্যার সনে,
আর কি দক্ষিণ হ'তে বায়ু নাহি বহিবে ?
আর কি রজনী-ভাগে, সেইরূপ অনুরাগে,
কামিনী রজনীগন্ধ বেল নাহি ফুটিবে ?
প্রাণেশ্বরি ! পুনর্বার, নিশীথে নিস্তব্ধ আর
ধরাতল সেইরূপে নাহি কিরে থাকিবে ?
জীবজন্তু কেহ কবে, কখন কি কোন রবে,
ভুলে অভাগার নাম কণ্ঠেতে না আনিবে ?
প্রেয়সি রে সুধাময়, স্নেহ ভুলিবার নয়,
কাঁদালি কাঁদিলি শুধু পরিণামে জানিবে !

(৪)

অই দেখ প্রিয়তমে বারিধারা ঝরিল।
শরতে সুন্দর মহী সুধা মাখি বসিল।
হরিৎ শস্যের কোলে, দেখ রে মঞ্জরী দোলে,
ভানুছটা তাহে কিবা শোভা দিয়া পড়েছে !
বহিলে মৃদুল বায়, ঢলিয়া ঢলিয়া তায়,
তটিনী-তরঙ্গলীলা অবনীতে খেলিছে।
গোঠে গাভী বৃষ সনে, চরিছে আনন্দ-মনে,
হরষিত তরুলতা ফলে ফুলে সেজেছে।
সরোবরে সরোরুহ, কুমুদ কহ্লার সহ,
শরতে সুন্দর হয়ে শোভা দিয়ে ফুটেছে।
আচম্বিতে দরশন, ঘন ঘন গরজন,
উড়িয়ে অম্বরে মেঘ ডেকে ডেকে চলেছে।
প্রেয়সি রে মনোহরা, এমন সুখের ধারা,
বিহনে তোমার আজি অন্ধকার হয়েছে !

(৫)

আহা কি সুন্দর-বেশ সন্ধ্যা অই আসিল !
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলি, ভাস্বর কিরণ তুলি,
পশ্চিম গগনে আসি ধীরে ধীরে বসিল,
অস্তগিরি আলো করি, বিচিত্র বরণ ধরি,
বিমল আকাশে ছটা উথলিয়া পড়িল।
গোধূলি-কিরণ-মাখা, গৃহচূড়া তরুশাখা,
প্রেয়সি রে, মনোহর মাধুরীতে পূরিল।
কাদম্বিনী ধীরি ধীরি, হয়, গজ, তরু, গিরি
আঁকিয়ে সুন্দর করি ছড়াইতে লাগিল !
দেখ প্রিয়ে সূর্য্য-আভা, গঙ্গাজলে কিবা শোভা,
সুবর্ণের পাতা যেন ছড়াইয়া পড়িল।
কৃষক মঞ্চের পরে, উঠিল আনন্দ-ভরে,
চঞ্চুপুটে শস্য ধরে নভশ্চর ফিরিল।
এ সুখ-সন্ধ্যায় প্রিয়ে, সাধ জলাঞ্জলি দিয়ে,
শূন্য-মনে নিরাসনে এ অভাগা রহিল।

(৬)

আজি এ পূর্ণিমা নিশি প্রিয়ে কারে দেখাবে ?
কার সনে প্রিয়ভাষে দেহ মন জুড়াবে ?
এখনি যে সুধাকর, পূর্ণবিম্ব মনোহর,
পূর্বদিকে পরকাশি সুধারাশি ছড়াবে।
এখনি যে নীলাম্বরে, শ্বেতবর্ণ থরে থরে,
আসিয়ে মেঘের মালা সুধাকরে সাজাবে :
তরু গিরি মহীতল, শিশির আকাশ জল,
চাঁদের কৌমুদীমাখা কারে আজ দেখাবে ?
প্রেয়সি, অঙ্গুলি তুলি, কুসুম-কলিকাগুলি,
শিশিরে ফুটিছে দেখি কারে আজি সুধাবে—

'অই দেখ চক্রবাক, ডাকে অমঙ্গল ডাক,'
বলে সুধাইবে কারে, কে বাসনা পুরাবে ?
তনু মন সমর্পণ, করেছিল যেই জন,
তারে কাঁদাইলে, হায়, প্রণয় কি জুড়াবে ?

(কবিতাবলী, ১৮৭০-৮০)

কোনো একটি পাখীর প্রতি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

ডাক্ রে আবার, পাখী, ডাক্ রে মধুর !
শুনিয়ে জুড়াক প্রাণ, তোর সুললিত গান
অমৃতের ধারা সম পড়িছে প্রচুর।
বলিয়ে বদন তুলে, বসিয়ে রসালমূলে
দেখিনু উপরে চেয়ে আশায় আতুর !
ডাক্ রে আবার ডাক্, সুমধুর স্বর।

(২)

কোথায় লুকায়েছিল নিবিড় পাতায় ;
চকিত চঞ্চল আঁখি, না পাই দেখিতে পাখী
আবার শুনিতে পাই, সঙ্গীত শুনায়।
মনের আনন্দে ব'সে তরুর শাখায়।
কে তোরে শিখালে বল, এ সঙ্গীত নিরমল ?
আমার মনের কথা জানিলি কোথায় ?
ডাক্ রে, আবার ডাক্, পরাণ জুড়ায়।

(৩)

অমনি কোমল স্বরে সেও রে ডাকিত,
কখন আদর করে, কভু অভিমান-ভরে,
অমনি ঝঙ্কার করে লুকায়ে থাকিত।
কি জানিবি পাখী তুই, কত সে জানিত।
নব অনুরাগে যবে, ডাকিত প্রাণবল্লভে,
কেড়ে নিত প্রাণ মন, পাগল করিত ;
কি জানিবি পাখী তুই, কত সে জানিত !

(৪)

ধিক্ মোরে, ভাবি তারে আবার এখন !
ভুলিয়ে সে নব-রাগ, ভুলে গিয়ে প্রেমযাগ,
আমারে ফকীর করে আছে সে যখন,
ধিক্ মোরে, ভাবি তারে আবার এখন !
ভুলিব ভুলিব করি, তবু কি ভুলিতে পারি !
না জানি নারীর প্রেম মধুর কেমন ;
তবে কেন সে আমারে ভাবে না এখন ?

(৫)

ডাক্ রে বিহগ তুই ডাক্ রে চতুর ;
ত্যজে শুধু সেই নাম, পূরা তোর মনস্কাম,
শিখেছিস্ আর যত বোল সুমধুর ;
ডাক রে আবার ডাক্, মনোহর সুর !
না শুনে আমার কথা, ত্যজে কুসুমিত লতা,
উড়িল গগন-পথে বিহগ চতুর ;
কে আর শুনাবে মোরে সে নাম মধুর।

(কবিতাবলী, ১৮৭০-৮০)

হতাশের আক্ষেপ

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে !
কাঁদাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে,
গগন-মাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে !
তারে ত পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়,
জ্বলিল যে শোকানল, কেমনে নিবাই রে !
আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে !

(২)

অই শশী অই খানে, এই স্থানে দুই জনে,
কত আশা মনে মনে কত দিন করেছি !
কতবার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি !
পরে সে হইল কার, এখনি কি দশা তার,
আমারি কি দশা এবে, কি আশ্বাসে রয়েছি !

(৩)

কৌমার যখন তার, বলিত সে বার বার,
সে আমার আমি তার, অন্য কারো হবো না।
ওরে দুষ্ট দেশাচার, কি করিলি অবলার,
কার ধন কারে দিলি, আমার সে হলো না।

(৪)

লোক-লজ্জা মান-ভয়ে, মা বাপ নিদয় হয়ে,
আমার হৃদয়-নিধি অন্য কারে সঁপিল।
অভাগার যত আশা জন্মশোধ ঘুচিল।

(৫)

হারাইনু প্রমদায়, তৃষিত চাতক-প্রায়,
ধাইতে অমৃত-আশে বুকে বজ্র বাজিল ;—
সুধাপান-অভিলাষ অভিলাষ (ই) থাকিল।
চিন্তা হলো প্রাণাধার, প্রাণতুল্য প্রতিমার,
প্রতিবিম্ব চিত্তপটে চিরাঙ্কিত রহিল,
হায়, কি বিচ্ছেদ-বাণ হৃদয়েতে বিঁধিল।

(৬)

হায়, সরমের কথা, আমার স্নেহের লতা,
পতিভাবে অন্যজনে প্রাণনাথ বলিল ;
মরমের ব্যথা মম মরমেই রহিল।

(৭)

তদবধি ধরাসনে, এই স্থানে শূন্যমনে,
থাকি প'ড়ে, ভাবি সেই হৃদয়ের ভাবনা,
কি যে ভাবি দিবানিশি তাও কিছু জানি না :
সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মান, অপমান—
অরে বিধি, তারে কিরে জন্মান্তরে পাব না ?

(৮)

এ যন্ত্রণা ছিল ভালো, কেন পুনঃ দেখা হলো,
দেখে বুক বিদরিল, কেন তারে দেখিলাম !
ভাবিতাম আমি দুখে, প্রেয়সী থাকিত সুখে,
সে ভ্রম ঘুচিল, হায়, কেন চোখে দেখিলাম !

(৯)

এইরূপে চন্দ্রোদয়, গগন তারকাময়,
নীরব মলিনমুখী অই তরুতলে রে ;
এক দৃষ্টে মুখপানে, চেয়ে দেখ চন্দ্রাননে
অবিরল বারিধারা নয়নেতে ঝরে রে ;
কেন সে দিনের কথা পুনঃ মনে পড়ে রে ?

(১০)

সে দেখে আমার পানে, আমি দেখি তার পানে,
চিত্তহারা দুইজনে বাক্য নাহি সরে রে ;
কতক্ষণে অকস্মাৎ, "বিধবা হয়েছি নাথ" !
বলে প্রিয়তমা ভূমে লুটাইয়া পড়ে রে।

(১১)

বদন চুম্বন ক'রে, রাখিলাম ক্রোড়ে ধরে,
শুনিলাম মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বলে রে—
"ছিলাম তোমারি আমি, তুমিই আমার স্বামী,
ফিরে জন্মে, প্রাণনাথ, পাই যেন তোমারে।"
কেন শশী পুনরায় গগনে উঠিলি রে !

(কবিতাবলী, ১৮৭০-৮০)

রূপ

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

(নির্বাচিত অংশ)

(১৯)

মুদ্রা করে লয়ে কোথা জন্মে কোন জন
কৌলীন্যের চিহ্ন থাকে কার ?
বিধাতার কর কে না করে দরশন
অঙ্গে তার, রূপ আছে যার ?

(২০)

নাই যার সেই বলে রূপ কিছু নয়,
এল গেল ক্ষণিক প্লাবন ;

চির নব যদিও না চির দিন রয়
তথাপি সে রূপ পুরাতন।

(২১)

যত্নে চায় অসিত পক্ষের শশধরে,
যত্নে চায় গ্রীষ্ম-সরোবরে,
ব্যয়ে ক্ষয় দেখে ধন যত্নে চায় নরে
প্রিয় আরো প্রিয় হ্রাস ভরে।

(২২)

প্রকৃতির বিস্তৃত বিনোদ আবরণ
বিশ্বপটে স্নেহের মার্জ্জন ;
রূপ তুমি প্রণয়ের অঙ্গজ নন্দন,
কর যত্নে পিতার পালন।

(২৩)

যে যারে সাজায় তারে প্রেম থাকে তার
সামান্য এ কথা বুঝিবার ·
অঙ্গে রূপ ভালবাসা দান বিধাতার ;
ভালবাস অঙ্গে রূপ যার।

(২৪)

রূপবেদী পরে প্রেম উপহার দিয়া
উপাসিব পুলকে ধাতার ;
পাষাণ কাষ্ঠের বেদী কি কাজ রচিয়া,
কি কাজ বা পট প্রতিমায় ?

('ফুলরা')

উপহার

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

(নির্বাচিত অংশ)

(১)

ইন্দুকুন্দ-বিনিন্দিত বরণ বিমল,
সিত কণ্ঠ-হার, সিত বাস,
সারদে ! চরণারুণে চিত-শতদল
বিকসি আসিয়া কর বাস ;—
ভাব রাগ বাক্ তানে
জাগাও নিদ্রিত প্রাণে,
হৃদি-যন্ত্র কর মা তন্ত্রিত ,—
গীতোচিত কণ্ঠহীনে কিঙ্কর কুণ্ঠিত !

(২)

বর্ণিতে না চাই হ্রদ, নদ, সরোবর,
সিন্ধু, শৈল, বন, উপবন,
নির্মল নির্ঝর, মরু—বালুর সাগর,
শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত-বর্ত্তন ;
হৃদয়ে জেগেছে তান,
পুলকে আকুল প্রাণ,
গাবো গীত খুলি হৃদি-দ্বার,—
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার !

(৩)

কোন বরবর্ণিনী বিশেষ নায়িকার
চাটু স্তুতি না চাই রচিতে ;
সমুদয় নারীজাতি নায়িকা আমার,
বাঞ্ছা চিতে বিশেষ বর্ণিতে ;

স্মরি চির উপকার,
দিব গীত-উপহার,
শুধিবারে ধার মমতার,
মায়া-কায়া মাতা, ভগ্নী, নন্দিনী, জায়ার

(৬)

সবিলাস বিগ্রহ মানস সুষমার,
আনন্দের প্রতিমা আত্মার,
সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার,
মুগ্ধমুখী মূরতি মায়ার ;
যত কাম্য হৃদয়ের,
সংগ্রহ সে সকলের,
কি বুঝাবো ভাব রমণীর ;—
মণি-মন্ত্র-মহৌষধি সংসার-ফণীর !

(১১)

নবীন জনমে নর জাগি সচকিতে,
শ্যামকান্তি নিরখে ধরার,
জলে স্থলে বিমল আলোকে পুলকিতে
চরাচর বিহরে অপার ;—
সমীরণে দোলে ফুল,
গুঞ্জে কুঞ্জে ভৃঙ্গকুল,
পাখী গায় বসি শাখী পরে,
সবে সুখী, নর শুধু কাতর অন্তরে !

(১২)

শূন্য মনে বসি শূন্য আকাশের তলে,
শূন্য দেখে শোভিত সংসার !
নিরূপিতে নাহি পারে নিজ বুদ্ধিবলে,
কিসে দুঃখী, কি অভাব তার !—

বুঝি ভাব মানবের,
ধাতা তার মানসের,
করিলেন প্রতিমা রচনা ;—
ভূলোক পুলকপূর্ণ, জন্মিল ললনা !

(১৩)

বিকচ পঙ্কজ-মুখে শ্রুতি পরশিত,
সলাজ লোচন ঢল ঢল,
চাঁচর চিকুর চারু-চরণ-চুম্বিত,
কি সীমন্ত ধবল সরল !
কান্তির হৃদয় ভরে,
স্বচ্ছ-মুক্তা-কলেবরে,
ঢল ঢল লাবণ্যের জল !
পাটল কপোল কর-চরণের তল !

(১৪)

পূজিবার তরে ফুল ঝ'রে প'ড়ে পায়,
হৃদি-ফল পরশে পাখীতে,
মুগ্ধ মুখে কুরঙ্গিণী মুগ্ধ মুখে চায়,
ধায় অলি অধরে বসিতে !
স্পর্শে পদ-রাগ-ভরা,
অশোক লভিল ধরা ;
এলোকেশে কে এল রূপসী !—
কোন্ বনফুল, কোন্ গগনের শশী !!

(২৪)

শ্রুতিহর চারুনাদে চরণসঞ্চার
ভাবভরা বিলাস আঁখির,
শোভিত সম্বন্ধে অর্থবহ অলঙ্কার,
আবরিত রসের শরীর ;—

পেয়ে হেনরূপ ছবি,
মানব হইল কবি ;
বনিতা সবিতা কবিতার।
মর্ত্ত্য-কুঁড়ে বিকসিল কুসুম মন্দার !

(২৭)

এক দুগ্ধে দধি, তক্র, ঘৃত, নবনীত,
নানা উপাদেয় যথা হয় ;—
এক নারী নানারূপে করে বিরচিত
সংসারের সুখ সমুদয় ;—
সৃষ্টি পুষ্টি জননীর,
প্রিয় চিন্তা ভগিনীর,
কন্যা সেবা, জায়ার বিহার ;—
অতুলনা দান যার কুমারী কুমার !

(২৯)

ফুটেছে অতুল ফুল-উদ্যান ধরায়,—
নরত্ব বিখ্যাত নাম তার ;
বৃন্তদল, কলেবর,—পুরুষের তায় ;—
নারী—বর্ণ, মধু, গন্ধ যার !
আছে কাঁটা অগণিত,
তবু অতি সুশোভিত ;—
সুধু এই শোক তার তরে !
কাল-অলি-মধুপান-অবসানে ঝরে।

(৩০)

সংসারে যে দিকে চাই, করি বিলোকন,
বিপরীত দুইভাব মেলা,—
বাহে দোহে অরি, মনে মধুর মিলন,—
কোমল-কঠিনে কিবা খেলা !

একে শোষে, অন্যে পোষে,
একে রোষে, অন্যে তোষে,
একে মূঢ়, অন্যে অতি কৃতী ;
হরগৌরীরূপ বিশ্বপুরুষ-প্রকৃতি !

(৪২)

ধন্য সাংখ্য তত্ত্বশাস্ত্র-সার-নিরূপণ !—
পেয়ে স্পর্শরস প্রকৃতির ,
পুলকে টলিল কায়, খুলিল লোচন
অবশ পুরুষ অকৃতীর ;
প্রকৃতির ভোগ্য কায়,
জীব ভোক্তা ভুঞ্জে তায়,—
কে ইহা করিবে অস্বীকার ?
পতি-পত্নী-ধাম ধরা প্রমাণ যাহার !

(৪৪)

সংসার পেষণি, নর অধঃশিলা তায়,
রেখে মাত্র আলম্বন যার,
নারী ঊর্দ্ধখণ্ড, কার্য্য করিছে লীলায়,
কালে রন্ধ্রে মিলন দোঁহার !—
ভাব-চক্ষে নিরখিয়া,
দেখ হে ভবের ক্রিয়া,
বিপরীত বিহার অতুল !—
রমণী-রমণ-রসে পুরুষ বাতুল !

(৪৫)

মূঢ়া উক্তি, মানবে মজালে মহিলায়,
দিয়া জ্ঞান-রস-আস্বাদন :
সদলে সে হেতু দুঃখ পশিল ধরায়,—
জরা ব্যাধি রোদন মরণ ।

মিলাইয়া নিজ যুক্তি,
ভাবুকে বুঝিবে উক্তি,
নিন্দা নয়, স্তুতি ললনার ;—
অমরত্ব ছাড়ে নরে প্রেমভরে যার !

(৪৮)

যদি মৃত্যু এনে থাকে মহিলা ধরায়,
সে ক্ষতি সে করেছে পূরণ ;
যম-যানে জরাজীর্ণে লোকান্তরে যায়,
নারী করে প্রসব নূতন !
কোন্ দুঃখ ধরা ধরে
নারী যারে নাহি হরে ?
তাই পুন মৃনার লিখন,—
নারী-বীজে হবে ফণি-ফণার দলন !

('মহিলা', ১৮৮০)

জায়া

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

(নির্বাচিতাংশ)

(১)

নদী-মধ্যভাগে যথা সন্তরিত জন
গভীর নীরের নৃত্য করি বিলোকন
সভয়ে সন্দেহ-মনে কূল-পানে চায় ;
কবির অবস্থা তাই,
আগে চেয়ে ভয় পাই,
নারী-নদী বিশাল, কি পার পাব তায় !—
ধরি ক্ষুদ্র ক্ষীণ তৃণ লেখনী সহায়।

(২)

মাতা মৃদু তটভাগ ভয়-হীন তায়,
না পাই সে শান্তভাব মাঝারে জায়ায়,—
বিষম আবর্ত্ত তুঙ্গ তরঙ্গ খেলায় ;
রসিক ভাবুক জনে
বুঝ বিচারিয়া মনে,
শত দোষ না পাইলে প্রকোপ মাতায় ;
অল্পে অভিমানী প্রিয়া ভয় বাসি তায় ।

(৬)

এসো এসো প্রিয়তমা প্রতিমা সাকার !
জাগাও ভক্তের হৃদে ভাব নিরাকার ;—
রাগভরে করি তব স্তবন পূজন !—
পৌত্তলিক ভাবি মনে,
হাসিবে অবোধগণে ;
সুবোধ বুঝিবে আছে নিগূঢ় কারণ,—
নিরাকারে ধ্যান নভ-কুসুম-চয়ন ।

(৭)

তোমার কাহিনী কাব্য, কবি বক্তা তার,
অলঙ্কারী কুশ-শিখ-সূক্ষ্ম-মতি যার,
বিচরিয়া ভাব অন্ত নাহি পায় !
ঘটে পটে মত্ত যারা,
দেখিতে না পায় তারা,
মনোহরী তোমার সুষমা প্রতিমায়,
অচিন্ত্য অগম্য ভাবে অধ্যাত্মবিদ্যায় ।

(১০)

জরা বাল্যকাল মাঝে সুখের যৌবন,
মানুষের মধ্যে মান্য মধ্যস্থ যে জন,
আঁখি-মধ্যভাগে আঁখি-মণির বিহার ;—

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মাঝে
প্রেমভাব যথা সাজে,
তুমি মধ্যচারী তথা মাতা দুহিতার,
পূর্ণ চারু বামা-ভাব-সাকার-লীলার।

(১৫)

মধ্যভাব দুইপ্রান্তে বিহরে বিকার,—
পালন গৌরব-ধর্ম বিকার মাতার,
সেবাধর্মে লাঘব বিকার দুহিতার ;
স্ত্রী ভাবের প্রেমপাত্র,
সবে এক তুমি মাত্র,
স্ত্রী নারী রমণী বামাঙ্গনা যত আর,
যত জাতি-উপাধি তোমার অধিকার।

(১৬)

স্নিগ্ধ উষ্ণ তীব্র মন্দ যত বিপরীত,
প্রহেলি-পুত্তলি ! সব তোমায় মিলিত ;
হেন দ্বন্দ্ব-মিল মিলে ঈশান কেবল !
দুই বিপরীত যথা,
মধ্য ভাব বসে তথা :
বিষয় বিরাগ তুমি প্রেম ধর্মস্থল ;
দিব্য সুধা মত্ত সুরা তীব্র হলাহল।

(১৭)

কুন্তল-কলাপ কিবা কাদম্বিনী কায়,—
চমকি চমকি চোখে চপলা খেলায়,
অকলঙ্ক শশাঙ্ক আনন শোভা পায়,
তরুণ অরুণ রাগে
সিন্দুর ললাট-ভাগে,
সন্ধ্যার নিবাস নেত্রপল্লব-ছায়ায়,
কি শীতল হিম ঝরে মুখের কথায় !

(৩২)

যার মিলে নারী সনে এ হেন মিলন,
নারী সনে সে যৌবন-মিলন কেমন !
হেন কবি কেবা তার করিবে বর্ণন !
পুরুষ পাষাণকায়,
যৌবন মিহিরপ্রায়,
প্রতিবিম্ব তায় তার রটে কি তেমন,
রমণী-মণির অঙ্গে ঝলকে যেমন ?

(৩৩)

কৃশাঙ্গীর কলেবরে যৌবন কেমন ?
হবির পরশভরে কৃশাণু যেমন,
অথবা বসন্তে যেন কাননের কায়,
নদী যেন বরিষায়
ধরে না রসের ভার,
লাবণ্য-লহরী খেলে ললিত লীলায়,
উছলে উদধি যেন পেয়ে পূর্ণিমায় !

(৩৪)

ইন্দ্রজাতী মতি করে মাটি-গুটিকায়,
যৌবনে বত্তিত হেন কামিনীর কায়,
কাল পেয়ে কাল কুঁড়ি কুসুম যেমন ;
ছদ্মবেশী দেব-বরে
যেন নিজরূপ ধরে ;
ধূলিচারী তস্তকীট বালিকা তখন
কি বিচিত্র প্রজাপতি যুবতী এখন !

(৩৫)

সে দিন না ছুঁইয়াছি যারে ঘৃণাভরে,
আজ তার স্পর্শ পেলে চাঁদ পাই করে ;
কাল ছুটাছুটি, আজ গজেন্দ্রগমন ;

কাল না চেয়েছি যায়,
আজ সে না ফিরে চায় ;
ধূলা-খেলা ছেড়ে আজ কেড়ে লয় মন,
আত্মা-অশ্বে করে কশা-কটাক্ষ শাসন !

(৩৬)

কোথায় উপমা দিব যুবতী শোভায় ?
অতি চারু শশাঙ্ক শারদ পূর্ণিমায় ?
শারদ সরসি বটে পরম শোভার ;
বিমল রসাল কায়,
মন্দ আন্দোলিত বায় ;
কিন্তু কোথা পাব তায় বিহার আত্মার !—
মদালস সে লোল লোচন লালসার !—

(৪৫)

তপনে কিরণ তুমি, কিরণে প্রকাশ,
হৃদয়ের প্রেম তুমি, বদনের হাস,
জড়ে অবয়ব তুমি, বিজ্ঞান আত্মার,
তুমি শীতগুণ জলে,
তুমি গন্ধ ফুলদলে,
মধুর মাধুরী স্বরে সঙ্গীতে সঞ্চার,
কাঞ্চনের কান্তি তুমি বল অবলার !

(৫০)

তনুরূপ রথ, উড়ে পতাকা অঞ্চল,
বল্গা-ধৈর্য্যে অঙ্গভঙ্গী নাচে হয়দল,
আপনি রমণী রথী, সারথি যৌবন,
মৃদু হাসি বীরদাপে
হেলাইয়া ভুরু-চাপে
সঘনে কটাক্ষ-শর সন্ধানে যখন,
কোন্ বীর পরাভব না মানে তখন !

(৫১)

আছে যে বারিতে পারে মদনের শরে,
নাই যে না বাসে রূপ-প্রভাব অন্তরে ;
না থাকে আহারে লোভ, রুচিবোধ রয় ;
হের হর-দৃষ্টিভরে
মদন পুড়িয়া মরে,
স্মরারি সৌন্দর্য্যে তবু উদাসীন নয় !—
পরিচয় হিমাচল-সুতা-পরিণয় ।

(৬৬)

অশ্বে যথা বল্গা, যথা অঙ্কুশ করীর,
দেহে যথা দৃষ্টি, কর্ণ যেমন তরীর,
বুদ্ধি-বৃত্তি-দলে যথা হিতাহিত-জ্ঞান,
সিন্ধু-যাত্রি—পথ-হারা
তার যথা ধ্রুব তারা,
পুরুষে প্রেয়সী তুমি সেরূপ বিধান ;—
তোমা বিনা পথ-ভ্রান্ত পান্থের সমান !

('মহিলা', ১৮৮০)

অস্তাচলগামী চন্দ্র

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(১)

ওই দেখ দাঁড়াইয়া আকাশের পাশে যামিনীবিলাসী ;
পাণ্ডুবর্ণ কলেবর, কাঁপিতেছে থরথর,
কপোলনয়নজলে যাইতেছে ভাসি ;
ছাড়িতে প্রাণের প্রিয়া, ব্যাকুল প্রণয়িহিয়া ;
প্রেম বিনা এ সংসার অন্ধকাররাশি ;

কেন রে গোকুলচাঁদ ভুলিল আমারে ?
বিষের জ্বলনে জ্বলি ভব-কারাগারে।

(২)

বিরহরাহুর ভয়ে শশীর এ দশা গগনমণ্ডলে ;
দেবতার বুদ্ধি হত, মানুষের সহে কত,
দুর্ব্বল মানবকুল সকলেই বলে ;
অবলা সহজে নারী ; যন্ত্রণা সহিতে নারি ;
জীবন জ্বলিছে যেন বাড়ব-অনলে ;
বল সজনি লো বল বাঁচিব কেমনে ?
অথবা মরণ ভাল শ্যামের বিহনে।

(৩)

প্রেমের কমল, হায়, মানসসরসে ফুটিবে কি আর ?
হৃদয়-গগন-রবি, সংসার-রঞ্জন-ছবি,
ঊষার সহিত দেখা দিবে কি আবার ?
লোকে মোরে কমলিনী, বলে কেন নিতম্বিনি ?
আমারে ঘেরিয়া আছে চির অন্ধকার।
এ নিশার অবসান হবে কিলো সই ?
আর কার কাছে মোর মনকথা কই।

(৪)

কেন সই তোর আঁখি করে ছল ছল বল্ না আমারে ?
কি ভাবি হৃদয়ে তোর, উথলে যন্ত্রণা ঘোর ?
কিসে তোর ফুল্লমুখ গ্রাসিল আঁধারে ?
বুঝিলাম মোর দুখ, হরিয়াছে তোর সুখ,
সুখ সুখ, দুখ দুখ, চৌদিকে বিম্ব।
যেখানে বসন্ত যায়, ফুটে ফুলকুল ;
যথায় শীতের গতি, সৌন্দর্য্য নির্মূল।

(৫)

সজনি লো সরোবরে দেখনা কাঁপিছে ভয়ে কুমুদিনী,

নয়ন মুদিতপ্রায়, যেন অবসন্ন কায়,

নাথ যায়, বলি হায়, এমন মালিনী।

না আইল মোর নাথ, কেবল বিরহ সাথ

যাপিতে হইল মম বিষম যামিনী।

নিশা তো হইল গত, বিরহ না যায়।

কেন হরি নিদারুণ হইলে আমায়?

(৬)

বলিতে আমারে তুমি কত ভালবাস, বৃন্দাবনধন।

কত প্রেমকথা কয়ে, আমারে হৃদয়ে লয়ে,

করিতে পুলককায়ে সাদরে চুম্বন।

একেবারে স্বপ্নবৎ, হইল কি সে তাবৎ?

অবলা ছলিতে তুমি পার কি কখন?

অথবা কপালগুণে—আমি অভাগিনী—

অমৃত হইল বিষ, লো প্রিয় ভগিনী।

(কবিতামালা, ১৮৭৭)

প্রণয়োচ্ছ্বাস

নবীনচন্দ্র সেন

(১)

অকস্মাৎ কি অনল হৃদয়েতে জ্বলিল?

অকস্মাৎ কেন মন বিষাদিত হইল?

আন্‌চান্ করে প্রাণ;

ধরা শর-শয্যা জ্ঞান;

কিসে হৃদয়েতে মম এত ব্যথা জন্মিল ?
অকস্মাৎ কি অনল হৃদয়েতে জ্বলিল ?

(২)

কেমনে জন্মিল ব্যথা ?—আমি কি তা' জানি না ?
কিন্তু যার জন্যে জ্বলি, সে যে জেনে জানে না।
প্রেয়সী রে নিরদয় !
প্রেম ভুলিবার নয়,
কত চাহি ভুলিবারে—ভুলিতে যে পারি না।

(৩)

প্রিয়তমে ! এই কি রে ছিল তব অন্তরে ?
আশা-ইন্দ্রধনু দূরে দেখাইয়া অম্বরে
কেন তৃষা বাড়াইলে ?
যদি নাহি জুড়াইলে
প্রণয়-শীতল-বারি বরষিয়া আদরে ?

(৪)

কি আর বলিব, প্রিয়ে ! কত আর বলিব ?
তাপিত তৃষিত চিত্তে কত আর সহিব ?
এই পাই, এই নাই,
হারাইয়া পুনঃ পাই,
মরে বেঁচে, বেঁচে মরে, কতকাল থাকিব ?

(৫)

কি দুঃখেতে, প্রিয়তমে, গত নিশি গিয়েছে !
কি অনলে এ হৃদয় সারা নিশি দহেছে !
তব চন্দ্রানন, প্রিয়ে !
অন্ধকারে নিরখিয়ে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস, প্রিয়ে সারানিশি বহেছে !
কি দুঃখেতে, প্রিয়তমে ! গত নিশি গিয়েছে !

(৬)

কতবার স্বপনেতে মুখশশী হেরেছি ;
কতবার স্বপ্ন-ভঙ্গে, সুখ-ভঙ্গে কেঁদেছি !
এইরূপে কেঁদে, হেসে,
দুঃখের সাগরে ভেসে,
প্রেয়সি রে ! মনোদুঃখে গতনিশি কেটেছি ।

(৭)

হবে না আমার, প্রিয়ে ! যদি মনে জেনেছ ;
এ অধীনে, তবে কেন, এত দুঃখ দিতেছ ?
বল, প্রাণ ! একবার,—
হবে না আমার আর,
ভস্ম হ'ক এ হৃদয়, যাহা দগ্ধ হতেছে ।

(অবকাশরঞ্জিনী, ১৮৭১)

আকাঙ্ক্ষা

নবীনচন্দ্র সেন

কোমল প্রণয়-বৃন্তে, কুসুম-যৌবনে
ফুটিয়াছে যেই ফুল, সাধ ছিল মনে,
নিরখিয়া জুড়াইব তৃষিত নয়ন,—
দেখিয়াছি, কিন্তু আশা হলো না পূরণ ।

নাহি জানি কি কৌশলে বিধি বিচক্ষণ,
সৃজিলেন তব সেই চারু চন্দ্রানন ;
নয়ন ভরিয়া যত করি নিরীক্ষণ,
ইচ্ছা হয় আর বার করি দরশন ।

কিন্তু মিছে আশা হায়, সরলে তোমার,
দেখিব কি প্রেমফুল্ল বদন আবার ?
আবার কি আশামত্ত নয়ন যুগল,
নিরখিবে প্রিয়ে ! তব নেত্রনীলোৎপল ?

অভাগার ক্রোড়ে গণ্ড করিয়া স্থাপন,
স্মিতবিকসিত নেত্রে করি নিরীক্ষণ,
প্রেমবিগলিত স্বরে বলিবে কি আর,
মধুমাখা কথাগুলি শ্রবণে আমার ?

বীণা-বিনিন্দিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
নিবিবে কি দুঃখানল, জুড়াবে জীবন ?
এইরূপ কত আশা নক্ষত্র যেমন,
ফুটিবে নিশীথে, হবে দিবসে নিধন।

সে সকল সুখ আহা ! কপালে আমার.
ফলিবে না এ জনমে ; তবে কেন আর,
চিত্র করি এই চিত্রে, ভাসি অশ্রুজলে,
মরিয়া মনের দুঃখে বসিয়া বিরলে ?

কেন স্মৃতি-পথে তব, প্রণয়-তুলিতে,
চিত্র করি তারে, যারে দেখে আচম্বিতে
ভুলিয়াছ এত দিনে ; বল না কেমন,
তুমি কি লো অভাগারে ভুলনি এখন ?

মম দীন হীন মূর্ত্তি ভাসে কিলো আর
তব চিত্ত-সরোবরে, বল একবার ?
সুখের সাগরে প্রিয়ে, ডুবিয়া কখন
(দেখ কি হে বিদেশীয় বন্ধু একজন !)

দেখ কিনা দেখ, কিন্তু আমি অনিবার,
নিরখি সরলে ! তব মোহিনী আকার।

সুনীল উজ্জ্বল দুই নয়ন তোমার,
মানস-সরসে মম দিতেছে সাঁতার।

কোমল কাঞ্চনকান্তি, রূপের কিরণ
হাসিছে আলোকি মম হৃদয়-গগন।
মুকুতার হারে গাঁথা অধর যুগল,
সুন্দর গোলাপি রসে করে টলমল।

মধুর তরল হাসি সতত তথায়
বিরাজিছে যেন স্থির বিজলীর প্রায়।
এখনও দেখি যেন ধরিয়া গলায়,
প্রেমভরে কত কথা কহিছ আমায়!

দুলিছে সৌন্দর্য্য তব, স্মৃতির গলায়,
দোলে যথা নব লতা সহকার গায়।
কিন্তু আহা! সে সকল করিয়া স্মরণ,
নিস্তেজ অনল কেন করি উদ্দীপন?

একদিন তরে মাত্র দেখিয়াছি যারে,
খুলিয়া হৃদয়দ্বার, কি ফল তাহারে,
শুনাইয়া অভাগার মনের বেদন?
সে আমার দুঃখে দুঃখী হবে কি কখন?

যাই প্রিয়ে! যতদিন থাকিবে জীবন,
প্রণয়-কমলাসনে করিয়া স্থাপন,
রাখিব তোমারে সখি! হৃদয়ে আমার;—
দুঃখী আমি, আর কিবা দিব পুরস্কার?

প্রেম-বিকশিত নেত্রে দেখেছ যখন,
হৃদয় তখন আমি করেছি অর্পণ।
মনপ্রাণ অভাগার করিয়া হরণ
সুখে থাক বিধুমুখি! বিদায় এখন।

তুলিয়া কমল-মুখ দেখ, এক বার,
মনে রেখো দুঃখী বলে ; বিদায় আবার !

(অবকাশরঞ্জিনী, ১৮৭১)

হৃদয়-উচ্ছ্বাস

নবীনচন্দ্র সেন

(১)

সখি রে !
আর কি বলিব আমি মরিতেছি মরমে,
বচন না সরে মুখে মরে আছি সরমে।
দিন দিন, পল পল, জ্বলিছে বিরহানল,
নিবিবে না আর তাহা বুঝি এই জনমে।
প্রিয়সখি, মরিতেছি মরমে।

(২)

সখি রে !
ওই দেখ ফুলকুল ফুটিতেছে কাননে,
নাচিতেছে অনুরাগে সমীরণ-চুম্বনে ;
বিহঙ্গিনী ফুল্ল মনে, স্বনাথ বিহঙ্গ-সনে,
বরষি সঙ্গীতসুধা মোহিতেছে শ্রবণে ;
ফুলকুল ফুটিতেছে কাননে।

(৩)

সখি রে !
যে দিকে ফিরাই আঁখি হেরি তারে নয়নে ;
যেই দিকে কর্ণ পাতি শুনি তারে শ্রবণে ;
নিত্য নয়নের কাছে, তার চিত্র ভেসে আছে,
সে যেন রয়েছে সখি, মিশাইয়া জীবনে,
প্রিয় সখি, মিশাইয়া জীবনে।

(৪)

সখি রে !

তারে যে পাবার নয় জেনেছি তা অন্তরে ;

তবে কেন দিবানিশি ভাসি দুঃখ-সাগরে ?

ছাড়িয়া গিয়াছে যবে, আর কি আমার হবে,

উড়ে গেলে পাখি পুনঃ ফিরে কি সে পিঞ্জরে ?

ওলো সখি, জেনেছি তা অন্তরে।

(৫)

সখি রে !

গেলে এ বসন্তকাল আবার সে আসিবে ;

নীরবি বিহঙ্গকুল পুনর্বার গাইবে ;

ফুটিবে কুসুমগণ, বহিবে এ সমীরণ ;

কিন্তু সেই পাখি পুনঃ পিঞ্জরে না ফিরিবে,

প্রেমপাখি পিঞ্জরে না বসিবে।

(৬)

সখি রে !

শুকাইবে এই ফুল ; কিন্তু পুনঃ দেখিবে,

এ ফুল ফুটিয়া পুনঃ সুসৌরভ ভরিবে।

এ হৃদয়ে পুনর্বার, সেই প্রেম সুধাসার,

এই জন্মে প্রিয়সখি আর নাহি বহিবে

এই জন্মে আর নাহি ফিরিবে।

(৭)

সখি রে !

কিন্তু সেই প্রেমধারা যেইখানে বহেছে,

গভীর বিচ্ছেদরেখা সেইখানে রহেছে।

এই রেখা চিরকাল, হইবে আমার কাল,

নদী সহ, নদীরেখা কোথা লুপ্ত হয়েছে,

সখি রে, যথা নদী বহেছে।

(৮)

সখি রে !

জীবন যাইবে, এই যৌবন ত যেতেছে।
ভস্ম হবে এ হৃদয়, এবে দগ্ধ হতেছে।
ক্রমে ক্রমে এই সব, হবে স্বপ্ন অনুভব,
দেখিতে দেখিতে সখি অলক্ষিত হতেছে
প্রিয়সখি, সকলেই যেতেছে।

(৯)

সখি রে !

বিচ্ছেদ যাবার নহে, বিচ্ছেদ ত যায় না।
প্রেম সহ এই পোড়া বিচ্ছেদ লুকায় না।
জীবন্তে ত না ছাড়িবে, প্রাণান্তেও সঙ্গে যাবে,
বিচ্ছেদ যাবার নহে, বিচ্ছেদ ত যায় না,
প্রাণসখি, বিচ্ছেদ লুকায় না।

(১০)

সখি রে !

যে বিধি চঞ্চল করি প্রেমনিধি গড়িল,
চঞ্চল করিয়া কেন বিচ্ছেদ না সৃজিল ?
লোকে বলে ফুলবাণ, সে কি এত খরশান ?
ফুলবাণ সখি মম মরমে কি পশিল !
ফুলবাণে এত ব্যথা জন্মিল ?

(১১)

সখি রে !

কিসের সে ফুলবাণ, কবিদের কল্পনা।
ফুলবাণে হৃদয়ে কি জন্মে এত বেদনা।
নিরখি কুসুমবন, মনে পড়ে প্রিয়জন,
স্মৃতিবাণে হৃদয়েতে বাড়াইছে বেদনা
ফুলবাণ কবিদের কল্পনা।

(১২)

সখি রে!

দিবানিশি তার স্মৃতি হৃদয়েতে জাগিছে;
অবলার মনোদুখ অনিবার বাড়িছে।
যত চাহি ভুলিবারে, তত মনে পড়ে তারে,
ততই বিচ্ছেদানল বেগে জ্বলে উঠিছে,
প্রিয়সখি, অবলারে দহিছে।

(অবকাশরঞ্জিনী, ১৮৭১)

কেন ভালবাসি?

নবীনচন্দ্র সেন

কি দিব উত্তর? আমি কেন ভালবাসি?
আজি পারাবার সম,
হায়, ভালবাসা মম,
কেন উপজিল সিন্ধু, এই অম্বুরাশি,
কে বলিবে? কে বলিবে, কেন ভালবাসি?

অনন্ত অতল সিন্ধু!—পশি বারি-তলে
কেমনে বলিব বল,
কোথা হ'তে নিরমল,
বহিল সে ক্ষুদ্রস্রোত, পরিণাম যা'র,
আজি, প্রিয়তমে, এই প্রেম-পারাবার।

যে তরু অনন্তছায়া হৃদয় আমার
করিয়াছে, আজ প্রিয়ে! কেমনে চিরিয়ে হিয়ে,
দেখাব সে পাদপের অঙ্কুর কোথায়?—
কেন ভালবাসি, হায়! বুঝা'ব তোমায়?

কেন বাসি ভাল ? অয়ি সচন্দ্র শর্বরি,
দেখেছ প্রথম তুমি,
এ হৃদয় বনভূমি—
সুখময়, ঝলসিতে সে রূপ-কিরণে,
প্রবেশিতে দাবানল কুসুম-কাননে।

ছিল এ হৃদয় ক্ষুদ্র প্রেম-সরোবর,
একটি নক্ষত্র তায়
ভাসিত, সে চিত্ত, হায়
কেন মরুময় আজি পিপাসা-লহরী ?—
কেন ভালবাসি, কহ সচন্দ্র শর্বরি !

শর্বরি ! তোমার অঙ্কে চাপিয়া হৃদয়,
হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি,
মরিয়াছি, বাঁচিয়াছি,
দহিয়াছি, সহিয়াছি তীব্র জ্বালারাশি ;
শর্বরি ! কহ না তুমি কেন ভালবাসি ?

দেখিয়াছ তুমি সেই মাজ্জিত কুন্তল ;
সুকুন্তল কিরীটিনী
প্রেমের প্রতিমাখানি,
আচরণ-বিলম্বিত দীর্ঘ কেশ রাশি,
দেখিয়াছ, কহ তবে কেন ভালবাসি ?

এ হৃদয়ে, নিশীথিনি ! জাগ্রতে নিদ্রায়,
যেই দৃষ্টি-সুধাদান,
মোহিয়া বিমুগ্ধ প্রাণ
করিয়াছে, সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ সুশীতল !—
কেন ভালবাসি, নিশি, বুঝিলে সকল ?

জীবন, যৌবন, আশা, কীর্ত্তিধন, মান,—
তৃণবৎ ঠেলি পায়
আসিনু উন্মাদপ্রায়
যা'র কাছে, হায়! তা'র মন বুঝিবারে,
সে কি জিজ্ঞাসিল কেন ভালবাসি তা'রে?

তুমি পত্র, তুমি চিত্র—সর্বস্ব আমার!
অক্ষরে অক্ষরে পত্রে,
রেখায় রেখায় চিত্রে,
কত জিজ্ঞাসিয়া, কত কাঁদিয়াছি, হায়!
কেন ভালবাসি, আহা, বল না তাহায়?

কেন ভালবাসি, প্রিয়ে, বলিব কেমনে,
কোথা আমি, কোথা তুমি,
মধ্যে এই মরুভূমি
নির্ম্মম সংসার,—কিসে শুনিবে সুন্দর
হৃদয়ে হৃদয়ে যা'র সম্ভব উত্তর!

(অবকাশরঞ্জিনী, ১৮৭১-৭৮)

প্রোষিতভর্তৃকা

(আশা-ভঙ্গ—সঙ্গিনীর প্রতি উক্তি)

মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়

বল সখি তায়, কেন মন চায়,
না মানে বারণ কেন?
কি তত্ত্ব ভাবিয়া, উন্মত্ত হইয়া,
রয়েছে বারণ যেন?

ভাবি নিশিদিন, এদিন সুদিন,
আর কি আমার হবে ?
আসি' গুণমণি, প্রফুল্লিত মনে,
আর কি আমায় লবে ?
সে হ'ল সাহেব, আমি যে বাঙ্গালি,
আর কি লো আছে আশা ?
লয়ে ইংরাজিনী, করিবে সঙ্গিনী,
ভুলে যাবে ভালবাসা !
না ভুলেছে যদি, দেখ সে অবধি,
না লয় সংবাদ কেন ?
আমার বিরহে, কাতর সে নহে,
মনে জ্ঞান হয় হেন।
তাঁহার বিচ্ছেদ, হৃদি করে ভেদ,
জ্বালা আর সহি কত ?
মনে ইচ্ছা হয়, নদী তীরে যাই,
গিয়া হই জলগত।
দেখিলে লো জল, যাতনা অনল,
বাড়য়ে দ্বিগুণ করে ;
জল যে জীবন, জ্বালাতেন কেন
করে এম জীবন রে ?
যার লাগি দুখ, সেই জন মুখ
পানে যদি নাহি চায়,
তবে কেন বল, উন্মত্ত বিকল
হ'য়ে মন তাঁরে চায় ?
প্রেমপান আশে, হৃদয়-আকাশে
রাখিনু যতনে শশী,
রাহু নানা ফাঁদে, হরিল সে চাঁদে,
চাতুরী করিয়া পশি'।

(বনপ্রসূন, ১৮৮২)

মিলনে

মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়

(১)

প্রিয়তমে !

পেয়ে বহুদিন পরে,
কত সাধ যে অন্তরে
হই'ছে, কি রূপে তোরে
সখি ! প্রকাশি' কহিব,
এবার তোমায় ছাড়ি', আর নাহি যাইব

(২)

আজি হেরে গুণবতি !
তব মুখ চারু ভাতি,
আঁধার অন্তরে জ্যোতি
বিকসিত, সুখ মনে
কত, হেন সুখ কভু, পেয়েছ কি ললনে !

(৩)

স্থানান্তরে মুখশশী
তব, বিরলেতে বসি
ভাবিতাম, দিবা নিশি
সখি তুমি মম তরে
ভাবিতে কি সেই মত, দুখ-মগ্ন অন্তরে ?

(৪)

কেন সখি, মনোমত
হয়েছিলে মম এত
বলনা ; নহিলে চিত
কভু এত ভাবিত না ;
একাধারে এত গুণ ধরে কত ললনা ?

(৫)

মনে সদা ইচ্ছা করে
রাখি কণ্ঠহার কোরে,
দিবানিশি হেরি তোরে,
কিন্তু তাহা হইল না
তাতেই স্ত্রৈণ বলি', লোক দেয় গঞ্জনা।

(৬)

রহিলে তোমার সনে,
কত সুখ শান্তি মনে,
আনন্দ-লহরী, ঘনে
ঘনে উঠে উথলিয়া
সব প্রলোভন হতে সুখ, কাছে থাকিয়া

(৭)

যৌবনে আছিলে নারী,
এবে তুমি সর্ব্বেশ্বরী,
মাতৃ-ভাব অধিকারী
হইলে যে ক্রমে ক্রমে,
সহায় আমার তুমি, এই ধরণী ধামে।

(৮)

গৃহলক্ষ্মী পূর্ণশশী,
কখন বা হও দাসী,
প্রকৃত বন্ধু প্রেয়সী
হও হে তুমি আমার,
পরামর্শে মন্ত্রী তুমি, জীবনের আধার।

(৯)

তোমারে ছাড়িয়া যাই,
এমন বাসনা নাই,
কি করি, যাইতে চাই

সংসার-তীব্র তাড়নে,
শ্রম দুঃখ বিনা অর্থ, নাহি মিলে ভুবনে।

(১০)

সখি ! করমের তরে,
ছাড়ি যবে যাই দূরে,
রহ তুমি এ অন্তরে,
দিনে সে মূরতি দেখি,
তব বাক্য শুনিহে স্বপনে, অমিয়মুখি !

(বনপ্রসূন, ১৮৮২)

বিরহে

প্রথম মিলন, হইল যখন,
যেন চাঁদ দিল করে,
পিতার কারণ, দুঃখিতা তখন,
ভুলিলাম সে আদরে।
ওগো প্রাণসখি, সে মিলনে সুখী,
কত মোর মন ছিল !
ভাবি নিরন্তর, ছাড়িয়া অন্তর,
সে কেন অন্তর হল ?
তিনি গুণাধার, কত গুণ তাঁর,
কত বা লাবণ্য হায় !
কেমনে পাসরি, সে সব মাধুরী,
মন যেন সঁপেছি তাঁয়।
হৃদয়-মন্দিরে, গেঁথেছি আদরে,
যত্নে তাঁর যত গুণ,
সে সব পাসরি', থাকিব কি করি',
সর্ব গুণে সে নিপুণ।

লুব্ধ, মুগ্ধ, প্রেমে, হয়েছিনু ভ্রমে,
কত আশা ছিল মনে !
এতই কেন লো সই, মন্দ হ'ল
অভাগীর ভাগ্যগুণে ?

সাক্ষাতে সবার, দুখের বিস্তার,
কিন্তু কা'রে দুখ কই ?
কা'র সাধ্য পারে, সান্ত্বনিতে মোরে,
ইহার ঔষধ কই ?

যে আমারে সুখী করেছিল সখি,
সে যদি সমুদ্র-পারে,
এ দুখ অনল নিবাইবে বল,
কেবা আছে এ সংসারে ?

কহিব কাহায়, সহি যে একাই,
দুখ-শর-বরিষণ,
সুহৃদ কে আছে ? আনি তা'রে কাছে,
দিবে মোর প্রাণদান ।

বধিতে এ প্রাণ, হইয়াছে পণ
সুদৃঢ়, নিশ্চয় তাঁর,
সফল সে পণ হ'ক, নিবারণ
হবে মম দুখ-ভার ।

(বনপ্রসূন, ১৮৮২)

অদর্শনে

রাজকৃষ্ণ রায়

(১)

যদিও উভয়ে এবে আছি বহুদূরে,
জীবন-সঙ্গিনি !
কিন্তু আমাদের প্রেম, আমা দোঁহাকার
জীবন-বন্ধনী
পলকের তরে নহে দূরে,
দু'টি ফুল গাঁথা এক ডোরে
দিবস রজনী।
প্রেম কভু তফাতে থাকে না,
রবি সম ডুবিতে জানে না।

(২)

কি উষায়, কি দিবায়, কি সন্ধ্যায়, কি নিশায়,
কি নিদ্রায়, কিবা জাগরণে
তুমি শুধু জাগ মোর মনে।
ভাবনা আমার
ভাবে অনিবার
তোমারে, ললনে !
তুমি বই কিছু নাই অনন্ত ভুবনে।
আমি বটে আছি হেথা,
কিন্তু মোর প্রাণ কোথা ?—
তোমার সদনে।

(৩)

যদিও ভানুর তনুখানি
লুকায় জলদ কালো, তবু সেথা আছে আলো,
ওরে আলোময়ি !
যদিও এখন
দূরে আছি দুইজনে, সমুখে আঁধার,
তবু তা'র মাঝে, প্রিয়তমে !
ভরপুর আলোক সঞ্চার ;
আছে কি আঁধার কভু প্রেমে ?
বিচ্ছেদে আঁধার !
দূরে আছি ;—এ বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ তো নয়,
এ বিচ্ছেদে অবিচ্ছেদে প্রেম আলোময় ।

(অবসর-সরোজিনী, ১৮৭৬-৮১)

চোখের দেখা

আনন্দচন্দ্র মিত্র

অনেক দিনের পরে প্রিয়ে,
সেদিন তোমায় দেখেছি,
নয়ন-জলে বক্ষস্থলে
পদচিহ্ন এঁকেছি ।

প্রেম-নয়নে মুখের পানে,
সেই যে তুমি চেয়েছিলে,
কোথা হতে নয়ন-পথে
না জানি কি ঢেলে দিলে

(৬)

তবে কেন পরিয়াছ বল থরে থরে,
হেম-রত্ন-বিজড়িত নানা আভরণ ;
পূর্ণ-শরদিন্দু লাজে তব কলেবরে,
হেম-রত্নে হেন চন্দ্রে কেন নিপীড়ন ।

(৭)

পর, দেবি, শ্বেত-সূক্ষ্ম কোমল বসন,
খুলে ফেল' রত্ন-ময় হেম-অলঙ্কার ;
এ নির্দোষ-রূপে নহে মণি সুশোভন,
বিদ্রূপ,—যে চারু কেশে পাঁতি মুকুতার

মালতীমালা, ১৮৯৯)

প্রেম-পূর্ণিমা

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী

(১)

কত সুখে আজি দেখ, এসেছি আবার
বিজলিতে সৌদামিনী তিমির-মণ্ডলে ;
কত সুখে শুনি পুনঃ ভ্রমর-ঝঙ্কার,
চুমিয়া ভ্রমরী গায় কমলিনী-দলে ।

(২)

সেই এসেছিনু আজি হ'ল কত দিন,
সপ্ত উষা সপ্ত সন্ধ্যা করি অবসান ;
চক্রবালে সপ্ত রবি হইল বিলীন,
বিষাদে বিগত আজি সপ্ত দিনমান ।

(৩)

সেই সপ্ত দিবসের অসহ্য উচ্ছ্বাসে,
হৃদয়ের সেই পূর্ব জোয়ারের জল,
আজি এই আকুলিত প্রেমের সম্ভাবে
মিশাইয়া উছলিল সাগর অতল।

(৪)

যে দিন আসিয়াছিনু, সেই দিন প্রিয়ে !
দেখেছিনু যামিনীর অর্দ্ধ অবসানে,
রেখেছিল নিশি কাল-অঞ্চলে বাঁধিয়ে,
কম্পিত-চন্দ্রমা-মণি বিষণ্ণ-বয়ানে।

(৫)

কিন্তু আজি নিশীথিনী কতই পুলকে,
ফেলিয়া দিয়াছে সেই মণি পুরাতন ;
নূতন চাঁদের টিপ পরিতে অলকে,
কালরূপে সাজিয়াছে কত মনোরম !

(৬)

কালরূপে কাল চুলে বিনাইল সতী,
কাঁচা-হেম-সুগঠিত তারকার ফুল,
জোনাকীর হীরাগুলি দিয়ে রূপবতী,
পরিয়াছে শ্রুতি-মূলে রতনের দুল।

(৭)

আজি এই পূর্ণ-অমা,—নাহি চারু-শশী,
যামিনী তমসে ভরা দেখ মনোরমে !
জোছনা আলোকময়ী নন্দন-রূপসী,
নাহি আজি খেলা করে যামিনীর সনে।

(৮)

সচন্দ্র-যামিনী আর অমা-তমিস্রায়,
কি প্রভেদ আছে বল, জীবন-সুন্দরি ?

কেবল না হেরি আজি চারু চন্দ্রমায়—
হাসাইতে ধরণীরে রসরঙ্গ করি।

(৯)

সকলি সমান আছে দেখ, রূপেশ্বরি!
সেই এ বিনোদ-কুঞ্জ পূর্ণ সুষমায়,
জড়াইয়া সহকারে বিনোদ-বল্লরী,
সেই ফুটি ফুল-পুঞ্জ সৌরভ ছড়ায়।

(১০)

সকলি সমান যদি আছে অবিকল,
তবে কেন বল, এই অমা-যামিনীর,
এই প্রেম-অভিযানে হৃদয়-যুগল,
মলিনিবে নিরানন্দ পশি সুগভীর?

(১১)

না রহিল চারু চন্দ্র নাহি ক্ষতি তায়,
নাহি কায চন্দ্রভাসে রঞ্জিয়া ধরণী;
থাকুক যামিনী সতী মাখি তমসায়,
মৃদু করে সুধু তারা জলুক এমনি।

(১২)

সেই তুমি, সেই আমি, দেখ বিদ্যমান,
সেই প্রাণ, সেই মন, সুচারুহাসিনি!
জলোচ্ছ্বাসে সেই পদ্মা বহে খরসান,
কি ক্ষতি করিবে তবে অচন্দ্র-যামিনী।

(১৩)

তবে কেন মৃদু হেসে বলিলে এখনি,
"জ্যোৎস্না রাত্তি নহে, নিশি ভরা অন্ধকারে;"
আমি বলিলাম, "আজি অমার রজনী;"
উত্তরিলে "নাহি সুখ এ বন-বিহারে।"

(১৪)

কেন সুখ নাহি বল, শত সুখ আছে,
চির সুখ-প্রদায়িনী তুমি প্রেম-রাশি !
শত সুখ পাই যদি থাক তুমি কাছে,
নেহারি অমৃত-মাখা ও বদন-খানি ।

(১৫)

মরুভূমি মাঝে কিম্বা বনের ভিতরে,
যেখানে থাকিবে কাছে তুমি, বিনোদিনি
অসুখেও স্বর্গ-সুখ পশিবে অন্তরে,
সেইখানে প্রবাহিবে সুধা-প্রবাহিনী ।

(১৬)

কত দুঃখে দেখ অই অমা-তমস্বিনী,
পঞ্চদশ নিশীথিনী দিবসের পরে,
পূর্ণচন্দ্র-প্রেম সুখে হ'য়ে সোহাগিনী,
রাখে পূর্ণ শশধরে হৃদয়ে আদরে ।

(১৭)

সেই দিনেকের সুখ পাইবার তরে,
কত আশা করে থাকে যামিনী সুন্দরী :
সেই একদিন চাঁদে বক্ষঃস্থলে ধরে,
তুষ্ট করে যত আশা প্রাণের ভিতরি ।

(১৮)

অমাবস্যা আছে ব'লে তাই কি জগতে,
পূর্ণিমা-যামিনী-ভাতি এত মনোরম ।
অদেখা-বিরহ-জ্বালা সহি কোন মতে,
তাই এত আদরের প্রেম-সম্মিলন ।

(১৯)

কি বলিব, অই অমা-যামিনীর সম,
ছিল এ হৃদয় মম পূর্ণ তমিস্রায় ;

পঞ্চদশ দিবা নিশি করি অতিক্রম,
পায় তবে নিশীথিনী পূর্ণ-চন্দ্রমায় ;—

(২০)

আমার সে অমা নিশা, কিন্তু প্রিয়তমে !
পক্ষ পূর্ণ না হইতে—দেখ—অবসান :
পূর্ণিমা-চন্দ্রমা চারু ভাতিল নয়নে,
কি জ্যোৎস্নায় এ হৃদয় আজি ভাসমান !

(২১)

আশা-পথ চেয়ে যথা থাকে নিশীথিনী,
চন্দ্রমা হৃদয়-মণি ধরিতে হৃদয়ে ;
আমার সে আশাময়ী তুমি, বিনোদিনি !
তব আশে ছিনু কত আশ্বাসিত হ'য়ে।

(২২)

সেই আশা দেখ প্রিয়ে ! পূরিল আমার ;
পূর্ণ-শশী-রূপে উঠি আমার অম্বরে,
জুড়াইলে চকোরের প্রাণ অনিবার,
অমল প্রেমের সুধা বরিষণ ক'রে।

(২৩)

অদর্শনে উচ্ছ্বসিত করিয়া হৃদয়,
দিনেকের সম্ভাষণ সপ্ত দিনান্তরে,
কি কুহকে করে মন চিরানন্দময়,
ফুটায় কুসুম কত হৃদয়-ভিতরে !

(২৪)

না হইতে যামিনীর অর্দ্ধ-অবসান,
হবে অস্তমিত পুনঃ, তুমি শশধর !
যে জ্যোৎস্নায় বিভাসিত করিলে এ প্রাণ,
সে বিভাস কোন দিন হবে কি অন্তর ?

(২৫)

সপ্তাহ-অন্তরে কিম্বা মাসেকের পরে,
ভালবাসা-নীরে মজি হৃদয় আমার,
নিরখিব আহ্লাদয় আকিঞ্চন করে,
পূর্ণিমার চন্দ্র-রূপে তোমায় আবার !

(২৬)

উঠিও ডুবিও, তুমি পূর্ণ-শশধর !
অদেখা-তিমিরে প্রাণ করিয়া বিকল ;
দেবা নিশি এই সাধ করি নিরন্তর,
থাকে যেন ভাতি তব অনন্ত, অচল ।

(২৭)

চল তবে যাই কুঞ্জ-কানন-বিহারে,
মৃদু-পদে কুঞ্জ-পথে করি বিচরণ ;
কি করিবে অমাবস্যা ঘোর অন্ধকারে,
প্রেমের পূর্ণিমা তুমি রয়েছ যখন !

(২৮)

দেখ কিবা পথগুলি সুন্দর সরল,
আরক্ত-কঙ্কর দিয়ে হয়েছে সজ্জিত ;
পাছে বাধা পায় তব চরণ-উৎপল,
সেই ভয়ে যেন কুঞ্জ সদা সশঙ্কিত ।

(২৯)

দেখ ও পথের ধারে হেরিয়া তোমায়,
চমকি ফুটিল কত ফুল মনোহর ;
চামেলি শেফালি তরু নমিয়া শাখায়,
বন-রাণী-ভ্রমে ফুলে পূজে নিরন্তর ।

(৩০)

বসন্ত-বরণ-বাসে আবরিত কায়,
ফুটি বাস ফেটে পড়ে চম্পক বরণ ;

রূপ-জ্যোতি অন্ধকারে দামিনী খেলায়,
তিমির-উজ্জ্বল শোভা কর বিতরণ।

(৩১)

একি রূপ সুরজিনি! নেহারি তোমায়,
দেখি কত অলি করে মধুরে গুঞ্জন :
আসিয়া জোনাকী-পাতি বসনে জড়ায়,
না জানি কি মোহ তুমি কর বিতরণ!

(৩২)

বলেছিলে তুমি সেই,—গত বহুক্ষণ,
"জ্যোৎস্না রাতি নহে, নিশি ভরা অন্ধকারে,"
ভেবেছিলে হেরি বুঝি অচন্দ্র গগন,
তিমিরে নাহিক সুখ কানন-বিহারে?

(৩৩)

কিন্তু কত সুখ তাহে বুঝিলে এখন,
অচন্দ্র সচন্দ্র নিশি সকলি সমান :
পূর্ণ জোয়ারের জল বহিছে যখন,
কেমনে সে জলস্রোত বহিবে উজান?

(মালতীমালা, ১৮৯১)

হাসিও না

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী

(১)

হাসিও না, হাসিও না, ইন্দু নিভাননে!
তুলো না শেফালি-হাসি মধুর অধরে,
ও মধুর হাসি আজি সহে না নয়নে,
নেহারি ও মৃদুহাসি হৃদয় বিদরে!

(২)

জান কি, জীবনাধিকে ! মরমে আমার—
কি অনল জ্বলিতেছে দিবস-যামিনী ?
সেই হুতাশন, সেই বিষাদের ভার—
পার কি বুঝিতে তুমি, বল, সুহাসিনী ?

(৩)

বুঝিও না প্রাণ-জ্বালা, প্রেয়সি আমার !
বুঝিলে কি জুড়াইবে জলন্ত-অনল ?
পারে কি বারিতে কেহ অনল-উদ্গার,
করে যবে শতধারে অনল অচল ?

(৪)

সহস্র শিখায় এই দেখ, প্রিয়তমে !
পলে পলে, স্তরে স্তরে, সেই হুতাশন—
হৃদয়-কাননে সুখ-ব্রততীর সনে,—
দগ্ধ করিতেছে এই কুসুম-যৌবন ।

(৫)

আজি তুমি দূর-দেশে যাবে, সুহাসিনি !
কত দিনে ফিরিবে, কি ফিরিবে না আর
সেই সঙ্গে উচ্ছ্বসিত প্রেম-তরঙ্গিনী
শুখাইছে, দেখ, অই হৃদয়ে আমার ।

(৬)

কালি যবে দিন-মণি পশ্চিম-কুণ্ডলে,
ডুবিবেন ম্লান-জ্যোতিঃ, বিদায়ি-চুম্বনে
চুম্বি নলিনীর চারু বদন বিমলে,
রঞ্জি হেমাম্বুদ-দাম আরক্ত-কিরণে ;

(৭)

চামেলির গন্ধ সনে বহিলে অনিল,
ফুটিলে মল্লিকা বেল সন্ধ্যা-প্রমোদিনী,

কুহরিলে চুত-কুঞ্জে উল্লাসে কোকিল,
দেখা দিলে ধরাতলে সন্ধ্যা সৌরভিনী ;

(৮)

এই সন্ধ্যাকালে যবে আসিব হেথায়,
জুড়াইতে ক্ষত হৃদি দিবসের রণে,
দেখিব—চপলে দূরে গঙ্গা বহে যায়,
কাঁপে তাল-তরু-শির সুমন্দ পবনে।

(৯)

দেখিব সকলি অই শ্যাম তরুগণ,
গাহিতেছে দধিমুখ শাখায় শাখায় ;
নিরখিব নীলানন্ত রঞ্জিত গগন,
ছড়ান জলদ শ্বেত তুলারাশি প্রায়।

(১০)

দেখিব সকলি, কিন্তু দেখিব না আর—
এই সন্ধ্যাকালে সান্ধ্য আকাশের তলে
প্রেম-রশ্মি-স্নাত চারু বদন তোমার ;
দেখিব না চন্দ্রকর অশোকের দলে।

(১১)

যাও তবে, প্রিয়তমে, কি বলিব হায় !
জ্বলুক এ হুতাশন, বিদায় এখন ;
ভাগ্যে যদি থাকে দেখা হবে পুনরায়,
তা' না হ'লে এই দেখা জন্মের মতন।

(১২)

বিদায়ের কালে এই ধর উপহার ;
বিমল-মুকুতা কত নয়নের জলে
ঝরিতেছে, শতেশ্বরী তাহে অনিবার
গাঁথিলাম,—প'রে যাও তোমার ও গলে

(বিনোদমালা, ১৮৭৮)

বিদায়

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী

(১)

আর নয়, বিদায় লো! যাই এইবার;
সুরক্ত-অধরোপরি
বিদায়-চুম্বন করি,
চাপিয়া উরসে বর শ্রীঅঙ্গের ভার,
হাসিয়া বিদায় দাও, প্রেয়সি! আমার।

(২)

দেখ নিশি প্রেমময়ি! মন্থর গমনে,
মৃদু পদে যায় চলি,
বন উপবন দলি;
ঝিল্লির নূপুর তাই যামিনী-চরণে,
বাজে না মধুরে আর সুধা-বরিষণে।

(৩)

কি তটিনী উচ্ছ্বসিয়া দেখ, এ কাননে—
কত সাধ-পূর্ণ মনে
আসিলাম দুইজনে;
কি পূর্ণ তরঙ্গোচ্ছ্বাস যুগল মরমে,
মিলাইল তটে তটে আজি প্রিয়তমে!

(৪)

দেখ চেয়ে অস্তপ্রায় চাঁদের কিরণে,
দেবদারু শ্যামদলে
অনিলে মাণিক জ্বলে,
মণি জলে সরোজলে, পরশি পবনে
হিল্লোলে হিল্লোলে মালা গাঁথিয়া রতনে

(৫)

রোহিণীরে হেরি শশী-বক্ষস্থল 'পরে,
বিরাগে যামিনী-বালা
ছিঁড়িয়া হীরক মালা,
ফেলিয়া দিয়াছে সতী বিন্দু বিন্দু ক'রে :
চমকে জোনাকী-পাঁতি তরু বনান্তরে।

(৬)

কি প্রেম-রঞ্জিত আজি বদন তোমার,
কি প্রেম-অমৃত মাখি
জ্বলে দুটি কাল আঁখি,
প্রাণের কি প্রেম-সাধ মিটাতে আবার,
হেরি আজি মুখখানি এত সুকুমার ?

(৭)

ও পড়ন্ত চন্দ্রভাস দেখ থরে থরে,—
কক্ষ বাতায়ন দিয়ে
পড়িয়াছে লুটাইয়ে,
শয্যার উপরে আর তব কলেবরে,
ম্লান জ্যোৎস্না হেরি জ্যোৎস্না অঙ্গের উপরে :

(৮)

যাই তবে, যায় নিশি চঞ্চল চরণে ;
সন্ধ্যায় আঁচল ভরি
তুলিলে যতন করি—
কত বেল, কত যূঁই বকুলের সনে,
ফুটাইলে সুরভিত-শ্বাস-পরশনে।

(৯)

চম্পকের চারুকলি মৃদু সঞ্চালনে,
দিয়ে ফুল পর পর,
গাঁথি মালা মনোহর,

জড়াইলে মনোরমে ! কবরী বন্ধনে,
ছড়াইলে পুষ্পরাশি কোমল শয়নে।

(১০)

মলিন দলিত মালা যামিনীর সনে,
গন্ধ নাই বাসি ফুলে,
কবরী হইতে খুলে,
দেখ মালা কে লুটিল পরিমল-ধনে,
অগন্ধ বেলের মালা দেখ প্রিয়তমে !

(১১)

দুঃখময় এ জগত বিধির সৃজন,
রোগ শোক-নিস্পেষণে
নিস্পেষিত প্রাণিগণে,
প্রতি পলে ঘোররাবে অশনি-পতন,
প্রতি পলে প্রভঞ্জনে সিন্ধু-বিলোড়ন।

(১২)

প্রতি পলে ঢাকে ঘন নির্মল আকাশ,
অরুদ্ধ প্রাণের দ্বার
রুদ্ধ করে অনিবার,
নিবায় আশার দীপ প্রত্যেক বাতাস,
সাধের কানন করে ভুজঙ্গ-আবাস।

(১৩)

অয়স্-অর্গলে বদ্ধ প্রাণের সে দ্বার ;
বল কে খুলিতে পারে,
কে সক্ষম তুলিবারে,
হৃদয়ে শায়িত গুরু পাষাণের ভার,
কে পারে আশার দীপ জ্বালিতে আবার ?

(১৪)

নিরুদ্ধ কপাট সেই খুলিতে আবার,
পারে শুধু প্রেমরাশি !
অই তব মুখখানি ;
তোমার ও ভালবাসা কিরণের হার,
আঁধারে করিতে পারে আলোক সঞ্চার ।

(১৫)

দেখ এ জগতে কত মানবের মনে,
রোগে শোকে অভিমানে,
পাষাণ চাপিল প্রাণে ;
সরিল সে গুরুভার পুনঃ, সুলোচনে !
একখানি বিকচিত মুখ দরশনে ।

(১৬)

হেরি আজি সুমধুর বদন নির্মল,
শুনি তব প্রেমবাণী
সরিল পাষাণ খানি,
প্রাণের কপাট আজি দেখ অনর্গল,
আঁধারে প্রদীপ-ভাতি আবার উজ্জ্বল !

(১৭)

কবিত্ব-রূপিণীরূপে হৃদয়ে বসিয়ে,
নয়ন-কিরণ দিয়া
মাজিয়া মলিন হিয়া,
আবার নিরুদ্ধ উৎস দিয়াছ খুলিয়ে,
রহিয়াছ চিরালোকে হৃদি আলোকিয়ে !

(১৮)

তোমার ও সুবিমল প্রেমের প্রভায়,
শোকের জগত আজি
হাসিছে অশোকে সাজি ;

ভালবাস ব'লে বুকে চাপিয়া তোমায়,
অমৃত-নির্ঝরে আজি হৃদয় জুড়ায়।

(১৯)

জুড়ায় হৃদয় বটে চাপি বক্ষঃস্থলে,
কিন্তু মরমের সাধ
নাহি হয় অবসাদ,
হইত,—পূরিয়া যদি দগ্ধ হৃদিতলে
রাখিবারে পারিতাম তোমায়, নির্মলে।

(২০)

মরমজ ভালবাসা কি সুখ-ভাণ্ডার,
কে বুঝিবে এ ভুবনে ?
বুঝে শুধু সেই জনে,—
যে জন মরমে ভাল বাসিয়া অপার,
ভালবাসা-রূপে প্রাপ্ত প্রতিদান তার।

(২১)

সেই প্রতিদানে আজি উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়,
প্রাণের ভিতরে আনি
রাখিয়াছি প্রেমরাশি !
তোমায় জড়িত দেখ করি প্রাণময়,
যে বন্ধন এ জীবনে খুলিবার নয়।

(২২)

যাই তবে, যামিনী যে পোহাবে এক্ষণে,
আবার মিলিব আসি,
আবার এ পৌর্ণমাসী
নিরখিব সৌধ-শিরে বসিয়া দুজনে,
প্রকৃতির শান্ত-শোভা দেখিব কাননে।

(২৩)

করেছিলে ফুলজালে শয়ন সজ্জিত,
দেখ আজি সুনয়নে
মিলি দেহ-গন্ধসনে,—
অই তব ক্ষীণ অঙ্গ অনিন্দ্য ললিত,
যূথিকা বেলের গন্ধে কত সুবাসিত।

(২৪)

যাই তবে, নিয়ে যাই বিদায়ের কালে,—
অই দেখ সুরভিত,
ফুল গন্ধে সুবাসিত,
সেই বাসে সুগন্ধিত করি দেহ মন,—
সেই গন্ধ প্রিয়ে! তব প্রেম-নিদর্শন।

(মালতীমালা, ১৮৭৭)

অমৃতে গরল

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী

(১)

এতদিনে বুঝি সখি! ফুরাল প্রণয় রে!
এ প্রাণের সাধ যত,
ফুরাইল অবিরত,
এতদিনে আজি প্রিয়ে আঁধার হৃদয় রে!
নিরমল সুধাময়,
কোথা আজি সে প্রণয়,
শূন্যময় দেখ অই প্রেমের আলয় রে!

(২)

কি কহিব প্রাণময়ি ! হৃদয়ের যাতনা !
জুড়াইতে দেশান্তর
ভ্রমিতেছি নিরন্তর,
কাঁদে প্রাণ দিবানিশি আর চিত্তে সয় না !
প্রাণবায়ু হুহু করে,
বহিতেছে অকাতরে,
হৃদয়পিঞ্জর ছেড়ে তবু যেতে চায় না !

(৩)

কোথা আজি সেই দিন বল প্রেম-পুত্তলি ?
প্রথম কুসুমকলি,
যুগল হৃদয়ে খুলি,
ফুটেছে ;—নবীন মধু পড়িতেছে উথলি'।
প্রণয়ের শতদল,
প্রস্ফুটিত অবিরল,
ঝরিতেছে পরিমল এ পরাণ আকুলি'।

(৪)

এই কি জীবনময়ি ! ছিল মম কপালে ?
প্রণয়ের পারাবার,
উচ্ছ্বসিত অনিবার,
কেন আজি প্রিয়তমে ! শুকাইল অকালে ?
নয়ন তিমিরে ভরি,
সম্মিলন-সুখ হরি,
হে বিধাতঃ ! কোন্ পাপে অকরুণে কাঁদালে ?

(৫)

দুঃখের তরঙ্গ প্রিয়ে কেন প্রাণে তুলিলে ?
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ,
করি সুখ অবসান,

হৃদয়-কাননে কেন প্রেমলতা ছিঁড়িলে ?
সে উন্মাদ ভালবাসা,
সেই উচ্ছ্বসিত আশা,
সে প্রেমমমতারাশি সব আজি ভুলিলে ?
ভুলে গেলে সে প্রণয়,
অমল অমৃতময়,
দারুণ বিচ্ছেদ-রেখা হৃদয়েতে রাখিলে ?

(৬)

তুমি ত ভুলিলে প্রিয়ে আমি কি তা পারিব ?
যত দিন তিন বেলা,
সংসারে ক'রবে খেলা,
ততদিন দিবানিশি আঁখি নীরে ভাসিব ;
ততদিন প্রাণেশ্বরি !
থাকিব মরমে মরি,
হৃদয়-ভাণ্ডার-মাঝে শুধু দুঃখ ভরিব।

(৭)

কত সুখে ছিনু দোঁহে প্রণয়ের মিলনে,
যেন রে কুসুম দুটি,
এক বৃন্তে আছে ফুটি,
সরস মধুর মাসে নিরজনে কাননে।
উন্মত্ত যুগল মন,
একমনে সম্মিলন,
মধুর প্রণয়সুখে বিমোহিত দু'জনে।
পরশি প্রণয়সুখ,
আনন্দে নাচিত বুক,
প্রেম-প্রবাহিনী-নীর ছুটিত এ মরমে,
কত সুখ হত হায়,
যবে প্রেমপ্রতিমায়

হৃদয়-আসনে রাখি, দেখিতাম নয়নে।
সেই মুখ-শশধর,
বর অঙ্গ মনোহর
অধর-জড়িত হাসি নিরুপম ভুবনে।

(৮)

প্রেয়সি !—
যখন তোমারে ধরে,
প্রণয়ে চুম্বন করে,
রাখিতাম প্রেমভরে এই বক্ষঃস্থলে রে ;
যবে করে কর ধরি,
কহিতাম প্রাণেশ্বরি !
আমার মতন সুখী নাহি ধরাতলে রে,
তখন জানি নি হায়,
প্রণয় যে বিষময়,
প্রণয়-অমৃত সাথে আছে হলাহল রে !

(৯)

কি কহিব প্রাণেশ্বরি ! মরমের যাতনা,
পুড়িয়াছে যেই জনে,
এই কাল হুতাশনে,
সেই ভিন্ন ত্রিভুবনে আর কেহ জানে না।
নশ্বর জীবন যাবে,
সেই দিন এ ফুরাবে,
জীবন থাকিতে প্রিয়ে এই জ্বালা যাবে না।

(১০)

প্রেয়সি !—
তোমার বিহনে আজি এ জীবন যায় রে ;
হৃদয়ে জলন্তানল,
জ্বলিতেছে অবিরল,
চন্দ্রের কলার মত ক্রমে বৃদ্ধি পায় রে !

যদি প্রিয়ে পারিতাম,
বুক চিরে দেখাতাম,
আমার হৃদয় মাঝে কি করে সদাই রে

(১১)

একদিন—প্রিয়তমে! আছে কি তা স্মরণে?
নব শরতের শশী,
নব জলধরে বসি,
শোভে যবে নীলীময় শরদিজ গগনে—
ধরি বন-কামিনীরে,
প্রেমভরে ধীরে ধীরে,
ধরিয়া কুসুমদাম নাচাইছে পবনে;
নীরব নিদ্রিত ধরা,
হৃদয় আনন্দে ভরা,
চন্দ্রালোক সৌধ-শিরে বসি সুখে দু'জনে,
নেহারি নয়ন ভরে,
বিভাসিয়া বিম্বাধরে—
প্রস্ফুটিত ভালবাসা, সুখ-ইন্দু-কিরণে।
সেই শোভা মনোরম,
হেরিয়া গলিল মন,
হাসিল প্রেমের লতা হৃদয়ের উপরে;
ত্রিদিব কুসুম শত,
সে আনন্দে অবিরত,
উছলি নন্দনামৃত বিকসিল অন্তরে।

(১২)

সেই ভালবাসা আজি এত দিনে ফুরাল!
জীবন-কাননে মম,
যেই ফুল নিরুপম,
ফুটেছিল, প্রিয়তমে, এতদিনে শুকাল

আশার হইল লয়,
শূন্যময় এ হৃদয়,
অতৃপ্ত বাসনা যত হৃদয়েতে রহিল।

(১৩)

জুড়াতে জ্বলন্ত জ্বালা! একবার তায় রে;
এস এস প্রেমময়ি,
আমার প্রাণের সই,
এসে দেখ কি কারণে এ জীবন যায় রে;
বিকসিত মুখখানি,
হৃদয়ে স্মরিয়া আমি
চলিলাম, মনে রেখ জনম বিদায় রে!

(১৪)

প্রণয়-বন্ধন ধরি,
মমতা স্মরণ করি,
তুষিতে তাপিত প্রাণ বারেক কি আসিবে?
সেই সুখ, সেই দিন,
মরমে মরম লীন,
সে প্রাণের ভালবাসা মনেতে কি পড়িবে?
হেরিব কি সেই শশী,
আবার গগনে বসি,
অমিয় বিতরি প্রাণ সুশীতল করিবে?

(১৫)

আর কি জীবনময়ি! দেখিব এ জনমে!
বিষণ্ণ হৃদয়ে মম,
করি সুখ বিকীরণ,
প্রীতি-হাসি ভাসে তব প্রেমমাখা বদনে।
হৃদয়-বীণার তার,
বাজিবে কি বল আর,
সেই কল প্রেমগানে জুড়াইয়া জীবনে?

(১৬)

এই জনমের তরে সকলি ত ফুরাল ;
আবরি' রবির কর,
দেখ কাল জলধর,
প্রভাত-আকাশ আসি ধীরে ধীরে ঘেরিল।
যৌবন কুসুমময়,
জীবন হতেছে লয়,
পার্থিব পিঞ্জর ত্যজি প্রাণ-পাখী উড়িল :
থাক তুমি প্রিয়তমে,
আমি যেন থাকি মনে,
এ মিনতি,—তবে পুনঃ কেন আঁখি ঝরিল ?

(১৭)

আবার নয়নে কেন,
উথলিল নীর হেন,
শোকের প্রবাহ বহি জীবন ভাসায় রে ;
কেন এ আকুল প্রাণ,
কাঁদিতেছে অবিরাম,
কাঁদিছে জীবন বুঝি সংসার-মায়ায় রে !

(১৮)

আর কি আছে লো সই,
জীবনের সাধ যত সকলি ত মিটেছে,
কিবা সাধ আছে আর
হৃদয়ে, যা পুনর্বার
চাহিব তোমার কাছে, সব সাধ ঘুচেছে ;
আর কিছু নাহি চাই,
একবার দেখে যাই,
সেই হাসি হাস প্রিয়ে ত্রিভুবন-মোহিনি,

সরল কৌমার হাসি,
সরলতা পরকাশি
সরল সৌন্দর্যময়, প্রাণমনতোষিণি !

(১৯)

কৌমার প্রতিমা সেই মৃত নব মাধুরী,
লাজে মাখা ত্‌'নয়ান,
চঞ্চল কোমল প্রাণ,
পড়েছে চিকুরদাম বদনের উপরি।
কখন নয়নজল,
ভাসাইছে বক্ষঃস্থল,
কখন উছলে প্রাণে আনন্দের লহরী ;
কখন বিরহ গায়,
সোহাগ-ঝঙ্কার তায়,
মিলন-সঙ্গীত কভু মনোদুঃখ পাসরি।

(২০)

প্রণয়বিরহে জ্বলি,
যখন যাইব চলি,
অনন্ত সুখের ধাম পরমার্থ ভুবনে ;
তখন আসিয়া প্রিয়ে,
মৃতকায়া বুকে নিয়ে,
মধুময়ী প্রেমকথা শুনাইও শ্রবণে।
ভাসিয়া আঁখির নীরে,
মুখশশী ধীরে ধীরে,
বাঁধিয়া মৃণালভুজে রেখ মম বদনে ;
অধর অমৃতালয়,
সঞ্জীবনী সুধাময়,
সেই সুধা-পরশনে বাঁচাইও জীবনে !

প্রেয়সি !
দাও লো বিদায় যাই জনমের মতনে।

(বিনোদমালা, ১৮৭৮)

সে বুঝেছে ভুল

গোবিন্দচন্দ্র দাস

(১)

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !
ও নহে নয়ন রাঙ্গা,
নূতন আঁধার ভাঙ্গা,
সে বুঝি দেখেছে ফোটা নীল সুঁদি ফুল !
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !

(২)

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !
ও নহে অধর মম,
নীলাব্জ প্রবাল সম
সে দেখেছে নিসিন্দার নবীন মুকুল !
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !

(৩)

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল,
সে বুঝি দেখেছে হায়,
নীল মেঘ উড়ে যায়,
সে ত গো দেখেনি মোর খোঁপা-খোলা চুল
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !

(৪)

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !
আমি গেছি তার কাছে,
তাও ভুল বুঝিয়াছে,
উড়ায়ে গিয়াছে উষা কনক মুকুল !
আমি ত করিনি রাগ, সে করেছে ভুল !

(৫)

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !
আমি ত বিরহ-বাণে,
তাহারে মারিনি প্রাণে,
অতনু তাহারে বুঝি মারিয়াছে ফুল !
আমি ত করিনি রাগ, সে করেছে ভুল !

(চন্দন, ১৮৯৬)

বিদায়

গোবিন্দচন্দ্র দাস

(১)

চলিলাম প্রাণময়ি ! চলিলাম আজি,
পরাণে পাষাণ চেপে ছাড়িয়া তোমায়,
এই ভাসাইনু তরী, জানিনা বাঁচি কি মরি,
জানিনা দৈবের বশে যাইব কোথায় !
অনন্ত সলিল-রাশি, গর্জিতেছে অট্টহাসি,
প্রলয়-পয়োধি যেন উছলিয়া যায় !
এই ব্রহ্মপুত্র-জলে, এই শূন্য বক্ষস্থলে,

এই যে অনন্ত শূন্য ধূ ধূ দেখা যায়,—
চলিলাম প্রাণময়ি ! ছাড়িয়া তোমায় !

(২)

যাই যে নাহি সে খেদ—নাহি দুঃখ তায়
ভুলিয়াও সে ভাবনা নাহি করে মনে,
কেবল রহিল দুঃখ, ওই পূর্ণচন্দ্রমুখ—
পূরেনি আকাঙ্ক্ষা যারে নিরখি নয়নে :
এত কষ্টে এত ক্লেশে, এত যারে ভালবেসে,
ছাড়িয়া যাহারে যাই বিধি-বিড়ম্বনে,—
একটি মুহূর্ত হায়, দেখিতে নারিনু তায়,
এই বিদায়ের কালে, চারু-চন্দ্রাননে,
তুষিল না চিত্ত তার একটি চুম্বনে !

(৩)

এই দুঃখ প্রাণময়ি ! রহিল অন্তরে,
ওই মণিময়ী মূর্তি বুকে বসাইয়া,
অন্তিম বিদায়ে হায়, ও কম-কমল পায়,
নয়নের শেষ অশ্রু উপহার দিয়া,
এই চিরদগ্ধ প্রাণ, করিব যে বলিদান,
প্রেম-যজ্ঞে স্বাহা-স্বধা মন্ত্র উচ্চারিয়া,
সে আকাঙ্ক্ষা, সে বাসনা, পরিপূর্ণ হইল না,
প্রাণের আগুন আজি প্রাণে লুকাইয়া,
যাই, প্রাণময়ি ! প্রাণ পাষাণে বাঁধিয়া !

(৪)

কোথা যাই প্রাণময়ি ! ছাড়িয়া তোমায় ?
তোমারে ছাড়িয়া যাই, হৃদয়ে বিশ্বাস নাই,
অথচ তরণীখানি দ্রুত ভেসে যায়,
দুর্নিবার স্রোতজলে, এই ব্রহ্মপুত্র চলে,
দেখিতে দেখিতে এই আসিনু কোথায় !

যাই তবে চন্দ্রাননে, রাখিও রাখিও মনে,
কেমনে ভুলিব তোরে হায় হায় হায় !
যাই প্রিয়ে প্রাণময়ি—বিদায় ! বিদায় !

(কস্তুরী, ১৮৯৫)

বিরহ-সঙ্গীত

গোবিন্দচন্দ্র দাস

মিলন হইতে দেবি বরঞ্চ বিরহ ভাল,
দেখিব বলিয়া আশা মনে থাকে চিরকাল !
নিরাশা নাস্তিক জানি,
সদা শুনি দৈববাণী,
মৃত-সঞ্জীবনী ভাষা—"বাসি ভাল ! বাসি ভাল !"
যেদিকে—যেদিকে চাই,
তোমারে দেখিতে পাই,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব বিশ্বরূপে কর আলো !
মিলনে বিরহ-ভয়,
আকুল করে হৃদয়,
চুম্বিতে চমকি উঠি নিশি বা পোহায়ে গেল !

(কস্তুরী, ১৮৯৫)

সামান্য নারী

গোবিন্দচন্দ্র দাস

সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ ?
শূন্য করে গেছে যেন সমস্তটা প্রাণ !
একটু গিয়াছে হাসি,
একটু গিয়াছে কান্না,
একটু আঁখির জলে মাখা অভিমান !

একটু চুম্বন গেছে,
একটু নিঃশ্বাস দীর্ঘ,
একটুকু আলিঙ্গন তৃণের সমান !
যা গেছে, সে ক্ষুদ্র গেছে,
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড আছে,
তবে যে ভরে না কেন তার শূন্য-স্থান ?
সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ ?

(কস্তুরী, ১৮৯৫)

এই এক নূতন খেলা

গোবিন্দচন্দ্র দাস

(১)

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা !
রেখে দে তোর টোপাঠালি,
সারা দিনই খেলিস্ খালি,
মাটির বেগুন মাটির ভাত,—হাত ধুইয়ে ফেলা !
পুতুল টুতুল রেখে দিয়ে,
চল বকুলের বনে গিয়ে,
বৌ বৌ বৌ, খেলি মোরা ফুলল-সন্ধ্যা বেলা !
আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা !

(২)

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা !
"না ভাই ! তুমি দুষ্ট বড়,
আঁচল টেনে আকুল কর,
তোমার কেবল ঘোম্‌টা খুলে উদ্‌লা করে ফেলা !"
চুপ্, চুপ্, চুপ্, কস্‌নে কারে, এই এক নূতন খেলা !

(৩)

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা !
"না না, আমি তোমার সনে,
যাব না আর বকুল বনে,
চ'খে মুখে বুকে তুমি ফুল দে' মার' ডেলা !"
চুপ্‌, চুপ্‌, চুপ্‌, কস্‌নে কারে,—এই এক নূতন খেলা !

(৪)

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা !
"তোমার কেবল কুসুম গোঁজা,
কাণে গোঁজা, খোঁপায় গোঁজা,
আমি অমন বইতে নারি ফুলের বোঝা মেলা !"
চুপ্‌, চুপ্‌, চুপ্‌, কস্‌নে কারে, এই এক নূতন খেলা !

(৫)

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা !
"তোমার সনে গেলে ছাই
সকাল আস্‌তে ভুলে যাই,
ভয়ে মরি একলা যেতে সবুজ-সন্ধ্যাবেলা !"
চুপ্‌ চুপ্‌, চুপ্‌, কস্‌নে কারে—এই এক নূতন খেলা !

(৬)

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা !
"তুমি কেবল বনে যেয়ে,
মুখের পানে থাক চেয়ে,
লজ্জা করে ! আর যাব না নিত্যি সন্ধ্যাবেলা !"
চুপ্‌, চুপ্‌, চুপ্‌, কস্‌নে কারে—এই এক নূতন খেলা !

(৭)

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা !
"তুমি বড় লক্ষীছাড়া,
ছেড়ে দেওনা খাড়াক্‌ খাড়া,

আকুল করে বকুল গাছে, কোকিল ডাকে মেলা !"
চুপ্ চুপ্ চুপ্, কস্‌নে কারে—এই এক নূতন খেলা !

(৮)

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা !
"না ভাই তুমি দুষ্টু বড়,
একটি বলে আর্‌টি কর,
ফাঁকি দিয়ে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে গেলা !"
চুপ্ চুপ্ চুপ্, কস্‌নে কারে—এই এক নূতন খেলা !

(কস্তুরী, ১৮৯৫

দিনান্তে

গোবিন্দচন্দ্র দাস

(১)

একবার
দিনান্তে দেখিতে দিও চারু চন্দ্রানন,
প্রীতির প্রতিমা, প্রিয়ে, করুণার মন !
সংসারের শত দুখে
যে যাতনা জ্বলে বুকে,
ভুলিব প্রাণের সেই তীব্র জ্বালাতন !
দেখিব নয়ন ভরি,
দাঁড়াইও, প্রাণেশ্বরি,
দেখিব লো কি করিয়া চুরি কর মন !
ইন্দ্রজাল রূপরাশি,
দেখায়ে ফুলের হাসি,
দেখিব কেমনে কর পরেরে আপন !
দিনান্তে দেখিব তব চারু চন্দ্রানন !

(২)

জীবনের এ দুর্দিনে ঘোর অন্ধকারে,
কে বলিবে কত পুণ্যে,
দেখিলাম দূর শূন্যে,
দয়াময়ী ধ্রুবতারা হাসিতে তোমারে !
দেখিনু স্বর্গীয় রূপে,
হৃদয়ের অন্ধকূপে,
ঢালিতে কৌমুদী শুষ্ক প্রীতি-পারাবারে !
নিরাশার বজ্ররবে,
যে বুক বিদীর্ণ হবে,
কোকিল-কোমল কণ্ঠে জাগাইলে তারে,
দিনান্তে দেখিব প্রিয়ে, সরলা তোমারে !

(৩)

প্রাণমন দগ্ধ এই ঘোর মরুভূমি,
এই মরু-পিপাসায়,
বিশুষ্ক কণ্ঠের হায়,
একটি সলিল-বিন্দু সুশীতল তুমি,
এ পাপ সংসার হায় ঘোর মরুভূমি !
প্রফুল্ল কুসুমভার,
প্রাণে ঢালো অনিবার,
সঞ্জীবনী আশা-লতা ছায়াময়ী তুমি,
এ পাপ সংসার হায় ঘোর মরুভূমি !

(৪)

দিনান্তে দেখিতে দিও চারু চন্দ্রানন,
ভরিবে এ শূন্য বুক, শূন্য প্রাণমন !
আরো যে বাসনা আছে,
বলিব আসিলে কাছে,
কি কাজ আগেই তাহা বলিয়া এখন ?

না, না, না, ও তীক্ষ্ণধার,
বুকে ঢাকা তরবার,
পারিনা যে না বলিয়া কেটে যায় মন !
প্রাণের লুকান কথা—'একটি চুম্বন' !

(কস্তুরী, ১৮৯৫)

সারদা ও প্রমদা

গোবিন্দচন্দ্র দাস

(১)

সারদা পশ্চিমে ডুবে, প্রমদা উঠিছে পূবে,
জীবন-গগন মধ্যে আমি দাঁড়াইয়া,
অপূর্ব সুন্দরী ঊষা, অপূর্ব সন্ধ্যার ভূষা,
পৃথিবীর দুই প্রান্ত উঠিছে প্লাবিয়া !

(২)

প্রমদা বাঁ হাত টানে, সারদা ধরেছে ডানে,
বুঝিতে পারিনা আমি কোন্ দিকে যাই,
দোঁহারি সমান স্নেহ, বেশ কম নহে কেহ,
দু'জনে ওজনে তুল চুক্‌ভুল নাই !

(৩)

দোঁহারি সমান জোর, প্রাণ ছিঁড়ে যায় মোর,
দু'জনেই চাহে তারা পূরাপূরি নেয়,
দু'জনেই করে আশা, পরিপূর্ণ ভালবাসা,
তিলমাত্র নাহি চাহে কেহ কারে দেয় !

(৪)

সারদা যাইতে ডাকে, প্রমদা ধরিয়া রাখে,
ঠেকেছি বিষম দায়—বিষম সঙ্কটে,

কে হয় বেজায় খুসি, কারে রুষি কারে তুষি,
এমন দারুণ দায় কারো নাকি ঘটে ?

(৫)

চেতে প্রেমদার পানে, সারদাও মরে প্রাণে,
বুঝিনা কেমন হিংসা—এ কেমন আড়ি
দু'জনেই বলে তারা, কেবল তোমারে ছাড়া,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চেলে তাও দিতে পারি !

(৬)

প্রেমদা পদ্মার কূলে, কোমল শেফালী-মূলে,
করিয়া বাসর-শয্যা ডাকিছে আমায়,
সারদা চিলাই-তীরে, আমকাঠ নিয়ে শিরে,
আঁচল বিছায়ে ডাকে চিতা-বিছানায় !

(৭)

নাহি নিশি নাহি দিন, দু'জনেই নিদ্রাহীন,
দুই দিকে দুই সিন্ধু গর্জিছে সমানে,
পাষাণ-হৃদয় স্বামী, পানামা যোজক আমি,
ধীরে ধীরে ভেঙ্গে না'ম' দু'জনার বানে !

(৮)

যদি কভু ভুলে চুকে, কারো নাম আনি মুখে,
অমনি আরেক জন অভিমানে ভোর,
না নড়িতে চুলকণা, সাপিনীরা ধরে ফণা,
ভয়ে ভয়ে সদা আছি হয়ে গরুচোর !

(৯)

কিবা ঘুম কিবা জাগা, দু'জনে পিছনে লাগা
পারিনা তিষ্ঠিতে বড় পড়েছি ফাঁপরে,
একটু নাহিক স্বস্তি, জ্বালা'য়ে ফেলিল অস্থি,
হায় ! হায় ! লোকে কেন দুই বিয়া করে ?

(কস্তুরী, ১৮৯৫)

পরনারী

গোবিন্দচন্দ্র দাস

(১)

আজ, সে যে পরনারী !
কেন তবে বল চাঁদ, দেখাও সে মুখ-ছাঁদ,
সে নব-লাবণ্য-আভা—সুষমা তাহারি ?
কেন নিতি নিতি আসি, দেখাও তাহার হাসি,
হৃদয়-সমুদ্র সে কি সামালিতে পারি ?
সে যে পরনারী !

(২)

সে যে পরনারী !
তোমরা কুসুমগণ, কেন সাধ অকারণ,
মধুর অধর-সুধা লইয়া তাহারি ?
কেন হে গোলাপ লাল, পেতে দাও তারি গাল,
আমি কি তাহারে আর চুমো খেতে পারি ?
সে যে পরনারী !

(৩)

সে যে পরনারী !
তারি আলিঙ্গন দিয়া, ধরিও না জড়াইয়া,
যদিও—যদিও 'কুঞ্জ' আছিল আমারি,
ছুঁয়োনা লতিকা কেহ, আমার এ পাপ-দেহ,
জনমের মত আজ দোঁহে ছাড়াছাড়ি !
সে যে পরনারী !

(৪)

সে যে পরনারী !
তোমরা জলদকুল, রাখিও না তার চুল,
ও নবীন নীলিমায় গগনে বিথারি,

নিরালা একেলা পেয়ে, চুপে চুপে কাছে যেয়ে,
আর কি সে ঝিঞা ফুল গুঁজে দিতে পারি ?
সে যে পরনারী !

(৫)

সে যে পরনারী !
তাহার ললিত গানে, আধা সাধা আধা মানে,
বরষিয়া সুর-সুধা মুনি-মনোহারী,
নিশীথে কোকিলগণ, কেন কর সম্ভাষণ ?
কানাকানি করিবে যে লোক—পাপাচারী !
সে যে পরনারী .

(৬)

সে যে পরনারী !
কেন গো চপলা তার, চপল আঁখির ঠায়,
হানিতেছ বার বার দিক্‌-দাহকারী ?
জ্বলিছে পুড়িছে মন, কেন কর জ্বালাতন !
আর ত তাহার পানে চাহিতে না পারি,
সে যে পরনারী !

(৭)

সে যে পরনারী !
তাহারি সুরভি শ্বাস, মলয়ায় করে বাস।
তুমি কি হে সমীরণ ফুলবনচারী ?
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা তবে, ছুঁইলে যে পাপ হবে,
আর কি তাহার হাওয়া পরশিতে পারি ?
সে যে পরনারী !

(৮)

সে যে পরনারী !
মধুময় পুষ্পদোল, তাহারি পুষ্পিত কোল,
শরীর কুসুমে ফোটা যৌবন তাহারি,

বসন্ত কি মধুমাসে, আমারেই দিতে আসে ?
সে অঙ্কে কলঙ্ক ভরা আজি দুজনারি।
সে যে পরনারী !

(৯)

সে যে পরনারী !
তোমরা কি হে নক্ষত্র, জ্যোতির্ম্ময় প্রেমপত্র,
অন্ধকারে সন্ধ্যাদূতী দিয়ে গেছ তারি ?
আর সে প্রণয় কথা, সে আদর সে মমতা,
চুপে চুপে চুরি ক'রে পড়িতে না পারি,
সে যে পরনারী !

(১০)

সে যে পরনারী !
কেন সে আমার তরে, সারা নিশি কেঁদে মরে ?
সজল সরোজ-আঁখি ঊষা বলে তারি।
দেখিয়া যন্ত্রণা-সার, দুর্ভাগা আমি কি তার
চুমিয়া ও চারু-চোখ মোছাইতে পারি ?
সে যে পরনারী !

(১১)

সে যে পরনারী !
প্রাণভরা প্রিয়ধন, বুকভরা আভরণ,
যদিও সে একদিন আছিল আমারি,
তবুও হয়েছে পর, শতজন অগোচর,
দু'জনার নামে আজ কলঙ্ক দোঁহারি !
সে যে পরনারী !

(১২)

সে যে পরনারী !
যত কিছু উপহার, সব অপবিত্র তার,
মিলনের স্বর্গ সেও নরক আমারি ;

কেবল পবিত্রতম, তার সে বিরহ মম,
যজ্ঞীয় অনলসম প্রাণদাহকারী !
পুড়িয়া হইতে ছাই, আদরে নিয়েছি তাই,
হেন প্রেম—উপহার ভুলিতে কি পারি ?
কহিও সে 'কুসুমে'রে, সে যে পরনারী !

(কুঙ্কুম, ১৮৯২)

রমণীর মন

গোবিন্দচন্দ্র দাস

রমণীর মন,
কি যে ইন্দ্রজালে আঁকা, কি যে ইন্দ্রধনু-ঢাকা
কামনা-কুয়াশা-মাখা মোহ-আবরণ
কি যে সে মোহিনী-মন্ত্র রয়েছে গোপন !
কি যে সে অক্ষর দুটি, নীল নেত্রে আছে ফুটি,
ত্রিভুবনে কার সাধ্য করে অধ্যয়ন ?
কত চেষ্টা যত্ন করি, উলটি পালটি পড়ি,
কিছুতে পারি না অর্থ করিতে গ্রহণ !
কি যে সে অজ্ঞাত ভাষা, দেব কি দৈত্যের আশা,
ঝলকে ঝলকে যেন করে উদ্গীরণ !
অতি ক্ষুদ্র দুই বিন্দু, অকূল অসীম সিন্ধু
উথলি উঠিছে তাহে প্রলয়-প্লাবন !
ত্রিদিবের সুধা নিয়া, ধরণীর ধূলা দিয়া,
রসাতল নিঙাড়িয়া করিয়া মিলন,
ঢালিয়াছি কত ছাঁচে, মৃত্তিকা কাঞ্চন কাচে,
পারিনি তোমার আর করিতে গঠন,
রমণীর মন !

(প্রেম ও ফুল, ১৮৮৮)

শত্রু

গোবিন্দচন্দ্র দাস

(১)

রমণী আমার শত্রু, আমি শত্রু তার,
পৃথিবীতে হেন শত্রু কেহ নহে কার।
শশাঙ্কের রাহু শত্রু সে ত গিলে ছাড়ে,
আমি করি চিরগ্রাস পাইলে তাহারে।
সে যদি সাগর হয় পৃথিবী প্লাবিয়া,
আমি সে অগস্ত্য ঋষি গিলি তারে গিয়া।
কঠিন পাষাণময় সে হ'লে পাহাড়,
আমি হয়ে মহাবজ্র শিরে পড়ি তার।
সে যদি জলদ হয় স্নিগ্ধ সুশীতল,
আমি হই বুকে তার অশনি-অনল।
সে যদি পৃথিবী হয় লোকরক্ষা হেতু,
আমি তার মহারিষ্টি হই ধূমকেতু।

(২)

যদি কেহ দিয়ে থাকে চোখে চিরজল,
সে আমার মহাশত্রু রমণী কেবল।
যদি কেহ দিয়ে থাকে চির হাহাকার,
সে কেবল মহাশত্রু রমণী আমার।
যদি কেহ করে থাকে মম সর্বনাশ,
সে আমার মহাশত্রু রমণী-নিশ্বাস।
মুহূর্ত তাহার কথা ভু'লতে না পারি,
সে আমার মহাশত্রু, আমি শত্রু তারি।

(৩)

পুরুষের তীক্ষ্ণ অসি তীক্ষ্ণ তরবার,
অমৃত মরণে করে যাতনা উদ্ধার।

নারী করে গুপ্তহত্যা আঁখির আঘাতে,
অনন্ত বিষাক্ত মৃত্যু ঢেলে দিয়ে তাতে।
জীবনের দিন দণ্ড পল অনুপল,
মরণ মরণ মম মরণ কেবল ;
মৃত্যুময় এ জীবন বহিতে না পারি।
রমণী আমার শত্রু, আমি শত্রু তারি।

(চন্দন, ১৮৯৬)

'ভুলে যাও' না বলিলে ভুলিতাম তায়

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

'ভুলে যাও' না বলিলে ভুলিতাম তায়।
দূর হতে ম্লান মুখে, না চাহিলে আমা পানে,
ভাসিয়া যাইত প্রেম এই নিরাশায়।
বুঝাতেম হৃদয়েরে, ত্যজিতাম এ দুরাশা,
'অভাগিনী' না বলিলে কথায় কথায়।
ভুলিলে সে সুখে রবে, সে কথা বলিত যদি
ভুলিয়ে হ'তেম সুখী কিন্তু তা ত নয়॥

(২)

সেই নিশি—সেই কক্ষ—সেই দরশন!
মনে হ'লে বক্ষঃস্থল, এখনো ফাটিয়া যায়,
পৃথিবী ঘুরিতে থাকে কেঁদে ওঠে মন।
বিদীর্ণ হৃদয়ে আমি, দাঁড়াইয়া বাতায়নে,
মথিত হইতেছিল অন্তর তখন।
অদূরে বসিয়া মম, জীবনের বৈতরণী,
হৃদয় সমুদ্র মোর করিছে মন্থন॥

(৩)

কতক্ষণে ত্যজি শ্বাস চাহিয়া বদনে।
দাঁড়াইয়া কি বলিল, পশিল না শ্রুতিমূলে,
চলে গেল কক্ষান্তরে—আমি শূন্য মনে,
ভাবিনু চীৎকার করে, বলি তায় কোথা যাও,
আছাড়ি চরণ-প্রান্ত করিব বেষ্টন।
খুলিয়া শাণিত ছুরি, বিদারিব বক্ষঃস্থল,
নিষ্ঠুর সময়ে নাহি সরিল বচন॥

(৪)

দেখিলাম কতক্ষণ বাতায়নে।
বিদ্ধ বিহঙ্গিনী মত, আঁধার সে কক্ষান্তরে
ভ্রমিতে লাগিল একা অস্থির চরণে॥
অবশ চরণে পুন, দাঁড়াইয়া স্থির নেত্রে
নিরখিলা কতক্ষণ থাকিয়া গোপনে।
কাতরে ডাকিনু তায়, দিল না উত্তর তবু,
একটি সুদীর্ঘ শ্বাস পশিল শ্রবণে॥

(৫)

পরদিন সন্ধ্যাকালে বসিয়া শয়নে।
হৃদয়ের সিন্ধু মম, উথলি উঠিতেছিল,
অশ্রুময় নেত্রদ্বয় হতাশ রোদনে॥
ছিন্ন লিপি এক খণ্ড, সহসা পশিল করে,
শিহরিয়া খুলি তায় পড়িনু যতনে।
প্রতি ছত্রে লেখা তার, 'বড় অভাগিনী আমি,'
"কেন হেন ভাব তব উপজিল মনে॥"

(৬)

ইচ্ছা হোল ভেঙে ফেলি তখনি হৃদয়।
নূতন করিয়া গঠি, প্রথমে যেমন ছিল,
ভুলে যাই জন্মশোধ দুখের প্রণয়॥

সে কাঁদিবে চিরদিন, আমিও কাঁদিব সদা,
সুখের সংসার হবে দুখের নিলয়।
প্রাণের ভিতর দেখি, শিহরি উঠিল মন,
উথলিছে শত সিন্ধু প্লাবিয়া হৃদয়॥

(৭)

নহে দিন—নহে মাস—নহেক বৎসর
পঞ্চম বৎসর আজ, লুকায়ে রাখিয়াছিনু,
এই নিরাশার স্রোত প্রাণের ভিতর॥
কখনো সন্ন্যাসী হ'য়ে, ভাবিয়াছি যাই বনে
না দেখি ভুলিব তায় জুড়াবে অন্তর;
দৃঢ় চক্ষু—তীক্ষ্ণ দিঠ, হাতে করি দাঁড়ায়েছি,
জীবনের সন্ধিস্থলে হইয়া কাতর॥

(৮)

দারুণ যন্ত্রণা এত সহি নিরন্তর;
তবু কি ভুলিতে তায়, পারিয়াছি একদিন,
তবু কি যাতনা কভু ভেবেছি কঠোর!
তাহার ভাবনাগুলি, যতনে রাখিলে বুকে,
তবে যেন পূর্ণ থাকে প্রাণের ভিতর।
এ স্মৃতি হইলে লোপ, কি লয়ে পরাণ রবে,
শূন্যময় মরুভূমি হইবে অন্তর!

(৯)

কিন্তু যার তরে এই জীবন কাতর।
ভবের ভিখারী সাজি, যৌবনে সন্ন্যাসী হ'য়ে,
যার প্রেম-সাধনায় ব্রতী নিরন্তর!
সে আজ নিষ্ঠুর মনে, বলে কিনা 'ভুলে যাও,'
কিসে নিরমিলে বিধি নারীর অন্তর!
কঠিন পাষাণও গলে, অবিরত বিন্দুপাতে,
রমণীহৃদয় কি হে তা হ'তে কঠোর!

(১০)

চিনিলে না রমণীরে এ প্রেম কেমন।
বুকভরা ভালবাসা, দিয়েছিনু হাতে তুলে,
যুবকের সুধাপূর্ণ নবীন জীবন।
বুক চিরে রাখিতাম, সোহাগে মণ্ডিত করি,
মরতের বৈজয়ন্ত দেখিতে কেমন—
আপনি কাঁদিবে দুখে, কাঁদাইবে অভাগারে,
নিরাশায় যাবে সখি দুইটি জীবন॥

(১১)

কোন কথা প্রিয়তমে হইব বিস্মৃত।
অতীত ঘটনাগুলি, হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
অঙ্কিত রয়েছে যেন চিত্রিতের মত॥
পঞ্চম বৎসর আজ, নিভৃত চিন্তায় বসি,
জড়ায়েছি আশালতা হৃদয়েতে কত!
সাধের সে ভালবাসা, সেই মধুমাখা আশা,
ভুলে যাও বলিলে কি হবে অন্তরিত॥

(১২)

জীবনের রঙ্গভূমে প্রথমে যখন—
বিশ্ববিমোহিনী রূপে, প্রবেশিলে ধীরে ধীরে,
সেই কথা আজ সখি হতেছে স্মরণ।
দুইটি বৃহৎ আঁখি, অনিন্দ্য বদনখানি,
নিরখিয়া কি চঞ্চল হয়েছিল মন!
অতৃপ্ত হৃদয়ে সেই, প্রথমে দেখিয়াছিনু,
অতৃপ্ত হৃদয় সেই রহিল এখন॥

(১৩)

রূপলালসায় নহে সে চিত্ত চঞ্চল,
তা হ'লে অনেক ছিল, সে সাধ মিটিয়া যে'ত,
তা হ'লে নয়নে আজ ঝরিত না জল।

নারীর অধিক ভাবি, দেখেছিনু মুগ্ধ নেত্রে,
নরের অধিক হয়ে হয়েছি বিকল।
সুধুই বাসিলে ভাল, ভুলিয়ে যেতাম তোমা,
সুধু ভালবাসা এত হয় না অটল॥

(১৪)

অভিমানে পরিপূর্ণ পুরুষের মন।
প্রতিদান নাহি পেলে, প্রণয় শুখায়ে যায়,
ঘৃণায় প্রেমের বেগ করে সম্বরণ।
প্রবৃত্তির তীব্র স্রোতে, অহঙ্কারে চূর্ণ হয়
সময়ে চিত্তের গতি করে নিবারণ!
বক্ষে তাচ্ছিল্যে সখি, অন্তরে বড়ই বাজে,
সে যন্ত্রণা পুরুষের বড় নিদারুণ!

(১৫)

নীরব যন্ত্রণা তুষানলের মতন।
হৃদয়ের স্তরে স্তরে, নিরন্তর দগ্ধ করে,
ভাষায় নাহিক তার একটি বচন।
স্বর্গের অমিয়া আনি, যদি কেহ দেয় হাতে,
সে দুখীর তৃপ্তি তাহে হয় না সাধন।
ফুটিতে পারে না ব'লে, যাতনা দ্বিগুণ তার,
নির্জ্জন রোদনে তার সুধু আকিঞ্চন।

(১৬)

সেই নিদারুণ ব্যথা হৃদয়ে আমার।
এই যে বিদীর্ণ বুক, এই যে অনন্ত দুখ,
এই ভিখারীর বেশ —এই নেত্রাসার।
এই আত্মবলিদান, এ সংসার বিষজ্ঞান,
রমণি রে! অভিনেতা তুমিই [illegible]
বড় ভাল বাসিতাম, বড় ভক্তি করিতাম,
ভাল প্রতিদান সখি পাইলাম তার!

(বাসন্তী, ১৮৮০)

মহাশ্বেতা

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি মধুর ছবি, অতীত কালের পটে,
রয়েছে অঙ্কিত আজো উজ্জ্বল রেখায়।
তপস্বিনী মহাশ্বেতা, নিবিড় কানন কোলে,
জ্যোৎস্নার ছায়া যথা বনরাজিগায়॥
নিবিড় তমুয়া কিবা, নবাঙ্গের স্ফুট বিভা,
নয়নে বদনে ঘন মাখান মাধুরী।
কল্পনায় সে প্রতিমা, ধেয়ান করিলে তবু,
উঠে ভাবুকের চিতে কি সুখলহরী॥
কিবা—তপস্বিনী বেশ, কিবা বিষাদের লেশ,
কি গম্ভীর হাবভাব, কি অমিয়া তায়!
পলকে পলকে তার, কি গভীর দৃষ্টি ঝরে,
কি পূত ধারণা তার অঙ্গের সীমায়॥
বিষাদ-ভাবনা-ভরে, সতত বিষণ্ণ আঁখি
সুন্দর উরসে কিবা ভাবনা মধুর।
অপাঙ্গে নীরবে ঝরে, মধুর নয়ন জল,
মধুর শোকেতে বালা কিবা সে আতুর॥
বাঁশরি তুলিয়া মুখে, কি গীত গাহিল এই,
ছুটিল পরাণ তার ভাসিয়া সে স্বরে।
গভীর প্রবাহে মরি মধুর নিনাদ করি
পড়িল ছড়ায়ে প্রাণ সে কানন পুরে॥
বিকচ-যৌবন-ভরে, ঢল ঢল তনুখানি
গভীর বিপিনে একা বসি তপস্বিনী।
পারশে পড়িয়া তার নাথের অচেত তনু
নয়ন রাখিয়া তার গায় বিষাদিনী॥

প্রাণ প্রাণ প্রাণ মম, যায় যায় যায় যে রে
অধরে ফুটিছে শ্বাস বাঁশরির গায়।
দ্রবিয়া হৃদয় লোহ আনত নয়ন যুগে
নীরবে পড়িছে ঝরি সেই যাতনায়॥

বল রে জগৎ! তোর, বিপুল সংসারে কোথা
আছে সুখ ওই মত রোদনে যা মিলে।
কিবা সে গভীর ব্যথা, মধুরে পরাণে বাজে,
কিবা সে অবশ তনু শোক পরশিলে॥

কিবা সে স্মৃতির জ্বালা, পরাণ আকুল করে,
কি আবেশে ঝরে জল মুদিত নয়নে।
[illegible] পরাণে যেন উথলে তরঙ্গরাশি
ঘাত-প্রতিঘাতে কত সুখ উঠে মনে॥

বিধি রে জন্মান্তরে, দিও তপ হৃদি পুরে
কাঁদিব পরাণ-ভরে বসি একমনে।
সংসার বন্ধনগুলি দিও জন্মান্তরে খুলি
দিও কিন্তু আশা তৃষ্ণা ঢালিয়া জীবনে॥

আধ লাজ আধ ক্ষুধা দিও না রে হেন দ্বিধা
পরাণ ভরিয়া যেন পারি কাঁদিবারে।
অমনি বাঁশরি-গলে পরাণ ঢালিয়া দিব
ছড়ায়ে পড়িবে প্রাণ অমনি সংসারে॥

পাতায় লতায় মূলে, ও গীত যেমনি বাজে,
যেমনি কানন পুরে উঠে প্রতিধ্বনি।
আমারো সে গীত যেন, বাজে নরনারী-প্রাণে
সংসার পুরিয়া যেন উঠে সে নিক্কণ॥

ওই শুন তপস্বিনী রা[illegible] বাঁশরিখানি
সজল নয়নে চাহি শবের বদনে।
না পরশি তনু তার, শুধুই নয়নে হেরে
কি তৃষ্ণা-পূরিত দৃষ্টি ঝরে ও নয়নে॥

নাথের যুগল আঁখি, পল্লবে রয়েছে ঢাকা
গভীর নিদ্রায় যেন রয়েছে মুদিত।
বিকসিত ওষ্ঠাধরে বিরাজে রক্তিম রাগ
বদনমণ্ডল যেন ভাষায় জড়িত॥

সে মৃণাল ভুজদ্বয় আলসে অবশ যেন
সেই পদ্মরাগ শোভে বিশাল উরসে।
প্রশস্ত ললাট খানি শান্ত খেদ-ক্লেদহীন
প্রসারিত যেন ঘোর নিদ্রার পরশে॥

জীবিত এখনো যেন, নিদ্রিত শুধু কি তবে
সে কি রে বিষাদ কেন এতই নিষ্ঠুর।
তপস্বিনী প্রিয়তমা এ দীর্ঘ বৎসর ধরি
কাঁদিছে পারশে তবু নিদ্রা নহে দূর॥

জাগ জাগ পুণ্ডরীক দেখ রে নয়ন মেলি
কি রত্ন পড়িয়া আজ পারশে তোমার।
স্বরগের পারিজাত, মরতের কোহিনূর
এ রতন তুলনায় সকলি সে ছার॥

কে বলে তাপস তোমা, কে বলে ভিখারি তুমি
কি নরেন্দ্র কি দেবেন্দ্র কাহার ভাণ্ডারে।
আছে এ অমূল মণি, আছে এ প্রেমের খনি
এ অশ্রু রয়েছে বিশ্বে আর কার তরে॥

কোন্ ব্রতে ছিলে ব্রতী কি তপ করিলে বল
অতীত জীবনে বল কি পুণ্য লভিলে।
কি শিক্ষা শিখিয়াছিলে, কি মন্ত্র আয়ত্ত করি
এমন দুর্লভ রত্নে সঞ্চয় করিলে॥

অভাগা কবির ভাগ্যে সাধ্য কি সে দৃঢ় ব্রত?
কি কঠিন পণ তার কি বা সে আচার।
সাধি যদি যুগে যুগে ধরি সে কঠোর ব্রত
ফলিবে কি সে তপস্যা অদৃষ্টে আমার॥

পুণ্যবান পুণ্ডরীক পুণ্যবতী মহাশ্বেতা
জগতের রম্য ছবি তোমা দুজন।
কালের বিশাল বক্ষে এমনি মধুর ভাবে
বিরাজিবে চিরদিন যাবত ভুবন॥

(বাসন্তী, ১৮৮০)

ভাবিও না

স্বর্ণকুমারী দেবী

উথলিত অশ্রুবারি এ পোড়া নয়নে হেরি
ভাবিও না আমারে যে ভুলে গেছ কাঁদি তাই :
তুমি আছ শান্তি-সুখে, কাঁদিব আমি কি দুখে ?
কে আমি করিব আশা আরো হৃদে পেতে ঠাঁই ?
ভাল যে বাস না মোরে, ভুলেছ যে একেবারে,
ভালই করেছ, সখে, আর কি ভাবনা তবে ?
ভাবি দুখিনীর কথা, আর ত' পাবে না ব্যথা
তুমি ত' নিশ্চিন্ত হলে, হোক যা আমার হবে।
পাছে সমদুখী জনে, আমি ব্যথা দিই মনে,
আমা দুখে পাছে তব মুখখানি মলিন হয়—
এই যে আশঙ্কা ছিল, সে আশঙ্কা দূরে গেল,
আর ত বাস না ভাল, হয়েছ পাষাণময়।
তবে আর কিসে ডরি, যাহা ইচ্ছা তাহা করি,
নাহি ত মমতা-ডোর, কে আর রাখিবে বাঁধি !
নিশ্চিন্তে মরণ-বুকে, ঘুমাতে যেতেছি সুখে,
সুখ-অশ্রু পড়ে তাই, ভেবো না দুখেতে কাঁদি।

(কবিতা ও গান, ১৮৯৫)

হাস একবার

স্বর্ণকুমারী দেবী

হাস একবার, সখি, সে মোহন হাসি
ভস্মময় হৃদে যাহা ঢালে সুধারাশি।
বিষাদ-তিমিরে, সই, একটি আলোক ঐ,
আঁধার সংসারে উহা ধ্রুবতারা মম!
সঙ্কট-কণ্টকগণে ও হাসির পরশনে
শোভে হৃদে সুখময় কুসুমের সম।
অনন্ত বিপদে, প্রিয়ে, ডরাও না এই হিয়ে,
যা লাগি লভেছি তোমা অমূল্য রতন।
তোমার কোমল বুকে বাজিল অভাগা-দুখে,
তাই ত, সদয়া বালা! দিলে নিজ মন!
বার বার শত শত ঘেরিল তরঙ্গ যত
যতই নিবিড় ঘন বিষাদের রাতি;
ততই দ্বিগুণ, প্রিয়া, উজলিল তুই হিয়া,
ততই বিমলতর প্রণয়ের ভাতি।
যতদিন মোর লাগি সোহাগে উঠিবে জাগি,
সখি লো! অধরে তোর মধুময় হাসি—
ততদিন, প্রিয়ে, শোন, আমার হৃদয় মন
সুখ বলি মানিবে লো বিপদের রাশি!

(কবিতা ও গান, ১৮৯৫)

সুন্দরী

স্বর্ণকুমারী দেবী

তুমি গো সুন্দরি, প্রাতে জীবনের তব
আছিলে একটি কলি গোলাপের নব
প্রণয়ী সুখের করে
সে মুকুল সারা ডরে,
খুলিতে কুমারী-হৃদি সাহস না পায়;

অধীর কোমল লাজে
সবুজ পাতার মাঝে
রাঙা মুখখানি যথা লুকাইতে চায়।

অথবা মরতে বুঝি নাহি সে তুলনা,
স্বরগ উষাটি তুমি আছিলে ললনা!
প্রভাত-পরশে যথা
প্লাত ফুল লতা পাতা,
হাসিয়া জাগিয়া উঠে ঝরি অশ্রুজল,
তোমার রূপের জ্যোতি
বিমল প্রশান্ত অতি,
তপ্ত মরু স্পর্শ পেয়ে স্নিগ্ধ সুশীতল।

সেদিন গিয়াছে, তবু দ্রুতগামী কাল
হরিতে পারেনি তব সুধা রূপ-জাল।
অতুল অস্ফুট সেই সৌন্দর্য লাজের,
সহিতে নারিত যাহা আঁখি অপরের!
কাল শুধু পূর্ণতম মোহিনী প্রভায়
ফুটায়ে তুলেছে তাহা যৌবন-শোভায়।

ফুটন্ত কুসুম যথা পাতার মাঝারে
আকুল আবেশে ভরা সৌরভের ভারে!
দিবাকর দ্বিপ্রহরে যথা পূর্ণ শোভা ধরে,
তেমনি কোমল তব আধ-ফুট রূপ নব,
বিকশিত অপরূপ সম্পূর্ণ আকারে!

কবিতা ও গান, ১৮৯৫)

কেমনে ভুলি

স্বর্ণকুমারী দেবী

সে ভুলেছে, আমি কেমনে ভুলি!
নূতন বসন্তে নূতন হাওয়া,
মধুর নয়নে মধুর চাওয়া,
ফুল তুলে চুলে পরাইয়া দেওয়া,
থাকিয়া থাকিয়া পাপিয়া বুলি,—
হায়! সে ভুলেছে বলে কেমনে ভুলি!

গাছের তলায় খেলার ভাণ,
প্রাণের মাঝারে প্রেমের টান,
কথায় কথায় মান অভিমান,
ভালবাসে কিনা এই আকুলি,—
হায়! সে ভুলেছে তাই কেমনে ভুলি!

ধীরে ধীরে বলা মনের কথা,
নয়নের নীরে প্রেম-আকুলতা,
পুরাতন ছলে নূতন ব্যথা—
আবেগে দেখান হৃদয় খুলি,—
হায়! সে ভুলেছে বলে কেমনে ভুলি!

স্বপনেতে যেন আত্ম-বিনিময়,
সুখের সাগরে মগন হৃদয়,
মুহূর্তের মাঝে অনন্ত বিলয়,
স্বর্গে পরিণত মরত-ধূলি!
সে কি ভোলা যায়! কেমনে ভুলি!

(কবিতা ও গান, ১৮৯৫)

প্রতিদান

স্বর্ণকুমারী দেবী

প্রতিদান প্রতিদান! কি দিবে গো প্রতিদান?
আদর, চুম্বন, হাসি, ভালবাসা, মনপ্রাণ?
তোমার যা কিছু আছে,
সবই ত আমার কাছে,
কি দিয়ে পুরাবে তবে বৃথা এই অভিমান?

বুঝিয়াছি মাঝে মাঝে তাই এই তিরস্কার,
ধারকরা ধন তব নিয়ে আস উপহার।
কেন, সখা, যাও ভুলে, প্রাণের এ অন্তঃপুর
তোমাতেই তন্ময়, তোমাতেই ভরপুর!
তোমার যা কিছু নয়
নাহি স্থান হৃদিময়,
হৃদয়ে পশিতে গিয়ে ফিরে যায় অতি দূর!

আঘাত-বেদনাটুকু শুধু তার প্রাণে লাগে।
সে কি না তোমারি দান,
তৃপ্ত তাহে অভিমান,
আদরেরি মত তাই হৃদয়েতে সদা জাগে!

কবিতা ও গান, ১৮৯৫)

নহে অবিশ্বাস

স্বর্ণকুমারী দেবী

সখা গো, এ নহে অবিশ্বাস!
অপূর্ণ মনের ইহা অতৃপ্ত উচ্ছ্বাস,
তাই অশ্রু অভিমান,
তাই এ বেদনা-গান,
তাই এই বুক-ফাটা দুরন্ত বিশ্বাস।
সখা গো, এ নহে অবিশ্বাস!

তব পুণ্য প্রেমে যদি করিব সংশয়,
কোথায় নির্ভর কোথা এ নিখিলময় ?
ঈশ্বরের অনুরূপ সত্য সুমহান
তোমার ও সুনীরব আত্মপ্রেম-দান।
তৃপ্ত আছ ভালবেসে,
যা পাইছ লও হেসে,
আকাঙ্ক্ষা, অভাব কিবা নাহি কোন জ্ঞান

আত্মা মোর অনুভবে এ প্রেম-মহিমা,
জ্ঞানেতে বুঝিতে পারি নাহি তার সীমা;
তবুও যে মাঝে মাঝে এই হাহুতাশ,
হৃদয় বাহিরে চাহে হৃদয়-প্রকাশ।

মনে রেখো অসম্পূর্ণ মানব প্রকৃতি,
অপূর্ণ প্রেমেতে তার এইরূপ রীতি !
তাই সাধ দেখিবার
অভাবের অশ্রুধার,
একই কথা শুধাইতে তাই চায় নিতি।

তোমার প্রাণেতে ইথে যদি লাগে ব্যথা,
আর, সখা, ভুলিব না হৃদয়ের কথা;
আর শুধাব না, সখা, ভালবাস কিনা,
আজ হতে আঁখি মোর হবে অশ্রুহীনা।

কি কথা কহিব তবে, কি গাহিব গান ?
প্রেমেরি বাসনাপূর্ণ হায় যে এ প্রাণ !
হোক সে বাসনা রুদ্ধ,
চলুক মরণ-যুদ্ধ,
নীরব অশ্রুতে হোক সে তাপ নির্বাণ !

(কবিতা ও গান, ১৮৯৫)

সে কেমনে চলে যায়

স্বর্ণকুমারী দেবী

সে কেমনে চলে যায় !

আমার ত দেখিলে তাহায়, শুধু দেখিলে তাহায়

শুধু মুখপানে চেয়ে, প্রাণ উঠে উথলিয়ে,

শতবার হৃদিমাঝে বিদ্যুতের লহরী খেলায়।

সদা ভয়ে ভয়ে সারা, বুঝি পড়িলাম ধরা,

হৃদয়ের ভাব বুঝি নয়নে প্রকাশ পায় ;

সে ত বুঝিতে না পারে, শুধু যাই যাই করে

মনে মন না বুঝিলে কে বোঝাবে কায়।

আমি বড় ভালবাসি সে মুখের হাসি,

মলিন দেখিলে মুখ বুক ফেটে যায় ;

তবু সাধ যায় সখি, একবার দেখি,

সে প্রাণে বেজেছে ব্যথা না দেখে আমায় !

দেখিতে পাইনে বলে, হৃদয়ে বেদনা জলে,

সখি এ হেঁয়ালি বল কে বোঝায় !

। কবিতা ও গান, ১৮৯৫

যামিনী

স্বর্ণকুমারী দেবী

এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী

সে শুধু গো যদি আসিত।

পরাণে এমন আকুল পিয়াসা ;

যদি সে শুধু গো ভালবাসিত !

এ মধু বসন্ত ; এত শোভা হাসি,

এ নব যৌবন, এত রূপরাশি,

সকলি উঠিত পুলকে বিকাশি,
সে শুধু গো যদি চাহিত।
মিথ্যা তুমি বিধি! মিথ্যা তব সৃষ্টি,
বৃথা এ সৌন্দর্য নাহি যদি দৃষ্টি
যদি হলাহলে-ভরা প্রেমসুধা মিষ্টি,
কেন তবে প্রাণ তৃষিত!

(কবিতা ও গান, ১৮৯৫)

সাধের ভাসান

স্বর্ণকুমারী দেবী

(প্রথমাংশ)

কে ও উন্মাদিনী, কে ওই বালিকা,
সুধার সুরেতে ছাড়িছে তান,
আকাশ পাতাল, মোহিয়া কে ওই,
আপনার মনে গাহিছে গান?

মলিন বসন, মলিন ভূষণ,
এলোকেশরাশি উড়িছে বায়,
শৈবাল 'পরে শতদল সম,
মুখানির শোভা বেড়েছে তায়।

ডাগর ডাগর বিজলি-উজল
নীল আভাময় নয়ন দুটি,
শূন্য ভাব ভরে, এদিকে ওদিকে,
চারিদিকে যেন খুঁজিয়া বেড়ায়!

কি যেন খুঁজিছে নিজেই জানে না,
অথচ পরাণ কি যেন চায়,
চোখের সমুখে গিরিনদীবন,
দেখেও যেন না দেখিছে তায়।

গরবে উথলি তটিনী ওই যে
আপনার মনে বহিয়ে যায়,
তীরে তীরে তার উন্মাদিনী বালা
ঐ শুন · শুন—কি গান গায়!

(ভৈরবী)

"ভুলে যাও ভুলে যাও ভুলে যাও দুখিনীরে,
নহিলে হবে না সুখী একটি দিনের তরে :
এমনি অভাগী বালা, বিষাদ যাতনা জ্বালা
যেখানে সেখানে আমি,
মোর সাথে সাথে ফিরে,
ভুলিবারে কহিতে, গো,
কি বেদনা লাগে প্রাণে—
কেবলি যাতনা-জীর্ণ মরমে সে ব্যথা জাগে,
হোক তবু তাও সবে, তুমি নাথ, সুখে রবে,
তাই ভিক্ষা, হও সুখী, ভুলে যাও অভাগীরে।"

গাইতেছে বালা, জানে না সে তবু
কি গান গাইছে? কি ভাব তার!
হৃদি হতে শুধু আপনি উথলে
এ ছাড়া কিছু সে জানে না আর।

গাহিতে গাহিতে চলেছে বালিকা
কিছুতেই যেন খেয়াল নাই,
আপনার ভাবে আপনি ভোর,
বাহিরে যা হয় হোক্ না তাই!

প্রখর হয়েছে রবির উত্তাপ,
প্রহর তিনেক হয়েছে বেলা,
নদীর উরসে কিরণের রেখা,
চমকিছে যেন দামিনী-মালা।

দূর শূন্যপটে আঁকা আছে যেন
ও পারেতে ছোট পাহাড়গুলি,
দু'একটি কভু শাদা শাদা মেঘ
শিখরের পরে পড়িছে ঢুলি।

মৃদু ঝর ঝর, পড়িছে নির্ঝর,
কোথায় অথচ না যায় দেখা,
মাঝে মাঝে শুধু পাহাড়ের গায়,
ঝলসিছে যেন রজত রেখা।

নদীর মধুর মৃদুল স্বরেতে,
মিশিছে মধুর নির্ঝর-তান,
বালিকা গাইছে আপনার মনে,
কোন দিকে তার নাহি ক' কাণ।

প্রখর উত্তাপ, হয়েছে, হোক্ না,
বালিকার তায় আসিবে কিবা ?
বহে যদি ঝড়, বহুক ঝটিকা,
কিবা এল গেল নিশি কি দিবা ?

কিন্তু একি একি, চমকি উঠিয়ে,
সহসা বালিকা থামিল কেন ?
পরিচিত স্বরে, কে গাহিছে গান,
কেন রে হৃদয় অবশ হেন ?

মনে পড়ে পড়ে—পড়ে না যে মনে,
কি ভাবে হৃদয় উঠিল পূরে,
কে গাইছে গান—কে গাইছে গান
সেই যে পুরানো মোহিনী সুরে !

কাঁপে যে হৃদয়, বেঁধে যে পরাণে,
গানের একটি একটি কথা ;
একি রে বালার বিভোল হৃদয়ে
একি রে সহসা একি রে ব্যথা ?

নিজেই জানে না, কি ভাবে আকুল,
মাথাটি ঘুরিয়ে আসিল তার,
নদীর ধারেতে গাছের তলায়,
রাখিল বালিকা শরীর-ভার।

(মাঘ, ১৮৯০)

অশ্রু

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

ওরে প্রিয় অশ্রু-ধার,
প্রণয়-পূজার চির-সঙ্গিনী আমার!
পবিত্র প্রণয়-দেবে পূজা করিবারে,
তোর সম উপচার নাই এ সংসারে।
শুভ্রবাস পূত বলি তাই তারে পরি,
তা হ'তেও পূত তুই, ওরে অশ্রু-বারি!
প্রেম যবে মূর্তিমান ছিলেন আমার,
পূজেছি তাঁহায় দিয়ে প্রীতি-ফুল-হার।
কোমল কুসুমে কত মালিকা গাঁথিয়া,
ভূষিতে প্রণয়-দেবে দেছি পরাইয়া।
পরায়েছি বটে ফুল, মনেতে ধরেনি,
কেহ বা মলিন, শুষ্ক, কেহ বা ফোটেনি
মধ্যে তার তীক্ষ্ণধার সূতা এক রেখা,
যোগ্য ইহা নয়, যেন এই তায় লেখা।
স্বর্গের দেবতা-প্রেম গেছেন যথায়,
সুকোমল কত হৃদি পূজিতে তাঁয়।
উদ্দেশে এখন তাঁর করিব পূজন,
কুসুম, কবিতা আর নাই প্রয়োজন।

পেয়েছি মনের মত রতন আমার,
সুকোমল, পূতোজ্জ্বল নিধি অশ্রু-ধার !
আয় অশ্রু, প্রেম-দেবে মানস-আসনে
বসায়ে, সাজাই তাঁরে মুকুতা-ভূষণে।

(অশ্রুকণা, ১৮৮৭)

প্রিয়তম

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

উথলিয়া ওঠে হৃদি, প্রেম-পারাবার ;
ভেঙে ফেলে দিতে চায় বাহ্য আবরণ !
মনে পড়ে কত কি যে উষার, সন্ধ্যার—
শ্রবণ-বধির-কর তরঙ্গ-গর্জন !
অস্ফুট মুকুল কত গন্ধ-ভার নিয়া
শুখাইয়া গেছে ঝ'রে নিদাঘ-দহনে .
বিফল সাধের ছায়া পরাণে লুকিয়া
বিরলেতে মুছে অশ্রু, কাঁদিয়া গোপনে।
আশা ত জ্বলিয়া গেছে, জানি না ক' হায়,
কোন্ সূত্রে ঝুলিতেছে এ ভার জীবন ?
শূন্যপথে ফিরিতেছে শূন্য-প্রাণ হায় !
অলক্ষ্যে ফিরায় তারে কোন্ আকর্ষণ ?
কোথা হ'তে কার গীত আসিতেছে ভেসে,
আশ্বাসি রাখিতে মোরে হৃদি-হীন দেশে।

(অশ্রুকণা, ১৮৮৭)

প্রভেদ

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,—
তৃপ্ত তাহাতে অহর্নিশ ;
—ভুক্ত সেথায় কোটী বসুন্ধরা,
মুক্ত সেথায় শত সরিদ্বরা,
দীপ্ত সেথায় নবগ্রহ তারা,
বিকীরিত জ্যোতি দশ দিশ ;
আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,
তৃপ্ত তাহাতে অহর্নিশ ।

তুমি ভালবাস রূপ-গৌরব,
সুকোমল তনু শিরীষপেলব,
বিম্ব-বরণ অধর-পল্লব,
নয়নের সুধামাখা বিষ ;
আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,
তৃপ্ত তাহাতে অহর্নিশ ।

সেথা কভু ভ্রমি আমি
বনবীথিতলে,
হরিণীর মত হরিত শাদ্বলে,
মৃদু-কুহরিত মধুর রসালে,
বাসনা-সায়রে মরালী ;
কভু শতজন্মার্জ্জিত সাধ-শতদলে,
গুঞ্জিত ভুঞ্জিত মকরন্দে ভুলে,
ছিন্ন-সূক্ষ্মপক্ষ কেতক-মুকুলে,
ঘুরে ফিরে ফিরে কেলি ;
কখন মোহান্ধ বদরী-পল্লবে
আবদ্ধ গুটিকা নিজ মুখাসবে ;

নিজ কর্মজালে গাঁথা সে।—
—বিষম-রহস্য-গাঁথা সে !
কভু কুন্দপ্রভ বসন্ত-প্রভাতে
স্ফুরিত আপনি আপন প্রভাতে
জ্ঞানরবি-কর-প্রদীপ্ত-বিভাতে
বিচ্যুত সকল বাসনা ;
বিস্ময়ে নেহারি আপনা !

তুমি ভালবাস রূপ-গৌরব,
সুকোমল তনু শিরীষপেলব,
বিম্ব-বরণ অধর-পল্লব,
নয়নের সুধামাখা বিষ,
আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,
তৃপ্ত তাহাতে অহনিশ।

(অর্ঘ্য, ১৯০২

বেলা যায়

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

ওগো ছেড়ে দাও পথ এবারের মত
লইয়া আকুল বিনতি ;
আমি করিয়া শপথ বাহি দূর পথ
শিরে বিরহের বেসাতি ;—
অমার আঁধার ধরে' শিরে ফিরে
ম্লান শর্বরী যেমতি।
কোথা যেতে চাই জানি না যে তাই
শুধু ঘুরে মরি সারাদিন ;
কত ঘোরা নিশি যাপি তটে বসি'—
কত মধু-নিশি আশাহীন।

নাহি কিছু বিত্ত, কুহকী চিত্ত
বৃথা চঞ্চল লালসে ;—
শুধু—শুধু আছে আকুল নিশ্বাস,
অশ্রু-শীকরে মাখা সে ;
আছে ওগো আর বনপ্রসূনের
শুষ্ক গাছের মালিকা,—
আছে ওগো আর লাজ-পিঞ্জরের
বদ্ধ মূক শুক সারিকা !
আছে সুরক্ষিত যতন-সঞ্চিত
ব্যর্থ বাসনার ছায়া গো—
বহে' যায় বেলা যাই এই বেলা
ছাড় ক্ষণিকের মায়া গো ।
হে পথিকবর, কোথা তব ঘর,
করুণ আঁখিতে কি ভাষা ?—
পথে শত ধূলি উড়ে যায় চলি
বুকে বহি মরু-পিপাসা !
ওগো অনিমিষে, কি দেখিছ মুখে,
চেয়োনা অমন করিয়া :
আছে দুই খানি শ্রাবনের মেঘ
এই আঁখিকোণ ভরিয়া !

(অর্ঘ্য, ১৯০২)

বিরহ

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

সখি, তেমনি শাওন নিশি, চমকিত দিশি দিশি,
মুহু মুহু ক্ষীণ হাসি চপলা-বালার ;
মৃদু মন্দ বরিষণ, পরে গুরু গরজন,
বিকট বজর-নাদ চমক হিয়ার ।—

এমনি যামিনী ঘনে, বেড়ি তুয়া সখীসনে,
মনে পড়ে রাধার সে প্রথমাভিসার !
সেই বাঁশী সেই গান, গানে সে রাধার নাম,
শিহরিত দেহ প্রাণ চমক আমার !
সেই মেঘ গুরু গুরু, হিয়ার কাঁপুনি শুরু,
কম্পিত চরণ উরু বিবশা রাধার ;—
মনে পড়ে, ললিতে রে, সেদিন আবার !
যার পলকে আকুল প্রাণ, ছল ছল অভিমান,
আঁখে উথলিত বান জগত আঁধার,
পত্র-ভঙ্গে ভাবিত যে গমন আমার—
মনে পড়ে, ললিতে রে, সেদিন রাধার !
সেই বৃন্দাবন এই,
এই ত কালিন্দী সেই,
সেই কি রাধিকা এই ? বল্ একবার,
কোথা তবে রাধানাথ, ললিতে, রাধার ?
কেন তবে বিরহের অকূল আঁধার।

(শিখা, ১৮৯৬)

মধু মাসে মাধবী

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

তোমার স্মরণে ফির' নবীন যৌবন আসে,
তোমারি মনোজ্ঞ ছবি—অন্তর-নয়নে ভাসে ;
বিশীর্ণ এ দেহ-লতা,
বিশুষ্ক অধর-পাতা,
পদে দলি' যায় চলি' এবে সবে উপহাসে ;
তোমারে স্মরিলে তবু নবীন যৌবন আসে।

পুলক-শোণিত-রাশি প্রবাহিত শিরে শিরে,
লাবণ্য-তরঙ্গোচ্ছ্বাস সারা দেহে ফুটে ধীরে ;
কচি কিশলয়-রাগ
আবার অধরে ফুটে ;—
সাধের মুকুল-কুল
পরিমলে ভরি' উঠে ,—
কোথা তুমি দূর বাসে, সুখ-সুপ্ত পারিজাতে,
তোমার স্বপন-ছায়া, আমারে জাগায় প্রাতে।
সুচির যৌবনরাশি
কোথা তব হৃদে রাজে,
যাহার পরশে ধরা
চির নব সাজে সাজে ?

(সিন্ধু-গাথা, ১৯০৭)

পরশমণি

দেবেন্দ্রনাথ সেন

না গো না, এ চক্ষু নয় সে অতুল মণি !
প্রেমই পরশমণি, যাদুকর-স্পর্শে যার
হয়েছে অমরাবতী মাটির ধরণী !
ইহারি পরশবলে অতুল রূপসী-সাজে
দাঁড়ায় যুবার পার্শ্বে শ্যামাঙ্গী রমণী !
ইহারি পরশবলে কৃষ্ণ ভূঙ্গে ক্রোড়ে লয়ে
মদন-লাঞ্ছন মুখ নেহারে জননী !
ইহারি পরশ পেয়ে ত্রিভঙ্গের শ্যাম অঙ্গে
হেরে ত্রৈলোক্যের রূপ ব্রজবিহারিণী !
হে কবি, ইহারি বলে হেরিয়াছ বঙ্গ-ঘরে
ডেসি-লেসি-ড্যাফোডিল্-কুসুম-লাঞ্ছন
বঙ্গনারী-পুষ্পরাজি বিশ্বে অতুলন !

দীপহস্তে যুবতী

দেবেন্দ্রনাথ সেন

"ছাড় ছাড়, হাত ছাড়—"

ছাড়িলাম হাত,

হে সুন্দরী রোষ কেন? তুমি যে আমার
পরিচিত, মনে নাই সে নিশি আঁধার?
তোমাতে আমাতে হ'ল প্রথম সাক্ষাৎ!
তরুটি ভরিয়া গেছে অশোকে অশোকে,
বসেছে জোনাকি-পাঁতি কুসুমে কুসুমে;
কবিচিত্ত ভরি' গেল মাধুরী-আলোকে,
তুমি সখি তরু হ'তে নেমে এলে ভূমে!
কি অশোক-বার্ত্তা আনি' মরমে মরমে
ঢালি' দিলে কবি-কর্ণে অশোক-সুন্দরা!
দিবসের পাপ-চিন্তা কলুষ সরমে
হেরি ও সাঁজের দীপ গিয়াছে বিস্মরি'?
হাসিয়া ছাড়ায়ে হাত গেল বধূ ছুটি'—
প্রাণের তুলসী-মূলে জ্বালিয়া দেউটি।

ভালবেস'না

দেবেন্দ্রনাথ সেন

(১)

বাস করে থাকে কীট পার্থিব কুসুমে রে,
থাকে গুপ্ত বিষধর অগুরু চন্দনে রে,
যুবতী-যৌবন হায়, তটিনী-বুদ্বুদপ্রায়
চকিতে মিলায়ে যায়; ভুল না রে ভুলনা,
কারে ভালবেস না রে বেস না!

(২)

জতুর কুসুমে গাঁথা আশার মালিকা রে,
দপ্ করে জ্বলে উঠে অনলের শিখা রে,
মালা সহ শরীরেতে নব-বক্ষঃ উপরেতে,
দগ্ধচিহ্ন থেকে যায় ; ভুল না রে ভুল না
কারে ভালবেস না রে বেস না !

(৩)

ওই বিধু তব সঙ্গে গলায় গলায় রে,
পলকে প্রমাদ গণে না হেরে তোমায় রে,
ওই পুনঃ আঁখি ঠেরে, নিরখিয়ে বিজয়েরে
প্রণয় বিষম খেলা ; ভুল না রে ভুল না,
কারে ভালবেস না রে বেস না !

(৪)

মেঘে আবরিত হয় সুধাংশু-আনন রে,
দাবানলে দগ্ধ হয় আনন্দ-কানন রে,
যেই ফুল মধু রাখে, সেই ফুল বিষ ঢাকে,
কাচ হেরি হীরাভ্রমে ভুল না রে ভুল না,
কারে ভালবেস না রে বেস না !

(৫)

ভেবেছ কি মরণান্তে সতী-দাহ হবে রে ?
সতীর পদবী সতী খুঁজিয়া লইবে রে ?
ওটে কাষ্ঠ ঘৃত জ্বলে, সতী কিন্তু কুতূহলে
নগরে ফিরিয়া যায় ; ভুল না রে ভুল না,
কারে ভালবেস না রে বেস না !

(৬)

নাচে বক্ষঃ গুরু গুরু তোমার পরশে রে,
অমনি গলিয়া যাও মোহ-ভ্রম-বশে রে ;

কুহকী কুহক-জয়ী, বিষম নাচনি সেই,
বিষম প্রেমের খেলা ; ভুল না রে ভুল না,
কারে ভালবেস না রে বেস না !

(৭)

আইলে বসন্তকাল কুফুলও ফোটে রে,
লূতিকাও অলিসঙ্গে মল্লিকায় জোটে রে ;
রজনীগন্ধার মত, ঘোর গন্ধে আকুলিত,
অরুচি জনমে প্রেমে ; ভুল না রে ভুল না,
কারে ভালবেস না রে বেস না !

(৮)

চিরদিন পূর্ণশশী উদয় ত' হয় না,
চিরদিন ঋতুরাজ ধরাতলে রয় না ,
চিরদিন ভালবাসা, হৃদয়ে করে না বাসা,
বনপাখী বনে যায় ; ভুল না রে ভুল না,
কারে ভালবেস না রে বেস না !

(৯)

সকলি জলের খেলা ইন্দ্রধনু-প্রায় রে,
দেখিতে দেখিতে প্রেম মিলাইয়া যায় রে ;
আবার শোকের ধারা, তিমিরে করিয়ে সারা,
দর্শকের আঁখি যায় ; ভুল না রে ভুল না,
কারে ভালবেস না রে বেস না !

(১০)

গোলাপে কণ্টক হয়, বিধাতার খেলা রে,
অগ্নির বিকারমাত্র সুন্দরী চপলা রে ;
রত্নের উত্তম যেই, উজ্জ্বল হীরক সেই,
অঙ্গার-বিকারমাত্র ; ভুল না রে ভুল না,
কারে ভালবেস না রে বেস না !

(১১)

ছুঁইলেই গলে যায়, প্রজাপতি-পাখা রে,
আগমনী না হইতে বিজয়ার দেখা রে,
অভিনয় না ফুরাতে, রঙ্গভূমি-প্রাঙ্গণেতে,
সূর্যরশ্মি দেখা যায় ; ভুল না রে ভুল না,
কারে ভালবেস না রে বেস না !

(১২)

নদীগর্ভে কিশলয় শিলাময় হয় রে,
শশধরে ম্লান করে উষার উদয় রে ,
সরলা বালিকা হয়, প্রগল্‌ভা হইয়া যায়,
বাসি প্রেম তিক্ত বড় ; ভুল না রে ভুল না,
কারে ভালবেস না রে বেস না !

(১৩)

বৃথা বাণী ! বৃথা বাণী ! প্রেমান্ধ প্রেমিক রে !
তার কাছে "প্রেম"-সত্য, কভু কি অলীক রে ?
কভু নয়, কভু নয় ! হে প্রেম, তোমারি জয় !
অমলা, ধবলা প্রিয়া, নহে কলঙ্কিনী রে !
চিরদিন সুধা-প্রসবিনী রে !

(গোলাপগুচ্ছ ১৯১২

যাদুকরি এত যাদু শিখিলি কোথায় ?

দেবেন্দ্রনাথ সেন

যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায় ?
বিহ্বলা মোহিনী বেশে, কথা ক'স্ হেসে হেসে,
জহরির দোকানের পট খুলে ২ ` !
কোহিনুরে কোহিনুরে, আলো যে উথলি পড়ে !
ছড়াছড়ি ইন্দ্রনীলে হীরায় মুক্তায় ;

যেখানে দাঁড়াস্ তুই, জাতী, বেল, মল্লী, যুঁই
ফুটে ওঠে ; পারিজাত শাখায় শাখায় ;
সহসা মালঞ্চ রাজে গৃহ-আঙ্গিনায় !
শাখী নাচে, পাখী নাচে, কুহু-শব্দ প্রতি গাছে,
সারা গৃহ হয় সারা সৌরভ-নেশায় !

হেরি ও মোহন ভেল্
ভুলে গেছি বুদ্ধি খেল্
মলিন তারার ভাতি চাঁদনি-নিশায় ;—
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায় ?

মনে নাই ? সেই নিশি,
অন্ধকার দশ দিশি,
জলদে চপলা চাহে বিকট বিভায়,
সোহাগে বাহুর ডোরে বাঁধিলি আমায়।
সুখ-পিয় হ'ল প্রাণ ;
ক্ষণে মোর হ'ল জ্ঞান
আমি যেন ডুবে আছি জাগন্ত-নিদ্রায়,
বাসন্তী যামিনী-কোলে ফুল্ল-জোছনায় !

জ্ঞানরন্ধ্র হ'ল রোধ,
পরক্ষণে হ'ল বোধ,
চম্পকে, কমলদলে শিরীষ-শয্যায়
আছি আমি , হাসি মোর অধরেতে তায় !

পাতিয়ে যাদুর কল,
এইরূপে প্রতি পল
কাটাইলি ; তুই যবে আইলি হেথায়,
সেই দিনই যামিনীর হ'য়েছে বিদায় !
নিশায় কোকিল গায়,
কমল মুচকি চায়,

যামিনীতে কোলাকুলি ঊষায় ঊষায় !
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায় ?

যাদুকরি, তুই এলি—
অমনি দিলাম ফেলি
টীকা ভাষ্য ;—তোর এই চক্ষু-দীপিকায়
বিদ্যাপতি মেঘদূত সব বুঝা যায় !
শব্দ হয় অর্থবান,
ভাব হয় মূর্তিমান,
রস উথলিয়া পড়ে প্রতি উপমায় !
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায় ?

শোকদুখে নিজ ঘরে,
শোক গেছে চিরতরে ;
পলাতক রোগ-দৈত্য ফিরিয়া না চায় ;
প্রতি কক্ষে আশা-পরী,
হীরার অঙ্গুরী পরি,
অন্ধকারে, হাসি মুখে, প্রদীপ দেখায় !
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায় ?

আমার মলিন নেত্রে,
আমার শীতল গাত্রে,
কি অনল জেলে দিলি !—নিশায়-দিবায়,
সে পূত অগ্নির সেকে,
পাপ-চিন্তা, একে একে,
শুকানো পল্লব সম দগ্ধ-হ'য়ে যায় ;—
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায় ?

ও যাদু পরশে তোর
জড়িত রসনা মোর
বীণার ঝঙ্কার ধ্বনি দিগন্তে বিলায় ।

হের দেখ সারি সারি,
জগতের নর-নারী
অবাক্, হাসিত নেত্রে, মোর পানে চায়।
যাছকরি, এত যাছ শিখিলি কোথায়?

(অশোকগুচ্ছ, ১৯০০)

সাঁজের প্রদীপ

দেবেন্দ্রনাথ সেন

(১)

নেত্রে হাসি, হস্তে দীপ, এস গো রূপসি!
হোলো মোর শয্যালয়, কুমুদ-কহ্লারময়,
ছেয়ে গেল নিশিপদ্মে চিত্তের সরসী!
হের দেখ, হাসি হাসি, দিল মোর কাছে আসি,
একরাশি ফুলরাশি কল্পন-রূপসী!
অধর্ম পাইল ভয়, পুণ্যের হইল জয়,
হেরি সখি নিশিমুখে তব মুখশশী!

(২)

গৃহ-রাজত্বের চির-বিজয়ী প্রদীপ!
অসাধ্য হইল সাধ্য, পুরুষ হইল বাধ্য,
জয় জয় নারী তব সাঁজের প্রদীপ!

(৩)

মধুনিশি—জ্যোৎস্নালোক— লালে লাল ফুটালোক,
কি কাহিনী কানে তব কহিল মোহিনি?
তাই ও ভালের টিপ্, তাই ও সাঁজের দীপ,
আভাষে প্রকাশ করে অশোক-কাহিনী!
তুমি কি নিজের আঁখে, পরাণের ক্ষুদ্র কাঁখে,
হেরিয়াছ কুঞ্জবনে জোনাকী-গাগরী?

হেরি তোমা, হর্ষে সারা, নিশান্তে কি শুক্রতারা,
ঢালি দিল প্রাণে তব আলোক-লহরী ?

(৪)

নিশি ভোর হয় হয়,— তুমি সখি সে সময়,
আলোকে দাঁড়ায়েছিলে. করে ফুলসাজি !
শিবের পূজার তরে, শ্রদ্ধাভরে, হর্ষভরে,
বাছি বাছি তুলে নিলে ফুল্ল ফুলরাজি ।
হেরি ও ধরণ ধারা, জ্যোৎস্না হাসিয়ে সারা,
লুটায়ে চরণে তব, শেফালী-ছায়ায় !
চন্দ্র ডাকে "আয় আয়" ! জ্যোৎস্না আর কি যায় ?
ঝাঁপাইয়া ক্রোড়ে তব পশিল হিয়ায় !

(৫)

সহসা কৌস্তুভমণি হাসিল হরষে !
সহসা ফুটিল পদ্ম মানস-সরসে !
সহসা "উপমা" আসি, জ্যোতিশ্ছটা পরকাশি,
বরষিল ভাবরাশি, কবির মানসে !
লাবণ্য উথলে দেহে, ইন্দিরা পশিলা গেহে—
হাসিয়া উঠিল গেহ চরণ-পরশে !

(গোলাপগুচ্ছ, ১৯১২)

প্রথম চুম্বন

দেবেন্দ্রনাথ সেন

(১)

না জানি কি নিধি দিয়া গড়িল চতুর বিধি,
প্রথম চুম্বন !
কুহরিয়া উঠে পিক,
শিহরিয়া উঠে দিক্,
ভরে যায় ফল ফুলে শ্যামল যৌবন ;
বনতুলসীর গন্ধে,
বায়ু হয় মাতোয়ারা ;
বিটপির গায়ে গায়ে চাঁদের কিরণ !

(২)

অজানা সুরভি ঘ্রাণে,
কি জানি কি জাগে প্রাণে,—
কোকিলা ঝঙ্কার ছাড়ে মাতায় ভুবন !
কি জানি কি মেঘ হেরি,
চঞ্চলা ময়ূরী নাচে,—
আবেশে প্যাখম তুলি অঙ্গের দোলন !
অজানা সুরভি ঘ্রাণে,
কি জানি কি বা সে প্রাণে,—
আগ্রহে দম্পতী করে প্রথম চুম্বন !

(৩)

কে আনিল আলোরাশি হৃদয়-আঁধারে ?
অধরের ফাঁক দিয়া ;
জ্যোৎস্না পড়ে উছলিয়া,
দম্পতীর শয্যার আগারে !
রঙ্গীন বার্‌নীস্‌ পেয়ে, খাটপালা হেসে উঠে !
কে রে এ চতুর কারিগর ?
দেয়ালের চিত্রগুলি আবার নূতন হ'ল !
কে রে সুনিপুণ চিত্রকর ?
কনক-পারদ লেগে, মলিন দর্পণ খানি
ধরিল কি অপরূপ শোভা মনোহর !

(৪)

নব বক্ষে নব সুখ,
নব ধর্ম, নব যুগ
নব শশী হেসে সারা প্লাবিয়া ভুবন !
জ্যোৎস্নার আবছায়ে যৌবন-নেশার ঝোঁকে,
মধুর মধুর এই প্রথম চুম্বন !

(গোলাপগুচ্ছ, ১৯১২)

শেষ চুম্বন

দেবেন্দ্রনাথ সেন

(১)

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
জীবনের রত্নাগার একেবারে করি খালি,
অভাগারে ফাঁকি দিয়ে মরণে দিতেছ ডালি।
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
লয়ে ও হাঁরার কুচি, চক্ষের সলিল মুছি,
দরিদ্র করিবে, সখি, জীবন-যাপন।
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !

(২)

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
এ হেমন্তে দাও সখি, ফুল্ল মালতীর মালা ;
পৌষের দুরন্ত শীতে রৌদ্ররাশি দাও বালা !
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
সবাই কাঁদিছে তাই, তব মুখ পানে চাই,—
মোর নাই অবসর করিতে ক্রন্দন,
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !

(৩)

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
ঘন-ঘোর বর্ষা রাতে, কোথা পাব জ্যোৎস্নারাশি ?
এ জলদে ছাড়ি দাও বিকট বিদ্যুৎ-হাসি !
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
পুলিনে দাঁড়ায়ে হায়, শীতে থর থর কায়,
সলিলে নামিব, সখি মুদিয়া নয়ন !
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !

(৪)

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
কে বলিল, গোধূলিতে, রবি গেলো অস্তাচলে,
প্রভাতে ভাস্কর হয় অরুণ উদয়াচলে ?
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
সূর্যকান্ত মণি সম অধর-প্রবালে মম,
ভরি লব একরাশি কাঞ্চন-কিরণ !
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
দাও চিত্ত-মণিবন্ধে রাখির বন্ধন বাঁধি !
চিরবিরহের দিনে, বিরহের চিরসাথী,
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !

(৫)

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
একি ! একি ! একি গোল ! একি রোদনের রোল !
সব শেষ ; তারি সমাচার ?—
দাও তবে প্রাণ-ভরা শেষ উপহার,
সুধা-হলাহল এই চুম্বন তোমার !

(গোলাপগুচ্ছ, ১৯১২)

মিরেণ্ডা

দেবেন্দ্রনাথ সেন

দেখিনু অদ্ভুত স্বপ্ন । পূর্ণিমা শর্বরী ;
নিথর শান্তির রাজ্যে সুধাকর হাসে !
সহসা উঠিল ঝড় তোলপাড় করি
স্বর্গ, মর্ত্ত ; ম্লান শশী কাঁপিল ত্রাসে ।

ব্যোম-যাদুকর কিন্তু করিয়া ভ্রূকুটি—
থামাইল ভীম বাত্যা ; মেঘ-নাট্যশালে
অদ্ভুত-অপ্সরবাদ্য বাজে তালে তালে ;
কি অদ্ভুত ! অন্তরীক্ষে নাচে নটনটী !
থামাগো স্বপ্নের কায়া ব্যোম যাদুকর
দিল কি বদলি ? এ কি চমৎকার হেরি !
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল চন্দ্র-কলেবর ;
দেখা দিল রঙ্গভূমে এ কোন কিন্নরী ?
তুমি কি মিরেণ্ডা ? কিম্বা আকাশের শশী ?
বুঝিব কি ? দৃষ্টে আঁখি গেল যে ঝলসি !

(অপূর্ব নৈবেদ্য, ১৯১২)

জুলিয়েট

দেবেন্দ্রনাথ সেন

লাল নীল শ্বেত পীত স্বর্ণ বর্ণরাজি,
পুষ্পোপরি পুষ্প ঢালা, পরতে পরতে,
শিশির ও জ্যোৎস্না ঢালা সঙ্গীতের স্রোতে ;
কি বিচিত্র সমাবেশ ! এ কি ছায়াবাজী ?
বসন্ত-উৎসব দিনে মালাকার সাজ
কি গড়িলে একচিত্তে আনন্দ-মোহিনী ?
স্ফূর্তিময়ী মূর্তি এ যে ! স্মর-সোহাগিনী,
ক্লান্ত তুমি ; ঘুমাও ঘুমাও, দেবি আজি !
চুপি চুপি ধীরে তথা আসিয়া মদন,
বিচিত্র সে পুষ্পমূর্তি অবাক নেহারি !
মুগ্ধ স্মর, কর্ণে তার করি উচ্চারণ
অগ্নিমন্ত্র, "উঠ, উঠ" কহিলা ফুকারি—
বিস্ফারি যুগল নেত্র, মূরতি হাসিল,
"আমি জুলিয়েট" বলি উঠি দাঁড়াইল।

(অপূর্ব নৈবেদ্য, ১৯১২)

রাক্ষসী

দেবেন্দ্রনাথ সেন

বসন্তের উষা আসি, রঞ্জি দিল যুগল কপোলে ;
তাই ও ফুলের বাস, ফুল-হাসি, আননে প্রিয়ার !
নিদাঘের রৌদ্র আসি, বিলসিল ললাট নিটোলে,
তাই গো প্রিয়ার ভালে জ্যোতি খেলে মহিমা-ছটার !
ঘন-ঘোর বর্ষা-রাত্রি বিহরিল অলক-নিচোলে ;
তাই গো প্রিয়ার পিঠ কেশ-মেঘে সদা মেঘাকার !
নাচিল শরত শশী রূপ-হ্রদে, হিল্লোলে, হিল্লোলে ;
তাই গো প্রিয়ার দেহ কূলে কূলে চন্দ্রে চন্দ্রাকার !
রাহু কেতু দুষ্ট ঋতু—শীত ও হেমন্ত শুধু হায়
প্রিয়ার হৃদয়ে পশি ছড়াইল কঠিন তুষার !
তাই প্রিয়ে, তাই বুঝি, সুকঠিন হৃদয় তোমার ?
উপাসনা, আরাধনা সকলি ঠেলিয়া দাও পায় !
আমি গো বুঝিতে নারি দেবী তুমি, অথবা রাক্ষসী !
পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তুমি, কিংবা ঘোরা কৃষ্ণা চতুর্দশী !

(অশোকগুচ্ছ, ১৯০০)

চিরযৌবনা

দেবেন্দ্রনাথ সেন

আমার প্রতিভা আজি কাঙালিনী, হে শ্যামসুন্দর
কবিতা-মালঞ্চ তার ভরপুর সৌরভে ও রূপে
নহে আর ; মাধবীমণ্ডপ তার, মধুপে, মধুপে,
নহে আর ঝঙ্কৃত ও অলঙ্কৃত ! শুষ্ক সরোবর ;
ফোটে না, ফোটে না তথা একটিও পদ্ম মনোহর
উপমার ! ঝরি' গেছে লতা-পাতা ; ওই দীন স্তূপে
ক্রোটনের পাতা কাঁপে (হায় তারে কে করে আদর ?)

কম্বল-সম্বল-হারা দরবেশ কাঁপে যথা চুপে !
হে বঁধু, হে প্রাণেশ্বর ! নাহি খেদ, নাহি তাহে লাজ !

তুমি যবে আসিয়াছ, কি গো কাজ গোলাপী ভূষণে ?
যুগান্তে পতিরে পেয়ে, বিরহিণী, ভুলি তুচ্ছ সাজ,
আলু-থালু কেশ-পাশ, পড়ে নাকি রাতুল চরণে ?
জানি আমি, হে স্বামিন্, তুমি মোরে করিবে না ঘৃণা
পতি-চক্ষে, প্রাণনাথ, প্রবীণা যে সুচির-নবীনা !

(গোলাপগুচ্ছ, ১৯১২)

অদ্ভুত অভিসার

দেবেন্দ্রনাথ সেন

মাধবের মন্ত্রসিদ্ধ মোহন মুরলী
ধ্বনিল রাধার চিত্ত-নিকুঞ্জ-মোহনে :—
অমনি রাধার আত্মা দ্রুত গেল চলি
শ্যামতীর্থে, শ্যামাঙ্গিনী যমুনা-সদনে !
গেল রাধা ; তবে ওই মন্থর গমনে
মঞ্জুল-বকুল-কুঞ্জে, কে যায় গো চলি ?
আকুল দুকূল ; ম্লান কুন্তল, কাঁচলি ;
ঘুম যেন লেগে আছে নিঝুম লোচনে।
নাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া। টানে তরুদল
লুণ্ঠিত অঞ্চল ধরি ! মুখপদ্মোপরি
উড়িয়া বসিছে অলি গুঞ্জরি গুঞ্জরি :
বিহ্বলা মেখলা চুম্বে চরণের তল।
আগে আত্মা, পরে দেহ যাইছে ছুটিয়া
রাধিকারে, বলিহারি তোর অভিসার।

(গোলাপগুচ্ছ, ১৯১২)

দাও দাও একটি চুম্বন

দেবেন্দ্রনাথ সেন

দাও, দাও, একটি চুম্বন।
বিছাইয়া দুটি ওষ্ঠে সোহাগের কচিপাখা
দাও, দাও, প্রাণময়ি, ত্রিদিব-অমিয়-মাখা,
একটি চুম্বন ;
আকুল ব্যাকুল হ'য়ে, আত্মা মোর বাহিরিয়ে,
করুক তোমার করে সর্বস্ব-অর্পণ,
দাও, দাও, একটি চুম্বন।
পশে যবে রবিকর পদ্মের উরসে,
তরল কনক সেই শিশির পরশে,
লাজ-রক্ত শতদল, প্রাণপুষ্পে ঢল ঢল,
সর্বস্ব বিলায়ে ফেলে চিত্তের হরষে।
তেমতি, তেমতি তুমি, বৈশাখী চুম্বনে চুমি,
লও, লও, (আঁখি মোর আসিছে মুদিয়া,)
প্রাণের মদিরা মম গণ্ডূষে শুষিয়া :
দাও, দাও, একটি চুম্বন—
মিলনের উপকূলে সাগর-সঙ্গমে,
দুর্জয় বানের মুখে, দিব ভাসাইয়া সুখে,
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন,
দাও, দাও, একটি চুম্বন।
আর এক,—একটি চুম্বন।
তোমার ও ওষ্ঠ দুটি, বাসন্তী যামিনী জাগি,
পাতিয়াছে ফুল-শয্যা বল গো কাহার লাগি ?
দাও, দাও, একটি চুম্বন।
নববধূ আত্মা মোর, লাজুক, লাজুক ঘোর,
চক্ষু বুজি মাথা গুঁজি করিবে শয়ন !

দাও, সখি ! মদির চুম্বন !
দাও, দাও, একটি চুম্বন ।
পুষ্পময়, স্বপ্নময়, তোমার ও ভালবাসা,
কবিতা-রহস্যময় নীরব তাহার ভাষা,
তোমার ও মদির চুম্বন ।
কপোত ও কপোতী সনে
মগ্ন মৃদু কুহরণে
থাকে যথা, সেইরূপে পরামর্শ করি,
তব ওষ্ঠ মম ওষ্ঠ উঠুক কুহরি !

(অশোকগুচ্ছ, ১৯০০)

দর্পণ-পার্শ্বে

দেবেন্দ্রনাথ সেন

(১)

ভাল করি আসি দাঁড়াও রমণি,
ও মুখ-কমল হেরিব আজিকে
ফুটিত দর্পণে চারুচন্দ্রাননি ;
শ্বেতদূর্বা জিনি ও শোভন অঙ্গ
নিরখিব আজি মানস ভরিয়া,
দর্পণের আগে দাঁড়াও আসিয়া ।

(২)

চারু মুখপদ্ম ফুটিছে দর্পণে,
অধর-সংস্থিত বিরাজিছে তিল,
ভৃঙ্গ-শিশু যেন পদ্মপত্র-কোণে ;
গলদেশে আসি কৃষ্ণ কেশরাশি,
হরিদ্রাক্ত অঙ্গ চুম্বিছে সঘনে ।
কৃষ্ণমেঘ যেন সুধাংশু-বদনে ।

(৩)

বক্ষঃদেশে মরি হস্ত সংস্থাপিত !
সুমৃদু হাসিতে দন্ত কুন্দ-পাতি
কিবা সুষমায় মরি সুসজ্জিত !
রূপের মাধুরী পড়িছে উথলি,
রূপের তটিনী বহিছে দর্পণে,
চন্দ্রলেখা যেন সরসী-বদনে ।

(৪)

দর্পণ-ভিতরে চিত্রিত যে ছবি,
এ ছবি-তুলনা কে দিবে রে বল ?
এ ছবি বর্ণিতে পারে না'ক কবি,
কাছে এস প্রিয়ে, মুখে মৃদু হাসি,
তাকাও সুমুখি ! মোর মুখ-পানে,
তোমার তুলনা তুমিই ভুবনে ।

(নির্ঝরিণী, ১৮৮১)

নারীমঙ্গল

দেবেন্দ্রনাথ সেন

জানি আমি নারি, তুমি কবি-বিধাতার
শ্রেষ্ঠ কাব্য ; সুকোমল কান্ত পদাবলী ;
ছন্দোবন্ধে, অনুপ্রাসে মরি কি ঝঙ্কার !
শ্যামের মুরলী সম শব্দের কাকলী !
উপমার কারিগরি, বর্ণের যোজনা,
কল্পনার লীলাখেলা (গোপীর হিন্দোলা !)
হেরি সখি, মুগ্ধ হয় লুব্ধ চেতনা—
নাচিছে উর্বশী যেন বাসন্তী-নিচোলা !

কিন্তু যবে হেরি সখি, ছন্দ-ভঙ্গিমায়
অর্থের মধুরতর চিকণ রঙ্গিমা—
ভাবের সে সমাবেশ! (রস উথলায়
পদে পদে—চারুতার গুপ্ত গরিমা!)—
লুপ্ত হয় বুদ্ধি মোর সরে না গো বাণী!
কবির এ গুণপনা কেমনে বাখানি?
সুকেশিনি, সুহাসিনি, চম্পকবরণি,
হে সুন্দরি, তুমি যবে পোহাতে শর্বরী,
পতি-পাশে (কুঞ্জে যথা ব্রজের রমণী!)
যাও অর্ধযামিনীতে—আনন্দ-লহরী
জাগায়ে প্রমোদ-কক্ষে! বধূ-বিলাসিনী
অভিসারিকার বেশে! নূপুর গুঞ্জরি
নাচে মরি; নাচে মরি কঙ্কণ-কিঙ্কিণী
গুঞ্জরি; প্রমোদ-কুঞ্জে তুমি মধুকরী!—
কি উৎস! হাসে দীপ; হাসে নেত্র-তারা,
হাসে অলকের পুষ্প; ঝলকে ঝলকে
হাসে তব রক্ত চেলী; হর্ষে হয় সারা
সারা গৃহ, গৌরাঙ্গীর পরশ-পুলকে!
রূপে ভোর পতি তব, তোমার সুষমা
পান করে শত নেত্রে, অয়ি মনোরমা!
নিশান্তে, করিয়া স্নান, পরি শুভ্র শাটী,
এলাইয়া তরঙ্গিত আর্দ্র কেশরাশি,
শ্বশ্রূর পূজার কক্ষে, পশি হাসি হাসি,
সাজাও পুষ্পের থালা, চন্দনের বাটী—
অর্চনার আয়োজন, কিবা পরিপাটি!
বধূর সুমুখ হেরি, শ্বশ্রূর আ মরি
নেত্রে বহে আনন্দের বারি!—ত্যজি শাটী,
পরি এক আটপৌরে শাড়ী, হে সুন্দরি,
কোথা যাও, বিম্বাধরে আনন্দ না ধরে।

পশিয়া রন্ধনগৃহে, তণ্ডুল ব্যঞ্জন
সুস্বাদু! রাঁধিয়া যতনে, পরিবেশন
করিছ দেবর-বর্গে কতই আদরে!
শব্দ-ঘটাময়ী শুধু নহ গো কবিতা—
তুমি সখি অর্থময়ী, ভাবময়ী গীতা!
তাই সখি বঙ্গ-কবি, রূপে গুণে ভোর,
রসরঙ্গে, মধুমাসে, রচে 'মাধবিকা'*—
চিকণ গাঁথনি! চারু কল্পনার ডোর!
পরায় তোমার গলে মোহন মালিকা!
তাই সখি বঙ্গ-কবি (বিদ্যুতের খেলা
মেঘে মেঘে! বহু তুলি নাচিছে শিখিনী!
হৃদি-কদম্বের সাথে দোলাইয়া 'দোলা',*
ডাকে তোমা—দোলাইতে তোমার রঙ্গিণি!
তাই সখি, বঙ্গ-কবি, 'চিত্রা'র* উদ্যানে
বসিয়া ("অকূল শান্তি, বিপুল বিরতি,
নাহি কাল, দেশ!") চাহি, তব মুখ-পানে,
"অনিমেষে করে সখি তোমারি আরতি!"
"অন্তর-মাঝারে তার একা একাকিনী"
তুমি জ্যোৎস্না—চারিধারে আঁধার যামিনী!
তুমি মোর স্পর্শমণি! তোমার দু'হাতে
পিত্তলের বালা যদি পরাই সোহাগে,
দরিদ্র কঙ্কণ-দুটি, জ্যোৎস্না-সম্পাতে,
ঝকমকে ঝলমলে কনকের রাগে!
গৃহের আরসী, ছবি (তাহাদের সাথে
কি সম্বন্ধ পাতায়েছ?) পড়ি এক ভাগে,
তোমার বিরহে তারা থাকে গো বিরাগে!
মেঘের দুঃস্বপ্ন হেরে কি দিবা নিশাতে!

---

* বলেন্দ্র ঠাকুর-প্রণীত (১৮৯৬), সুধীন্দ্র ঠাকুর-প্রণীত (১৮৯৬), রবীন্দ্রনাথ-প্রণীত (১৮৯৬)

তুমি যবে হাস্যমুখে তাদের সকাশে
যাও সখি, তোমার ও মোহন পরশে,
তাদের মলিন তনু কি দ্যুতি বিকাশে,
করিয়া অবগাহন সোণার সরসে !
আমারো ছিল গো সখি, মলিন নয়ন,
এবে তাহে হাসি-ছটা, সোণার কিরণ !
সত্য করি বল সখি, কোন্ অলকায়,
কোন্ যক্ষ-মোহিনীর প্রমোদ-উদ্যানে,
শোভিতে মর্মর-বেশে ? বেষ্টিয়া তোমায়,
নীলকান্ত আলবালে, কনক-বিতানে,
পালিত যক্ষ-মোহিনী ! প্রবাল-শাখায়
ফুটিত মুকুতা-ফুল ! চাহি তব পানে,
হর্ষ-দীপ্তি উছলিত মোহিনী-বয়ানে,
ল'য়ে নীল পীত রক্ত আভার ছটায় !
ছিলে কি গো কল্পলতা, ইন্দ্রের উদ্যানে,
আলিঙ্গিয়া পারিজাতে ? হ'ত আন্দোলিত
লীলা-রঙ্গে শাখা-বাহু ! চাহি তব পানে,
উর্বশী মেনকা রম্ভা নর্তন শিখিত !
আকুলি সে দেবভূমি, স্বর্গের শেফালি !
ফুটিয়া, ঝরিয়া পুনঃ, ফুটিতে কি আলি ?
তারপরে বুঝি কোনো দুর্বাসার শাপে,
নারী হ'য়ে জনমিলে অবনী-মাঝার ?
তব পুণ্যফলে, সঙ্গে আনিলে তোমার
স্বর্ণবর্ণ, শ্রীঅঙ্গের চারু ইন্দ্রচাপে !
তবু সখি, তোমার ও বদনমণ্ডলে
উছলে স্বর্গের সেই দুরন্ত সৌরভ !
কি বলিব ? হেরি কেহ অকুণ্ঠিত দান,
হাসি কহে : "হের দেখ দরিদ্রের ঠাট্ !"
হায় সে অদূরদর্শী জানে না সন্ধান,

তুমি মোরে—রত্নময়ি !—করেছ সম্রাট্ !
দেবতা প্রসন্ন—আমি প্রিয় দেবতার !
কে পায় মরতে বল হেন উপহার ?
তাই সখি, তোমার ও রূপ-কক্ষে বসি,
থাকি আমি দিবানিশি। লোকে বলে : "একি !
নির্জনে কেমনে থাকে !"—হে কবি-প্রেয়সি,
বুঝাব এদের, এরা বুঝিবে তবে কি ?
তোমার সকাশে বাস সে কি গো নির্জন ?
সহস্র সমিতি সে যে সভার আহ্বান,
সহস্রের সাথে সে যে শত আলাপন,
সহস্রের সাথে সে যে আদানপ্রদান !
তুমি একা কথা কও ? দু'চক্ষু চঞ্চল
কথা কয় ; কথা কয় প্রগল্‌ভ অঞ্চল,
কথা কয় শত মুখে কেশের কুন্তল !—
কারে উত্তরিব ? হই বিস্ময়-বিহ্বল !
কি উৎসব। রূপরাজ্যে একি সুমঙ্গল !
একি তব অঙ্গে অঙ্গে হর্ষ-কোলাহল !
প্রেমের অব্যবসায়ী—কি জানে উহারা !
"নির্জনে, একেলা বসি, আমি গো কেমনে
বিশ্বের সংবাদ রাখি নখের দর্পণে !"—
এই ভাবি, হয় তারা বিস্ময়েতে সারা !
তোমার সকাশে বাস সে কি গো নির্জন ?
সহস্র নগর সে যে, সহস্র নগরী,
সহস্র কান্তার সে যে, নদী, গিরি, দরী,
সহস্র মোহন দৃশ্য, নয়ন-রঞ্জন !
বসি তব, রূপ-কক্ষে বিশ্বের আকাশ
হেরি সখি, সীমাশূন্য সে নীল বিতানে
রবি শশী গ্রহ তারা পাইছে প্রকাশ—
দেববৃন্দ, দেববধূ, আলোক-বিমানে !

কি আর দর্শনে তব অদর্শন রয় ?
জীব-রাজ্য, তরু-রাজ্য নরনারীময় !
বিস্ময়-বিস্ফার-নেত্রে জ্ঞাতি বন্ধু বলে :
"বধূর অঞ্চলে বাঁধা থাকে অহরহ—
তার এত সহোদর-সহোদরা-স্নেহ ?
তার এত মাতৃভক্তি ? বুঝি ভূমণ্ডলে
নাহি হেন বন্ধু-প্রীতি ! দেখেছ কি কেহ
কুটুম্ব-আদর এত ?"—ও রূপ-অনলে
(হোমানলে !) পুড়ায়েছি "আমিত্বে"র দেহ !
অজ্ঞ এরা, তাই এরা এত কথা বলে !
সজনি লো ! তোমার ও প্রেম-মন্দাকিনী !—
তাহারি প্রয়াগ-তীর্থে, ত্রিবেণী-সঙ্গমে,
পুণ্য-কুম্ভ-মেলা দিনে, সরমে ভরমে
অবলজ্জা ত্যজি, হইয়াছে সন্ন্যাসিনী
আমার এ আত্মা-বধূ !—গড়েছে মন্দির
ভিতরে : বাহিরে মাত্র উচ্চ সৌধ-শির !
লোকে বলে : "সবি এর অদ্ভুত ব্যাপার !
দু'সন্ধ্যা জোটে না অন্ন, দশা যার এই !—
লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র যেই,
সেও কিন্তু দেয় এরে প্রীতি-উপহার !"
"সেও কিন্তু করে এরে প্রীতি-নিমন্ত্রণ ;
আদর-ক্ষীরাম্বু স্বাদু পিয়ায় যতনে !
পদ্মার পুলিনে যেতে করে আকিঞ্চন ;
ললাট মণ্ডিয়া দেয় সুমাল্য-রতনে।"
অয়ি যাদুকরি ! এরা জানে না তোমার
যাদুমন্ত্র—কবিতায়, কল্পনায় দীক্ষা—
প্রেম-কুশাসনে বসি একান্তে এ শিক্ষা !
অয়ি বিশ্বরমে, তব প্রীতি-প্রতিভার
কি মাহাত্ম্য !—দীন আমি, পথের ভিখারী ;

বন্ধু মম রাজপুত্র, রাজার ঝিয়ারি!
লোকে বলে : "এর হায় এমন সুরীতি,
পত্র লিখ এরে, তুমি তাহার উত্তর
পাবে না (হাসির কথা!) দুইটি বৎসর!
(ধৈর্যের আশঙ্কাস্থল! বন্ধুতার ভীতি!)—
তবু কিন্তু এর প্রতি বিরাগ, অপ্রীতি,
কভু নাহি জনমিবে তোমার পরাণে!
অদ্ভুত আলাপী!—বুঝি যাদুমন্ত্র জানে!"
আমি হই হেসে সারা, শুনে এ ভারতী!
সজনি জানে না এরা—নির্বাক্ নীরবে,
তোমার আয়ত চক্ষু (মুখে নাহি বাণী!)
ভরি দেয় বক্ষ মোর কথার উৎসবে!
মুগ্ধ হয়ে শোনে শ্রোতা—মোর অন্তঃপ্রাণী!
বশম্বদ বন্ধুবর্গ জানে এ বারতা—
মুখর প্রেমের উৎস মোরো নীরবতা!
লোকে হাসে হেরি মোর বিধবার রীতি,
আতপ-তণ্ডুল-দুগ্ধ-উদ্ভিদের রসে
এ দেহ-পালন! চাকচিক্য, সজ্জা-প্রীতি,
নাহি মম : একি রঙ্গ হায় এ বয়সে!
"পশু, পক্ষী, দাস, দাসী—জীব সমুদয়!"—
তুমি মোরে শিখায়েছ, অয়ি স্নেহলতা!
করুণাময়ীর প্রাণ দ্রব হ'য়ে বয়
জীব-দুঃখে, নারীরূপা কে তুমি দেবতা?
কনকের কাজ করা, স্বর্ণফুলে ভরা,
তুলে রাখি অনাদৃত বারাণসী শাড়ী,
অয়ি গৃহস্থের বধূ, অযত্ন-অম্বরা,
বিশ্বের সৌন্দর্য তুমি লইয়াছ কাড়ি!
"বাকল-বসনা শোভা—তাপসী সরলা!"—
তোমারি এ শিক্ষা, অয়ি গৃহ-শকুন্তলা!

কেহ বলে : "আছে এর শিরোরোগ-ব্যাধি !"
কেহ বলে : "এ কবিটি নিশ্চয় পাগল !
ধরণ ধারণ এর সবি উচ্ছৃঙ্খল !"
এইরূপে পরস্পরে সবে বিসম্বাদী !
শপথ-কাহিনী মম যারা নাহি জানে,
তারা বলে : "এ কবিটি পিয়ে মনঃসাধে
সোমরস : হের ওর বঙ্কিম নয়নে
মাদকতা !"—আমি হাসি মিথ্যা অপবাদে !
তুমি গো মদির-আঁখি, প্রেমের পিয়ালা
দাও ভরি সুধারসে : আমি হ'য়ে ভোর,
পিই তাহা—সুধামুখি ! নিভৃত নিরালা
তব সোহাগের কুঞ্জে !—অপরাধ ঘোর
এইমাত্র মোর !—ও-গো নিন্দা, দৈত্যবালা
পাগল করেছে মোরে পাগলিনী মোর !
আলুথালু কেশপাশ, মাথার বসন
চরণে লুটায়ে পড়ে : ব্যস্ত গৃহকাজে,
ছুটিতেছ চতুর্দিকে ! জান না বন্ধন,
মূর্তিমতী স্বাধীনতা ! পাগলিনী-সাজে,
হাসিয়া করিছ কাজ ! যেন মেঘমাঝে
শ্রাবণের সৌদামিনী ! বিমুক্ত হরিণী
যেন বনমাঝে ! তটিনী যেন রঙ্গিণী !
উধাও, অস্থির, তব নারী-মূর্তি রাজে !
হে নারি ! অবন্ধনের অন্তর-অন্তরে
তবু কি বন্ধন ! তবু কি শোভা-শৃঙ্খলা,
তোমার এ উচ্ছৃঙ্খল অশোভা-ভিতরে !
চঞ্চলারে বাঁধিয়াছ, অয়ি সুমঙ্গলা !
সুশাসিত, নিয়ন্ত্রিত, রাজতন্ত্র-মাঝে,
রাজ্ঞী হয়ে, তোমার ও নারীমূর্তি রাজে !
হে মোহিনি শিক্ষাদাত্রি ! তাই এ বন্ধন

মম অবন্ধন-মাঝে ! কল্পনা-অশ্বিনী
ছুটিছে কান্তারে, তার চরণে শিঞ্জিনী
দিয়া, আনিছ টানিয়া ; ধন্য এ যতন !
নয়—নয় উন্মাদিনী কবির প্রতিভা ;
তিমিরপুঞ্জের কুঞ্জে যামিনী যেমনি
ফুটায় চন্দ্র-কুসুমে, তুমিও তেমনি
কবি-চিত্ত-অন্ধকারে ঢালিয়াছ বিভা !
চারিধারে কোলাহল শব্দের সাগরে।
ঘোরা তমস্বিনী নিশি, বহিছে ঝটিকা !—
কবি-চিত্ত-বেলাভূমে সৌন্দর্যের শিখা
কে জ্বালিল ? হে নারি, মোহিনী মূর্তি ধরে,
'শান্তি শান্তি' উচ্চারিলে !—আইল অমনি,
সাগর-সঙ্গমে মরি অর্ধ-সুরধুনী !
নিরানন্দে ছিল সখি প্রেমের নগরী .
ছিল না উৎসব ; যত ঐশ্বর্য-বিভব
ছিল গুপ্ত ; মালঞ্চের পুষ্পতরু সব
ছিল শুষ্ক ; নিদ্রামগ্ন যতেক সুন্দরী !
তুমি এলে একদিন রাজারাণী-প্রায়—
জাগিয়া উঠিল হর্ষে নিদ্রিত নগরী !
সে দিন কি ভুলিয়াছি ? ভোলা কি গো যায় ?
এস সখি, আজি তোমা অভিষেক করি !
ধর ধর ছত্রদণ্ড, রাজরাজেশ্বরী !—
বিপুল ভাবের রাজ্য, অদ্ভুত, বিরাট !
বিচিত্র-ফুল্ল-আলোকে তোরণ-কপাট
আলোকিত সিংহদ্বারে ; কল্পনা-অপ্সরী
বরষিছে লাজমুষ্টি ; গায় শতভাট
তোমার মঙ্গল-গীতি, হে বঙ্গ-সুন্দরি !

(অশোকগুচ্ছ, ১৯০০)

অহল্যা

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

(১)

কেন গো বাঁধিল মোরে বিবাহের ডোরে ?
অসহ বন্ধন !
কিবা সুখে সে সুখিনী পিঞ্জরের বিহগিনী ?
প্রমুক্ত গগন
বিস্তীর্ণ শ্যামল বন হেরি কাঁদে অনুক্ষণ ;
পীড়িত লোহের দণ্ডে পক্ষপুট তার ।
তবু নিত্য ব্যথা-মাথা ঝাপটে বাসনা-পাখা ;
বন্দিতে যুবতী-জনে একি কারাগার !

(২)

নিত্য যদি নব ঋতু না সাজাত তনু
ধরণী তোমার ,
মোহিনী বলিয়া তোরে কে দেখিত আঁখি ভোরে
কভু অনিবার ?
হ'তে কি সুন্দর তুমি পুষ্পময়ী বনভূমি ?
নিত্য নব নব ফুল না ফুটিলে হেসে ?
হে গগন, তব পটে কভু নীল শোভা ফোটে
বিজুলি-জড়িত ঘন কভু আসে ভেসে ।

(৩)

বিচিত্রতা নাহি যদি প্রেমের সম্ভোগে
সে কি সুখময় ?
নিত্য যদি নবোৎসবে মন্দির নাহিক শোভে,
আঁধার আলয় ।

জলাঞ্জলি দিয়া সাধে, বাসনা বিষাদে কাঁদে ;
যৌবন-মন্দির মম পূর্ণ তমিস্রায় ।
নির্মম পুরুষ-হৃদি, সৃজিল বিবাহবিধি,
দহিতে রমণীগণে শত যাতনায় ।

(৪)

ভাঙিয়া বালির বাঁধ, প্রেম-প্রবাহিনী,
বহে যা ছুটিয়া ।
মুক্তপথে একাকিনী উড়ে চিত্ত-বিহঙ্গিনী
পক্ষ বিধুনিয়া ।
মিথ্যা কথা, কুল, লাজ ; এস তুমি দেবরাজ !
তৃপ্ত কর ; ক্ষিপ্ত প্রাণ, নবভোগ আশে ।
যথা নব ফুল ফোটে, নব সমীরণ ছোটে,
এ নব যৌবন লয়ে যাব সেই দেশে ।

(সুরলহরী, ১৯০৭)

সাত

প্রেমধ্যান

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

প্রিয় পঞ্চবটী বনে চিত্র কুঞ্জ নিরঞ্জনে
কোথা সে নয়নানন্দ কহ গোদাবরি ?
সুখ-স্মৃতি-মাখা তব হৃদয়-পরশি রব ;
ঢাল গো তাপিত বক্ষে করুণা-লহরী ।
লতায় পাতায় ফুলে সরসীর শ্যাম কূলে,
গিরি-শিরে, তব নীরে, শুধু রাম নাম ;
আজি এই জনস্থানে ছায়া কাঁপে রাম-নামে,
করি সে নামের ধ্বনি পাপী গাহে গান ।

নিশ্বাসে শোণিতে মাথা— পরাণের বুকে আঁকা
প্রীতি যাঁর, ছবি যাঁর, কোথা সে দেবতা ?
নিত্য পূজি পাদ যাঁর ঢালি ভক্তি-অশ্রুধার
কোথা সে চরমগতি, প্রেমে মুক্তিদাতা !

ওই পুনঃ পম্পাসরে কলহংস গান করে,
গগনে বলাকা যেন তোরণে গ্রথিত ;
ওই রে আকাশ-গায় ক্রৌঞ্চ-গীতি ভেসে যায়
আনন্দে ময়ূর পুনঃ গাহে কেকাগীত।

প্রকৃতির প্রেম-পুরে, কার প্রাণ প্রেমে পূরে
কহিব প্রেমের কথা প্রেমের ইঙ্গিতে ?
কোক-বধূ যবে দুখে কাঁদিবে, কাহার বুকে
মুখ রাখি যাচিব সে রহিব ভাঙিতে ?

দীপ্তিহীন দুটি আঁখি আজি করপুটে ঢাকি
ধ্যান করি পদযুগ বিরলে বিজনে।
আজি শ্যাম চিত্রপটে আজি এ তটিনী-তটে
হে দেব ! প্রকাশ তনু জলদ-বরণে।

কে তুমি দুখিনী বালা ? সীতার মরম জালা
মর্মে অনুভবি, বল, কাঁদ অনিবার ?
এস দুঁহে গলা ধরি রাম নাম গান করি :
কাছে এস প্রিয় সখি বাসন্তি আমার।

ভারত চরণে যাঁর এ দাসী হৃদয়ে তাঁর :
আদরের আদরিণী আমি জান নাকি ?
প্রেমময় মোর স্বামী, প্রেমে ভাগ্যবতী আমি :
অভাগিনী নহি আমি, দুখিনী জানকী।

প্রাণে প্রাণ আছে গাঁথা, ভিন্ন নহে রামসীতা,
প্রজার রঞ্জনে দুঃখ কেন না সহিব ?
আত্ম-সুখ-অন্বেষণে না তুষি সন্ততিগণে,
অকলঙ্ক রাম নামে কলঙ্ক আনিব ?

কি দুঃখে দুখিনী সীতা, জান নাকি সেহি কথা ?
একাকিনী নহে সে যে গহনবাসিনী।
অযোধ্যার সিংহাসন, আজি যে গহন বন !
কি যে ব্যথা বুকে তাঁর জানে বিরহিণী।

চিরদিন মোর তরে সে কমল-আঁখি ঝরে,
এ দুঃখ কহিব কারে, সহিব কেমনে ?
কুশাগ্র বিঁধিলে পায় এবে বুক ফেটে যায় !
হায় রে সন্তাপে তাঁর রহিনু বিজনে !

কপোলে কপোল রাখি, আঁখি দিয়া আঁখি ঢাকি
আর কি তুষিতে তাঁরে পারিব কখন ?
এস দুঁহে গলা ধরি রাম নাম গান করি,
ধ্যান-ভরে, বুকে কোরে, সে রাঙা চরণ।

(ফুলশর, ১৯০৬)

অজ-বিলাপ

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

(১)

জাগ গো সখি ইন্দুমুখি,
কেন গো আঁখি মুদিলে ?
কহ কি ব্যথা লাগিল কোথা ?
কেন গো পড়ি ভূতলে ?
কুসুম-মালা আঘাতে বালা,
মুরছে যদি চেতনা,
উঠ গো ত্বরা, কঠোর ধরা
বাড়াবে আরো যাতনা !

জানি গো জানি অঙ্গখানি
কুসুম হতে সুকুমার ;
জানি গো ক্ষিতি কঠিন অতি,
ঝটিকা বাজে সমীরে তার।
কোমল রুচি প্রেমেতে রচি
আসন মম অন্তরে,
রাখিব এস ; হৃদয়ে বোসো ;
উঠহ প্রিয় জাগরে!

(২)

গৃহিণী মম সচিব মম
লক্ষ্মী সুখ-সম্পদে,
সহায় মম সঙ্গী মম—
ওগো ও সখি নর্মদে!
ডাকিছে তোরে আদর করে
সখীরা কত সাধিয়া,
ডাকিছে সবে করুণ রবে
পাখীরা হেথা কাঁদিয়া।
কাঁদিছে অলি কুসুম-কলি
বিষাদে পড়ে খসিয়া ;
শোক-বিনতা কাঁপিছে লতা,
সমীর কাঁদে শ্বসিয়া।
বেদনা-ভরে রোদন করে
প্রভাত দিবা যামিনী,
উপেখি সবে তুমি কি রবে
নীরবে তবু মানিনি?

(৩)

তটিনী-পারে ঝঙ্কারে
ক্রৌঞ্চ-সম বুঝিরে ;
এপারে আমি ওপারে তুমি,
ডাকিয়া দোঁহে খুঁজিবে!

আমার কথা পশে না তথা,
তোমারো কথা শুনি না ;
এ নিশা কবে প্রভাত হবে,
জানিনা ও গো জানিনা !
গরজি হারে অন্ধকারে
ঊর্মি ছোটে অকূলে—
ওপারে তুমি, এপারে আমি
ডাকিয়া কাঁদি আকুলে !
ভাসিয়া স্রোতে সিন্ধু-পথে
তরিয়া আমি যাব কি ?
জীবন-পারে আবার তোরে
পাব কি আমি পাব কি ?

স্বপ্নভঙ্গ, ১৯০৪)

মোহিনী

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

কেন গো গাহ ? আমি তো গান
শুনিতে চাহিনি ।
করুণ ওই গীতিতে
তরুণ হয় স্মৃতিতে
অতীত সুখ সহিত দুখ-কাহিনী ।
কণ্ঠ—গড়া ননীতে—
স্পন্দিত সে ধ্বনিতে ;
আঁখির কোণে নাচে সঘনে চাহনি ।
উরসে তুলি লহরী
বরষি রস-মাধুরী,
মথি' অধর বহেরে স্বর-বাহিনী ।

বিভল হ'য়ে চকিতে,
অতল কোন্ অতীতে
ডুবিয়া মরি, উঠিতে নারি, মোহিনি !
কেন গো গাহ ? আমি তো গান
শুনিতে চাহিনি।

(যজ্ঞভস্ম, ১৯০৪)

আমায় ভালবাসি

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

তোমায় ভালবাসিনেক', আমায় ভালবাসি !
বুকের পাষাণ, ঘাড়ের বোঝা,
তোমার উপর চাপিয়ে সোজা,
পথ চলিতে চাহি ব'সে, তোমার কাছে আসি,
তোমায় ভালবাসিনেক', আমায় ভালবাসি !

তোমার প্রীতির বনে তুলে কুসুম রাশি রাশি,
ফুলের মালা গলায় পরি ;
ভুলতে জ্বালা গলা ধরি,
করুণ চোখে চাইলে তুমি মুখে ফোটে হাসি।
তোমায় ভালবাসিনেক', আমায় ভালবাসি !

বিষাদ যখন ঘনিয়ে এসে বিশ্ব ফেলে গ্রাসি,
তখন তুমি ওগো বঁধু !
চুম্বনেতে ঢাল মধু ;
সেই অমৃতে বিষের জ্বালা নিঃশেষিয়ে নাশি।
তোমায় ভালবাসিনেক', আমায় ভালবাসি !

ভাঁটার টানে মৃত্যু-সিন্ধু পানে চলি ভাসি
আঁকড়ে ধরি তোমার চরণ,
তোমার পায়ে সঁপি মরণ,
তোমার দেওয়া জীবন-ভেলায় উজান বয়ে আসি।
তোমায় ভালবাসিনেক', আমায় ভালবাসি!

(হেঁয়ালি, ১৯১৫)

প্রেম-প্রতিমা

মুন্সী কায় কোবাদ

(১)

আমি দেখিতাম শুধু তারে!
মধুর চাঁদনীময়ী মধুরা যামিনী,
শশধর হাসিত অম্বরে।
সে তখন ধীরে ধীরে, এসে এই নদীতীরে,
গাইত প্রেমের গীত মাতায়ে ধরণী;
তাহার মধুর স্বরে মুকুতা পড়িত ঝরে
নীরবে বহিয়া যেত আকুলা তটিনী!
আমি দেখিতাম শুধু তারে!

(২)

সে আমার সুখে দুঃখে প্রাণের সঙ্গিনী!
তারি তরে বেঁচে আছি ভবে!
জীবন-জলধি-পাড়ে, আর কি পাইব তারে
এক দুই করে আমি মাসদিন গণি!
সে চাঁদ উঠে না আর, ঢালে না সে সুধা-ধার,
আমি তার সে আমার—শুধু এই জানি!
সে আসিবে কবে!

(৩)

তাহারি চরণ চুমি বনকমলিনী
ফুটিয়া উঠিত থরে থরে !
সে নিতি উন্মুক্ত কেশে, ফুলরাণী-বেশে এসে
দাঁড়াইয়া এই সরঃতীরে
গাইত প্রেমের গান, আকুল করিয়া প্রাণ
বিহগ শিখিত সেই প্রেমের রাগিণী ।
আমি দেখিতাম শুধু তারে ।

(৪)

সে সদা কুসুম-সাজে এলাইয়া বেণী
আমার এ প্রাণ নিত কেড়ে !
চারিধারে পুষ্প-তরু, বায়ু ব'ত ঝুরু ঝুরু
কোকিল তুলিত কত কুহু কুহু ধ্বনি !
হেরি তার রূপরাশি, হেরি তার প্রেমহাসি,
পাপিয়া আকুল প্রাণে হ'ত পাগলিনী
আমি দেখিতাম শুধু তারে !

(৫)

তাহারি রূপের ছটা উজলি ধরণী
ঝরিয়া পড়িত চারি ধারে !
আকাশে চন্দ্রমা-তারা, তারি প্রেমে মাতোয়ারা
নয়নে খেলিত তার চঞ্চলা দামিনী !
বুকেতে অমৃত-খনি কণ্ঠে সুধা-নির্ঝরিণী
সৌন্দর্য-সরসে সে যে ফুটন্ত নলিনী !
আমি দেখিতাম শুধু তারে !

(অশ্রুমালা, ১৮৯৭)

কে তুমি ?

মুন্সী কায়কোবাদ

(১)

কে তুমি ?—কে তুমি ?
ওগো প্রাণময়ি,
কে তুমি রমণী-মণি !
তুমি কি আমার, হৃদি-পুষ্প-হার
প্রেমের অমিয় খনি !
কে তুমি রমণী-মণি ?

(২)

কে তুমি ?—
তুমি কি চম্পক-কলি ?
গোলাপ মতিয়া বেলী ?
তুমি কি মল্লিকা যূথী ফুল্ল কুমুদিনী ?
সৌন্দর্যের সুধাসিন্ধু,
শরতের পূর্ণ ইন্দু
আঁধার জীবন-মাঝে পূর্ণিমা রজনী !
কে তুমি রমণী-মণি ?

(৩)

কে তুমি ?—
তুমি কি সন্ধ্যার তারা, সুধাংশুর সুধা-ধারা
পারিজাত পুষ্প-কলি
বিশ্ব-বিমোহিনী
অথবা শিশির-স্নাতা, অর্ধস্ফুট, অনাঘ্রাতা
প্রণয়-পীযূষভরা,
সোনার নলিনী !
কে তুমি রমণী-মণি ?

(৪)

কে তুমি ?—

কে তুমি বসন্ত-বালা, অথবা প্রেমের ডালা,

প্রাণের নিভৃত কুঞ্জে

সুধা-নির্ঝরিণী !

অথবা প্রেমাশ্রু-ধারা, শোকে দুঃখে আত্মহারা

প্রেমের অতীত স্মৃতি,

বিধবা রমণী !

কে তুমি রমণী-মণি ?

(৫)

কে তুমি ?—

তুমি কি আমার সেই

হৃদয়-মোহিনী ?

সেই যদি,—কেন দূরে ? এস, এই হৃদি-পুরে

এস' প্রিয়ে প্রাণময়ি,

এস' সুহাসিনি !

এস' যাই সেই দেশে,—ফুল ফুটে চাঁদ হাসে

দয়েলা কোয়েলা গায়

প্রাণের রাগিণী !

জরা নাই—মৃত্যু নাই, প্রণয়ে কলঙ্ক নাই

চল যাই সেই দেশে

এস' সোহাগিনী !

কে তুমি রমণী-মণি ?

(অশ্রুমালা, ১৮৯৪)

প্রেমের স্মৃতি

মুন্সী কায়কোবাদ

কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে?
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ হৃদি করি খান্ খান্
জনমের মত যারে
গিয়াছিনু ভুলে!
কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে?

সেই মুখ—সেই হাসি, সে অতুল রূপরাশি,
প্রাণের অধিক ভাল
বেসেছিনু যারে!
কেমনে ভুলিব আমি তারে?

সে মোর হৃদয় মণি, সে মোর প্রেমের খনি,
সে বিনে কেমনে আমি
র'ব ধরাতলে!
সে বা কোথা আমি কোথা, এ জনম গেল বৃথা,
বসে বসে কাঁদি আমি
তটিনীর কূলে!
কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে?

যেই ভালবাসে যারে, সে যদি না পায় তারে,
বৃথা যে জনম তার
ধিক্ নরকুলে!
এমন বিধান যার, দয়া মায়া নাই তার
চাইনে এমন জন্ম
পাপ ধরাতলে!
কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে?

স্বার্থপর দেশাচার কেড়ে মোর কণ্ঠ-হার
পরায়ে দিয়াছে হায়
অপরের গলে !
তারি স্মৃতি বুকে ধরি, দিন রাত কেঁদে মরি,
আর কি পাইব তারে
জীবনের কূলে !
কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে ?

এ প্রাণের কত কথা, এ প্রাণের কত ব্যথা,
চাপিয়া রেখেছি আমি
হৃদয়ের মূলে !
প্রাণ ভরা ভালবাসা, প্রাণ ভরা কত আশা
নারিনু জানাতে তারে
এ হৃদয় খুলে !
কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে ?

জগৎ ভরিয়া তায় দেখি আমি হায় হায়
তাহারি মুখের জ্যোতিঃ
গগনে ভূতলে !
কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে ?

সমীরে তাহারি শ্বাস, গোলাপে তাহারি বাস,
দেহের বরণ তার
চম্পকের ফুলে !
অধরে পীযূষ ভরা, আঁখি দুটি মনোহরা
প্রেমের প্রতিমা সে যে
অবনী মণ্ডলে !
কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে ?

মনে করি ভুলে যাই, ভুলিলেও সুখ নাই
অশান্ত হৃদয় মোর
ভাসে আঁখি জলে !
নক্ষত্রে তাহারি হাসি, চাঁদে তার রূপরাশি
তারি মুখ দেখি আমি
ফুলে ও মুকুলে !
কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে ?

(অশ্রুমালা, ১৮৯৪)

প্রণয়ের প্রথম চুম্বন

মুন্সী কায়কোবাদ

(১)

মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন !
যবে তুমি মুক্ত কেশে,
ফুলরাণী বেশে এসে,
করেছিলে মোরে প্রিয় স্নেহ-আলিঙ্গন !
মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন ?

(২)

প্রথম চুম্বন !
মানব জীবনে আহা শান্তি-প্রস্রবণ !
কত প্রেম কত আশা,
কত স্নেহ ভালবাসা,
বিরাজে তাহায়, সে যে অপার্থিব ধন
মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন !

(৩)

হায় সে চুম্বনে
কত সুখ দুঃখে কত অশ্রু বরিষণ !
কত হাসি কত ব্যথা,
আকুলতা, ব্যাকুলতা,
প্রাণে প্রাণে কত কথা, কত সম্ভাষণ !
মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন !

(৪)

সে চুম্বন, আলিঙ্গন, প্রেম-সম্ভাষণ,
অতৃপ্ত হৃদয় মূলে
ভীষণ ঝটিকা তুলে,
উন্মত্ততা, মাদকতা ভরা অনুক্ষণ,
মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন !

(অশ্রুমালা, ১৮৯৪)

বিদায়ের শেষ চুম্বন

মুন্সী কায়কোবাদ

(১)

আবার, আবার সেই বিদায়-চুম্বন,
আলেয়ার আলোপ্রায়,
আঁধারে ডুবায়ে যায়,
স্মৃতিটি রাখিয়া হায় করিতে দাহন !

(২)

বিদায়-চুম্বন,
উভয়েরি প্রাণে করে অগ্নি বরিষণ,
উভয়ে উভয় তরে,
আকুলি ব্যাকুলি করে,
উভয়েরি হৃদিস্তরে যাতনা ভীষণ !
এমনি কঠোর হায় বিদায়-চুম্বন !

(৩)

প্রণয়ের মধুমাখা প্রথম চুম্বনে,
শুধু সুখ সমুল্লাস,
এতে ঘন হাহুতাশ,
কেবলি যে বহে হায় উভয়েরি মনে !

(৪)

সে চুম্বনে এ চুম্বনে কি দিব তুলনা,
সে স্বর্গের পরিমল,
এ মর্ত্ত্যের হলাহল,
তাহাতে উল্লাস, এতে কেবলি যাতনা !

(৫)

সে যে শরতের স্নিগ্ধ সুধাংশু-কিরণ,
মুহূর্ত্তে মাতায় ধরা,
এযে শুধু ক্লেশ-ভরা
বৈশাখের ঘন ঘোর ঝটিকা ভীষণ !

(অশ্রুমালা, ১৮৯৪)

রূপ

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

উছলিছে রূপরাশি লাবণ্য-সাগরে,
কূলে কূলে উছলিছে যৌবনের জল ;
তনুতে তরঙ্গমালা সাজে থরে থরে ;
অঙ্গের পূর্ণরূপ হয়েছে চঞ্চল ।
কপোলে তরঙ্গ দোলে চিবুকে খেলায়,
সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে নয়নে ঠেকিয়ে,
উচ্ছ্বসিয়ে ওঠে যেন হৃদয়-দোলায়
শব্দহীন কলস্বর ঘিরিয়ে ঘিরিয়ে ;

উদ্বেলিয়া স্নেহসীমা ভেঙ্গে ফেলে কূল
ব্যাপ্ত হতে চাহে যেন বিশ্ব চরাচরে ;
ত্রিজগতে আছে যত অস্ফুট মুকুল
ফুটাবারে চাহে সবে চাপিয়া অধরে ;
যাচিয়া জগতে দিবে প্রেম-আলিঙ্গন,
রূপের শীতল জলে জুড়াবে যাতন।

(স্বপনসঙ্গীত, ১৮৮২)

আয় রে বসন্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

আয় রে বসন্ত তোর এ
কিরণ-মাখা পাখা তুলে।
নিয়ে আয় তোর কোকিল পাখির
গানের পাতা গানের দলে।

বলে—পড়ি প্রেমফাঁদে
তারা সব হাসে কাঁদে ;—
আমি শুধু কুড়ই হাসি—
সুখনদীর উপকূলে।

জানি না ত দুখ কিসে,
চাহি না প্রেমের বিষে,
আমি বনে বেড়িয়ে বেড়াই,
নাচি গাই রে প্রাণ খুলে।

নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি,
তারার কিরণ, চাঁদের হাসি,
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়
উড়িয়ে দে মোর এলোচুলে।

(আর্য্যগাথা, ১৮৮২)

ভালবাসিব লো তারে

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ভালবাসিব লো তারে সেও যদি ভালবাসে,
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে।
কি দৈবগুণে, কে জানে, তারি পায়ে বাঁধা প্রাণ এ;
দিয়েছি কি ছার প্রাণ সে হৃদিরতন-আশে;
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে।
ফিরে কি লো যায় উষা ধরণী না চায় যদি,
সাগর চাহে না বলি ফিরে কি লো যায় নদী;
প্রেম লো আত্মার গান, প্রেম লো প্রাণের প্রাণ,
প্রেম কি লো বাঁধা কারো আদেশ কি অভিলাষে,
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে।

(আর্যগাথা, ১৮৮২)

দাঁড়াও

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দাঁড়াও সুন্দরি! চক্ষের সম্মুখে, ছায়াবাজিপ্রায়,
এই বিবর্তিত ব্রহ্মাণ্ড জগৎ এসে চ'লে যায়;
তার মাঝে তুমি দাঁড়াও সুন্দরি!
একবার দেখি দুটি নেত্র ভরি',
প্রেমের প্রতিমা, প্রিয়ে, প্রাণেশ্বরি!—
দাঁড়াও হেথায়।
আমি তরঙ্গিত আবর্তসঙ্কুল উন্মত্ত জলধি,
উচ্ছৃঙ্খল:—করি তোমারে সতত নিপীড়ন যদি;
তুমি স্নেহশ্যামা ধরিত্রী!—নীরব,
সহ্য কর; বক্ষ প্রসারিয়া, সব
লাঞ্ছনা, ও অপমান, উপদ্রব,
সহ নিরবধি

নিষ্ঠুর সংসার স্বার্থপর,—স্বার্থে নিমগ্ন থাকুক ;
তুমি দাও প্রেম, তুমি দাও শান্তি, স্নেহ, এতটুক ;
শুধু অবসাদে, এস মাথা রাখি
এ কোমল অঙ্কে ; এস চেয়ে থাকি
এ আনত নেত্রে ;—তুমিই একাকী
ফিরায়ো না মুখ।
সব দুঃখ হ'তে, সব পাপ হ'তে, অন্তর ফিরাই
তোমা পানে যেন ; সেথা যেন সদা তোমারেই পাই।
তব ব্রত হোক, প্রীতি-পুণ্যভরা,
ওগো শান্তিময়ি, ওগো শ্রান্তিহরা—
শুধু ভালবাসা, শুধু সহ্য করা,
নীরবে সদাই।
যত অপরাধ, যত অত্যাচার, যাহা করি নাক',
সব কর ক্ষমা ; হাস্যমুখে দেবি ! তুমি চেয়ে থাক।
পাতকী নারকী আমি যদি হই,
তবু ভালবাস তুমি প্রেমময়ি !
এ অধমে তবু সোহাগে চুম্বয়ি'
বুকে ক'রে রাখ !
(মন্দ্র, ১৯০২)

মোহিনী

মানকুমারী বসু

(১)

কেন যে এ দশা তার সে তা' জানে না,
চাহিলে মুখের পানে আঁখি তোলে না ;
মুখখানি রাঙা রাঙা,
কথা বলে ভাঙা ভাঙা,
কত বলি "সর্ সর্" তবু সরে না,
কেমন সে হতভাগী, কিছু বোঝে না।

(২)

সকালে গোলাপ ফোটে বন উজলি,
সে এসে দাঁড়ায় আগে সোহাগে গলি,
দেখি তার মুখে চেয়ে,
হাসি পড়ে বেয়ে বেয়ে,
কচি হাতে তোলে কত কুসুম-কলি!—
দেখিলে সে ফুল-তোলা ভুলি সকলি।

(৩)

বাসন্ত বিকালবেলা মৃদু বাতাসে,
তারি ছবিখান কেন পরাণে ভাসে?
শরত-চাঁদেরে চেয়ে,
সে কেন গো থাকে চেয়ে,
শুকতারা-রূপে কভু নীল আকাশে,
কেন সে মরমে সদা সনায়ে আসে?

(৪)

যতবার উপেক্ষিয়া গিয়াছি চলে,
ততবার এসেছে সে "আমার" বলে!—
সে মধুর সুধা-স্বরে,
পরাণ দিয়েছে পূরে,
পদে বাধা, আঁখি বাঁধা, চরণ টলে,
তাই ফিরিয়াছি তারে "আমারি" বলে।

(৫)

কি মোহিনী মায়া যে সে তা ত জানিনে,
ছেড়ে যেতে চাহি ভুলে—তাও পারিনে,
উপেক্ষিতে গিয়ে তা'য়,
প্রাণ ফেটে চুরে যায়,
পাছে অশ্রু হেরি তার আঁখি-নলিনে!
কি বাঁধনে বেঁধেছে সে কিছু জানিনে।

(কনকাঞ্জলি, ১৮৯৬)

মৃত্যু-সুহৃৎ

মানকুমারী বসু

(১)

আমি দেখিয়াছি তারে ফুলমালা গলে,
বসন্তের নব হাসি
উল্লাসে উঠিছে ভাসি,
মল্লিকা-মালতী-জাতী খোপা খোপা দোলে;
অঙ্গের সৌরভ তার
তুলনা মিলে না আর,
নন্দনে মন্দার মরি! প্রাণ-মন ভোলে!
আমি দেখিয়াছি তারে ফুলমালা গলে।

(২)

আমি দেখিয়াছি তারে মলয়-বাতাস,
তেমনি মধুর ছটা!
তেমনি আনন্দ-ঘটা,
পরাণে তেমনি ক'রে মাখায় উল্লাস;
অতি ধীরে অতি ধীরে
হেসে তোষে চলে ফিরে,
অনন্তে ছুটিতে চালে অমৃত-উচ্ছ্বাস,
আমি দেখিয়াছি সে তো মলয়-বাতাস!

(৩)

আমি দেখিয়াছি তারে শরদের শশী,
শারদ চাঁদের মত
তারও জোছনা কত।
হাসিয়া মধুরতর সেও পড়ে খসি;

ফুটায়ে বনের ফুল,
উছলি নদীর কূল
জীবন-মেঘের পাশে সেও থাকে বসি,
আমি দেখিয়াছি তারে শরদের শশী।

(৪)

আমি দেখিয়াছি তারে পূরবী রাগিণী,
সে যখন জাগে যন্ত্রে,
কি জানি কি মোহ-মন্ত্রে—
নিচল নিথর চিত ঘুমায় অমনি ;
সে যেন মধুর ঊষা,
সে যেন দেবের ভূষা,
সে যেন সুখের সাধ, সোহাগের খনি !
আমি দেখিয়াছি সে তো পূরবী রাগিণী !

(৫)

আমি দেখিয়াছি তারে মধুরতাময়,
মমতা মাখান প্রাণ,
মুখে মমতার গান,
বড় আদরের কথা কানে কানে কয় ;
কাছে গেলে মিঠা হাসে,
আদরে ডেকে নেয় পাশে—
কেমন কেমন যেন প্রাণ কেড়ে লয়,
আমি দেখিয়াছি তারে মধুরতাময় !

(৬)

আমি দেখিয়াছি তারে মহাযোগে রত,
সে এক জলন্ত যোগী,
সুখভোগে নহে ভোগী ;
পোড়ায়েছে নেত্রানলে পাপ রিপু যত ;
আশা তার পরমার্থ,
কোথা কিছু নাহি স্বার্থ,

বিশ্বপ্রাণ-ধ্যানে যেন আছে অবিরত,
দেখেছি সে পুণ্যময়ে মহাদেব মত !

(৭)

নিষ্কাম সন্ন্যাসী সে যে এ মর-ধরায়,
তারে তো চেনে না কেহ,
করে না আদর স্নেহ,
"আপদ বালাই" ব'লে ফিরে নাহি চায় ,
শত ঘৃণা শত রাগে
তার হিংসা নাহি জাগে,
সব অত্যাচার সে তো হাসিয়া উড়ায়,
অথচ সে মহাবীর
ভাঙে ভবের শর,
দু'দণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড-নাশ তার ক্ষমতায়,
দু'হাতে সে ভালবাসা জগতে বিলায় ।

(৮)

আমি তারে চিনি-শুনি, ভালবাসি তায়,
শুনিলে তাহারি নাম,
উথলে হৃদয়ধাম,
পরাণ শিহরি উঠে সুধা পড়ে গায় ,
এক দিন দূরে—দূরে,
অনন্তে অমরপুরে—
নিয়ে যা'ব সে আমারে, কয়েছে আমায় :
সে আমার কাছে কাছে,
দিন রাত সদা আছে,
পরাণে বেঁধেছি পাছে ফেলে চ'লে যায়,
তার নাম "মৃত্যু" আমি ভালবাসি তায় ।

(কাব্যকুসুমাঞ্জলি, ১৮৯৩)

সখী

মানকুমারী বসু

যারে আমি "মোর" বলি,
　　সেই নাহি আসে কাছে,
তাই ভয় করে, সখি!
　　তুমি ফাঁকি দাও পাছে!
এখনো রয়েছি বেঁচে
　　ওই মুখ-পানে চেয়ে
এ দেহে শোণিত বহে
　　তোমারি বাতাস পেয়ে।
হৃদয়ে দেবতা তুমি,
　　কর্মের উৎসাহ বল,
সুখের উৎসব মম,
　　বিষাদের আরাম-স্থল;
এই ভিক্ষা মাগি তোরে
　　দু'খানি চরণ ধরি,
হৃদয়ে জাগিয়া থাক্
　　এ আঁধার আলো করি!
নিশায় হাসিবে শশী
　　খুলি যবে চন্দ্রানন,
স্বরগ-অমিয় নিয়ে
　　বহি যাবে সমীরণ;
প্রকৃতি মাণিক-ফুলে
　　সাজাবে গগন-ডালা,
জ্বালাইবে দিগঙ্গনা
　　উজল-আলোক-মালা;

নীরব নির্জন পুরী

স্তিমিত আলোক-রেখা,

সংসারের অগোচরে

তুমি আমি র'ব একা!

ধীরে ধীরে মহানিদ্রা

নয়নে আসিবে মম,

দেখিব পরাণ ভরি

ও আনন নিরুপম!

ঢলিয়া পড়িব যবে,

তোরি কোলে মাথা র'বে,

বল দেখি, সোনামুখি!

এ কপালে তা'কি হবে?

(কনকাঞ্জলি, ১৮৯৬)

কর'না জিজ্ঞাসা

কামিনী রায়

(১)

মোরে প্রিয় কর'না জিজ্ঞাসা,

সুখে আমি আছি কিনা আছি।

হরি আমি রসনার ভাষা;

দোঁহে যবে এত কাছাকাছি,

মাঝখানে ভাষা কেন চাই;

বুঝাবার আর কিছু নাই?

হাত মোর বাঁধা তব হাতে,

শ্রান্ত শির তব স্কন্ধোপরি,

জানিনা এ সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যাতে

অশ্রু যেন ওঠে আঁখি ভরি।

দুঃখ নয়, ইহা দুঃখ নয়,
এইটুকু জানিও নিশ্চয়।
নীলাকাশে ফুটিতেছে তারা,
জাতী যূথী, পল্লব হরিতে ;
অতি শুভ্র, অত্যুজ্জ্বল যারা
আসে চলি আঁধার তরীতে।
ভেসে আজ নয়নের জলে
কি আসিছে, কে আমাদের বলে ?

(২)

সুখ সে কেমন যাদুকর,
তাকাইলে হয় অন্তর্ধান,
ডাকিলে সে দেয়না উত্তর,
চাহিলে সে করেনা তো দান।
দুঃখ যে হইলে অতীত
সুখ বলি হয় গো প্রতীত!
সুখ সাথে আছে, কি না আছে,
কোন নাই প্রশ্ন মীমাংসার,
চলিছে সে পার্শ্বে কিবা পাছে ;
সুখ দুঃখ চেনা বড় ভার ;
আমরা দুজনে দু'জনার,
পিছে পাশে দৃষ্টি কেন আর ?
ওগো প্রিয়, মোর মনে হয়,
প্রেম যদি থাকে মাঝখানে,
আনন্দ সে দূরে নাহি রয়।
প্রাণ যবে মিলে যায় প্রাণে,
সঙ্গীতে আলোকে পায় লয়,
যত ভয়, যতেক সংশয়।

(মালা ও নির্মাল্য, ১৯১৩)

কর্তব্যের অন্তরায়

কামিনী রায়

কে তুমি দাঁড়ায়ে কর্তব্যের পথে,
সময় হরিছ মোর ;
কে তুমি আমার জীবন ঘিরিয়া
জড়ালে স্নেহের ডোর,
চির-নিদ্রাহীন নয়নে আমার
আনিছ ঘুমের ঘোর ?
দু'নয়ন হ'তে দূরন্ত আলোকে
কেন কর অন্তরাল ?
কেমনে লভিব লক্ষ্য জীবনের
পথে কাটাইলে কাল ?
আমার রয়েছে কঠোর সাধনা,
ফেল না মায়ার জাল।
তোমারে দেখিলে গত অনাগত
যাই একেবারে ভুলে,
মুগ্ধ হিয়া মম চাহে লুটাইতে
তোমার চরণ-মূলে,
ফেলে যাও তারে, দলে যাও তারে,
নিওনা, নিওনা তু'লে।
তোমার মমতা অকল্যাণময়ী,
তোমার প্রণয় ক্রূর,
যদি লয়ে যায় ভুলাইয়া পথ,
লয়ে যাবে কত দূর ?
এই স্বপ্নাবেশ রহিবার নয়,
চলে যাও হে নিষ্ঠুর।

(মাল্য ও নির্মাল্য, ১৯১৩)

পুষ্প-প্রভঞ্জন

কামিনী রায়

লঙ্ঘি কোন্ সাগর উত্তাল,
এলে তুমি ভীম প্রভঞ্জন,
ঘন কৃষ্ণ মেঘ-জটা-জাল
আবরিছে অদৃশ্য আনন ;
বিদ্যুৎ হানিছে দৃষ্টি তব,
অশনি কহিছে রোষ বাক্,
আজ আমি নতশিরে রব,
ওষ্ঠাধর আজ রুদ্ধ থাক।
আছাড়ি, আস্ফালি, চূর্ণ করি,
শ্রান্ত হয়ে করিবে শয়ন,
নিদ্রা শেষে শান্ত রূপ ধরি
সম্ভাষিবে প্রসন্ন নয়ন।
চুমা দিবে আমার আঁখিতে,
দুলাইবে চূর্ণালকগুলি,
হাসি আমি নারিব ঢাকিতে,
অধর আপনি যাবে খুলি।
আপনি আসিবে বাহিরিয়া
হৃদয়ের নিভৃত সুবাস,
তুমি মোরে ঘিরিয়া ঘিরিয়া
ফেলিবে অতৃপ্ত দীর্ঘশ্বাস।
কাল দিব রূপ গন্ধ রস,
মেঘ বৃষ্টি হইলে অতীত,
অরূপের মৃদুল পরশ
আমারে করিবে পুলকিত।

(মাল্য ও নির্মাল্য, ১৯১৩)

চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ

কামিনী রায়

অন্ধকার মরণের ছায়
কতকাল প্রণয়ী ঘুমায়?—
চন্দ্রাপীড়, জাগ এইবার।
বসন্তের বেলা চলে যায়,
বিহগেরা সান্ধ্যগীত গায়,
প্রিয়া তব মুছে অশ্রুধার।
মাস, বর্ষ হ'ল অবসান,
আশা-বাঁধা ভগ্ন পরাণ
নয়নেরে করেছে শাসন,
কোনদিন ফেলি অশ্রুজল,
করিবে না প্রিয়-অমঙ্গল—
এই তার আছিল যে পণ।
আজি ফুল মলয়জ দিয়া,
শুভ্র-দেহা, শুভ্রতর হিয়া,
পূজিয়াছে প্রণয়ের দেবে;
নবীভূত আশারাশি তার,
অশ্রুমালা শোনে নাকো আর—
চন্দ্রাপীড়, মেল আঁখি এবে।
দেখ চেয়ে, সিতোৎপল দুটি
তোমা পানে রহিয়াছে ফুটি,
যেন সেই নেত্র-পথ দিয়া,
জীবন, তেয়াগি নিজ কায়,
তোমারি অন্তরে যেতে চায়—
তাই হোক্, উঠ গো বাঁচিয়া।
প্রণয় সে আত্মার চেতন,
জীবনের জনম নূতন,
মরণের মরণ সেথায়।

চন্দ্রাপীড়, ঘুমা'ও না আর—
কানে প্রাণে কে কহিল তার,
আঁখি মেলি চন্দ্রাপীড় চায়।
মৃত্যু-মোহ অই ভেঙ্গে যায়,
স্বপ্ন তার চেতনে মিশায়,
চারি নেত্রে শুভ দরশন
একদৃষ্টে কাদম্বরী চায়,
নিমেষ ফেলিতে ভয় পায়—
"এতো স্বপ্ন—নহে জাগরণ।"
নয়ন ফিরাতে ভয় পায়,
এ স্বপন পাছে ভেঙ্গে যায়,
প্রাণ যেন উঠে উথলিয়া।
আঁখি দুটি মুখ চেয়ে থাক,
জীবন স্বপন হয়ে যাক,
অতীতের বেদনা ভুলিয়া।
"আধেক স্বপনে, প্রিয়ে,
কাটিয়া গিয়াছে নিশি,
মধুর আধেক আর
জাগরণে আছে মিশি ;
"আঁধারে মুদিনু আঁখি
আলোকে মেলিনু তায়
মরণের অবসানে
জীবন জনম প্রায়।"
"জীবন ?—জীবন, প্রিয় ?
নহি স্বপনের মোহ ?
মরণের কোন্ তীরে
অবতীর্ণ আজি দোঁহে ?"

(আলো ও ছায়া, ১৮৮৯

সে কি ?

কামিনী রায়

"প্রণয় ?"

"ছি !"

"ভালবাসা—প্রেম ?"

"তাও নয় ।"

"সে কি তবে ?"

"দিও নাম, দিষ্ট পরিচয়—

আসক্তিবিহীন শুদ্ধ ঘন অনুরাগ,
আনন্দ সে নাহি তাহে পৃথিবীর দাগ ;
আছে গভীরতা তার উদ্বেল উচ্ছ্বাস,
দু'ধারে সংযম-বেলা, ঊর্ধ্বে নীলাকাশ,
উজ্জ্বল কৌমুদীতলে অনাবৃত প্রাণ,
বিম্ব প্রতিবিম্ব কার প্রাণে অধিষ্ঠান ;
ধরার মাঝারে থাকি ধরা ভুলে যাওয়া,
উন্নত-কামনা-ভরে ঊর্ধ্ব দিকে চাওয়া ;
পবিত্র পরশে যার, মলিন হৃদয়,
আপনাতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবালয়,
ভকতি বিহ্বল, প্রিয় দেব-প্রতিমারে
প্রণমিয়া দূরে রহে, নারে ছুঁইবারে ;
আলোকের আলিঙ্গনে, আঁধারের মত,
বাসনা হারায়ে যায়, দুঃখ পরাহত ;
জীবন কবিতা-গীতি, নহে আর্তনাদ,
চঞ্চল নিরাশা, আশা, হর্ষ, অবসাদ ।
আপনার বিকাইয়া আপনাতে বাস,
আত্মার বিস্তার ছিঁড়ি ধরণীর পাশ ।
হৃদয়-মাধুরী সেই, পুণ্য তেজোময়,
সে কি তোমাদের প্রেম ?—কখনই নয় !

শত মুখে উচ্চারিত, কত অর্থ যার,
সে নাম দিওনা এরে মিনতি আমার।"

(আলো ও ছায়া, ১৮৮৯)

মুগ্ধ প্রণয়

কামিনী রায়

সে কি কথা—যারে চেয়েছিলে
পাও নাই সন্ধান তাহার ?
কারে বলে' কার গলে দিলে
প্রণয়ের পারিজাত হার ?
মুগ্ধ নর ; আঁখি ছলে মন ;
কল্পনা সে বাস্তবের ছায় ;
চারু মূর্তি করিয়া গঠন,
শিল্পী ভাল বেসেছিল তায়।
স্বরচিত প্রতিমার তরে
উন্মত্ত হইল যবে প্রাণ,
দেবতারে কহিল কাতরে—
পাষাণে জীবন কর দান ;
প্রেমময় বিধাতার বরে
সে বাসনা পূর্ণ হ'ল তার—
অনুভূতি কঠোর প্রস্তরে,
প্রতিমায় জীবন-সঞ্চার।
পাষাণের প্রতিমাটি যবে
প্রাণময়ী নারীরূপ ধরে,
নারী তবে পারেনা কি তবে
দেবী হ'তে বিধাতার বরে ?

(আলো ও ছায়া, ১৮৮৯)

প্রণয়ে ব্যথা

কামিনী রায়

কেন যন্ত্রণার কথা, কেন নিরাশার ব্যথা,
জড়িত রহিল ভবে ভালবাসা সাথে ?
কেন এত হাহাকার, এত ঝরে অশ্রু ধার ?
কেন কণ্টকের কূপ প্রণয়ের পথে ?

বিস্তীর্ণ প্রান্তর মাঝে প্রাণ এক যবে খোঁজে
আকুল ব্যাকুল হয়ে সাথী একজন,
ভ্রমি বহু, অতি দূরে পায় যবে দেখিবারে
একটি পথিক-প্রাণ মনেরি মতন ,—

তখন, তখন তারে নিয়তি কেনরে বারে,
কেন না মিশাতে দেয় দুইটি জীবন ?
অনুল্লঙ্ঘ্য বাধারাশি সম্মুখে দাঁড়ায় আসি—
কেন দুই দিকে আহা যায় দুইজন ?

অথবা, একটি প্রাণ আপনারে করে দান—
আপনারে দেয় ফেলে' অপরের পায় :
সে না বারেকের তরে ভুলেও ভ্রূক্ষেপ করে,
সবলে চরণতলে দলে' চলে' যায় ।

নৈরাশপূরিত ভবে শুভযুগ কবে হবে,
একটি প্রাণের তরে আর একটি প্রাণ
কাঁদিবে না সারা পথে ;— এ[illegible] মনোরথে
স্বর্গমর্ত্যে কেহ নাহি দিবে বাধা দান ?

(আলো ও ছায়া, ১৮৮৯)

স্বপ্ন-রাণী

অক্ষয়কুমার বড়াল

ঘুমন্ত চাঁদের বুক হতে,
ভেসে ভেসে জোছনার স্রোতে,
মুক্ত বাতায়ন দিয়া, তরাসে কম্পিত-হিয়া,
আসি, প্রিয়, তোমায় দেখিতে !

ধীরে পড়ে বায়ুর নিঃশ্বাস,
মৃদু কাঁপে ফুলের সুবাস ;
ছোট ছোট তারাগুলি ঘুমে পড়ে ঢুলি' ঢুলি',
কাঁপে চোখে সরমের হাস।
নদী-পারে ডাকে পাখী আধ-ঘুমে থাকি' থাকি',
কুল্-কুল্ নদী বহে' যায় ;
তীরে তীরে তরু-কোলে কুসুমিতা লতা দোলে,
জগৎ ঘুমায়।
আসি, প্রিয়, দেখিতে তোমায় !

যখন গো হৃদয় ঘুমায়—
বাসনা ঘটনা যত, সমীরে সুরভি মত
নীরবে স্মৃতিতে মিশে যায় ;
ভাসা-ভাসা কথা শত, নদীতে ঢে'য়ের মত,
হেথা-হোথা ভাসিয়া বেড়ায় ;
কে আপন, কেবা পর, কাহারে করিবে ডর—
হৃদয় বুঝিতে নাহি চায়।
স্বপনের মত হ'য়ে, হাতে প্রেম-মালা ল'য়ে
আসি, প্রিয়, দেখিতে তোমায় !

আসি, প্রিয়, দেখিতে তোমায়।
যাই—যাই, নাহি বল, চোখে 'ভরে' আসে জল,
হৃদয় কাঁপিয়া উঠে সন্দেহে লজ্জায়।
আর বার মনে হয়,— কেন লজ্জা, কেন ভয় ?
নয়নে লিখিয়া দেই অলক্ষ্য চুম্বনে,—
যে প্রেম ফুটে না কভু নারীর বচনে !

(কনকাঞ্জলি, ১৮৮৫)

শত নাগিনীর পাকে

অক্ষয়কুমার বড়াল

শত নাগিনীর পাকে বাঁধ' বাহু দিয়া
পাকে পাকে ভেঙ্গে যাক্ এ মোর শরীর !
এ রুদ্ধ পঞ্জর হ'তে হৃদয় অধীর
পড়ুক ঝাঁপায়ে তব সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া !
হেরিয়া পূর্ণিমা-শশী—টুটিয়া লুটিয়া
ক্ষুভিয়া প্লাবিয়া যথা সমুদ্র অস্থির ;
বসন্তে—বনান্তে যথা দুরন্ত সমীর
সারা ফুলবন দলি' নহে তৃপ্ত হিয়া।

এ দেহ—পাষাণ-ভার কর গো অন্তর !
হৃদয়-গোমুখী-মাঝে প্রেম-ভাগীরথী,
ক্ষুদ্র অন্ধ পরিসরে ভ্রমি' নিরন্তর
হতেছে বিকৃত ক্রমে, অপবিত্র অতি।
আলোকে-পুলকে ঝরি, তুলি' কলস্বর
করুক তোমারে চির স্নিগ্ধ-শুদ্ধমতি !

(কনকাঞ্জলি, ১৮৮৫)

হৃদয় সমুদ্র সম

অক্ষয়কুমার বড়াল

হৃদয় সমুদ্র সম আকুলি উচ্ছ্বসি'
আছাড়ি' পড়িছে আসি' তব রূপকূলে।
হৃদয়—পাষাণ-দ্বার দাও—দাও খুলে'।
চিরজন্ম লুটিব কি ও পদ পরশি'?
অনুদিন—অনুক্ষণ দুরাশায় শ্বসি'
বৃথায় পশিতে চাই ওই মর্ম্ম-মূলে।
লক্ষ্যহীন নেত্রে, নারী, সাজি' নানাফুলে,
মরণ-লুণ্ঠন হের,—স্থির গর্বে বসি!
কি মমত্ব-হীন তুমি, রমণী-হৃদয়!
এত বর্ষে, এই স্পর্শে, এ চির-ক্রন্দনে,
এত ভাগ্যে, এই দাস্যে, এ দৃঢ়-বন্ধনে,—
দানব সদয় হয়, ব্রহ্মাণ্ড বিলয়!
বিফল উদ্যম, শ্রম, বিক্রম, বিনয়—
নিত্য পরাজিত আমি তোমার চরণে!

(কনকাঞ্জলি, ১৮৮৫)

মানসী

প্রিয়নাথ সেন

ধরা যে তোমায় পাব কেমনে—কোথায়?—
লেশহীন দীর্ঘ তৃষা মিটাই কেমনে?
কোনরূপে বহুরূপী হৃদয়-বেলায়—
তোমারে করিয়া বন্দী নিবাই চরণে
অশেষ বাসনা-ঊর্মি সংক্ষুব্ধ জীবনে?

ধ্যান বল, প্রেম বল নিষ্ফল প্রয়াস।
পাইলেও পাই নাই মিটে না তিয়াস।
চির উপভোগ নেশা চির অন্বেষণে।
জড়রূপে দেখা দিলে,— সদা কাঁদে প্রাণ
চেতনার সাড়া পেতে অমূর্ত্ত যখন,—
দরশ-পরশ-আশে হৃদি ম্রিয়মাণ ;—
দেহ প্রাণ ধরি এলে,— কোথা সে মিলন
তব অঙ্গে প্রতি অঙ্গ পাবে পরিত্রাণ,
প্রাণ পাবে তব প্রাণে নিশ্চিন্ত নির্বাণ !

হৃদয়-যমুনায়

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হৃদয়-যমুনায় ঐ ভাঙা তরী বাহি
অনুরাগে ঝিরি ঝিরি
বায়ু বহে ধীরি ধীরি,
কূল হ'তে কূলে ফিরি,
কোন বাধা নাহি ;
হৃদয়-যমুনায় ঐ ভাঙা তরী বাহি ॥

শীতের বেলায় যবে মেঘবিন্দু নাই।
নিস্তরঙ্গ হৃদি-নীর
প্রেমমন্ত্রে রহে স্থির,
আমি বাসনা-অধীর
তরী লয়ে যাই।
শীতের বেলায় যবে মেঘবিন্দু নাই ॥

মধুমাসে শাখে বসে' গাহে যবে পিক্।
হৃদিনদী ভরা টানে
কোথা দিয়ে কোথা আনে,
ভেসে যাই কোন্‌খানে
নাহি তার ঠিক্।
মধুমাসে শাখে বসে' গাহে যবে পিক্॥

নিদাঘের কালে যবে অবসন্ন ধরা।
তনুখানি তাপে ক্ষীণ,
হৃদয়-সলিলে লীন,
পড়ে থাকে নিশিদিন
অবসাদে ভরা।
নিদাঘের কালে যবে অবসন্ন ধরা॥

বরষায় ঘন ঘন মেঘ যবে ডাকে।
ভয়ে সারা মনে মনে,
তীরে আসি' সযতনে
বাঁধি তরী প্রাণপণে
হৃদয়ের বাঁকে।
বরষায় ঘন ঘন মেঘ যবে ডাকে॥

আমি নিশিদিন এই ভাঙা তরী বাহি।
সারা ঋতু সারা বেলা
ভাসাইয়া প্রেম-ভেলা
হৃদি-মাঝে করি খেলা,
কোন কাজ নাহি।
আমি নিশিদিন এই ভাঙা তরী বাহি॥

(দোলা, ১৮৯৬)

ভিখারী

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভিখারী এসেছি আমি চরণের মূলে,
যাহা দেবে দাও তুমি নিজ হাতে তুলে !
বলয় বাজুক রনঝন্,
বরষা সম বরিষণ
যত পার তত কর আঁখি মন খুলে !

কিছু নাহি চাহি শুধু দুটি হাত ধরে'
অধর-নির্ঝর হ'তে হাসি দাও ভরে' !
শুভ্র-বরণ রাশি রাশি
তরল কল স্নিগ্ধ হাসি
যত পার তত দাও ফিরায়োনা মোরে !

হাসি নাই ! দাও তবে হৃদিকুণ্ড-জলে
সিক্ত করে' রাণি মোর, দুটি করতলে !
কোমল হৃদয়ের জল
মুকুতাসম নিরমল
যত পার ভরে' দাও ভিক্ষা-দান-ছলে !

কিছু নাই ! ফিরিব কি দুটি শূন্য হাতে !
সব আশা ব্যর্থ হবে আজি এ নিশাতে !
তবে ঐ অলক্ত-বরণ
নূপুর-শিঞ্জিত চরণ
হৃদি'পরে তুলে দাও মরণ সাধাতে !

(ঢোলা, ১৮৯৬)

পরিতাপ

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি সারা দিন ধরে' তোমারে পড়িছে মনে
একেলা এই বিজনে ;
সামান্য বলে' যে কথা মনে পায় নাই ঠাঁই
আজি উঠিছে স্মরণে ;—
কি কথা বলেছি কবে কি ব্যথা দিয়েছি মনে
মনে হয় শতবার,—
নিকটে থাকিতে যাহা বায়ুসম লঘু ছিল
আজি তাহা গুরুভার !

আজি মোর মনে পড়ে মুখখানি ম্লান করে'
একা ফিরিতে কেবল !
ভাবিতে "কেন আসিনু পরের জীবনখানি
করিতে শুধু নিষ্ফল !"
আমি নিত্য নবসুখে মত্ত হয়ে রহিতাম
মদির-রস-বিহ্বল—
প্রদীপ জ্বালায়ে তুমি সারা রজনী বসিয়া
আঁখি দুটি ছলছল !

আজি মনে পড়ে সব আর মনে হয় কেন
করিনু এত প্রমাদ !
রবির কিরণে জ্বলি' আজিকে বুঝিতে পারি
ঘরে ছিলে তুমি চাঁদ !
যে মুখ থাকিতে কাছে আঁখি তুলে দেখি নাই
আজি সাধ দেখিবার !
যে প্রেম ঠেলেছি পায়ে আজি কি আদরে লই
যদি পাই কণা তার !

আজি সাধ যায় মনে যুগল-জীবন দোঁহে
পুনঃ আরম্ভ করিতে ;

যে জীবন গেছে চলে উজান বাহিয়া গিয়া
তারে ফিরায়ে লইতে ;
যে ব্যথা দিয়েছি মনে সে ব্যথা আপনি লয়ে
তোমায় সুখী করিতে ;—
প্রেমতরু-ছায়ে-ছায়ে দুটি প্রাণ এক হ'য়ে
ধীরে ভাসিয়া যাইতে !

রয়েছি পড়িয়া আমি, চলিয়া গিয়াছ তুমি
জীবনের আর কূলে ;—
পৌঁছিবে কি আজিকার বিলম্ব-বিলাপ এই
তোমার হৃদয়-মূলে !
গৃহের মাঝারে যবে ছিলে হায়, ঢেলেছিনু
অনাদরে বিষানল ;—
কাছে তুমি নাই আর, আজি মনে পড়ে সব
আর চোখে আসে জল !

(দোলা, ১৮৯৬)

নিষ্ফল প্রয়াস

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কত রাত্রি কত দিন জীবন মরণ
কত কিছু ভেসে গেছে নিয়ত যেমন,
আমি ছিনু অন্যমনে

সবারে করিয়া দূর, ছাড়ি' সব কাজ
নেমেছিনু হৃদি-সিন্ধু-অতলের মাঝ
ওই মুখ-অন্বেষণে !

ছড়ায়ে মানস-জাল পাগলের মত
হারা মুখ ধরিবারে খুঁজিয়াছি কত
শয়নহীন নয়নে !

ছায়ার মতন কভু মনে পড়ে পড়ে,
পলক নাহি প'ড়তে দূরে যায় সরে',
ধরিতে নারিনু মনে।

দেখেছিনু স্বপ্নে তারে, নিমেষের মাঝে
ঝলসিয়া চলি' গেল আলোকের সাজে
বিমানে বিজুলী-পারা।

কোথা আঁখি কোথ' দিঠি কোথা মুখখানি,
সব নিয়ে রেখে গেল শুধু ভাবখানি,
আমি খুঁজে হনু সারা!

বৃথায় কাটিল দিন নিষ্ফল প্রয়াসে,
স্বপনের ধনে ফিরে' ধরিবার আশে
বৃথা ঘুরি দিশাহারা!

(দোলা, ১৮৯৬)

অদৃষ্টদেবী

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কে তুমি রয়েছ মোর অন্তরের মাঝে
বিচিত্ররূপিণি! কত দিন কত সাজে
হেরেছি তোমায়;—কভু দীপ্ত রবিসম
আলোকে ঝলসি' হৃদয়-আকাশে মম
উঠেছ গরবে; সহস্র রশ্মির তীরে
টানিয়া লয়েছ মোর হৃদয়ের নীরে;
ঝরায়েছ তাহা নয়নের প্রান্ত হ'তে
ঝর ঝর বৃষ্টিসম। বিমল শরতে
কভু ক্ষীণ, কভু অর্ধ, কভু পরিপূর্ণ
শশিকলাসম পূর্ণ করি' হৃদি-শূন্য
কভু বিছায়েছ শ্বেত লাবণ্য-দুকূল!—

অয়ি অদৃষ্ট আমার, বিচিত্র অতুল,
তোমায় হেরেছি কত দিন কত সাজে,—
প্রভাতে হেরেছি এক, অন্যরূপ সাঁঝে।
কোথা হতে আসিয়াছি, কোথা যেতে হবে
তাহা নাহি জানি ; জানি শুধু এই ভবে
প্রথম জনমে ভ্রূণসম এনু যবে,
তুমি এলে সাথে ; শত জনমে জনমে
জীবন মরণে মোর সকল করমে
তুমি চির রবে ;—নাড়ীতে নাড়ীতে রহি।
যমজের মত তোমাতে আমাতে অয়ি,
জনম-বন্ধন। কভু হাসি মন-সুখে
আশাতে সফল—কভু নিরাশার দুখে
ঝরে আঁখিজল ;—এই সুখ এই দুঃখ
সকলি তোমারি ওগো,—পরাণ বুভুক্ষু
নিশিদিন প্রাণপণে কেমনে না জানি
তোমা হতে প্রাণরস লইতেছে টানি।
চিরতরঙ্গিত এই জীবন-সাগরে
এত দূর আনিয়াছ তুমি হাত ধরে' ;
যাহা ঘটিয়াছে মন হতে দূর করে,
এবে তোমা কাছে যাচি—জানত সুন্দরি
অন্তরের মাঝে মোর দিবস শর্বরী
কি আশা জাগিয়া আছে, তাহে পূর্ণ করি'
জীবনের সুধাপাত্রখানি দাও ভরি',—
তারপর রথচক্র-তলে বাঁধি' মোরে
যেথা খুসি নিয়ে যেয়ো জন্ম জন্ম ধরে'।

(ঢোলা, ১৮৯৬)

মাধবিকা

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পঞ্চ ঋতু থাক্ নিয়ে যাহে খুসী যার,
মধুমাস থাক্, প্রিয়ে, তোমার আমার ;
শুধু এই যৌবনের অনন্ত উচ্ছ্বাস,
অনুরাগরঙ্গে ভরা নিত্য নব আশ,
এই তন্দ্রা, এই স্বপ্ন, এই নিশি-শেষ,
এই মনোমোহকর মদির আবেশ,
শুধু এই মুকুলিত আম্রকুঞ্জবন,
গন্ধভরা দিশাহারা প্রভাতপবন,
শুধু এই পত্রে পত্রে মধুর মর্মর,
কুঞ্জে কুঞ্জে মুখরিত সঙ্গীতনির্ঝর,
এই স্বচ্ছ নীলাকাশ, কুলুকুলু নদী,
এই বর্ণ, এই গন্ধ, গীতি নিরবধি
এই প্রাণ, এই প্রেম, এ পূর্ণ পুলক
থাক্ যতক্ষণ থাকে দিনের আলোক ।

(মাধবিকা, ১৮৯৬)

কল্পবেদনা

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমারে বাঁধিয়া লহ কটিতটে তব,
হে সুরসুন্দরি, চারু অঙ্গে অভিনব
রহিব সম্বদ্ধ ওই বসনের মত
তনুখানি সযতনে সম্বরি' সতত
মোর স্বচ্ছ জলধারে ; মৃদুমন্দ বায়ে
বিথারিয়া তন্তুজাল অঞ্চলের প্রায়

লুণ্ঠিব চঞ্চলহিয়ে কাঞ্চীপরিক্ষীণ
ওই তনুতটমূলে, যৌবন নবীন
পড়িছে খলিয়া যেথা কাঞ্চন বরণে
নিবিড়নিবদ্ধ ওই নীবীর বন্ধনে
করিয়া লঙ্ঘন, মৃদু কনকনিক্কণে
ধ্বনিছে ঘন্টিকা শত বিজন বেদনে
বিঁধি' বিরহীর মন ; পরশ লাগিয়া
উঠিবে আমারো চিত্ত আকুল হইয়া
নব রাগে, ইন্দ্রধনুসম দিশি দিশি
বিচ্ছুরিব বিম্বজাল মম অহর্নিশি
দিবালোকে চন্দ্রিকায় বর্ণে নব নব
মৌন সুখভরে ; স্নিগ্ধ শুভ্র কান্তি তব
স্বচ্ছ অম্বরের তলে উঠিবে ফুটিয়া
শরৎ-কৌমুদীসম অভ্র টুটিয়া
চারু রশ্মিজালে।

বড় আশা আছে মনে
আমারে লইবে, তুলি', অয়ি সুগঠনে,
বক্ষতলে তব। তাপে খিন্ন হবে যবে
পীন স্তন দুটি রাখিব আচ্ছাদি' তবে
সলিল-অম্বরে, স্তনাগ্রশিখর পরে
শুধু দুটি বারিবিন্দু স্বচ্ছ স্নেহভরে
রহিবে উজলি' ; পয়োধর-অন্তরালে
বিগলিত হারলতা লঘু বাষ্পজালে
মনে হবে মরীচিকা—বক্ষের স্পন্দনে
যেথা বহু আশা বহু ব্যথা সঙ্গোপনে
নিশিদিন ফুটে আর ঝরে।—অয়ি প্রিয়ে
মানব প্রেয়সি, চিত্ত উঠে আকুলিয়ে
আলিঙ্গন-আশে তব, এই বক্ষোপরি
চাহে লভিতে বিশ্রাম চিরদিন ধরি'

তপ্ত স্নেহতলে, কোমল পরশে তব
লভি' নিত্য অনুপম শান্তি অভিনব
আনন্দ-নিশ্চল।

আর নাহি লাগে ভাল
সারাদিন কূলে কূলে ছায়া আর আলো
নিয়ে মিথ্যা বিড়ম্বনা, গুরু মনোভার
বহি' কলকলছল নিত্য অভিসার
কোন্ অজানা অকূলে। এবে হয় মনে
চিরদিন রব পড়ি' কমলচরণে
তব, নূপুরগুঞ্জন শুনি' কাটি' যাবে
দীর্ঘদিন সুখে দুখে এইমত ভাবে
যুগ পরে যুগ ; রহিব ঘিরিয়া তব
তরল যৌবনখানি—তনু অভিনব—
শত-নাগিনী-বেষ্টনে অনঙ্গের মত
লঘু স্বচ্ছ আবরণে ; খেলিব সতত
অঙ্গ হতে অঙ্গে তব যৌবননন্দনে
নিঃশব্দ ঠুকারে কভু বাজিয়া কঙ্কণে
মৃদু ; হারলগ্ন হ'য়ে পড়িব খসিয়া
বক্ষতল হ'তে নীবীতটে, উঘারিয়া
হিয়া তব—হরকোপানলে মনমথ
ভস্মীভূততনু পড়েছিল যেই পথ
বাহি' রসাঙ্গনে, কভু মেখলার মাঝে
হারাইয়া পথরেখা কোনদিন সাঁঝে
ঝুরুঝুরু বায়ুবশে পড়িব এলায়ে
বিবশ আবেগে তব শিথিলিত কায়ে
তাপজরজর ; পুলক উথলি' উঠি,
সর্ব অঙ্গে সর্ব বন্ধ ফেলিবেক টুটি।

(মাধবিকা, ১৮৯৬)

বিড়ম্বনা

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

চুম্বন গুঞ্জন আর সরস বসন্ত
অদ্যাবধি হয়েছে বিস্তর, হোক্ অন্ত
এবে এ সবের। পুরাতন পুষ্পশরে
বিদায় করিয়া দাও এই অবসরে,—
পুষ্পে তোর পশিয়াছে কীট, ধনুকের
ছিলা গেছে ছিঁড়ে এতদিনে, শুধু এর
আছে মাত্র পূর্ব আস্ফালন ; এতদিনে
অতিব্যয়ী সর্বস্বান্ত যৌবনের ঋণে
বিকায়ে গিয়াছে তোর পরিপূর্ণ তূণ ;
মদনের মদপাত্রে তরল আগুন
নিঃশেষিত এবে ; দ্বারে এসে বারম্বার
ফিরে যায় মধুঋতু দৈন্য হেরি' তোর ;—
তবু যদি তোর পরে মায়া থাকে, তবে
রহিয়ো গোপনে তাহা, রহিয়ো নীরবে।

(মাধবিকা, ১৮৯৬)

কোথা ?

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুঝিতে না পারি, প্রিয়ে, আছ কোন্‌খানে-
বুকের পঞ্জর মাঝে অথবা নয়ানে ?
হিয়া যবে ধক্‌ধকে বক্ষতলমাঝে
ভয় হয় পাছে তব অন্তরেতে বাজে ;
অশ্রু যবে ভরি' উঠে নয়নের পাতে
তোমারে ব্যথিছে বুঝি কি বেদনাঘাতে

তাই হয় মনে। চোখে চোখে আছ যবে
তখনো বিরহ যেন রহিছে নীরবে
অন্তরে অন্তরে,—মনে হয়, স্বপ্নসম
মায়ায় ছলিলে না ত মূঢ় মন মম
ক্ষণভরে ; প্রবাসে বিরহে হয় মনে,
নিশিদিন সাথে বুঝি আছ সঙ্গোপনে।
বাহিরে তোমারে চাহি' পাই অন্তঃপুরে,—
অন্তরে খুঁজিতে গিয়া হেরি বহু দূরে।

(শ্রাবণী, ১৮৯৭

বিষামৃত

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

একদিকে বিষ আর একদিকে সুধা
মিটাইতে জগতের সর্ববিধ ক্ষুধা
দুটি কুম্ভ পূর্ণ করি' দিয়াছেন বিধি
নারীর হৃদয় জুড়ি' দুটি পয়োনিধি।
আদিযুগে দেবাসুর-মন্থনসময়ে
মহামায়া হরেছিলো অসুরের ভয়ে
সকল অমৃত বুঝি এই বক্ষতলে,
ছলিতে অসুরে শেষে ভরিয়া গরলে
অনুরূপ কুম্ভ বিধি বসাইল আনি',—
দেবাসুরে ভাগ করি' লয় দুইখানি।
সে অবধি নারীবক্ষ বিষামৃতে ভরি'
তুষিতেছে সর্বলোকে দিবসশর্বরী।
কেহ বা বাসনাবিষ পান করে' যায়,
কেহ স্নিগ্ধ উৎস হ'তে শুধু সুধা পায়।

(মাধবিকা, ১৮৯৬

দোঁহে

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে বধূ, তোমারি নদী, তুমিও নদীর,
অন্তরে অন্তরে দোঁহে মিলন গভীর ;
তুমি না আসিলে ঘাটে সকালে সন্ধ্যায়
কপোলে ছলকি' উঠি' জানাবে সে কায়
হৃদয়বেদন যত ? কার কানে কানে
উছল যৌবনভরে মৃদু কলতানে
ঢালিবে পীযূষধারা ? সুললিত স্নেহে
জড়ায়ে শতেক পাকে সুবন্ধুর দেহে
চুম্বন ভরিয়া দিবে ললাটে কুন্তলে
পেলব অধরপাতে ? বিবশ অঞ্চলে
আর্দ্র করি' শতধারে প্রেমলীলাভরে
ঝাঁপায়ে পড়িবে আসি' কার বক্ষপরে
দিনশেষে ? কারে দিবে ভালবাসা যত
মৌন হৃদয়ের ? আশা ও দুরাশা শত
অগাধ তলের ?

তুমি শুধু বুঝ ওই
হৃদয় বেদনা—ভাষা কলকলময়ী ।
তাই দিনে শতবার নানা কর্মছলে
এস এই নদীতীরে, পীন বক্ষতলে
নীলাম্বরীখানি সম্বরিয়া সযতনে,
কলসী লইয়া কক্ষে মরাল গমনে ;
আঁচল খসিয়া পড়ে ধীরে শিথিলিপা
যৌবন শিখরদেশ হ'তে ! মুগ্ধ হিয়া
পুলকে মুকুলি উঠে গহিন লালসে
ওই নীলনীরে ; না জানি কি নব রসে

চিত্ত ওঠে ভরি' ; বিবসনা লজ্জাভরে
ঝাঁপাইয়া পড় আসি' নদীবক্ষ পরে
চারু বক্ষতলে ; পরিরম্ভনিপীড়নে
কি বেদনা কি সুখাশা জেগে ওঠে মনে
তন্দ্রাবেশবশে !

চারিদিকে ঘিরে' আসে
শত বাহু বাড়াইয়া তরঙ্গ-উল্লাসে
ফেনিল নীলিমা বক্ষতলে বাহুমূলে
বঙ্কিম গ্রীবার ভঙ্গে নীবীবন্ধ-কূলে
সর্ব অঙ্গে ; সুধাস্মিত স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে
শান্ত কর অন্তর-আবেগ ; দুই হাতে
মুছি' দাও নিদারুণ জ্বালা বিরহের ;
অধরের রাগে দূর কর হৃদয়ের
অন্ধ তমোভার ; সুখ উঠাও উথলি',
মুগ্ধ চিত্ততট ভরি' ছলছলছলি' ;
অবশেষে কিছুতে না মিটে যবে আশ,
কোনমতে নাহি মিটে দারুণ পিয়াস,
সকল হৃদয়ভার কলসীতে ভরি'
লয়ে' যাও গৃহমাঝে কক্ষতলে করি' ;

শ্রাবণী, ১৮৯৭)

অন্তরবাসিনী

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেঘ নামিয়াছে আজি ধরণীর গায়,
তুমি এস নেমে এস হৃদয়-গুহায়
অন্তরের মাঝে, অয়ি অন্তরবাসিনি !
ঘনায়ে আসুক আরো তিমির-যামিনী
তব চারিধারে, ঘন ঘন-গরজনে
পরিপূর্ণ হোক্ দশ দিশি, সনসনে

বহুক্ পবন খর বেগে ; তুমি রহ
অহরহ পূর্ণ করি' সকল বিরহ
অন্তর-মন্দির-মাঝে ; তব স্নেহছায়ে
সজীব হইয়া উঠে নব মহিমায়
পুরানো বিরহ যত, কুঞ্জ-অভিসার
ঝঞ্ঝা, ঘন-গরজন শ্রাবণ-নিশার ;
মত্ত দাদুরীর রোলে, দ্বিধা কেকারবে
তুমি যেন ভরি' উঠ সর্ব অবয়বে ;

(শ্রাবণী, ১৮৯৭)

হাসি

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পড়েছে রজতরেখা রক্তিম অধরে,
মরমের ভাষা যেন হয়েছে বিকাশ।
জোছনার স্নেহ যেন গোলাপের পরে
ফুটায়ে দিতেছে তার সুষমা, সুবাস।
কোন্ শুভ দিবসের চুম্বনের স্মৃতি
অধরের রক্তিমায় হয়েছে বিলীন ;
কোন্ সুখরজনীর চাঁদের কিরণ
অধর পরশে এসে আপনা-বিহীন।
দুইটি তরঙ্গ মাঝে শুভ্র রশ্মিরেখা,
তরঙ্গের গতি যেন গিয়াছে থামিয়া।
দু'টি সুখস্মৃতি যেন আপনা ভুলিয়া
সহসা অধর কোণে মিশিছে আ[illegible]সিয়া।
পড়েছে রজতরেখা রক্তিম অধরে
মরমের ভাষা যেন গিয়াছে গলিয়া।

(শ্রাবণী, ১৮৯৭)

আমার আঙিনায় আজি

অতুলপ্রসাদ সেন

আমার আঙিনায় আজি পাখী গাহিল একি গান !
শুনিনি এমন গাওয়া, হেন মরম-ভেদী বাণ !
যে করেছে অবহেলা, আমার গানের মালা,
আজি কি পাখীর গলায় তার গলার প্রতিদান ?
যে দিয়েছে এত ব্যথা, মনে হয় এ তারই কথা ;
বুঝি গো ভিজেছে আজি তার নিঠুর দু নয়ান !
বল্‌রে অজানা পাখী, তুই তার দূত নাকি ?
এতদিনে ভাঙিল কি, তার গভীর অভিমান ?
মোর প্রাণের গানটি শিখি, বনে যা তুই বনের পাখী
বুঝায়ে কহিস তারে, আমি তার লাগিয়া ধরি প্রাণ !

ওগো সাথী

অতুলপ্রসাদ সেন

ওগো সাথী ! মম সাথী ! আমি সেই পথে যাব সাথে,
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ-তিলক মাথে।
যে পথে কাননে আসে ফুলদল, যে পথে কমলে পশে পরিমল,
যে পথে মলয় আনে সৌরভ শিশির-সিক্ত প্রাতে।
যে পথে বধূরা যমুনার কূলে, যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে,
যে পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে !
যে পথে পাখীরা যায় গো কুলায়, যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়,
সে পথে মোদের হবে অভিসার, শেষ তিমির রাতে।

এড়াতে পারলে না

অতুলপ্রসাদ সেন

এড়াতে পারলে না আজ প্রভাতে ;
আমার ফুলের ফাঁদে পড়লে ধরা গন্ধে আর ঐ শোভাতে।
ভেবেছিলে গোপন রেণু, ঢাকবে তোমার মোহন বেণু,
লুকাতে পারলে না গো সুন্দরের এই সভাতে।
দুঃখ-শোকের ভগ্ন ভিতে, এসেছিলে অলক্ষিতে,
স্বার্থ-সুখের দুয়ার দিয়ে পথ পেলে গো পালাতে।
আমার বঁধুর আনাগোনা, কোন্ পথে তা কেউ জানে না
শুধু নূপুর যায় গো শোনা পথিকের মন ভোলাতে ॥

আজ আমার শূন্য ঘরে

অতুলপ্রসাদ সেন

আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর, ওগো অনেক দিনের পর
আজ আমার সোনার বঁধু এল আপন ঘর,
ওগো অনেক দিনের পর ॥
আজ আমার নাই কিছু কালো,
পেয়ে আজ উজলমণি সব হ'ল আলো ;
আজ আমার নাইকো কেহ পর,
সুখীরে করিছে সখা, দুখীরে দোসর ॥
মনে পড়িল তা কি ? এতদিন যে দুয়ার খুলে রহু একাকী ;
বুঝি ভিজিল আঁখি
আর ছেড়ে যেওনা বঁধু জন্ম-জন্মান্তর, ওগো আমার সুন্দর ॥

বিরহ

প্রিয়ম্বদা দেবী

মেঘ নামিয়াছে আজ ঘেরি চারিপাশ,
নব স্নিগ্ধ অন্ধকার, সজল বাতাস
ধরণীর আর্দ্রবক্ষে নিবিড় পরশে
রোমাঞ্চ জাগায়ে তুলি' উদাস হরষে
ছোটে গর্বভরে ; বজ্র ডাকে বারে বারে
প্রদীপ্ত অনলশিখা বিদ্যুৎ-প্রিয়ারে
আপন বক্ষের মাঝে. শ্যাম তরুগুলি
সুঠাম বঙ্কিম বাহু ঊর্ধ্ব পানে তুলি
আরক্ত চুম্বন-পুষ্প দেখায় কাহারে!
পূর্ণা তরঙ্গিণী ধায় দূর পারাবারে
মিলন-ব্যাকুল ; রুদ্ধ ঘরে একা বসি
অশ্রু আঁখি. প্রাণে জাগে তব মুখশশী!
তবু একবার এস নয়ন-সম্মুখে
বাহু-বন্ধে তনুখানি গাঁথি লহ বুকে।

[illegible], ১৯০০

মানসী

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

চিরদিন আছ সাথে ছায়াটির মত,
অয়ি স্নেহময়ি! বাল্যে মুগ্ধক্রীড়া কত!
রূপকথা কহিতাম সখা-সাথীগুলি
লয়ে কৈশোরে যখন ; সর্বকর্ম ভুলি'
তুমিও আসিতে নিত্য উৎসুক অন্তর,
শুনিতে সকল কথা ;—ভাবিতাম পর!

তাই ব্যথা দিয়েছি তোমারে ; অকাতরে
করিয়াছি অনাদর। কবে তারপরে,
ধরিলে ষোড়শীমূর্তি ; সিঞ্চিলে অমিয়া
জীবনের শূন্য মাঝে ! সদ্য তৃষ্ণা দিয়া
চাহিনু বাঁধিতে !—লজ্জার বসন টানি'
চলি গেলে, তদবধি মুক্তগণ্ডখানি
অসীম রহস্য সম ফিরে স'রে স'রে,
তবু ওই দুটি নেত্রে স্নেহ-অশ্রু ঝরে !

আরো

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

আরো ভালবাসি তোমা, হে মম হৃদয়,
যবে তব প্রাণপণ নীরব সঞ্চয়
পড়ে যায় চোখে ! স্নেহ-পক্ষপাত সনে
কত কি সোহাগ ফুটে নিভৃত গভনে !
আরো ভালবাসি, যবে আনন্দ কম্পিত
আপনারে গর্বভরে কর বিমর্দিত,—
সুন্দর সুকৃতি সম ঝলকে ঝলকে—
মধুর অমৃত উঠে বিপুল পুলকে !
আরো ভালবাসি, যবে নাহি পার কিছু,
কেবলি ঘুরিয়ে এস দুঃস্বপ্নের পিছু ;
সান্ত্বনাবিহীন, আর্দ্র, করুণা-কাতর,
গম্ভীর-বিষাদস্ফীত বিধুর অন্তর !
আরো ভালবাসি, যবে পড় অতি ধীরে
ঘুমাইয়া নিমেষের শান্তিস্নিগ্ধ নীড়ে !

(পন্থা, ১৮৯৮)

অর্জুনোর্বশী

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

চিত্রসেন-মুখে শুনি আপনার বাঞ্ছিত বারতা,
মদভরে তরঙ্গিয়া সুকুমার ক্ষীণতনুলতা
প্রসাধনে রত, স্বর্গে, স্বর্গপুরে অতুল্যা রূপসী ;
ঝলকিত পুলকিত পূর্ণিমার পরিপূর্ণ শশী
অলক্ষ্যে করিতেছিল কক্ষমাঝে কটাক্ষ ক্ষেপণ,
অসম্বৃতা, উর্বশী যখন !

মাণিক্য-কিঙ্কিণী রঙ্গে কটিতট নিল আলিঙ্গিয়া ,
মুক্তিকার কণ্ঠমালা স্তনমূলে পড়িল মূর্ছিয়া !
অদৃশ্য অম্বরপথে একাকিনী পার্থের সদনে
উন্মত্তা উর্বশী চলে অভিসারে, আকুল গমনে !
ফুলশরে বিমোহিল আচম্বিতে ত্রিলোক অজ্ঞাতে
সেইদিন পূর্ণিমার রাতে ।

সভয়ে বিস্ময়ে দ্বারী দ্বার ছাড়ি গেল দূরে সরি ;
পার্থের শয়নকক্ষে উত্তরিল সুন্দরী অপ্সরী ,
সৌরভে মোদিল কক্ষ, উজলিল লাবণ্যকিরণে !
শিঞ্জিনীশিঞ্জিত রবে জাগি ভদ্র, বিমুগ্ধ নয়নে,
মুহূর্তে হেরিলা, যেন মায়াদীপ্ত স্বপন-আগারে,
পরিচিতা মোহিনী বামারে ।

সম্ভ্রমে উঠিলা যবে নমিবারে রাতুল চরণে,
সত্বরে শিহরি ধনি নিবারিল স্খলিত-বচনে :—
প্রণম্য নহি গো আমি ; যার তরে তৃষিত ভুবন,
যার তরে সুরাসুর বিবাদিল মূঢ়ের মতন,
সে সুধার যমজা যে, সেই আমি হের ধনঞ্জয়,
আসিয়াছি সঁপিতে হৃদয় !

স্তম্ভিত বিস্মিত, সৌম্য দাঁড়াইলা নত করি শির,
স্থিরকণ্ঠে আরম্ভিলা সসঙ্কোচে ব্রহ্মচারী বীর,—
সুরপুরে স্বর্গসুখে বঞ্চি দিন, দেখিছ সতত ;
কিন্তু নাহি জান, দেবি, কি আমার জীবনের ব্রত ;
প্রসন্ন প্রশান্ত মনে আশিষিয়া যাও নিজ ধাম,—
পূর্ণ যেন হয় মনস্কাম !

কহিল উর্বশী হাসি,—দেবপুরে হে মুগ্ধ অতিথি,
দেবেন্দ্র প্রেরিলা মোরে তুষিবারে তোমা যথারীতি ;
দেবাদেশ পাল', প্রিয় এই স্বর্গ ভোগের আধার ;
জেনো মনে, সুখ-পক্ষী ধরা নাহি দেয় বারবার।
তুষিতে ফিরাও যদি, একদিন এ বিশ্বসংসারে
কেঁদে কেঁদে খুঁজিবে তাহারে।

ঈষৎ রোষাগ্নিরেখা চমকিল নরেন্দ্র-লোচনে ;
দেবাদেশ ?—শতধিক্ !—উত্তরিলা পরুষ বচনে,—
মোরা দীন মর্তবাসী, নাহি জানি স্বর্গের আচার ;
হে অপ্সরা, ফিরে লও তোমাদের অতিথি-সৎকার ;
বলিও মহেন্দ্রে তুমি, এই ভিক্ষা মাগি তাঁর পায়,—
স্বর্গ হ'তে লইব বিদায়।

দলিতা ফণিনী যথা দংশ অরি লুকায় বিবরে,
গর্বিতা উর্বশী শূন্যে মিলাইল সন্তপ্ত অন্তরে ;
ধ্বনিতে লাগিল কক্ষে নিদারুণ প্রেম-অভিশাপ।
হ'ল শেষে দৈববাণী,—হে অর্জুন, ত্যজ মনস্তাপ ;
অভিশাপ বররূপে দেখা দিবে দ্বিগুণ প্রভায়,
মহাকার্যে হইবে সহায় !

(গীতিকা)

পাথার

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

পড়িতে আসিনি তব তরঙ্গের পুঁথি।
খুলিতে আসিনি তব যন্ত্রের মহল।
ঢালি শুধু হৃদয়ের গাঢ় অনুভূতি
পরাব তোমার পায়ে প্রেমের শিকল।
ভাণ্ডার তোমার আজ ছেড়ে দিলে লুটে,
উড়িব ঘুরিব শুধু আনন্দ-পাথারে
মোর চিত্ত-নীপ-তরু-শাখায়-শাখায়
কুসুম রোমাঞ্চ হয়ে পলে পলে ফুটে!
ভাব শুষ্ক, ভাষা রুদ্ধ, গেছে ভেসে চুরে,
মূর্ছনা আসিয়া কণ্ঠে পড়িছে মূর্ছিয়া,
গেছে ছন্দ, গেছে তাল ধোঁয়া হয়ে উড়ে,
ছিঁড়েছে সুরের তার চড়াইতে গিয়া।
আজ মনে হয় যেন নিখিল ভুবন
মৎস্য-রমণীর আধ সলিল-স্বপন।

মুগ্ধ বিরহ

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

মনে হয় যেন তুমি যাও নাই দূরে;
পরিচিত কলকণ্ঠে,—রহি মায়াপুরে
ডাকিছ আমারে! সকল ধ্বনির মাঝে
ক্ষীণ স্নিগ্ধ মধুস্বর থাকি থাকি বাজে
মানস-শ্রবণে। বসি দূর দূরান্তরে
যে হাসি, যে স্নিগ্ধদৃষ্টি দিতেছ আমারে

বিলাইয়া সর্বক্ষণ, সে লাবণ্যরাশি
স্বর্ণকুরঙ্গের মত খেলা করে আসি
করুণ স্বপ্নের সনে হৃদি-তপোবনে,
অপূর্ব অমৃতলোকে! একাকিনী বনে
কুসুম চয়ন করি মালা গাঁথ যবে,
সে সৌরভ, সে পরশ আমারে নীরবে
বহি আনি দেয় বায়ু! স্বপ্নে মোহে মিশি
রয়েছে উজ্জ্বল মোর বিরহের নিশি।

(গীতিকা)

মুক্তকণ্ঠ

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

লুকায়ো না হৃদয়, সুন্দরি,
জাগে আমা দোঁহা'পরে মধু বিভাবরী!
তালে তালে নদী-পা'য়, স্বর্ণশোভা ভেসে যায়;
কোলাহল পেয়েছে বিদায়;
মুকুলিত আম্রবনে হৃষ্ট পিক প্রিয়া সনে
আলাপিছে তরুণ তৃষায়।
ভালবাসি!—বলার তো এই শুভক্ষণ;
প্রেম র'বে মূকের মতন?

কেহ নাই, তবে ত্যজ লাজ;
বিমানে বিরাজে, হের, প্রেমিকসমাজ;—
চন্দ্র-তারা ভাবে ঢুলে' বিহারে হৃদয় খুলে'
বায়ু-সখা বাজাইছে বাঁশী;
যক্ষবধূ অলকায় সঁপিছে বঁধুর পায়
মুখর বেদনা রাশি রাশি!
উদার অনন্ত ভরি এত ব্যাকুলতা;
সাজে কি তোমার নীরবতা?

একি তব গোপন গঞ্জনা,
বচনে দলিতে পার সোনার কল্পনা?
তাই হোক, দাও ব্যথা; ভাঙি সব জটিলতা,
প্রেম-স্বর্গে ঘটাও প্রলয়;
অমরা-মালঞ্চ হ'তে ফেলে দাও জ্বালা-স্রোতে
যাই ভেসে, ঘুচুক সংশয়।—
দেখা ভাল, অন্ধকারে জ্বলিছে যে মণি
সে ত' নহে শুধু কালফণী?

কথার ভিখারী এ হৃদয়;
তাও কেন নাহি দেয়,—নারী কি নিদয়!
ভালবাসি, ভালবাসে,— এসেছিনু বড় আশে;
দর্প গর্ব আজ চুরমার।
থাক, বালা, দৃপ্ত সুখে, জয়-ঘটা নিয়ে বুকে;
কাজ নাই শুনে হাহাকার:
ডুবিছে যে, তার লাগি কি তোমার দায়?
যাও, যাও; কাল ব'য়ে যায়!

(গীতিকা)

বিচিত্র বন্ধন

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

বন্দী করিয়াছ মোরে বিচিত্র বন্ধনে,
অয়ি বিজয়িনি! এই বিশাল ভুবনে,
সর্বজন শতকর্মে ব্যগ্র অতিশয়;
আমি আছি দল-ছাড়া নিশ্চিন্ত তন্ময়;
পাতিয়াছি হৃদিপদ্ম পাদপদ্ম তলে
উন্মত্ত ভক্তের মত। চৌদিকে সকলে,

যে যাহার অংশ, স্বার্থ লইতেছে সাথে
বাঁটিয়া লুটিয়া! মোর দুঃখ নাহি তাতে;
ধনজন খ্যাতিবৃদ্ধি ভাগ্যের আশায়
উগ্র বিশ্বমৃগয়াতে প্রাণ নাহি ধায়।
আমি পাইয়াছি এই শোভা-আভাময়
সুন্দর সরল স্বচ্ছ একটি হৃদয়;
অধীনের পদে তাই বন্ধনশৃঙ্খল,
নিঃসহ সুখের ভারে হয়েছে অচল!

(গীতিকা)

প্রেমহীন

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

একি মুক্তি? নিস্তরঙ্গ সমুদ্র সমান
নিশ্চল নিষ্কম্প প্রাণ;—প্রেম অবসান!
এর চেয়ে কত ভাল লেলিহান লোভ,
রুদ্র মিলনাকুলতা, সংশয়ের ক্ষোভ,
নিত্য নব বাসনার পতন, উত্থান!
—কে জানিত মৃত্যু সত্য মানিবে আহ্বান!
প্রকৃতিরে উদ্বোধিছে আজি যত কবি;
পঞ্জর-পিঞ্জরাবদ্ধ আমি শুদ্ধ ছবি!
কোথা গেল মোর শশী, উদার গগন,
সুধাছন্দা তটিনীর বিলোল নর্তন?
এত ক'রে তবু আমি পারি না গাহিতে,
ক্রন্দনবিহীন প্রাণ নারি উন্মোচিতে।
প্রেম দিয়াছিল যারে মৃত-সঞ্জীবনী,
দেবতা কাড়িয়া নিল তার স্পর্শমণি!

সন্ধি

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

আজ ভুলে যাও বৈর, বিরাগ, সঙ্কোচ ;
বক্ষে তুলি' লও ওরে রমণী বলিয়া ;
ভুলে যাও ইতিহাস ব্যর্থ জীবনের।
পতিতা ! পাপিষ্ঠা !—এই রুক্ষ ঘৃণা যেন
আর আনিও না মুখে ; যবনিকা খুলি'
দে'খ না অন্তরদৈন্য। চিরদিন, আহা,
হয় ত ও এমন ছিল না ; সকলের
মাঝে সেও ছিল কেহ ; হয় ত অতুল
কত শুভ্র আশা ওরো বক্ষে পোষা ছিল !
কবে মূঢ় মেয়ে করিল বিষম ভুল ;—
এত দৈন্য, লজ্জা, ত্রাস, অন্তররোদনে
ভগ্ন প্রাণটুকু যদি হৃদয়ে নিবিল,
আজি ওরে ডেকে এনে সকলের মাঝে,
মার্জনা মাগিয়া লই গত অবজ্ঞার।

(পদ্মা, ১৮৯৮)

দৃষ্টি

বিনয়কুমারী ধর

হৃদয়ের সাথে বুঝি হৃদয়ের কথা।
দোঁহারে টানিছে দোঁহে আপনার পানে,
জানাইতে মরমের চির আকুলতা
এসেছে হৃদয় দুটি ভাসিয়া নয়ানে !
গোপন প্রাণের দ্বার গেছে যেন খুলে,
দোঁহার লুকানো আশা দেখিছে দোঁহায়,

উথলিছে প্রেমসিন্ধু আঁখি-উপকূলে,
ভরে উঠে দরশের হরষ-জ্যোৎস্নায়।
কত না মধুর সাধ সুখের পিপাসা,
জাগিছে অতৃপ্তি নিয়ে নয়নের কোণে ;
নীরব মনের কত সুকোমল ভাষা,
বুঝিতেছে পরস্পরে না বলে, না শুনে ;
প্রাণে বাঁধিতেছে প্রাণ গাঢ় আলিঙ্গনে,
চেয়ে শুধু অনিমেষে নয়নে নয়নে !

(নির্ঝর, ১৮৯১)

কেন বাঁশী বাজে ?

বিনয়কুমারী ধর

ও কেন বাজায় বাঁশী আকুল করে ?
বাঁধিতে দেয় না মন আপন ঘরে !
মধুর মোহন তানে,
কি মায়া ছড়ায় প্রাণে,
অবশে, চরণে হৃদি লুটায়ে পড়ে !
অধর চুমিয়া বাঁশী,
চুরি ক'রে মৃদু হাসি,
কি সাধে গাহে লো গান কাহার তরে ?
কেন, সে তানে মুঞ্জরে ফুল ;
গুঞ্জরে মধুপ-কুল ;
পিকবধূ ডাকে 'কুহু' অধীর স্বরে ?
ওর দুটি কালো আঁখিতা[illegible]
অমল অলস-পারা,
ঢুলু ঢুলু করে কেন কি ভাব-ভরে ?

কি খেলা খেলিতে চায় ?
কেন হৃদি লয়ে যায়,
চরণে দলিবে যদি ক্ষণেক পরে !
ও কেন বাজিয়ে বাঁশী পাগল ক'রে ?

(নির্ঝর, ১৮৯১)

যাচনা

কুমারী লজ্জাবতী বসু

দেবী ! চির অসম্পূর্ণ কাহিনীর মত
ব্যাকুল রাখিও পরাণি ;
অকূল নদীর তীর-রেখা মত
থেকো, আবেগে বহিব যখনি।
থেকো, দীপ্ত যৌবনের রহস্যের মত,
মোর দুকূল ভরিয়া থমকি ;
ফুটো, ধরণী যেমন জাগে গো বসন্তে
নিজ পূর্ণতায় চমকি ;
জেগো, চির অনুদ্দেশ পথ-রেখা মত
মোর দূর দূরান্তর ভরিয়া ;
এস, নিজ মহিমায়, চির নীরব
আকাশের মত নামিয়া।
দাঁড়ায়ো, প্রথম জাগ্রত সৌন্দর্যের মত,
আপন প্রকাশে বিস্মিত ;
বীণার প্রথম সুরটির মত
মধুর মরমে জড়িত।
যথা, ভাবের বাণীটি কবির গাথায়
জেগো, তেমনি আমার নয়নে ;
প্রেমের প্রথম পুলক মতন
ওগো, চিরদিন এসো স্মরণে।

সাধনা

সরোজকুমারী দেবী

(১)

জেনেছি বুঝেছি দেবি বিফল সাধনা !
শিখিনি করিতে পূজা ও দুটি চরণ !
আজন্মের ঘোর তৃষা অতৃপ্ত বাসনা,
মিটিবে না কভু মোর থাকিতে জীবন !
গোপন মর্ম্মের মাঝে তবু দিবানিশি,
কি রুদ্ধ শোণিত-স্রোত উছলিতে চায় ।
কি যে ঘোর অমা হের, ছেয়ে দশদিশি,
কি ক'রে আলোক মৃদু প্রবেশিবে তায় !

(২)

সুগভীর অন্ধকারে একেলা বিজনে
তবু দেবি ও সুন্দর মানস প্রতিমা,
হেরিব সতত ইচ্ছা জ্ঞানে কি অজ্ঞানে,
অন্ধ আমি কোথা পাব অসীমের সীমা !
জানি মনে এ জনমে বিফল সাধনা,
মিটিবে না তৃষা-ভরা অতৃপ্ত বাসনা !

(৩)

তবু দেবি আশাহীন নবীন আশায়,
গেঁথেছি যতনে এই ঝরা ফুলগুলি,
পরাইতে যাই আর সাহস ফুরায় ;
পরিবে না গলে তুমি, লবে না কি তুলি ?
না হয় রাখিয়া দিও চরণের ছায়,
মুহূর্ত্ত বিফল আশা যদি মেটে হায় !

(হাসি ও অশ্রু, ১৮৯৪)

তবে কেন ?

সরোজকুমারী দেবী

তবে থাক এইখানে হোক সব শেষ,
বিদায়ের অশ্রুজল মুছে ফেল হায়,
যেখানে প্রাণের জ্বালা পরাণে মিশায়,
বলে দাও যাব আমি কোথা সেই দেশ
এ চির-অতৃপ্তি লয়ে পরাণেতে আর,
বহিতে পারি না হায় বাসনা-গরল।
থামে নাক' উচ্ছ্বসিত নয়নের জল,
নিশিদিন পরাণে গরজে পারাবার।
যাও তবে শেষ হোক সব এইখানে,
কেন আর মুখ-পানে চাও ফিরে ফিরে
জান নাকি মিটিবে না এ আশা পরাণে.
নিমেষের সুখ দুঃখ নিমেষেই ঝরে!
কেন তবে এইখানে সব যাও ভুলে.
হের গো গরজে সিন্ধু সংসারের কূলে।

(হাসি ও অশ্রু, ১৮৯৪)

কোথায় সে দেশ ?

সরোজকুমারী দেবী

(১)

জীবনের পরপারে কোথায় সে দেশ ?
যেথায় রয়েছ তুমি আমারে গো ভুলে
তৃষিত কাতর এই পরাণ লইয়া,
নিশিদিন বসে আছি কল্পনার কূলে।

জীবনের পরপারে কোথায় সে দেশ ?
সেথা কি গো ফুটে ফুল, হাসে কি গো রবি ?
সেথা কি এমনি বহে মলয় অনিল ?
এমন কি মোহমাখা আছে সেথা সবি ?

তুমি যে রয়েছ ভুলে এখনো আমায়,
বুঝিতে পারি না সখি কি মোহ-বাঁধনে ?
ভুলে যেতে তোমা হায় ভুলি গো আপনা,
কি ভুলে বেঁধেছ তুমি আমার পরাণে !

ভাবি সখি জীবনের কোন পরপারে,
র'য়েছ হরষে তুমি ভুলিয়া আমারে ?

(২)

ভাবি আজি তাই আমি কোথায় সে দেশ,
কি রাগিণী বাজে সেথা কোন অপ্সরার ;
কি সুরে গাহিয়া গান বহে মন্দাকিনী,
কি সুর বাজিছে সখি পরাণে তোমার !

রবি-কর-জালে গাঁথা শুভ্র সে আঁচলে
খসিয়া পড়িছে কত বিকশিত ফুল,
উষার রক্তিম মুখে অরুণের রেখা,
তেমনি অধরে শুয়ে হাসিটি আকুল।

মাঝে মাঝে হরষেতে হাসিবারে গিয়া
অজানা বিষাদে ম্লান কভু কি মুখানি ?
কখনও পুরান স্মৃতি জাগে কি পরাণে ?
গাহে কি হৃদয় কভু অভাব-কাহিনী ?

আমি জীবনের উপকূলে শ্রান্ত পরাণ লয়ে,
গণিতেছি দীর্ঘশ্বাস আকাশের পানে চেয়ে !

হাসি ও অশ্রু, ১৮৯৪)

শ্যাম

সরোজকুমারী দেবী

শ্যাম ! তুঁহু নিকরুণ অতি !
একলি রজনী ঘোরা বালিকা যে দিশেহারা
না জানি একেলা যায় কথি !
বাঁশরীকো রব শুনি যেন ধায় পাগলিনী
আলু থালু কুন্তলক রাশ ;
আঙিয়া খসিয়া যায় কণ্টক বিঁধিছে পায়
ম্লান ভেল অধর সহাস ।
নিকরুণ তু যে কালা একা সে দুখিনী বালা
এ আঁধারে বোলো গেল কথি ?
চঞ্চল যমুনা-বারি ডারল কি ক'রে তারি
নিরাশায় জীবনক ভাতি ।
কে বলে করুণ তোয় জনম-দুখিনী সোয়
তোহার পিরীতি সেবা করে ।
তবু ত এ বিষ-মধু ডুবিয়ে রয়েছি বঁধু
নিশিদিন আঁখিজল ঝরে ।

(হাসি ও অশ্রু, ১৮৯৪)

একটি চুম্বন

সরোজকুমারী দেবী

চলে যায় পুন ফিরে এসে
হাত তার ধরে নিজ করে ।
থর থর কাঁপিল অধর
আঁখি-কোণে দুটি অশ্রু ঝরে ।

কাতর মুখের পানে চেয়ে
সান্ত্বনার কথা বলে তারে,
গলা ধরে উঠিল কাঁদিয়া
সোহাগেতে বুকে চেপে ধরে।
যায় যায় পুন ফিরে এসে
মুখ-পানে চাহিল তাহার,
ভাঙ্গা প্রাণ আরো ভেঙ্গে গেল
উথলিত অশ্রু-পারাবার !
কুসুমের মত গেল ঝরে
ধীরে ধীরে একটি চুম্বন,
অশ্রুজলে ফুটে উঠে হাসি
বরষাতে রবির কিরণ !

(হাসি ও অশ্রু, ১৮৯৪)

সপ্তম বর্ষ

সরোজকুমারী দেবী

বসন্ত সপ্তম আজি হইল পূরণ !
সমস্ত অতীত হায় !
আজিকে নয়নে ভায়,
যে দিন প্রথম সেই নয়নে মিলন !
জাগিয়া মরত-বাসে স্বরগ-স্বপন !

কিশোর চপল সেই বালিকা হৃদয় !
কি গভীর প্রেমভরে
চাহিয়া মুখের পরে
দেখাতে গো আপনার হৃদি প্রেমময় !
সেত সেদিনের কথা, বহু দিন নয়।

তারপর জানাশোনা দুইটি পরাণে!
আকুল ব্যাকুল হৃদি
শূন্য পানে চেয়ে বাঁধি,
মাঝে বিরহের নদী মিলিব কেমনে,
কাটিত দীরঘ দিন আবার স্বপনে!

তখনো বিরহ শুধু, মিলন কোথায়!
নন্দন-সৌরভ ভেসে
পরাণে মিশিত এসে,
প্রেমের বিকাশ সে যে জানাইত হায়!
মুগ্ধ হিয়া শুধু তার আসার আশায়!

তারপর দেখাশোনা তোমায় আমায়।
পবিত্র প্রণয়কূলে
তুমি চেয়ে দেখ ভুলে,
আমি শুধু দেখিতেছি চাহিয়া তোমায়!
মুহূর্তে সে সুখস্বপ্ন ফুরাইল হায়!

আবার বাঁধিনু হৃদি, স্বরগের ফুল
দেখাতে মাধুরী তার
এসেছিল আর-বার,
পলকে চলিয়া গেছে ভাঙ্গাইয়া ভুল!
আমরা দুজনে চেয়ে, পাথার অকূল।

আজি কেহ নাহি আর আমরা দুজন!
নাহিক আশার আলো,
নাহি দুঃখ-ছায়া কালো,
শুধু সাধ পাশে পাশে কাটাতে জীবন।
হেন সপ্তবর্ষ শত হউক পূরণ।

(হাসি ও অশ্রু, ১৮৯২)

দুটি চুম্বন

সরোজকুমারী দেবী

আজ আমি এসেছি আবার !
ওগো তুমি মুখ তুলে, মুখপানে চাও ভুলে,
আঁখি দিয়ে দেখি একবার !
অতৃপ্ত এ দুটি আঁখি, ও মধুর মুখে রাখি,
চেয়ে চেয়ে দেখি শুধু হায়,
অবশ বিভুল বুকে, কি মোহ অধীর সুখে,
না জানি আজিকে সখি তায় !

আজ আমি এসেছি আবার !
কি দিব তোমায় তাই, কিছুই ভেবে না পাই,
লহ দুটি দীন উপহার।
ও রাঙা অধর দুটি, লাজ-বাঁধ গেছে টুটি,
কি মোহেতে মুগধ নয়ন ;
আপনারে গেছি ভুলে, চাও গো মুখানি তুলে,
ধর সখি দুইটি চুম্বন !

(হাসি ও অশ্রু, ১৮৯৪)

উপহার

সরোজকুমারী দেবী

(১)

সে দিনো কি আছিল এমনি !
গোধূলির আবছায়ে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সেই
পুরজনে করে হুলুধ্বনি !

আনত ঘোমটা-ছায়ে লুকায়ে গোপনে সেই,
একবার সলাজ চাহনি !
মিলিলে আঁখিতে আঁখি মরমেতে মরে যেন,
সরমেতে ফিরায় অমনি ।

(২)

এমনি কি আছিল সেদিন !
কিশোরের নবস্ফুট প্রেমের লতিকা মরি,
আপনায় আপনি বিলীন !
ফুটিতে চাহে না কথা লাজে উঠিত না আঁখি
সরমেতে ব্যাকুল অধীর !
তোমার নবীন প্রেম তৃষিত আকুল আঁখি
কি জানাত যাতনা গভীর !

(৩)

সে দিনো হেন কি ছিল হায় !
একেলা বিরহ-তীরে ফেলিয়া নয়ন-নীরে,
পূজিতাম কে জানে কাহায় !
গণিতাম প্রতিপল কখনো নিরাশ প্রাণে,
কখনো আশায় ভরা হিয়া ;
কখনো কল্পনা বুকে প্রেমাঞ্জলি সঁপিতাম,
প্রিয়ের চরণতলে গিয়া ।

(৪)

সে দিনো কি আছিল এমন !
আশা নিরাশায় কভু যাতনা-গরলময়,
কভু হেরি নন্দন-স্বপন !
কখনো নিরাশা এসে গাহিত একই গান
ডুবিতাম দারুণ আঁধারে,
আশা এসে খেলাত সে মধুর কুহকীময়
আপনার সৌন্দর্য-মাঝারে !

(৫)

ছিলনা ত কখনো এমনি !
আজিকে সর্বস্ব মোর তোমাতেই মিলাইয়া
ছুটিতেছি একই বাহিনী !
হাসি অশ্রু আজি মোর সকলি যে তোমাময়,
তোমাময় নিখিল সংসার,
মিলনের উপকূলে তোমারে পেয়েছি আজ,
দূরেতে বিরহ-পারাবার !

(হাসি ও অশ্রু, ১৮৯৪)

বৃথায়

সরোজকুমারী দেবী

বৃথায় গেঁথেছি ফুলহার !
দিয়াছিনু তার হাতে কণ্টক আছিল তাতে,
বুঝি করে ফুটেছে তাহার !
সারাটি রজনী ধরে' কাননে কাননে ফিরে'
গেঁথেছিনু সাধের এ মালা !
হাসিতে অশ্রুতে সারা দিনু ক'রে আত্মহারা
কে জানিত প্রেম নিয়ে খেলা !
সে কর পরশে তার পরাণের পারাবার,
হরষেতে উঠিল উচ্ছসি !
মুখে সরিল না কথা রয়ে গেল হৃদে ব্যথা,
সে যে হায় চলে গেল হাসি ।
মালাগাছি হাতে নিয়ে, দিয়ে গেল ফিরাইয়ে,
ফুলহার ধূলিতে লুটায় !
প্রেম প্রাণ কেন আর ! যার আছে থাক তার,
আমার ত সকলি বৃথায় !

(হাসি ও অশ্রু, ১৮৯৪)

সমর্পণ

সরোজকুমারী দেবী

সেই বিদায়ের কালে হাত দুটি ধরে,
সজল দুইটি আঁখে চাহি আঁখিপানে,
দুটি কথা বলেছিল নীরবে কাতরে ;
তারকা হাসিতেছিল সুনীল গগনে।

সুধীরে বহিতেছিল বসন্ত সমীর,
চুমি চুমি কুসুমের লাজমাখা মুখে ;
কি জানে কিসের সুখে তটিনী অধীর,
মধুর চাঁদের আলো উছলে সে বুকে !

নীরব সন্ধ্যায় সেই তটিনীর তীরে,
মুখপানে চাহি চাহি সজল নয়নে,
নীরব প্রাণের ভাষা কহিল সুধীরে ;
বুঝিল সে ভাষা দোঁহে দোঁহার পরাণে

দোঁহার পরাণ ল'য়ে যেন গো দু'জনে
সমর্পণ করিল সে সন্ধ্যার বিজনে।

(হাসি ও অশ্রু, ১৮৯৪)

দুরাকাঙ্ক্ষা

সরোজকুমারী দেবী

অসীম জীবন-স্রোতে নাহি ত কিনারা !
চলেছি তাহার মাঝে ভেসে ভেসে হায় !
উছলিছে ঊর্মিমালা পরাণের ছায়,
চেয়ে আছে তার পানে আঁখি আত্মহারা !

আধ-ফুটো আশাগুলি ধীরে সরে যায়,
মরমের ভাষা যেন ফোটে না ক' আর !
বৈতরণী বহে যায় পরাণে আমার,
তরঙ্গিত দিবানিশি ঘোর ঝটিকায় ।

ঝটিকা থামিত যদি দাঁড়াত সে এসে
একবার জীবনের মাঝখানে মোর,
ফুটিত কুসুমরাশি চরণ-পরশে
সে সুখ-স্বপনে আঁখি হইত গো ভোর ;

জীবন দুরাশা শুধু, মিটিবে না হায়,
আশায় আপনহারা প্রাণ তবু চায় !

হাসি ও অশ্রু, ১৮৯৪ ।

বিদায়োপহার

নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী

(১)

অবশে বিহ্বল প্রাণে
ছিলাম ঘুমের ঘোরে,
এ নিঠুর বজ্রনাদে
কেন গো জাগালে মোরে ?

(২)

"এই তবে শেষ দেখা
বিদায় লইনু আজ",
পড়িল মরমে মোর
যেন কি দারুণ বাজ !

(৩)

সহসা ভাঙ্গিয়া যেন
গেল গো সাধের বাঁশী,
সহসা নিবিল যেন
শারদ-চাঁদের হাসি।

(৪)

সহসা ফিরিল যেন
তটিনী উজান-পানে,
বাজিতে বাজিতে বীণা
বাজিল বেসুর তানে ;

৫)

তেমনি সহসা মোর
ভেঙে গেল ভাঙা প্রাণ,
সহসা আজি গো হেন
কে গাহে বিদায়-গান ?

৬)

এ বিদায়ে ভেসে যেন
আসে কার স্মৃতিটুকু,
মনে পড়ে একখানি
পূত-প্রেম-পূর্ণ মুখ

(৭)

যে হও সে হও যাও
প্রাণ যথা যেতে চায়,
স্বরগে আবার পুন
দেখা হবে দুজনায়।

(৮)

তুমি আমি ম'রে যাব
প্রেম ত মরণহীন
প্রেম-বলে সেই দেশে
মিলিব রে একদিন।

(৯)

আজি এ বিদায়কালে
কিবা দিব উপহার,
লও শুধু দুই ফোঁটা
এই দগ্ধ অশ্রুধার!

১৩০৩।১২ই বৈশাখ, হুগলী।

(প্রেমগাথা, ১৮৯৮)

হতাশের আক্ষেপ

নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী

(১)

এত দুখ দিতে হয়
ভালবাসি বলিয়া?
অবশ চিত্তের সনে,
যুঝিয়াছি প্রাণপণে
ফেলিতে মূরতি তব
হিয়া হ'তে মুছিয়া।

(২)

কই, তা গেল না মুছা
মরমেই রহিল,—
মুছে কি প্রেমের ভাতি,
নিবে কি আশার বাতি?
হৃদয় মথিয়া শুধু
তপ্ত শ্বাস বহিল।

(৩)

তুমি ত গিয়াছ ভুলে,
আমি নারি ভুলিতে,—
কত ছবি আঁকি মনে,
ধারা বহে দু'নয়নে,
মরমে আঁকিয়া মুছি
কল্পনার তুলিতে!

(৪)

কভু বা বিরলে বসি
করি মনে ভাবনা,—
যদিই সে কাছে আসে,
বলে বড় ভালবাসে,
নীরবে শুনিব শুধু
মুখ তুলে চাব না।

(৫)

নলিনী যেমন থাকে
রবি-পানে চাহিয়া,
কহে না একটি ভাষা,
নাহি কোন সাধ আশা,
নীরবে কেবল তারে
দেয় প্রেম ঢালিয়া।

(৬)

আমিও বাসিব ভাল
নীরবেতে তেমনি,
ক'ব না একটি কথা,
দেখাব না মর্ম্মব্যথা,—
নীরবে রহিব বাঁধা,
সাধ মোর এমনি।

(৭)

হায় মোর ভেঙে গেল
সে সাধের ভাবনা।
কেন স্মৃতিপটে আসি,
বাড়াও মমতারাশি,
কেন আর ফিরে চাও
বাড়াইতে যাতনা ?

(৮)

আঁখিতে মমতা ল'য়ে
ভালবাসা বুকেতে,
কেন আর দেখা দাও,
মাথা খাও সরে যাও !
যা হবার হবে মোর
তুমি রও সুখেতে।

(৯)

কেন আর ফিরে চাও
ব্যথা দিতে পরাণে ?
শুধুই নীরবে বসি,
স্মরিবে সে মুখশশী,
মুছিবে না সেই দাগ
প'ড়েছে যা পাষাণে।

(১০)

দেখিলে সে মুখ মোর
হিয়া উঠে উথলি,
ভাঙে যে বুকের বাঁধ,
জেগে উঠে কত সাধ,
নয়নের জলে বুক
ভেসে যায় কেবলি।

(১১)

তাই বলি কেন আর
ফিরে চাও বল না,
যেখানে বাসনা যাও,
এ মুখ লুকাতে দাও,
পায়ে পড়ি আর তুমি
স্মৃতিপটে খেল না।

১৩০৩।৩রা জ্যৈষ্ঠ, মুগড়িয়া।

(প্রেমগাথা, ১৮৯৮)

নীরবে

নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী

(১)

কি যে গো দারুণ ব্যথা
আমার এ বুকময়,
কি দারুণ ব্যথায় যে
পুড়িতেছে এ হৃদয়

(২)

নীরবে হৃদয়ে আছে
হায় সে অনন্ত ব্যথা,
একটি দিনের তরে
বলি নি একটি কথা।

(৩)

আজ যে গো পূর্বস্মৃতি
জাগিয়াছে সমুদয়,
আজ যে গো পোড়া বুকে
কত কি উচ্ছ্বাস বয়

(৪)

আর যে নীরবে হিয়া
পারে না সহিতে হায় !
নীরবে নীরবে যে গো
হৃদয় ফাটিয়া যায়।

(৫)

আজি গো তোমারে কব
একটি মনের কথা,
নতুবা মরমে আর
সহে না দারুণ ব্যথা !

(৬)

না গো না কব না আর
নীরবেই থাক্ থাক্,
মরমের আশা মোর
মরমেই মিশি যা'ক

(৭)

কব না মুখটি ফুটে
কখন(ও) একটি কথা,
বলিব না এ হৃদয়ে
কি অভাব কি যে ব্যথা।

(৮)

মরমের কথা মোর
নীরবে মরমে রবে,
যখন পরাণ যাবে
মোর সাথে সাথী হবে।

(৯)

সুখশান্তি নীরবেতে
হইয়াছে সমাধান,
কিছু প্রাণে নাহি মোর
নীরবতা-মাখা প্রাণ।

(১০)

আমি যে গো শুয়ে আছি
চির-নীরবতা-কোলে,
তবে আর কি হইবে
মিছে দুটো কথা বলে।

(১১)

নীরবে নীরবে থাক্
মরমের ব্যথা মোর,
নীরবে নীরবে যাবে
জীবনিশা হয়ে ভোর।

(মর্মগাথা, ১৮৯৬)

প্রিয় সম্বোধনে

নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী

কি মদিরা ঝরে সখে ! নয়নে তোমার !
হেরিলে পাগল হই,
আমি যেন আমি নই,
ত্রিজগত পলকেতে হয় একাকার !
মুহূর্ত্তেক মাঝে হয়,
অনন্ত জীবন লয়,
নবীন জীবন জাগে চকিতে আবার।
ভেবেছিনু মনে মনে,
দেখা হ'লে দুইজনে,
চোখে চোখে রব, বাধা মানিব না আর।
ব্যর্থ সে কল্পনা-লেখা,
যেমন হইল দেখা,
রোধিল শরম আসি মরমের দ্বার।
কি যেন ও চোখে ছিল,
সরবস্ব লুটে নিল,
নারিল সহিতে আঁখি ও আঁখির ভার।
হ'লনাক চেয়ে থাকা,
মিছা কল্পনারে ডাকা,
আজি শরমের কাছে প্রণয়ের হার।

(অমিয়গাথা, ১৯০১)

চোর

নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী

আমি যে বেসেছি ভাল আমারি কি দোষ ?
প্রাণভরা প্রেম ল'য়ে
তৃষায় আকুল হ'য়ে,
তুমি কি চাহনি সখা, মোর পরিতোষ ?

আমি বাসিয়াছি ভাল এই দোষ মম !
হানিয়া স্নেহের বাণ,
তুমি কি দাওনি টান—
এ ক্ষুদ্র পরাণে,—সত্য বল প্রিয়তম !

আমি বাসিয়াছি ভাল, দোষ এ আমার !
তুমি নব ঘনরূপে,
ঢাল নি কি চুপে চুপে ;
পিয়াসী চাতকী-মুখে অমিয়া-আসার !

ভাল বাসিয়াছি ব'লে দোষ দাও তাই,
শুনাইয়া তত্ত্বকথা,
চাহ এ বুকের ব্যথা,
মুছে দিতে—ছি ছি সখা লাজে ম'রে যাই

আমি কি একাই ভাল বেসেছি কেবল ?
আমিই কি শুধু হায়,—
আপনা ঢেলেছি পায়,
ঢাল নি গোপনে তুমি নয়নের জল ?

আমিই সমাধি শুধু লভেছি কি পায় ?
একটি মুহূর্ত তরে
তুমি কিগো স্নেহভরে,—
নীরবে নিস্তব্ধে বসি ভাবনি আমায় ?

আমিই কি শুধু তোমা করেছি পাগল ?
তুমি এ হৃদয়ে এসে,
মধুর—মধুর হেসে,
করনি কি ক্ষুদ্রপ্রাণ উন্মত্ত বিভল ?

তুমিই সরল সাধু, আমিই কি চোর ?
প্রাণের কবাট হানি,
হৃদয়-সিন্ধুক টানি,
তুমি কি সর্বস্ব চোর ! লুঠ নাই মোর ?

তোমারে দেখিয়া শুধু আমারি কি সুখ ?
নিকটে বসিলে তব,
তুমি কি ভোল না ভব,
বহে না অমিয়া-স্রোত ভরি তব বুক ?

আমিই কি চাহি শুধু দেখিতে তোমায় !
বল দেখি প্রাণময় !
চাহে নাকি ও হৃদয়,
বিভলে হেরিতে তব প্রেম প্রতিমায় ?

তুমিও যা কর সখা আমি করি তাই,—
তবু ভালবাসি ব'লে,
দোষ দাও নানা ছলে,
চোর হয়ে সাধু তুমি বলিহারি যাই !

ভাল বাসিয়াছি পেয়ে এই দোষ মোর,—
রাজা হ'য়ে হৃদাসনে,
বসিয়াছ স্ফুল্লমনে,
চোর হয়ে রাজা হলে—ধন্য পাকা চোর !

(অমিয়গাথা, ১৯০১)

প্রেম

নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী

(১)

মনে করি ভুলেছি তোমায়,
মনে হয় কাছে এলে,
দেখিব না আঁখি মেলে,
দেখা হ'লে চ'লে যাব আনত মাথায়

(২)

মনে হয় সে সকল কথা,
নাহি লেখা হিয়াতলে,
ডুবেছে বিস্মৃতি জলে,
মুছে গেছে মরমের দারুণ ব্যথা।

(৩)

কিন্তু অহো এ রীতি কেমন !
ভুলেও কেননা ভুলি,
কেন বা স্মৃতির তুলি,
আবার এ বুকে করে সে ছবি অঙ্কন !

(৪)

হেরে নীল নৈশাকাশে চাই,
ভাঙিয়া বুকের বাঁধ,
কত কথা কহে চাঁদ,
নীরব ভাষায় তার গেয়ান হারাই।

(৫)

স্মরি তোমা হেরি তারা-হার।
হেরি যবে ফুলবালা,
তাহে তব স্মৃতি ঢালা,
সারাবিশ্ব-ব্যাপী তুমি একি গো আবার

(৬)

যাহা কিছু মধুর ভুবনে,
তারেই দেখিলে চায়,
তব ছবি বুকে ভায়,
ভুলিয়াছি তবে আর বলিব কেমনে

(৭)

এবে দুঁহে বহু ব্যবধান,
তুমি মায়ারাজ্য পারে,
আমি মায়া-পারাবারে,
তবু কেন অলক্ষিতে টানিছ পরাণ ?

(৮)

চঞ্চলদামিনী সম সার,
কেন মিছা আস আর,
বাড়াইতে অন্ধকার,
কেন হেন টানাটানি ল'য়ে ছেঁড়া তার ?

(৯)

আজু কেন টানে প্রাণমন ?
কোন মন্ত্র হেন আছে
শতদূর—করে কাছে,
ভাঙা বীণা সপ্তমেতে বাজায় এমন ?
আমি জানি প্রেম সে গো, অন্য নহে জন ।

১৩০৩।১২ই আশ্বিন, হুগলী ।

(প্রেমগাথা, ১৮৯৮)

হতাশে

তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী

আমি দূর হ'তে দেখি তারে,

প্রাণ চায় কাছে ছুটে যেতে, তবু যেন সবে না চরণ

আমি সসম্ভ্রমে কই কথা,

প্রাণ চায় খুলিয়া বলিতে, তবু যেন আসে না বচন ॥

স্বতঃই নিরখি আমি তারে,

দেখা যেন ফুরাতে চাহে না, ফিরে ফিরে চাই মুখপানে,

দেখিবার তৃষা স্বধু বাড়ে,

কিছুতেই পিয়াসা ছুটে না, সারা প্রাণ চ'খে টেনে আনে।

মনে হয় নিশিদিন বসি',

এমনই চেয়ে মুখপানে, কোন এক শূন্য নিরালায়,

কথা কব' মুখোমুখী হ'য়ে,

কত কথা, অন্তরের ব্যথা, আপনা ভুলিয়া দুজনায়,

কভু বা আদরে ধরি' গলে,

কহিব অধীর স্বরে তা'রে, প্রিয়তমে! কত ভালবাসি।

পুন কভু সে বেড়িয়া মোরে,

তার ক্ষুদ্র বাহুলতা দিয়ে, কবে—সখা তোমারি এ দাসী।

কিম্বা কোনও শূন্য তীরে বসি,

করস্পর্শে মুগ্ধ আত্মহারা, চেয়ে রব দোঁহে দোঁহা পানে,

ভাষাহীন মনোভাবগুলি,

হিল্লোলে করিবে চলাচলি, নীরবেতে দুজনার প্রাণে।

কিন্তু হায় কল্পনা আমার,

কল্পনাই রবে চিরদিন, এ বাসনা পূরিবার নয়।

প্রাণ তাই করে হাহাকার,

দীর্ণচূর্ণ হয়ে যায় বুক, একথা যখনি মনে হয় ॥
উদ্দাম-উন্নত-লালসায়,
উচ্ছৃঙ্খল-মত্ত-প্রেম-ভরে, জ্ঞান-হারা ভাবি কতবার,
সেও বুঝি ভাবে মোরে,
ভালবাসে কাঁদে নিরালায়, সে হৃদয় বুঝিবা আমার।
তখনি এ ক্রূর ব্যবধান,
ভেঙে চুরে দূরে ফেলে দিয়ে, কাছে তার ছুটে যেতে চাই,
আমার সর্বস্ব দিব ভাবি,
কমনীয় ঐ চারু কর, বারেক যদি গো ছুঁতে পাই।
ভাবি পুনঃ না না কাজ নাই,
ব্যথা পায় যদি সে আমার, বাসনার তপ্তকরে ছুঁলে।
দূরে দূরে থাকি সদা তাই,
আকুল এ দীর্ঘশ্বাসে মোর, শুখায় যদি সে কাছে গেলে ॥
দূরে থেকে দেখি মুখখানি,
পাছে মোর তৃষিত নয়ন, বিঁধে তা'র নবনীত কায়,
কাছে তার তাই নাহি যাই,
পাছে মোর মলিন ছায়ায়, স্বর্ণকান্তি ম্লান হ'য়ে যায়,
সভয়ে সম্ভাষি তারে তাই.
প্রাণ খুলে বেদনা জানালে, স্বচ্ছ হৃদে রেখা পাছে পড়ে,
সমবেদনায়, প্রেমময়ী.
মমতার প্রস্রবণ পাছে, আপন কর্তব্য হ'তে নড়ে,
অনেক ভাবিয়া আমি তাই,
হতাশায় করিয়াছি স্থির, তাহার প্রেমের মন্ত্র লয়ে,
দীক্ষিত যোগীর মত আজ,
তারি ধ্যান করিয়া সম্বল, চলে যাব নির্বাসিত হ'য়ে।

(গৃহস্থ, ১৩১৭)

আকুল আহ্বান

স্বর্ণলতা বসু

(১)

এস গো ! আমার মানস দেবতা,
শূন্য হৃদয়-আসনে ।
(আমি) সরবস্ব দিয়া সাজায়েছি ডালি
অর্পিব তব চরণে ॥
(আমি) সারাটি যামিনী তব পথ চাহি,
নীরব নিশীথে প্রেমগান গাহি,
ঘুমভারে নত অলস নয়নে,
বসে আছি নিশি-শেষে ।
এস গো আমার সাধনের ধন !
অধরে মধুর হেসে ॥

(২)

এস গো ! আমার জনম মরণ
চির জীবনের সাথী ।
নিরাশা-আঁধার হিয়া-উপকূলে
আশার উজ্জল বাতি ॥
এস গো ! আমার হৃদয়ের ধন,
সুখ-অশ্রুনীরে পুজিব চরণ,
সাধের মালিকা পরাব গলায়
এস ! এস ! হৃদিবাসী ।
শান্তি-সুধা ভরি নিরমিয়া অর্ঘ্য
বসে আছে তব দাসী ॥

(৩)

কে জানিত ওগো! এ মিলন নিশি
বিরহে হইবে ভোর?
কে জানিত হায়! এ সুখের গীতি
বরষিবে আঁখিলোর॥
সযতনে গাঁথা চারু ফুলহার,
ঝরিবে প্রভাতে ভগ্নপ্রাণে
কে জানিত বল শুভ্র নিরমল
বাসন্তী প্রভাত মাঝে।
মলিন আননে দাড়াইব আমি
বিষাদিনী সাজে সেজে॥

(৪)

এস গো! আমার হে মনোমোহন
এস! একবার এসো!
দেবতার বেশে ফুল্ল অধরে,
মধুর মৃদুল হাসো।
কোথায় সুদূরে তটিনীর তীরে,
আকুল বাঁশরী বাজিতেছে ধীরে,
ফুলগুলি হাসি ফুটিয়া উঠেছে
অরুণ-আদর-পরশে।
অধীর চপল প্রভাতী সমীর
চুমিছে কপোল হরষে॥
(আজি) এ নব প্রভাতে সে করুণ তানে
পরাণ পাগলপারা,
ওগো মনোময়! এস গো! বারেক
মুছাতে নয়ন-ধারা॥

এস ! শোভাময় দেবতার বেশে,
দীনার আঁধার অন্তর-আকাশে
ধ্রুবতারাসম কর বরিষণ
বিমল কিরণ-ভাতি।
সে আলোকে মোর হউক উজ্জ্বল
মৃত্যু-আঁধার রাতি॥

(গৃহস্থ পত্রিকা, ১৩১৬)

সহযাত্রিণী

রমণীমোহন ঘোষ

যযাতি

আজিকে বিদায় তবে দেহ, দেবযানি,
ত্যাগ করি' আজন্মের রাজধানী
চলিয়াছি বনাশ্রমে।

দেবযানী

এখনি বিদায় !
কোন্ অপরাধ দাসী করিয়াছে পায় ?
এখনি সহস্র বর্ষ হয়েছে কি শেষ,
টুটেছে কি যৌবনের প্রমত্ত আবেশ,
নিত্যনব সুধা মোর কিছু নাই আর—
প্রিয়তম, ভোগতৃষ্ণা মিটেছে তোমার ?

যযাতি

মিটে নাই। মিটিবার নহে তো বাসনা,
ঘৃতাহুতি যত পায়—অনল-রসনা
তত বেশী জ্বলি উঠে। এ কি ভ্রান্তি হায়,
ভোগানলে দহিবারে চাহি বাসনায় !

যৌবন-মদিরা পান করি' নিশিদিন
জানি নাই বর্ষ মাস কেমনে বিলীন
হয়েছে স্বপনসম। ভোগ-অভিলাষ
তবুও বাড়িছে নিত্য, নাহি তা'র হ্রাস ;
তবুও জাগিছে চিত্তে অতৃপ্ত পিপাসা।
এতদিন পরে বুঝি আজি দীর্ঘ নিশা
হয়েছে প্রভাত, তাই মেলি দুটি চোখ
দেখিতে পেয়েছি শুভ্র জ্ঞানের আলোক।
আজি লভিয়াছি সত্যের আভাষ—
মরীচিকা নাহি পারে মিটাতে তিয়াষ।
ভোগ নহে, সুখ নহে, অটল অক্ষয়
পরিপূর্ণ শান্তি তাই খুঁজিছে হৃদয়।

দেবযানী

চল তবে, প্রিয়তম, ছাড়ি লোকালয়
শান্তিপূর্ণ তপোবনে লভিতে আশ্রয়।
যেথানে যাইবে তুমি ছায়ার মতন
দাসীও যাইবে সাথে।

যযাতি

আবার বন্ধন !
রমণীর প্রেমে ভুলি' ছিলাম সংসারে
আজি যাব বনবাসে, সেথাও কি তা'রে
লয়ে যাব সাথে করি' !

অয়ি দেবযানি,
পরিপূর্ণ ছিল মোর এ হৃদয়খানি
তোমার মোহনরূপে ; কখনো বাহিরে
অনন্ত বিশ্বের পানে চাহি নাই ফিরে ;
অলস মণ্ডূক যথা অবরুদ্ধ কূপে,
মগ্ন হয়ে ছিনু আমি রমণীর রূপে।

আজি সেই মায়ামোহ—সোনার শৃঙ্খল
সবলে ছিঁড়িয়া, শুধু আত্মার মঙ্গল
খুঁজিতে করেছি পণ। থাক তুমি, প্রিয়া,
একা আমি যাব আজি; অরণ্যে পশিয়া
করিব দুশ্চর তপ।—বিদায় এখন।

দেবযানী

হায়, নাথ, নারী শুধু বিলাসের ধন!
যৌবনের কাম্যবস্তু—ক্ষণিক অসার
খেলনা পুরুষহস্তে, নাহি কিছু আর
প্রয়োজন তা'র—খেলা হলে সমাপন।
ছিন্নদলপুষ্প-সম হেলায় তখন
দূরে ফেলে দিবে তা'রে! বিলাস-রঙ্গিণী
নারী শুধু! মুমুক্ষুর হইতে সঙ্গিনী
নাহি কোনো অধিকার? ধিক্ নারী-প্রাণ,
নীরবে কেমনে সহে এত অপমান
পলে পলে?

শুন আজ কহিব সে কথা,
গোপন হৃদয়তলে ছিল যেই ব্যথা
এতদিন। যবে পুত্রে সঁপি' জরাভার
তরুণ যৌবন মাগি' লইলে তাহার
ভুঞ্জিতে বিষয়সুখ—রূপ রমণীর—
আসিলে আমার পাশে পুলকে অধীর
আকুল করিলে মোরে সোহাগে আদরে—
তখন সহসা নারীজনমের পরে
জাগিল কি ঘৃণা মনে! জন্মিল ধিক্কার
এ রূপ লাবণ্যে—যাহে ছিল অহঙ্কার—
হেরি তব প্রত্যাগত নবীন যৌবনে
শুধু বাসনার জ্বালা? জ্ঞান হল মনে
মোর প্রতি তোমার সে অজস্র উচ্ছ্বাস

আদরের—প্রাণহীন শূন্য পরিহাস।
নীরবে আপনি সেই বিষ করি' পান
তবুও তোমায় সুধা করিয়াছি দান।
আজি নাথ শুভদিন, এস ব্রত ধরি'
হও তুমি ব্রহ্মচারী, আমি সহচরী
তপস্বিনী। মহারাজ, চল দুইজনে
ত্যজি রাজ্যভোগ যাই বিজন কাননে
পবিত্র প্রেমের ব্রত করি উদ্‌যাপন।
নিবে না বাসনা বহ্নি যোগালে ইন্ধন,
তপস্যার শান্তি-বারি করিয়া সেচন
নির্বাপিত কর তা'রে। করো না বর্জন
পুণ্যপথে এ দাসীরে।

যযাতি

অয়ি সুচরিতা,
কুসুম-কোমলা তুমি—বিলাস-লালিতা ;
কঠোর তপস্যা কভু সাজে কি তোমার ?
প্রিয় গৃহ পরিজন করি' পরিহার
কেমনে কাটাবে কাল অরণ্য-আশ্রমে
অনাসক্ত পতি-সনে ? অয়ি নিরুপমে
ভাল করে ভেবে দেখ।

দেবযানী

ভুলো না রাজন্‌,
ঋষি-কন্যা আমি, ভালবাসি তপোবন।
শিখিয়াছি সতীধর্ম। সে নির্জন বনে
প্রতিদিন ফুল তুলি আনিব যতনে
পূজিতে দেবাধিদেবে ; প্রভাতে প্রদোষে
গাহিব বন্দনাগীতি পরম সন্তোষে
কলকণ্ঠ-কণ্ঠ সনে মিলাইয়া স্বর।
হৃদয়ে বহিবে সদা তৃপ্তির নির্ঝর,

বিষয় বাসনা-জ্বালা, দুঃখ অবসাদ
স্পর্শিবে না কভু প্রাণ। দেব-আশীর্বাদ
যোড়করে যাচি' ল'ব দুজনার শিরে
ভক্তিভরে।

যযাতি

ধন্য আমি, সহধর্মিণীরে
চিনিতে পারিনু আজি।—তাই হোক প্রিয়া,
ভঙ্গুর বিষয়-ভোগস্পৃহা বিসর্জিয়া
চল তবে যাই মোরা শান্ত তপোবনে,
আত্মার অক্ষয় ধন—শান্তি-অন্বেষণে।

(দীপশিখা

মানসী

রমণীমোহন ঘোষ

আর কত বল ভুলাবে আমারে,
মানসকুঞ্জবাসিনি!
নবীন শোভায় নিত্য বিকশি'
চিত্তগগনে পূর্ণিমা-শশী,
একি গো রঙ্গে খেলা কর বসি'
সুন্দর শুভহাসিনি!
নব নব সাধ জাগাও পরাণে
নীরব মঞ্জুভাষিণি!
হেরি রূপ তব নিত্য নূতন,
অয়ি নির্মলবরণে!
মনে নাই কবে কোন্ স্থলগনে
কোথা আমাদের দেখা দুইজনে;

কি মূরতি ধরি' অয়ি বরাননে
নূপুর-মুখর চরণে
পশেছিলে আসি' হৃদয়ে আমার,
আজ নাই তাহা স্মরণে।

সংসার নিতি আসে মোর পাশে
হাতে লয়ে মায়া-শিকলি,
প্রকৃতি আমায় করে আবাহন
দেখা'য়ে তাহার শোভা অগণন,
পারে না বাঁধিতে কেহ মোর মন,
তুচ্ছ নেহারি সকলি।—

উজ্জ্বল তব রূপ অতুলন
জেগে থাকে হৃদে কেবলি!
তাই হেথা বসি' বিজন বিপিনে
বনমর্মর পবনে,
মানসে ও মুখ করি দরশন,
শুনি' শুধু তব অমিয় বচন,
ভুলে আছি আমি জীবন-মরণ
কঠিন মলিন ভুবনে।

দিবস রজনী রেখেছ ভুলাতে
স্বর্গের নব স্বপনে।
কত নব নব ছলনার পাশে
রেখেছ হৃদয় বাঁধিয়া!
কভু মুখ ঢাক টানি' আবরণ,—
কখনো মুক্ত অবগুণ্ঠন,
কভু হাসি,—কভু মান অকারণ,
কখনো বা উঠ কাঁদিয়া!

কখনো মৌন, কখনো সোহাগে
সান্ত্বনা কর সাধিয়া।

কাছে থাকি তবু থাকিবে কি দূর,—
কখনও চির-জীবনে,
অয়ি মায়াবিনি, অরুণ-অধরা,
আকুল-অলকা, নীল-অম্বরা,
বাহুবন্ধনে দিবে নাকি ধরা
মর্ত্ত্য বাসর-শয়নে!—
বাহিরিয়া আসি' অন্তর হ'তে
থাকিবে নয়নে নয়নে!

(প্রদীপ পত্রিকা, ১৩০৬)

অভিসার

বরদাচরণ মিত্র

(১)

জাগিনু নিশীথে ঘুমঘোর-মাঝে
দেখিয়া তোমারে স্বপনে,
বায়ু বহে মৃদু, তারকা-নিচয়
ফুটিয়া রয়েছে গগনে;
উঠিনু ত্বরায় শয়ন তেয়াগি,
চলিল না জানি কেমনে
চরণ আমার,—কি প্রভাব-বশে,—
তব বাতায়ন-সদনে।

(২)

আঁধারে মিলায় চঞ্চল পবন
নিসাড়া-সরিত-সলিলে,
চাঁপার সুবাস, সুখস্বপ্নপ্রায়,
মিলায় মৃদুল অনিলে,

কোকিলের কুহু মিলাইয়া যায়
পশি অন্তরের অন্তরে,
যথা মিলাইব আমি, প্রিয়তমে,
তোমার হৃদয় ভিতরে !

(৩)

দেখ প্রিয়সখি, প্রেম-যাতনায়
কি দশা হয়েছে আমার,
শুকায়েছে মুখ, তেজোহীন আঁখি,
মলিন হয়েছে অধর ;
চুম্বন বরষি এ শুষ্ক কুসুমে
বাঁচাও করিয়া করুণা,
হৃদয় উপরে হৃদয় রাখিয়া
ঘুচাও হৃদয়-বেদনা ।

(অবসর, ১৮৯৫)

জাগরণ

বরদাচরণ মিত্র

তাহারি লাগিয়া জাগিয়া জাগিয়া
নিশিতে আপনা পাশরি,
মধুকথা তার স্মৃতির মাঝার
পশে যেন দূর-বাঁশরী !
জ্যোৎস্নানিন্দিত তার রূপভাতি
উজলে আলোকে হৃদয়ের রাতি,
অতৃপ্ত কামনা
কুমুদ-বরণা
তরল রক্ততে ঝলসে !

নলিনী-কোমল তার মুখখানি
ভাসাই মানস-সরসেতে আনি,—
লহরী-লীলায়
প্রাণ ভেঙে যায়
অসহ সুখের অলসে !
পরিমল-মাখা অধরে সুহাসি
কোমল নিক্কণে বাজে হৃদে আসি,
বড় যে তাহায়
ভালবাসি, হায়,
মাণিক কি তায় পড়ে গো ?
মধুর বেদনে আঁখি ছল ছল
দেখেছি যে তার নয়নের জল,
চুমেছি যতনে
সে অমূল্য ধনে,—
মুকুতা কি তায় গড়ে গো ?
বসন্ত-পবনে সৌরভের মত,
তার মৃদু-শ্বাসে পিয়াসা সে কত,
দুলায়ে আদরে
হৃদি-ফুল-থরে,
পশিত মরম-নিভৃতে,
পরশ তাহার বিজলি সমান
পশিলে ক্ষরণে, মুরছে পরাণ,
মরণের সুখে
চাহি পুনঃ বুকে
সে ফুল-অশনি ধরিতে !
তাহারি ত লাগি সারানিশি জাগি
গগনে তারকা গুনি রে,
তারি সুধা কথা, তারি মধু ব্যথা,
তারি মৃদু-শ্বাস শুনি রে !

(অবসর, ১৮৯৫)

তুমি কি আমার ?

প্রিয়নাথ মিত্র

(১)

কে তুমি বসিয়ে একা এ অভাগা-ভবনে,
কার সুখে সুখী তুমি বল বিধু-বদনে ?
সদা প্রেম-সুধাদানে ,
তোষ প্রিয়ে কার প্রাণে ,
বল ওগো সুলোচনে ,
তুমি কি আমার ?
দিবানিশি হাসি হাসি,
তোমার এ মুখশশী,
বল ওরে বিধুমুখি,
তুমি কি আমার ?

(২)

অচলা-চপলা-সম আছ মম ভবনে,
আঁধার-হৃদয়-ভার ঘুচিয়াছে জীবনে ,
পাতার কুটিরে থাকি,
কি সুখে হয়েছ সুখী,
বল দেখি প্রিয় সখি,
তুমি কি আমার ?
আমার প্রাণের পাখি,
পাগলিনী তুমি নাকি,
তাই সদা সুখী দেখি,
বল বল বিধুমুখি,
তুমি কি আমার ?

(৩)

অভাগা-আঁধার-হৃদে কে গো তুমি ললনা,
সদাই হাসিছ তুমি কার সুখে বল না ?
কার সুখে সুখী এত,
দিবানিশি অবিরত,
আমোদ—আমোদে রত,
নিরানন্দ জান না ;
বল না কি ভাবি মনে,
সদাই আনন্দমনে,
বল বল সুবদনে,
তুমি কি আমার ?

(৪)

আঁধার-হৃদয় মোর আঁধার যে আছিল,
বদন সুধাংশু তব দুঃখ-তম নাশিল ;
কি জানি কি গুণ ধরে,
ও বদন-সুধাকরে,
হেরি যবে প্রেয়সি রে,
বদন তোমার,
স্বর্গ, মর্ত্য নাহি চাই,
সুখ, দুখ ভুলে যাই,
সুধাই তোমারে তাই,
তুমি কি আমার ?

(৫)

কুসুমে গড়েছে বিধি তোমার শরীর রে,
প্রেমের প্রতিমাখানি প্রেয়সী আমার রে !
ভালবাসি ভালবাস,
সদাই সুখেতে ভাস,
আদরে মাখান নাম
তাই কি তোমার ?

আমারে করিতে সুখী,
সদাই ব্যাকুলা দেখি,
বল দেখি বিধুমুখি,
তুমি কি আমার ?

(৬)

সদাই দেখিতে তোরে কেন ইচ্ছা যায় রে,
প্রেমময়ী মূর্তিখানি নয়নে উদয় রে ;
দেখিয়াছি কত বার,
দেখিতেছি বার বার,
তবুও মনের আশা,
হৃদয়ের সে পিপাসা,
নাহি তৃপ্তি পায় রে ;
তোমার মুখের হাসি,
কেন এত ভালবাসি,
দেখিবারে দিবানিশি,
বাসনা আমার,
বল ওরে প্রেয়সি রে,
তুমি কি আমার ?

(হরি[illegible] বিষাদ)

সাবধান

কুঞ্জলাল রায়

জানি আমি রূপবতী অতি
মূর্তিময়ী ষোড়শী যুবতী,
কিন্তু সাবধান !

কাল চুক্‌চুকে চুলগুলি
কাঁধে পিঠে হেলে দুলি দুলি
কভু কপোলে কভু কপালে
শোভায় শোভা শোভায় গালে,
কিন্তু সাবধান !

মিহি-হাসি-মাখা মুখখানি
তাহে মধুর, মধুর বাণী,
কিন্তু সাবধান !
নয়ন-কোণের দৃষ্টিপাতে
গগনের চাঁদ আসে হাতে,
কিন্তু সাবধান !

বসন চাপা যুগল কুচে
বোধজ্ঞান সব যায় ঘুচে,
কিন্তু সাবধান !
স্পর্শমাত্র হাত দু'খানি
তুষারসম শীতল প্রাণি,
কিন্তু সাবধান !

কি জানি কি আছে মনে তার,
জানা-শুনা নাহিক তোমার,
তাই সাবধান !
হতে পারে দৃশ্যে দেবাঙ্গনা,
মায়াবিনী কিনা ? নাহি জানা,
তাই সাবধান !

ভস্মচাপা বহ্নি যথা থাকে,
জানা নাই বিশ্বাস কি তাকে ?
সরলতা দেখায় বাহিরে
কুটিলতা লুকায়ে অন্তরে,
তাই সাবধান !

অভ্যস্তা কুটিলা মুখে মধু
হৃদয় গরলে ভরা শুধু,
কিন্তু সাবধান !
ওই হের হের হাতে তার
ফুলমালা মরি কি বাহার,
কিন্তু সাবধান !
আসে তব গলে দিতে ওই
বলে মুখে "তোমা ছাড়া নই",
কিন্তু সাবধান !
বিশ্বাস না কর রমণীরে
পিছু হাঁটি চলে যাও ধীরে,
হও সাবধান !

(মালা, ১৮৯৩)

স্মৃতিপথে

কুঞ্জলাল রায়

প্রাণের অধিক ভাল বাসিতাম যারে,
আগ্রহে যাহার হায় ! মুখ-চন্দ্রানন
অনিমিষে হেরি' আশা না মিটিত মোর
বিপলের তরে আজি নাহি দরশন ;
চিকুর কুন্তল-বেণী পৃষ্ঠেতে লম্বিত
ফণিনী জিনিয়া, শোভা কত মনোলোভা,
মদনের ফুল-ধনু যথা পরাজিত
যুগ্ম ভুরু আহা মরি অপরূপ শোভা !
নবনীত হেম আভা উভয় কপোলে,
সুচারু বংশীরে জিনি নাসিকা সুন্দর

দুইখানি ঠোঁট মরি সম বিম্বাধর
স্মৃতিপথে আসি আজি কাঁদায় অন্তর,
হায় স্মৃতি! কেন আজি মাতাও এভাবে,
ক্ষম স্মৃতি! ধরি পায়, ব্যথা পাই প্রাণে!

(মালা, ১৮৯৩)

হাসি

গোপালকৃষ্ণ ঘোষ

বিধি কি মধুর হাসি দিয়েছে সে বদনে।
সে যে হাসি সুধাময়—
সুধার অধরে রয়—
সরসী-হিল্লোল যেন মাখা শশি-কিরণে—

হাসিতেই যেন বিধি গড়েছে সে কামিনী;—
হাসি তার ওষ্ঠাধরে
হাসি সে কপোলোপরে—
হাসি তার দুটি চক্ষে—খেলে যেন দামিনী।

সে হাসি যখন আসি উজলিল নয়নে,
চমকিল আচম্বিত
এ মোর চকিত চিত—
জাগাইয়া যত মোর শৈশবের স্বপনে।

জ্ঞান হ'ল তারে আঁখি যেন কোথা হেরেছে;
যেন তারে জন্মান্তরে
হেরেছি স্বপ্নের ঘোরে,—
সে মাধুরী আজো তাই ভাঙা ভাঙা রয়েছে।

তবু তারে এত করে নারিলাম চিনিতে ;
কত রূপ গন্ধ আলো
থাকি থাকি চমকিল
ঘেরি ঘেরি প্রিয়মুখ লাগিলেক ঘুরিতে ;
তবু তারে এত ক'রে নারিলাম চিনিতে।

আঁধার কাননে পশি সৌদামিনী খেলিল ;—
আঁধারে আলোক ভরি—
আলো-অন্ধকার করি—
কত পরিচিত স্থল দেখাইতে লাগিল ;
কিন্তু সে বিহ্বল আঁখি চিনিবারে নারিল।

তার হাসি দিয়ে আমি তারে এবে জেনেছি—
ওই বটে সেই জন—
সেই মোর স্বপ্ন-ধন—
জন্ম জন্ম যারে আমি প্রাণে ভালবেসেছি !

(কুসুম-মালা, ১৮৭২)

উপমা

গোপালকৃষ্ণ ঘোষ

একদা প্রেয়সী হাসি সুধা হাসি
সুধাইল মোরে সুধার স্বরে -
"বলনা আমারে বুঝায়ে কাহারে
উপমা কহে সে পণ্ডিতবরে

পাঠ্যপুঁথিখানি রহিল পড়িয়া
পদ্ম আঁখি দু'টি হইল স্থির,
হাসিটুকু আসি আগ্রহে ডুবিল,
নয়ন ঘেরিল কৌতুক-নীর।

"অভিধান আমি দেখেছি যতনে—
অভিধান-কথা বুঝিতে নারি,
বুঝাইলে মোরে সরল ভাবেতে
তবে ত মরম বুঝিতে পারি।"

এতেক কহিয়া প্রেয়সী আমার
রহিল চাহিয়া উত্তর-আশে;
সে রূপ অন্তরে পশিল আমার
উজলিয়া মোর হৃদয়াকাশে।

উছলিল মোর প্রণয়-জলধি,
তাহাতে তরঙ্গ ছুটিল বেগে,
নানা ছাঁদে কিবা খেলিতে লাগিল
চিন্তার বিজলী ভাবের মেঘে।

যথা শোভা পায়, নীল-মেঘ-গায়,
সন্ধ্যার আগেতে সন্ধ্যার তারা,
যথা সরোবরে, সলিল উপরে,
ভাসে কুমুদিনী তরঙ্গ-হারা।

যথা মরুমাঝে শোভে শ্যাম দ্বীপ—
জুড়ায় পথিক-তাপিত-আঁখি,
যথা বনফুল শোভে বনস্থলে
শ্যামলতা-পরে শিরটি রাখি।

যথা নিরজনে কুসুম-কাননে,
বিমল-সলিলা সরসী মাঝে,
পূর্ণচন্দ্র-লেখা হাসি দেয় দেখা,
সাজায়ে নিশিরে রজত সাজে।

যথা কাল রাতে শোভে আলো করি
অমূল্য মাণিক রাজার নিধি,
যথা দীন-হৃদে—এ-ঘোর সংসারে—
আশামণি সেই দিয়াছে বিধি।

তুমি রে তেমতি—প্রেয়সি আমার—
পরাণ-পুতলি—আঁখির তারা—
বিরাজিছ এই হৃদয়-মাঝারে
আঁধার নিশির আলোক-পারা।

(কুসুম-মালা, ১৮৭২)

বিগত

গোপালকৃষ্ণ ঘোষ

উদয় হতেছে শশী হাসি হাসি গগনে ;
বিন্দু বিন্দু হীরা প্রায়
তারাদল শোভে তায়,—
তটিনীর কোলে কিবা দোলে তরু পবনে।

গত দিন—গত সুখ, প্রেয়সি রে, অমনি
তব মুখশশী সনে
উদয় হতেছে মনে,
উজলিয়া আজি মম এ অন্তর-রজনী।

দরশন—অনুরাগ—বিচ্ছেদেরি যাতনা—
মনে জ্ঞান হয় হেন
সে দিনের কথা যেন,—
কত কাল গেল কিন্তু বৃথা আশে দেখ না।

নহে এ অপার সিন্ধু কেমনেতে হইল!—
সময়েতে গেল সুখ
সময়েতে হ'ল দুঃখ,—
অবশেষে আশামাত্র অন্তরে না রহিল।

আর কি সে সব কথা, প্রিয়ে, মনে পড়ে না?
এ হেন নিশিতে বসি—
নীলাম্বরে শুভ্র শশী—
হেরিয়ে তারার মালা সে প্রাণ কি দহে না?

(কুসুম-মালা, ১৮৭২)

———

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ দেশপ্রেম-কবিতা

দেশপ্রেম-কবিতা

ভাষা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ।
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ॥
অগাধ দুঃখের জলে সদা ভাসে ভাষা।
কোন মতে নাহি তার জীবনের আশা॥
নিশাযোগে নলিনী যেরূপ হয় ক্ষীণা।
বঙ্গভাষা সেইরূপ দিন দিন দীনা॥
অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে।
কোনমতে কেহ নাহি সমাদর করে॥
পণ্ডিতের মনে মনে বিষম বিলাপ।
একেবারে ঘুচিয়াছে শাস্ত্রের আলাপ॥
ধর্ম্ম যান সত্য সহ দেশ পরিহরি।
ধর্ম্মভেদ মন্ত্রে বেদ মিছে খেদ করি॥
বিস্মৃতি হইল স্মৃতি স্মৃতি তার কত।
শ্রুতি হয় সকলের শ্রুতিপথ-চ্যুত॥
তন্ত্রের স্বতন্ত্র তন্ত্র সে তন্ত্র কে জানে।
কুতর্কে লইলে তর্ক তর্ক কেবা মানে॥
পুরাণ পুরাণ ব'লে করে নানা ছল।
নাহি মন গীতায় কি তায় পাবে ফল॥
এইরূপে হইতেছে শাস্ত্রের সংহার।
রীতি-নীতি প্রাণ ত্যজে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর॥

লোকের ভাষায় প্রতি ভাব দেখে বাঁকা।
সমাচার-পত্রে লিখে কত যাবে রাখা॥
শুন হে দেশের লোক দ্বেষ পরিহর।
পরস্পর পত্র প্রতি সমাদর কর॥
জানিলে জাতীয় বিদ্যা সুখ তাহে নানা।
থাকিতে উজ্জ্বল নেত্র কেন হও কানা॥
জ্ঞান বিদ্যা সুখ আদি লভ্য হয় যাহে।
রীতিমত সুবিদিত যত্ন কর তাহে॥
যাহার ইচ্ছায় সৃষ্টি হইল সকল।
সংবাদপত্রের তিনি করুন মঙ্গল॥

বঙ্গভূমির প্রতি

মধুসূদন দত্ত

My Native land, Good Night!
Byron

রেখ মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে!
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন ক'রো না গো তব মনঃ কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে, জীব-তারা যদি খসে,
এ দেহ-আকাশ হ'তে নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হ'বে, অমর কে কোথা কবে?
চির-স্থির কবে নীর, হায় রে জীবন-নদে?

কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি মা ডরি শমনে,
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে,
সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজনে;
কিন্তু কোন্ গুণ আছে যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে?

তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে মা যথা ফলে,
মধুময় তামরস, কি বসন্তে, কি শরদে।

(১৮৬২)

ভারত-ভূমি

মধুসূদন দত্ত

"Italia ! Italia ! O tu cui feo la sorte
Dono infelice di bellezza !"

Filicaia.

"কুক্ষণে তোরে লো, হায়, ইতালি ! ইতালি !
এ দুখ-জনক রূপ দিয়াছেন বিধি।"

কে না লোভে, ফণিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে ?
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে ?—
হায় লো ভারত-ভূমি ! বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি,
বিধাতা ? রতন-সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি !
নহিস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী ;
রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি ;
পুড়ি কামানলে, তোরে করে লো অধীনী,
(হা ধিক্ !) যবে যে ইচ্ছে, যে কামী দুর্মতি !
কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনি,
চন্দন হইল বিষ, সুধা তিত অতি ?

(চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৬)

বঙ্গভাষা

মধুসূদন দত্ত

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি !
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন !
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥

(চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৬)

স্বাধীনতা-সঙ্গীত

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়।
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায় !

দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গসুখ-তায় হে,
স্বর্গসুখ তায় !
এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয় !
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে,
ক্ষত্রিয়-তনয় ॥
তখনি জ্বলিয়া উঠে হৃদয়-নিলয় হে,
হৃদয়-নিলয় ।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
বিলম্ব কি সয় ?
অই শুন ! অই শুন ! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ ;
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ ।
চল চল চল সবে, সমর-সমাজে হে,
সমর-সমাজ ।
রাখহ পৈতৃক ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের কাজ হে,
ক্ষত্রিয়ের কাজ ।
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনার হে,
রাজপুতনার ।
সকল শরীর ছুটে রুধিরের ধার হে,
রুধিরের ধার ॥
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার ।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার ॥
কৃতান্ত-কোমল কোলে আমাদের স্থান হে,
আমাদের স্থান ।

এসো তার মুখে সবে হইব শয়ান হে,
হইব শয়ান ॥
কে বলে শমন-সভা ভয়ের বিধান হে,
ভয়ের বিধান ?
ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি যম* বেদের নিধান হে,
বেদের নিধান ॥
স্মরহ ইক্ষ্বাকু-বংশে কত বীরগণ হে,
কত বীরগণ ।
পরহিতে দেশ-হিতে ত্যজিল জীবন হে,
ত্যজিল জীবন ॥
স্মরহ তাঁদের সব কীর্তি-বিবরণ হে,
কীর্তি-বিবরণ !
বীরত্ব-বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়-নন্দন হে ?
ক্ষত্রিয়-নন্দন ॥
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
চল ত্বরা যাই ।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই ॥
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে,
চিতোর না পাই ।
স্বর্গসুখে সুখী হব, এস সব ভাই হে,
এস সব ভাই ॥

(পদ্মিনী উপাখ্যান, ১৮৫৮)

* যম সূর্যের পুত্র এবং ক্ষত্রিয়দিগের আদি যমও সূর্যের পুত্র ।

হায় কোথা সেইদিন

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

হায় কোথা সেইদিন ভেবে হয় তনু ক্ষীণ,
এ যে কাল পড়েছে বিষম।
সত্যের আদর নাই, সত্যহীন সব ঠাঁই,
মিথ্যার প্রভুত্ব পরাক্রম॥
সব পুরুষার্থ-শূন্য কিবা পাপ কিবা পুণ্য,
ভেদজ্ঞান হইয়াছে গত।
বীর-কার্যে রত যেই, গোঁয়ার হইবে সেই,
ধীর যিনি ভীরুতায় রত।
নাহি সরলতা লেশ, দ্বেষেতে ভরিল দেশ,
কিবা এর শেষ নাহি জানি।
ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, ক্ষীণ প্রাণ, ক্ষীণ পণ,
ক্ষীণ ধনে ঘোর অভিমানী।
হায় কবে দুঃখ যাবে, এ দশা বিলয় পাবে,
ফুটিবেক সুদিন-প্রসূন।
কবে পুনঃ বীর-রসে, জগত ভরিবে যশে,
ভারত ভাস্কর হবে পুনঃ?
আর কি সেদিন হবে, একতার সূত্রে সবে,
বদ্ধ রবে মননে বচনে?
পূজিবে সত্যের মূর্তি, প্রণয় পাইবে স্ফূর্তি
সুখদ সরল আচরণে?

(কর্মদেবী, ১৮৬২)

দিনের দিন্ সবে দীন

মনোমোহন বসু

দিনের দিন্ সবে দীন হয়ে পরাধীন !
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ !

সে সাহস বীর্য নাহি আর্যভূমে,
পূর্ব গর্ব সর্ব খর্ব হলো ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা-রাহু-মুখে লীন ! ১ ।

অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন ! ২ ।

তুঙ্গ দ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সারা শস্য গ্রাসে যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে
খোসা ভূষি শেষে, হায় গো রাজা কি কঠিন ! ৩ ।

তাঁতি, কর্মকার, করে হাহাকার, সূতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার—
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর, হ'লো দেশের কি দুর্দিন ! ৪ ।

আজ যদি এরাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ, কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ ?
ধ'রবে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ—বাকল্, টেনা,
ডোর, কপিন ? ৫ ।

ছুঁই সূতো পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে ; দীয়াশলাই কাটি,
তাও আসে পোতে ;
প্রদীপটি জ্বালিতে,
খেতে, শুতে, যেতে ;
কিছুতেই লোক্ নয় স্বাধীন ! ৬ ।

(১৮৭৪)

জন্মভূমি

(প্রবাসীর স্বদেশ-স্মরণ)

মনোমোহন বসু

আহা মরি! "স্বদেশ" কি সুধা-মাখা নাম!
মনে হয়, তার কাছে তুচ্ছ স্বর্গ-ধাম!
যে স্থানে মায়ার বস্তু, সকলি আমার!
সুখের বিষয় যথা, অশেষ প্রকার!
যে স্থানের পূর্বকথা, করিলে স্মরণ;
অনুরাগে উথলিয়া উঠে প্রাণ মন!
যেখানে আমার পিতা, পিতামহগণ,
বংশের মর্যাদা সদা, করিয়া পালন,
চিরদিন করি মান, যশের বিকাশ,
পুরুষে পুরুষে সুখে, ক'রেছেন বাস!
ফুলের সৌরভ সম, কুলের গৌরব,
যথা চির-ব্যাপ্ত! যথা জ্ঞাতি বন্ধু সব!
এত প্রেম, ভক্তির বন্ধন, যেই স্থলে—
আহা! আহা!
আর কি এমন স্থান, পাব ধরাতলে?

ভারত বিলাপ

(নির্বাচিতাংশ)

গোবিন্দচন্দ্র রায়

কতকাল পরে, বল ভারত রে!
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।
অবসাদ-হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ওকি শেষ নিবেশ রসাতল রে'
নিজ বাসভূমে, পরবাসী হলে
পর-দাস-খতে সমুদায় দিলে।

পর-হাতে দিয়ে, ধনরত্ন সুখে
বহ লৌহবিনির্ম্মিত হার বুকে।
পর ভাষণ, আসন, আনন রে
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে।
পর দীপশিখা, নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।
ঘুচি কাঞ্চনভাজন, সৌধ-শিরে
হলো ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে।

খনি খাত খুঁড়ে, খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে
পুঁজি-পাত নিলে যুটিয়ে লুটিয়ে।
নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে
পরিবর্ত্ত ধনে দুর্-ভিক্ষ নিলে।
মথি অঙ্গ হরে, পর স্বর্গ-সুখে
তুমি আজও দুখে তুমি কালও দুখে।
নিজ ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে
ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে।
বিধি বাদ হলে, পরমাদ ঘটে
পরমাদ হরে হিত-বোধ ঘটে।
কি ছিলে কি হলে, কি হতে চলিলে
অবিবেক-বশে কিছু না বুঝিলে।

নয়নে কি সহে, এ কলঙ্ক-দুখ
পর রঞ্জন অঞ্জনে কাল মুখ।
নিজ শোণিত শোষি, পরে পুষিলে
ভুষিতে কুল শীল স্বধর্ম্ম দিলে।

পর বেশ নিলে, পর দেশ গেলে
তবু ঠাঁই মিলে নাহি দাস বলে।
লভিয়ে বল বুদ্ধি, পরের বশে
হত জীবন চা অহিফেন চষে।

শিখিলে যত জ্ঞান, নিশীথে জেগে
উপযুক্ত হলো পর-সেবা লেগে।
হলো চাকরি সার, যথায় তথায়
অপমান সদায় কথায় কথায়।
শুনিবে বল কে, তব আপন কে
পরদাস-দশায় বধির সবে।
অহ! কে কহিবে এ সুদীর্ঘ কথা
সম সিন্ধু অপার অগাধ ব্যথা।
কহিতে বুক চায় দুভাগ হতে
নয়নে উথলে জল স্রোত-শতে।
কত নিগ্রহ নিত্য অশেষমতে
সহিতেছ নিরন্তর ঘাট-পথে।
নিজ ছায়া পড়ে, পর-কায়ে যদা
রহ ভীত পদে পথ-পাশে সদা।
পড়িলে পর তুঙ্গ-তুরঙ্গ-মুখে
হয় চাবুক চূর্ণ কপাল বুকে।
কি করে গুণগ্রাম, সহস্র ঘটে
শির না লুঠিলে রুটি নাহি ঘটে।
পরে ব্রহ্ম বধে, তৃণ নাহি নড়ে
তব ভ্রান্তি হলে ভূমিকম্প ধরে।
উলটে পৃথিবী, পরশ-পরশে
সুখশান্তি নভে হব কায়-রসে।
আজি যে টুকু মান, লভে কুকুরে
ঘটে সে টুকু না তব বাসী নরে।
করি যেমন কাটিছ, রাত্রি দিবা
জীবনে মরণে বল ভেদ কিবা।
মন চায় কষায়, কৌপীন পরি
তব দুঃখ গেয়ে সব দেশ ঘুরি।

(গীতিকবিতা, ১৮৮২)

যমুনালহরী

গোবিন্দচন্দ্র রায়

নির্ম্মল সলিলে,　　　বহিছ সদা।
তটশালিনী সুন্দরী যমুনে! ও (ধ্রু)

(১)

কত কত সুন্দর,　　　নগরী তীরে,
রাজিছে তটযুগ ভূষি ও।
পড়ি জল নীলে,　　　ধবল-সৌধ-ছবি,
অনুকারিছে নভঅঙ্গন ও।

(২)

যুগ-যুগ-বাহী,　　　প্রবাহ তোমারি,
দেখিল কতশত ঘটনা ও।
তব জল-বুদ্বুদ　　　সহ কত রাজা,
পরকাশিল, লয় পাইল ও।

(৩)

কল কল ভাষে　　　বহিয়ে, কাহিনী,
কহিছ সবে কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি,　　　মরম পরশে কথা,
ভূত সে ভারত-গাথা ও।

(৪)

তব জল-কল্লোল,　　　সহ কত সেনা,
গরজিল কোন দিন সমরে ও।
আজি শব নীরব,　　　রে যমুনে সব,
গত যত বৈভব কালে ও।

(৫)

শ্যাম সলিল তব,　　　লোহিত ছিল কভু,
পাণ্ডব-কুরুকুল-শোণিতে ও।
কাঁপিল দেশ,　　　তুরগ-গজভারে,
ভারত স্বাধীন যেদিন ও।

(৬)

তব জল-তীরে, পৌরব যাদব,
পাতিল রাজসিংহাসন ও।
শাসিল দেশ, অরিকুল নাশি,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

(৭)

দেখিলে কি তুমি, বৌদ্ধ পতাকা,
উড়িতে দেশ-বিদেশে ও।
তিব্বত-চীনে, ব্রহ্ম তাতারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

(৮)

এ জল-ধারে, ধারে বহিল কভু,
প্রেম-বিরহ-আঁখি-নীর ও।
নাচিল গাইল, কত সুখ-সম্পদ,
এ তব সৈকত-পুলিনে ও।

(৯)

এ তব-মুকুরে, আসি পূর্ণশশী,
নিরখিতে মুখ যবে শরদে ও।
ভাসিত দশ দিশি, উৎসব-রঙ্গে,
প্লাবিত চিত সুখ-উৎসে ও।

(১০)

সে তুমি সে শশী, ধীর অনিল সম,
তবু সব মগন বিষাদে ও।
নাহিক সে সব, প্রমোদ উৎসব,
গ্রাসিল সকলে কালে ও।

(১১)

যে মুরলী-রবে, নিবিড় নিশীথে,
উন্মাদিত ব্রজবালা ও।

আকুল প্রাণে, তব তট-পানে,
ধাইত রব-সন্ধানে ও।

(১২)

বর্ধিত বিরহে, শ্বাস-পবন কত,
বিরচিতো বলি তব হৃদনে ও।
সুহৃদ-সমাগমে, পুন এই দর্পণে,
প্রতিবিম্বিতো সিত হাসি ও।

(১৩)

সে সব কৌতুক, কাল-কবল আজি,
লেশ না রাখিল শেষ ও।
কই সেই গৌরব, নিকুঞ্জ-সৌরভ,
হলো পরিণত শত-কাহিনী ও।

(১৪)

কভু শত ধারে, এ উভপারে,
পাঠান আফগান্ মোগল ও।
ঢালিল্ সেনা, ত্রাসি নিবাসী,
ঘোর সে ভারত-বন্ধনে ও।

(১৫)

অহ! কি কুদিবসে, গ্রাসিল রাহু,
মোচন হইল না আর ও!
ভাঙ্গিল চুর্ণিল, উলটী পালটী,
লুঠি নিল যা ছিল সার ও।

(১৬)

সে দিন হইতে, অন্ধ মনোগৃহ,
পরবল—অর্গল-পাতে ও:
সে দিন হইতে, শ্মশান ভারত,
পর—অসি—ঘাত-নিপাতে ও।

(১৭)

সে দিন হইতে, তব জল তরলে,
পরশে না কুলবালা ও।
সে দিন হইতে, ভারত-নারী,
অবরোধে অবরোধিত ও।

(১৮)

সে দিন হইতে, তব তটগগনে,
নূপুর-নাদ বিনীরব ও।
সে দিন হইতে, সব প্রতিকূলে,
যেদিন ভারত বন্ধন ও।

(১৯)

এ পয়-পারে, কত কত জাতীয়,
ভাঙ্গিল কত শত রাজ্য ও।
আসিল স্থাপিল, শাসিল রাজ্য,
রচি ঘর কত পরিপাটী ও।

(২০)

কত শত দুর্জয়, দুর্গম দুর্গে,
বেড়িল তব তট-দেশে ও!
নগর-প্রাচীরে, ঘেরিল শেষে,
চিরযুগ সম্ভোগে আশে ও।

(২১)

উপহাসি সর্বে, মানব গর্বে
কাল প্রবল চিরকালে ও।
গৃহ-গড়-পুঞ্জে, কতিপয় তুঞ্জে,
রাখিল করি বিকলাকৃতি ও।

(২২)

ঐ পুরোভাগে, ভগ্ন বিভাগে,
গৃহবর শেষ শরীরে ও।

দেখিছ যে সব, উজ্জ্বল লেখা,
সে গত যৌবন-রেখা ও।

(২৩)

এর অলিন্দে, সুন্দরিবৃন্দে,
মোগল নরপতি-কেশরী ও।
বসি ও মর্মরে, উল্লাস অন্তরে,
তৌলিত মোহন রূপে ও।

(২৪)

কভু এ গবাক্ষে, কৌতুক-চক্ষে,
নিরখিত পরিজন লইয়ে ও।
নিম্ন প্রদেশে, সে গজ-যুদ্ধে,
ভীষণ প্রাণ-বিনাশক ও।

(২৫)

এ ঘর মাঝে, নারী-সমাজে,
বসি কভু খেলিত চৌসর ও।
রাখিত পাশে, সে তরবারি,
কাফের-কণ্ঠ-বিদারী ও।

(২৬)

কৈ? সব আজি, সময়-সমুদ্রে,
মজ্জিত সহ শত আশা ও।
দেখিল শত শত, হলো কি নিবারিত,
নিস্রূপ মনুজ-পিপাসা ও।

(২৭)

যে গৃহ-পাশে, কাঁপিত ত্রাসে,
ভূপতি পদ-বিক্ষেপে ও।
সে সব ভবনে, কত শত অধমে,
পুরিছে মূত্র পুরীষে ও।

(২৮)

যে ঘর মধ্যে, সুরভি সমুদ্ধে
সমোহিত চিত কালে ও।
সে সব সদনে, উদ্ভবে বমনে,
পূতি-গন্ধ-বিকীরণ ও।

(২৯)

যে গৃহ-অঙ্গে, বহুবিধ রঙ্গে,
বিখচিত ছিল মণিরাজি ও।
সে সব কালে, হরি এক কালে,
ঢাকিল লূতা-জালে ও।

(৩০)

এ তব তীরে, শুভ্র শরীরে,
দণ্ডায়িত গৃহ-রাজ ও।
যার স্বরূপে, দিক দিক হইতে,
কহে মনুজ-সমাজে ও।

(৩১)

কত নর-পঞ্জরে, নির্মিল ইহারে,
শোষি শোণিত-কোষে ও।
দর্শাইতে সব, দর্শক লোকে,
প্রমদা-গৌরব শেষে ও।

(৩২)

অহ ! কত কাল. রবে এ জীবিতে,
তটিনি ! তট তব শোভি ও।
ভূষণ হইয়ে, তব জল নীলে,
ব্যঞ্জিতে মন-অভিলাষে ও।

(৩৩)

হবে কোন কালে, হত ঘোর কালে,
পরিমিত সুর-পরমায়ু ও।

রহিবে শেষে, এ গৃহ-দেশে,
আকাশে মৃদু বায়ু ও।

(৩৪)

যদি এই শেষ, রবে সব শেষ,
জীবন-স্বপন-প্রভাতে ও।
তনু মন ক্ষয়িয়ে, দুঃখ শত সইয়ে,
চরিছে লোক কি আশে ও।

(গীতিকবিতা, ১৮৮২)

বন্দে মাতরম্

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বন্দে মাতরং
সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং
শস্য-শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর-ভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্ত-কোটি-কণ্ঠ-কল-কল-নিনাদ-করালে
দ্বিসপ্ত-কোটি-ভুজৈর্ধৃত খরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে!
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে॥

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী,
কমলা কমলদল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী।
নমামি ত্বাং,
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।

(১৮৮২)

জন্মভূমি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই ত আমার জগতে সার,
স্মৃতি-সুখকর জনম-ঠাঁই:
যেখানে আহ্লাদে নবীন আস্বাদে,
শৈশব-জীবন সুখে কাটাই॥
যে সুখের দিন আজ (ও) পড়ে মনে,
ভুলিব না যাহা কভু এ জীবনে,
যেখানেই থাকি যেথায় যাই।
হেরেছি কত নগরী নগর,
কত রাজধানী অপূর্ব সুন্দর,
এ শোভা ঐশ্বর্য কোথাও নাই॥

গৃহ ঘাট মাঠ তরু জলাশয়,
স্মৃতি-পরিমল-মাখা সমুদয়,
হেন স্থান আর কোথায় আছে।

জগৎ-জননী জনম-ভুবন,
গুরুত্ব-গৌরবে তুই অতুলন,
স্বরূপ (ও) নিকৃষ্ট তুয়ের (ই) কাছে

এই সে মণ্ডপ পবিত্র আলয়
(দশভূজা-পূজা কত সেথা হয়)
গীত-বাদ্যশালা সম্মুখে তায়।

সেই আটচালা নীচেই অঙ্গন,
ইষ্টক-মৃত্তিকা-প্রাচীরে বেষ্টন,
বোধনের বিল্ব পরশে যায়॥

হেরে যেন সব চারিদিক্ময়,
প্রাণভরা সুখে ভরিল হৃদয়
আবার যেন বা আসিল ফিরে।

শৈশব কৈশোর সুখের যৌবন,
বাল্য-সখা-সখী বৃদ্ধ গুরুজন,
আবার যেমন চৌদিকে ঘিরে॥

কত পুরাতন কথোপকথন,
হাস্য-পরিহাস সঙ্গীত-বাদন,
মানসের চক্ষে দেখিতে পাই।

পুনঃ যেন খেলি সঙ্গিগণে মেলি,
মাঠে ঘাটে ছুটি ক'রে জলকেলি,
কালাকাল তার বিচার নাই॥

কখন যেন বা ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর,
আতপ-উত্তপ্ত ফিরি নিজপুর,
জননী-নিকটে ছুটিয়া যাই

কখন (ও) যেন মার কোলে শুয়ে,
জড়সড় হয়ে আঁধারের ভয়ে,
আঁচলে ঢাকিয়া বদন লুকাই॥

কতদিন (ই) হয় সে মায়ের মুখ,
হেরি নাই চক্ষে—দিয়া চির-দুখ,
কাল দেছে মুছে সে আনন্দ-ছবি ;
কত সুখ কথা হইল স্মরণ,
আনন্দময়ীর হেরে সে বদন,
অন্ধকারে যেন উদিল রবি ;
কতই এ হেন স্মৃতির লহরী,
উঠিতে লাগিল প্রাণ-মন ভরি,
ভূতল আকাশ যে দিক্ হেরি ।
পুনঃ এল সেই নবীন যৌবন
পুনঃ সে ছুটিল মলয়-পবন,
কামিনী-কুসুমে পুনঃ শিহরি ;
ইন্দ্রিয়-উত্তাপে উন্নতির আশা,
ধন-যশ-লোভে বিজয়-পিপাসা,
আবার যেমন প্রাণে জুড়াই
যাহার আদরে বাল্য সুখে যায়,
যৌবন-আরম্ভে হারায়ে যাহায়,
কবিতা-সুধার আস্বাদ পাই ;
কতই আগের সুখ ভালবাসা,
কতই আকাঙ্ক্ষা কতরূপ আশা,
ফুটে উঠে প্রাণে যে দিকে চাই ·
কখন একত্রে কভু একে একে,
অনিমেষ চক্ষু আনন্দ-পুলকে,
হৃদয়-মুকুরে হেরি সদাই ;
আগেকার মত যেন হেরি সব,
আগেকারি মত পশু-পক্ষি-রব,
আগেকারি মত করি শ্রবণ ।
জুড়াতে পরাণ ইহার সমান,
নাহি কিছু আর, নাহি কোন স্থান,
চিরতৃপ্তিকর মধুর এমন ;

মহামহিময় হয় যদি স্থান,
দারুণ উত্তাপে জলে যায় প্রাণ,
তবুও সে দেশ স্বদেশ যার।
তাহার নয়নে তেমন সুন্দর,
মনোহর স্থান পৃথিবী সাগর,
নাহিক ভূতলে কোথাও আর॥

কে আছে এমন মানব-সমাজে,
হৃদি-তন্ত্রী যার আনন্দে না বাজে,
বহুদিন পরে হেরি স্বদেশ।
না বলে উল্লাসে প্রফুল্ল অন্তরে,
প্রেমভক্তি-মোহ-অনুরাগভরে,
এই জন্মভূমি আমার দেশ॥

তুমি বঙ্গমাতা এত হীন-প্রাণা,
এত যে মলিনা এত দীন-হীনা,
তোমার (ও) সন্তান স্বদেশে ফিরে।
হেরে তব মুখ মনে ভাবে সুখ,
প্রাণের আবেগে হইয়া সোৎসুক,
নিজ জন্মদেশ আনন্দে হেরে॥

হে জগৎপতি এ দাস-মিনতি,
রেখ এই দয়া বঙ্গমাতা প্রতি,
বঙ্গবাসী যেন কখনও কেহ।
যেখানেই থাক যেখানেই যাক,
যতই সম্মান যেখানেই পাক,
না ভুলে স্বদেশ-ভকতি-স্নেহ॥

(চিত্তবিকাশ, ১৮৯৮)

জন্মভূমি

(বীরবাহুর উক্তি)

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মাগো ওমা জন্মভূমি !
আরো কত কাল তুমি,
এ বয়সে পরাধীনা হয়ে কাল যাপিবে ।
পাষণ্ড যবনদল
বল আর কত কাল,
নির্দয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে ॥
কতই ঘুমাবে মাগো,
জাগো গো মা জাগো জাগো,
কেঁদে সারা হয় দেখ কন্যা পুত্র সকলে ।
ধূলায় ধূসর কায়,
ভূমি গড়াগড়ি যায়,
একবার কোলে কর, ডাকি গো মা, মা বলে ॥
কাহার জননী হয়ে,
কারে আছ কোলে লয়ে,
স্বীয় সুতে ফেলে ফেলে কার সুতে পালিছ ?
কারে দুগ্ধ কর দান,
ও নহে তব সন্তান,
দুগ্ধ দিয়ে গৃহমাঝে কালসর্প পুষিছ ।
মোরে দিলে বনবাস,
প্রিয়ে আছে কার পাশ,
হায় কত পীড়া পায় ও সুধাংশু-বদনে !
কোথা বসো কোথা যাও,
কিবা পর কিবা খাও,
হায় পুনঃ কতদিনে জুড়াইব নয়নে ॥

(বীরবাহু কাব্য, ১৮৬৪)

রাখি-বন্ধন

(কলিকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশন উপলক্ষে লিখিত)

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কি আনন্দ আজ ভারত-ভুবনে—
ভারতজননী জাগিল !
আহা কি মধুর নবীন সুহাসি
মায়ের অধরে রয়েছে প্রকাশি,
যেন বা প্রভাতী কিরণের রাশি
উষার কপোলে জ্বলিল !
মরি কি সুষমা ফুটেছে বদনে,
কিবা জ্যোতি জ্বলে উজ্জল নয়নে.
কি আনন্দে দিক্ পুরিল !—
ভারতজননী জাগিল !

পূরব বাঙ্গালা, মগধ, বিহার,
দেরাইসমাইল, হিমাদ্রির ধার,
করাচি, মান্দ্রাজ, সহর বোম্বাই,
সুরাটী, গুজরাটী, মহারাঠী ভাই,
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল ;
প্রেম-আলিঙ্গনে করে রাখি কর,
খুলে দেছে হৃদি—হৃদি পরস্পর,
এক প্রাণ সবে এক কণ্ঠস্বর
মুখে জয়ধ্বনি করিল।
প্রণয়-বিহ্বলে ধরে গলে গলে
গাহিল সকলে মধুর কাকলে
গাহিল—"বন্দে মাতরং,
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্য-শ্যামলাং মাতরং।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর-ভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরং।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরং।"

উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে
ভারত-জগত মাতিল।
আনন্দ-উচ্ছ্বাস ফুটেছে বদনে
মায়েরে বসায়ে হৃদি-সিংহাসনে,
চরণযুগল ধরি জনে জনে
একতার হার পরিল,—
পূরব বাঙ্গালা, অউধ, বিহার,
দর কচ্ছ দেশ, হিমাদ্রির ধার,
তৈলঙ্গ, মান্দ্রাজ, সহর বোম্বাই,
সুরাটী, গুজরাটী, মহারাঠী ভাই,
মা বলে ভারতে ডাকিল।
যোগনিদ্রা শেষ জননীর তায়,
হাসি মৃদু হাস নয়ন মেলায়,
নবীন কিরীট নব শোভাময়
যেন জ্যোৎস্নারাশি ভাতিল
ভারতজননী জাগিল।
গাও রে যমুনে, ভাসায়ে পুলিনে,
গাও ভাগীরথী ডাকি ঘনে ঘনে,
সিন্ধু গোদাবরী গোমতীর সনে
ভূবন জাগায়ে গা ের—
"যোগনিদ্রা শেষ আজি ভারতের
ভারত-জননী জাগেরে!"

আর নহে আজ ভারত অসাড়,
ভারত-সন্তান নহে শুষ্ক-হাড়,
দ্রাবিড় পঞ্জাব অউধ বিহার
এক ডোরে আজ মিলিল ;
ধ'রে গলে গলে আনন্দে বিহ্বল
চাহিছে মায়ের বদন-মণ্ডল,
দেখ্ রে মুহূর্তে ভারত-কঙ্কাল
জীবনের স্রোতে ভরিল।
আজি শুভক্ষণে ভারত-উত্থান,
এ দেউটি কভু হবে কি নির্বাণ ?
হে ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান
হের দুখ-নিশি পোহাল !
শত হৃদি বাঁধা একই লহরে
পূরব পশ্চিম দক্ষিণ সাগরে
হিমগিরি আজি মিলিল ;—
ভারতজননী জাগিল।
দেখ্ রে কিবা সে উজ্জ্বল নয়ন
উৎসাহ-ভাসিত মানব ক'জন
দৈববাণী যেন করিয়ে শ্রবণ
জীবনের ব্রতে নামিল।
জয় জয় জয় বল রে সবাই—
পূরবী পঞ্জাবী আজি ভাই ভাই—
সম তৃষানলে আশাপথে চাই—
একতার হার পরিল,—
ধন্য রে 'বৃটন' ধন্য শিক্ষা তোর,
যুগ-যুগান্তের অমানিশি ঘোর
তোরি গুণে আজ হ'ল উন্মোচন,
তোরি গুণে আজ ভারত-ভুবন
এ সখ্য-বন্ধনে বাঁধিল !

হবে কি সেদিন হবে কিরে ফিরে
বিশ কোটী প্রাণী জাগি ধীরে ধীরে
হয়ে এক প্রাণ, ধ'রে এক তান
ভারতে আপনা চিনিবে ;
বুঝিবে সবাই হৃদয়-বেদনা
ভারত-সন্তান জানিয়ে আপনা,
চিনিবে স্বজাতি—স্বজাতি-কামনা,
আপনার পর জানিবে !
আর কেন ভয়—হের তেজোময়
ভারত-আকাশে নব সূর্যোদয়
নবীন কিরণ ঢালিল,
ভারতের চির ঘোর অমানিশি
তরুণ কিরণে ডুবিল !
গাও রে যমুনে ছড়ায়ে পুলিনে
গাও ভাগীরথী ডাকি স্বনে স্বনে
গাও রে যামিনী পোহাল !
সবে ব'ল জয় ভারতের জয়
ভারতজননী জাগিল ।
যোগনিদ্রা শেষ দেখে জননীর
কে নহে রে আজ রোমাঞ্চ-শরীর,
কার না নয়ন তিতে রে ?
সহস্র বৎসর গোলামের হাল,
ভারতের পথে এত যে জঞ্জাল,
আজি তার ফল ফলে রে !
জীবন সার্থক আজি রে আমার
এ 'রাখি'-বন্ধন ভারত মাঝার
দেখিনু নয়নে—দেখিনু রে আজ
অভেদ ভারত চির-মনোরথ
পুরাবার তরে চলিল ।—

যে নীরদ উঠি 'রীপন'-মিলনে
শুষ্ক তরু-ডালে সলিল-সিঞ্চনে
আশার অঙ্কুর তুলিল পরাণে
সে আশা আজি রে ফুটিল !

জয় ভারতের জয়
গাও সবে আজ প্রমত্ত-হৃদয়
ভারতজননী জাগিল ॥

(১৮৮৩)

ভারত-বিলাপ

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভানু অস্ত গেল, গোধূলি আইল,
রবি-কর-জাল আকাশে উঠিল,
মেঘ হতে মেঘে খেলিতে লাগিল,
গগন শোভিল কিরণজালে ;—
কোথা বা সুন্দর ঘন-কলেবর
সিন্দূরে লেপিয়া রাগে থরে থর,
কোথা ঝিকি ঝিকি হীরার ঝালর
যেন বা ঝুলায় গগন-ভালে :

সোণার বরণ মাখিয়া কোথায়
জলধর জলে, নয়ন জুড়ায়,
আবার কোথায় তূলারাশি-প্রায়
শোভে রাশি রাশি মেঘের মালা ।

হেনকালে একা গিয়ে গঙ্গাতীরে
হেরি মনোহর সে তট উপরে
রাজধানী এক, নব শোভা ধরে
রয়েছে কিরণে হয়ে উজলা ।

দ্বিতালা ত্রিতালা চৌতালা ভবন
সুন্দর সুন্দর বিচিত্র গঠন
গোধূলি রাগেতে রঞ্জিত কায়।

অদূরে দুর্জয় দুর্গ গড়খাই,
প্রকাণ্ড-মূরতি, জাগিছে সদাই,
বিপক্ষ পশিবে হেন স্থান নাই :
চরণ প্রক্ষালি জাহ্নবী ধায়।

গড়ের সমীপে আনন্দ-উদ্যান,
যতনে রক্ষিত অতি রম্যস্থান,
প্রদোষে প্রত্যহ হয় বাদ্যগান,
নয়ন, শ্রবণ, তনু জুড়ায়।

জাহ্নবী-সলিলে এ দিকে আবার
দেখ জলযান কাতারে কাতার
ভাসে দিবানিশি—গুণবৃক্ষ যার
শালবৃক্ষ ছাপি ধ্বজা উড়ায় :

ওহে বঙ্গবাসি, জান কি তোমরা
অলকা জিনিয়া হেন মনোহরা
কার রাজধানী, কি জাতি ইহারা,—
এ সুখ সৌভাগ্য ভোগে ধরায় ?

নাহি যদি জান, এস এইখানে,
চলেছে দেখিবে বিচিত্র বিমানে
রাজপুরুষেরা বিবিধ বিধানে—
গরবে মেদিনী ঠেকে না পায়।

অদূরে বাজিছে "রুল ব্রিটানিয়া"
শকটে শকটে মেদিনী ছাইয়া
চলেছে দাপটে ব্রিটনবাসী
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আছে কোথায় ?

হায়রে কপাল, ওদেরি মতন
আমরাও কেন করিতে গমন
না পারি সতেজে—বলিতে আপন
যে দেশে জনম, যে দেশে বাস ?

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই,
ফুটিয়া ফুকারি বলিতে না পাই—
এমনি সদাই হৃদয়ে ত্রাস !

কি হবে বিলাপ করিলে এখন,
স্বাধীনতা-ধন গিয়াছে যখন
মনের মাহাত্ম্য হয়েছে নিধন,
তখনি সে সাধ গিয়েছে ঘুচে ।
সাজে না এখন অভিলাষ করা,
আমাদের কাজ শুধু পায়ে ধরা,
মস্তকে ধরিয়া দাসত্বের ভরা
ছুটিতে হইবে ওদেরি পাছে ।

হায় বসুন্ধরা, তোমার কপালে
এই কি ছিল মা, পড়ে কালে কালে
বিদেশীর পদে জীবন গোঁয়ালে,
পূরাতে নারিলে মনের আশা ।
রূপে অনুপম নিখিল ধরায়
করিয়া বিধাতা সৃজিলা তোমায়,
দিলা সাজাইয়া অতুল ভূষায়—
তোর কিনা আজি এ হেন দশা
হায় রে বিধাতা, কেন দিয়াছিলি
হেন অলঙ্কার ; কেন না গঠিলি
মরুভূমি করে,—অরণ্যে রাখিলি,
এ হেন যাতনা হতো না তার ।

তাহ'লে এখানে করিত না গতি
পাঠান, মোগল, পারস্থ দুর্মতি,
হরিতে ভারত-কিরীটের ভাতি,
অভাগা হিন্দুরে দলিতে পায় !

এই যে দেখিছ পুরী মনোহর,
শতগুণ আরো শোভিত সুন্দর,
এই ভাগীরথী ক'রে থর থর
ধাইত তখন কতই সাধে !

গাইত তখন কতই সুস্বরে
এই সব পাখী তরু শোভা ক'রে
কতই কুসুম পরিমল-ভরে
ফুটিয়া থাকিত কত আহ্লাদে ॥

আগেকার মত উঠিত তপন,
আগেকার মত চাঁদের কিরণ
ভাসিত গগনে—গ্রহ-তারাগণ
ঘুরিত আনন্দে ধরিয়া ধরা ।

যখন ভারতে অমৃতের কণা
হতো বরিষণ, বাজাইত বীণা
ব্যাস, বাল্মীকি,—বিপুল বাসনা
ভারত-হৃদয়ে আছিল ভরা ॥

যখন ক্ষত্রিয় অতীব সাহসে
ধাইত সমরে মাতি বীররসে,
হিমালয়চূড়া গগন পরশে
গায়িত যখন ভারত-নাম ;

ভারতবাসীরা প্রতি ঘরে ঘরে
গায়িত যখন স্বাধীন অন্তরে
স্বদেশ-মহিমা পুলকিত-স্বরে,—
জগতে ভারত অতুল ধাম ॥

ধন্য ব্রিটানিয়া ধন্য তোর বল,
এ হেন ভূভাগ ক'রে করতল,
রাজত্ব করিছ ইঙ্গিতে কেবল—
তোমার তেজের নাহি উপমা ;

এখন কিঙ্কর হয়েছি তোমার
মনের বাসনা কি কহিব আর ?
এই ভিক্ষা চাই ক'রো গো বিচার
অথর্ব দাসেরে ক'রো গো ক্ষমা ॥

দেখ্‌ চেয়ে দেখ্‌ প্রাচীন বয়েসে
তোর পদতলে পড়িয়ে কি বেশে
কাঁদিছে সে ভূমি, পূজিত যে দেশে
কত জনপদ গাহি মহিমা।

আগে ছিল রাণী ধরা রাজধানী,
স্মরণে যেন গো থাকে সে কাহিনী,
এবে সে কিঙ্করী হয়েছে দুখিনী
বলিয়ে দম্ভ ক'রো না গরিমা ॥

তোমারো ত বুকে কত শত বার
রিপু-পদাঘাত করেছে প্রহার,
কালেতে না জানি কি হবে আমার—
এই কথা সদা করিও ধ্যান।

ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার,
বাজিত গরজে—উথলি আবার
উঠিত ভারতে ব্যথিত প্রাণ ॥

(কবিতাবলী, ১৮৮০)

ভারত-সঙ্গীত

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

"আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি ,
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী
কিবা সুসজ্জিত, কিবা কুতূহলী,
বিবিধ মানবজাতিরে লয়ে।

"মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,
প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,
বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে,
দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে।—

"হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য নিজ বীর্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।

"মধ্যস্থলে হেথা আজন্মপূজিতা
চিরবীর্যবতী, বীর-প্রসবিতা,
অনন্ত-যৌবনা য়ুনানীমণ্ডলী,
মহিমা-ছটাতে জগৎ উজলি,
সাগর-ছেঁচিয়া, মরু গিরি দলি,
কৌতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায়॥

"আরব্য, মিশর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত—অন্য কব কি ?
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে, করে হেয়জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

"বাজ্‌ রে শিঙ্গা, বাজ্‌ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

এই কথা বলি মুখে শিঙ্গা তুলি
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী
গায়িতে লাগিল জনৈক যুবা।

আয়ত লোচন, উন্নত ললাট,
সুগৌরাঙ্গ তনু, সন্ন্যাসীর ঠাট,
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিল বিজলী,
বদনে ভাতিল অতুল আভা।—

নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
"বিংশতি কোটি মানবের বাস
এ ভারতভূমি যবনের দাস?
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা!

"আর্য্যাবর্ত্ত-জয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা,
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা?

"ধিক্ হিন্দুকুলে! বীরধর্ম্ম ভুলে,
আত্ম-অভিমান ডুবায়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে,
সোণার ভারত করিতে ছার!

"হীনবীর্য্য সম হয়ে কৃতাঞ্জলি,
মস্তকে ধরিতে বৈরি-পদধূলি,
হাদে দেখ ধায় মহাকুতূহলী,
ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার।

"এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্তভূমে,
দিক্ অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণ-রঙ্গ-মত্ত পূর্ব-পিতৃগণ,
যখন তাহারা করেছিল রণ,
করেছিলা জয় পঞ্চনদগণ,
তখন তাঁহারা ক'জন ছিল ?

"আবার যখন জাহ্নবীরকূলে
এসেছিলা তাঁরা জয়ডঙ্কা তুলে,
যমুনা, কাবেরী, নর্মদা পুলিনে,
দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, দাক্ষিণাত্যবনে ;
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে,
তখন তাঁহারা ক'জন ছিল ?

"এখন তোরা যে শত কোটি তার,
স্বদেশ-উদ্ধার করা কোন্ ছার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে.
সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়া করিলে পণ।

"তবে ভিন্ন জাতি শত্রু-পদতলে
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে ?
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হইতে করিস্ মন ?

অই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা, দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিতে যেরূপে দিক্ শোভা করে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল !

"সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন (ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাগিরি এখন (ও) উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখন (ও) ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল।

"কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন-সম
হিন্দু বীর দর্প, বুদ্ধি, পরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধি-সীমা ?

"সকলি ত আছে, সে সাহস কই ?
সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই ?
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই ?
কোথারে আজি সে জাতি-মহিমা !

"হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি !
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি ?
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি !—
আর কি ভারত সজীব আছে ?

সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীর-পদ-ভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সেদিন ঘুচিয়া গেছে !"

এই কথা বলি অশ্রুবিন্দু ফেলি,
ক্ষণমাত্র যুবা শৃঙ্গনাদ ভুলি,
পুনর্বার শৃঙ্গ মুখে নিল তুলি,
গর্জিয়া উঠিল গম্ভীর স্বরে—

"এখন (ও) জাগিয়া উঠরে সবে,
এখন (ও) সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবি-কর-সম দ্বিগুণ প্রভাবে,
ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক'রে।

"একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
করি দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা,

"জপ, তপ, আর যোগ-আরাধনা,
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তূণীর কৃপাণে কর্ রে পূজা!

"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু, উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধরে'
স্বকার্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও!

"তবে সে পারিবে বিপক্ষে নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হতে,
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে একণে পাদুকা বও

"ছিল বটে আগে তপস্যার বলে
কার্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে,
সংগ্রাম করিত অমরগণ

"এখন সেদিন না হ'ক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবে না,—হবে না—খোল্ তরবার;
এ সব দৈত্য নহে তেমন।

"অস্ত্র-পরাক্রমে হও বিশারদ,
রণ-রঙ্গ-রসে হওরে উন্মদ,—
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ,
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও!

"কিসের লাগিয়া হলি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান-বুদ্ধিজ্যোতিঃ তেমতি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে পড়ে লুটাও?

"ওই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা করে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল ;
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন (ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখন (ও) উন্নত,
সে জাহ্নবী-বারি এখন (ও) ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল ?

বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?"

(কবিতাবলী, ১৮৮০)

মাতৃ-স্তুতি

(নির্বাচিতাংশ)

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

১

জনন, পালন, পুন শোধন, তোষণ,
জননী এ সকল কারণ ;—
যাঁর প্রেম-সিন্ধু পরে, মায়ার তরঙ্গ ভরে,
বিশ্ব-বিম্ব বিহরে লীলায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

২

না জন্মিতে আমি, মম মঙ্গল-কামনা!—
হেন প্রেম ধরে কোন্ জনা?
পেতে সুত সুলক্ষণ, কত ব্রত-আচরণ,
কত বা মনন দেবতায়!
প্রসীদ, প্রসন্না-মনা জননী আমায়!

১১

বিরলে বসিয়া করি যখন চিন্তন,
সিন্ধুজলে তরঙ্গ যেমন,—
হৃদে তব স্নেহ কথা, একে একে উঠে তথা,
যত স্মরি তবু না ফুরায়!
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায়!

১৭

বিলোকন তব রূপ হয় কল্পনায়,—
রত্ন-বেদী, বসি তুমি তায়,
বিশুদ্ধ প্রেমের ছবি, অনল, তরুণ রবি,
রক্ত-বাসে বিজড়িত কায়!
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায়!

(মহিলা, ১৮৮০)

গাও ভারতের জয়

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিলে সব ভারত সন্তান,
একতান মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি অভ্রভেদী হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত-খনি কত মণি-রত্নের নিধান!
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়।

কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়!
রূপবতী সাধ্বীসতী, ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয় ইত্যাদি।

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন,
বাল্মীকি বেদব্যাস ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত-ভূষণ।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয় ইত্যাদি।

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি!
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয় ইত্যাদি।

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথুরাজ আদি বীরগণ !
ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল-ধূমকেতু,
আর্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয় ইত্যাদি ॥

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতোধর্মস্ততো জয় !
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল
মায়ের মুখ উজ্জ্বল হইবে নিশ্চয়।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, ইত্যাদি ॥

(১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে হিন্দুমেলার
দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে গীত হয়)

ভারত-ললনা

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।
অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি,
হও বীরজায়া, বীর-প্রসবিনী।
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,
বীর-গুণগাথা, বিক্রম-কাহিনী,
স্তন্যদুগ্ধ যবে পিয়াও জননী।
বীরগর্বে তার, নাচুক ধমনী,
তোরা না করিলে এ মহাসাধনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না

বঙ্গনারী

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কি পাপে পাঠালে বিধি করে বঙ্গনারী।
প্রকৃতিরঞ্জিত ছবি জন-মনোহারী॥
জলে স্থলে শূন্যে একা, স্বরূপ লাবণ্যমাখা,
এ পোড়া নয়ন আছে দেখিতে না পারি।
পিঞ্জরের পাখীসম, দিবানিশি অষ্ট যাম,
ঘুরে ফিরে এক ঠাঁই, বার বার তা নেহারি।
সেই বাড়ী সেই ঘর, সেই দ্বার নিরন্তর,
দেখে দেখে ক্লান্ত আঁখি আর না দেখিতে নারি।
এ চক্ষের কি এই ফল, দিবানিশি অশ্রুজল,
বহিছে অজস্রধারে, যেন নির্ঝরের বারি।
মোরে অন্ধকারে রাখ, প্রকৃতির রূপ ঢাক,
তামসী নিশার সম ঘোর আঁধার প্রসারি॥

(জাতীয় সঙ্গীত, ১৮৭৬)

ভারতমাতা

রাজকৃষ্ণ ঘোষ

"ম্লান মুখচন্দ্র ভারতি তোমারি,
হেরি দিবানিশি ঝরে নেত্রবারি,
নিয়ত যে কান্তি, বরষিত শান্তি,
আজি তা কেমনে এমন নেহারি;
দুখ-পারাবারে, নিরখি তোমারে,
হৃদয়ে ধৈরজ ধরিতে না পারি।"

মধুর বচন করিয়া শ্রবণ
চকিতা দুখিনী ফিরায় নয়ন
অমৃতভাষিণী তরুণী পানে ;
অদৃষ্টের ফের, হায়, দৃষ্টিহারা
পূর্বতেজস্বিনী নয়নের তারা ;
কিছু না হইল জ্ঞানের উদয় ;
পুনঃ কমলিনী ভাষ সুধাময়
বর্ষিলা মধুর মধুর তানে ।

"দেখ গো ভারতি তোমারি সন্তান
ঘুমায়ে রয়েছে সবে হতজ্ঞান ;
বলবীর্যহীন, অন্ন বিনা ক্ষীণ,
দেখিয়া দুর্দশা, বিদরয়ে প্রাণ ;
হেরিতে না পারি এ দশা তোমার,
দেশের সুখের মুখে দিয়া ছার,
হইয়া অপার জলনিধি পার,
চলিলাম আজি ত্যজি এই স্থান ।"

দুখিনী আবার চাহিলা চকিতে,
কিন্তু সংজ্ঞা তাহে না হইল চিতে
দেখিয়া চপলা অদৃশ্য হইল ;
অমনি আলোকমালিকা নিভিল ।

কতক্ষণ পরে আর্তনাদ করি
উঠিলা দুখিনী, যেন চোরে হরি
লয়ে গেছে তাঁর মাথার মণি ;
সন্তানগণেরে চান জাগাইতে
আলস্যে কেহই না চাহে উঠিতে,
যে জাগে সে পুনঃ যায় ঘুমাইতে,
করেন জননী রোদনধ্বনি ।

অবশেষে জাগি উঠিল সকলে,
"কি খাব মা, খাব" ক্ষুধাভরে বলে,
কহেন জননী "কি বলিব, হায়,
গিয়াছেন লক্ষ্মী ছাড়িয়া আমায় ;
অন্ন আর কোথা পাইব এবে ;
কমলা এখন সাগরের পারে,
বিরাজেন মহারাণীর আকারে,
অন্ন কর বাছা তাঁহায় সেবে।"

"জয় মহারাণী জয় জয় জয়,
বিপদ্-সময় দেহ মা আশ্রয়",
হৃদয় ভরিয়া, উৎসাহ করিয়া,
কহিল কাতরে তনয়চয়।

হেনকালে শ্বেতকান্তি মহাবীর,
জলদগ্নি কোপে কম্পিতশরীর,
বিদ্রোহী বলিয়া, ভর্ৎসিয়া গর্জিয়া,
পদাঘাত করে, নিষ্ঠুর অন্তরে,
সন্তানগণের গায়।
দেখিয়া দুঃখিনী জন্মভূমি,
বলে "অহে বিধি, কোথা আছ তুমি ?
ছাড়িলেন লক্ষ্মী আমায় যে কালে,
কেন না গেলাম ডুবিয়া পাতালে ?
কোথায় হরিশ, কোথায় গিরিশ,
কোথা ফেলি গেলি মায়।"

কবিতামালা)

শূন্য কৌটা

রাজকৃষ্ণ রায়

১

একদা বিরক্ত হ'য়ে জন-কোলাহলে
চলিলাম শান্তি-লাভে বিজন কাননে ;
নিবিড় পাদপশ্রেণী, দৃষ্টি নাহি চলে ;
বসিলাম স্থির হ'য়ে চিন্তাময় মনে।
ব'সে আছি ; অকস্মাৎ করিলাম দৃষ্টিপাত
পিছনে—অনতিদূরে পড়িল নয়নে
একটি সুচারু কৌটা বিজন কাননে।

২

নিরজন বনে কৌটা ! বিচিত্র ব্যাপার !
কুতূহলী হ'য়ে সেটি কুড়ায়ে নিলাম।
খুলিলাম তাড়াতাড়ি, ভিতরে তাহার
কি আছে, দেখিতে আশা, শেষে দেখিলাম
কিছু নাই—শূন্যময় ; কিন্তু হেন বোধ হয়,
আছিল রতন তা'য় দেখি' জানিলাম,
যেহেতু রতন-চিহ্ন লক্ষ্য করিলাম।

৩

নারকী কলুষী চোরে করিয়া হরণ
এ কৌটারে, আনি' এই অটবী মাঝার,
আত্মসাৎ করিয়াছে কৌটার রতন,
খালি কৌটা ফেলে গেছে আঁটিয়া আবার।
বিবিধ রঞ্জনে আঁকা কৌটা এবে ধূলিমাখা,
রতন হারায়ে যেন মলিন-আকার ;
বাসী ফুল্ল ফুল যথা পল্লব মাঝার।

৪

নিরখি' কৌটায়, মনে হইল উদয়
ভারতভূমির দশা, দুখের কাহিনী!—
স্বাধীনতা-রত্ন-হারা এবে শূন্যময়—
ভারত এ কৌটা সহ অদৃষ্টভাগিনী!
চিত্ত হ'ল ব্যাকুলিত, নানা চিন্তা সমুদিত
হইল মানসে; হায়, দুখের কাহিনী!—
ভারত এ কৌটা সহ অদৃষ্টভাগিনী!

(অবসর-সরোজিনী)

ওঠ, জাগ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঠ! জাগ! বীরগণ! দুর্দান্ত যবনগণ
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।
হও সবে এক প্রাণ মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ॥
এত স্পর্দ্ধা যবনের, স্বাধীনতা ভারতের,
অনায়াসে করিবে হরণ।
তারা কি করেছে মনে, সমস্ত ভারতভূমে,
পুরুষ নাহিক একজন?
'বীর-যোনি এই ভূমি, যত বীরের জননী',
না জানে এ কথা তারা অবোধ যবন।
দাও শিক্ষা সমুচিত দেখুক বিক্রম॥
স্বদেশ-উদ্ধার তরে, মরণে যে ভয় করে,
ধিক্ সেই কাপুরুষে শত ধিক্ তারে,
পচুক সে চিরকাল দাসত্ব-আঁধারে।
স্বাধীনতা বিনিময়ে, কি হবে সে প্রাণ লয়ে,
যে ধরে এমন প্রাণ ধিক্ বলি তারে॥

যায় যাক্ প্রাণ যাক্, স্বাধীনতা বেঁচে থাক্
বেঁচে থাক্ চিরকাল দেশের গৌরব।
বিলম্ব নাহিক আর, খোল সবে তলোয়ার,
ঐ শোন ঐ শোন যবনের রব॥

(পুরুবিক্রম, ১৮৭৪)

চল্ রে চল্ সবে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

চল্ রে চল্ সবে ভারত-সন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান !
বীর-দর্পে পৌরুষ-গর্বে
সাধ্ রে সাধ্ সবে দেশের কল্যাণ !
পুত্র ভিন্ন মাতৃ-দৈন্য
কে করে মোচন ?
উঠ, জাগো, সবে বল—মা গো !

তব পদে সঁপিনু পরাণ।
এক তন্ত্রে কর তপ,
এক মন্ত্রে জপ্ ;
শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য মোর এক,

এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ-দেশান্তে যাও রে আনতে
নব নব জ্ঞান
নব ভাবে, নবোৎসাহে মাতো
উঠাও রে নবতর তান।

লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন
না করি দৃক্‌পাত
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়
তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি
হিন্দু-মুসলমান;
এক পথে এক সাথে চল
উড়াইয়ে একতা-নিশান।

(বাণাবাদিনী, ১৮৯৮)

সরস্বতী-পূজা

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১

কবি-কুঞ্জবনে তুলিতে কুসুম
কে যাবি রে সাথে আয়,
যদি জুড়াবি তাপিত প্রাণ।
শোক, তাপ, জরা, যন্ত্রণা তথায়
অনায়াসে ভুলা যায়;
ভবে সেই মাত্র সুখ-স্থান!

২

দেবতা-বাঞ্ছিত ত্রিদিব আলয়
কতই বা শোভা ধ'রে?
সে'ত কপোলকল্পিত কথা।
কবি-হৃদ্-কুঞ্জ অকল্পিত স্বর্গ
দেখগে অবনী 'পরে,
আহা, সকলি সুন্দর তথা!

৩

কোথা পারিজাত দেবের পীযূষ,
ইন্দ্রের অমরাবতী,
তা'কি দেখেছ কখনও চোখে ?
ভ্রান্ত মানবের সুখতৃষ্ণা হেতু
বাসনা প্রবল অতি,
তাই স্বরগ স্বপনে দেখে।

৪

কত উচ্চ স্থানে আছে সে স্বরগ,—
স্বরগই কত দূর ?
স্বর্গ কোথায় আছে কে জানে ?
কবি-হৃদ্-স্বর্গ সীমাশূন্য রাজ্য
জীবন্ত অমরাপুর
অতি পবিত্র উন্নত স্থানে।

৫

•থাকে যদি সুধা, থাকে পারিজাত,
ইন্দ্রের অমরাবতী,
তবে আছে তা' কবির হৃদে।
থাকে যদি সুখ, শান্তি, স্বাধীনতা,
পবিত্র ভকতি, প্রীতি,
তবে আছে তা কবির হৃদে

৬

কবি-কুঞ্জবনে জীবন্ত নন্দন
স্বর্গাদপি গরীয়সী ;
আমি কি দিব তুলনা আর ?
বৃক্ষে মোক্ষ ফলে, ফুলে সুধা [illegible],
পত্রে শান্তি ছায়ারাশি,
মূলে ভক্তি-প্রেম-ধারা তা'র

৭

অনন্ত-প্রসর বিবেক-প্রান্তর
প্রেমের পরিখা-বেড়া,
তাহে অমৃত-প্রবাহ বহে।
(মাঝে) অতি মনোহর শান্তি-সরোবর,
মোক্ষ-বৃক্ষ, বল্লী-বেড়া,
চরে চৈতন্য-সাগর তাহে।

৮

শ্বেত-স্বচ্ছদল জ্ঞানের কমল
প্রস্ফুটিত সারি সারি,
তাহে প্রীতি-মকরন্দ ক্ষরে
মনোভৃঙ্গ তায় মত্ত, মধু খায়
ফুলে ফুলে সবে উড়' ;
সুখ-প্রমত্ত ঝঙ্কার ছাড়ে।

৯

কুঞ্জ-চারি-ভিতে, বৃক্ষ চারিধারে
ফলপুষ্প-পত্রে নত,
চির অক্ষুণ্ণ অচ্যুত তাহা।
সুযশ-সমীরে সুগন্ধ বিতরে,
বিশ্ব তাহে আমোদিত,
সুখ কিরূপে প্রকাশি, আহা!

১০

নিকুঞ্জ-কুটিরে কল্পনা কুহরে,
প্রতিভা-পাপিয়া গায়,
স্বরে অমিয়-লহরী উঠে।
অবনী মোহিয়া আকাশ শব্দিয়া
উচ্ছ্বাস উঠিয়া তায়,
স্বর অম্বর ভেদিয়া ছুটে!

১১

সরসীর কূলে লতাকুঞ্জ-তলে
ভাবুক-প্রেমিকচয়,
বসি' পুলক-পূর্ণিত প্রাণে,
কাব্য-কুন্দ-ফুলে মালা গাঁথি গলে
পরিছে মাধুরীময়,
কিবা গায় মধুমত্ত মনে !

১২

পুষ্প-মকরন্দ পরাগ সুগন্ধ
রসাল পীযূষ ফল,
সব যদৃচ্ছা ভুঞ্জিছে সুখে !
ইচ্ছা যার যাহা, লভি'ছে সে তাহা,
না চাহি যতন বল,
কবি-কল্পবৃক্ষতলে থেকে ।

১৩

কিসের অভাব ? কিসের অসুখ ?
যা চাহ, তা মিলে তথা ।
তথা অনন্ত ঐশ্বর্যরাশি ।
তথায় যা নাই, ব্রহ্মাণ্ডে তা নাই,
আর কি কহিব কথা,
সুখ উথলিছে দিবানিশি !

১৪

মণিময় খাতে প্রেমধারা-পাতে
বহে নদী চতুষ্টয়,
নাম, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ।
অনন্ত প্রবাহে নিত্য নদী বহে
কে জানে কোথায় যায় ।
তীরে দেব নর যক্ষ রক্ষ

১৫

বসি', পরপারে যেতে ইচ্ছা করে
যাইতে পারে না কেহ,
পারী জমে না সময় মাঝে।
কালের আশ্বাসে আছে তা'রা বসে',
যায় নিশা, আসে অহঃ,
নিত্য সাক্ষী রাখি' প্রাতঃ-সাঁজে।

১৬

আজি শুভ দিন স্বর্গ মর্ত্য জুড়ি'
আনন্দ-উন্মত্ত সবে,
ভবে বসন্ত-পঞ্চমী-তিথি।
দেব নর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্বাদি
জয় জয় জয় রবে
গায় জ্ঞানদা ব্রহ্মাণী-স্তুতি।

১৭

শান্তি-সরোবরে জ্ঞানাম্বুজ 'পরে
জ্ঞান-রাজ-রাজেশ্বরী,
সঙ্গে বিদ্যা বুদ্ধি সখীজন
বিহরে, অধরে হাস্যসুধা ক্ষরে,
করে বীণা, আহা মরি,
রূপে ত্রিভুবন তনময়।

১৮

বাল্মীকি, ব্যাসাদি, বাণ, ভবভূতি,
ভারবি, শ্রীহর্ষ কবি,
তথা কালিদাস মহামতি
ল'য়ে কাব্য-পুষ্পহার পুষ্পাঞ্জলি মা'র
পাদপদ্ম 'পরি সঁপি'
কিবা গাইছে সুস্বরে স্তুতি।

১৯

দুঃখী বঙ্গ কবি কোথায় কি পা'বে ?
দারিদ্র্য সম্বল সার,
আর কি আছে ?—কি দিয়া পূজে ?
অন্ধ খঞ্জাতুর বধির যে জাতি,
স্কন্ধেতে দাসত্ব-ভার,
গৃহে দুর্দশা-দুন্দুভি বাজে !

২০

তা'রা কভু পারে ষোড়শোপচারে
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পুত্রসম,
হা মা ! পূজিতে ও পদতল ?
পূর্ণব্রহ্মময়ি কৃপাময়ি অম্ব !
জগদম্বা তুমি সত্য,
তুমি একমাত্র আশা-স্থল ।

২১

প্রসন্নে ! বরদে ! জ্ঞানদে ! মোক্ষদে !
দে মা, পদ দুটি হৃদে,
আমি একান্তে ধরেছি তোরে ।
শাঠ মন প্রাণে প্রেমাশ্রু-চন্দনে
চর্চি জ্ঞান-পুষ্প পদে
যেন দিতে পারি প্রাণ ভ'রে ।

(ভুবনমোহিনী প্রতিভা. ২য় ভাগ, ১৮৭৫)

ভারত-রাণী

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী

তুমি মা ভারত-রাণী, নহিলে জগতে আর
এত শ্রী-সম্পদরাশি, কোথা আছে সুষমার?
সভ্যতার এ জগতে তুমি যে মা বিজয়িনী;
বিদ্যাবুদ্ধি-অধিষ্ঠাত্রী, তুমি লক্ষ্মী-স্বরূপিণী।
আসি বাণী তব গৃহে ধরি বীণা অবিরত,
গাহিল মা, কবি-কণ্ঠে তোমার মহিমা শত।
পদ্মরাগ মরকত হিরণ্য হীরক হার,
তব কণ্ঠে আসি রমা পরাইল অনিবার।
স্বর্গ হ'তে মন্দাকিনী ঝরি স্রোত-জলে চুমি',
করিয়াছে পুণ্যময় মা তোমার দেবভূমি।
বালার্ক কিরণে মাখি বিসর্পিত শ্যামকায়,
পুণ্য জলে তব অঙ্কে কৃষ্ণাতোয়া বহে যায়।
তোমার আকাশ বিনা কোথায় মা, নীলাকাশে
নির্মল রজতে মাখা হেন ফুল্লচন্দ্র হাসে?
কোথায় মা হেন দেশ যেথানে লাবণ্যধাম
মনোময়ী প্রকৃতির চারু চিত্র অভিরাম?
কোথায় মা, আসি বল আপনি প্রকৃতি-রাণী
সাজাইল নানারূপে তার বিধুমুখখানি?
সেই মা ভারত তুমি, যেখানে মা নিরন্তর
খরতাপে বিভা নিত্য ঢালে প্রভাকর।
যেখানে নীরদ শ্যাম করে মৃদু গরজন,
দামিনী চমকি রূপে আলো করে ত্রিভুবন।
ময়ূর-চন্দ্রকে যথা শত চন্দ্র পরকাশ
কোকিলের কুহু কণ্ঠে জাগে প্রাণে অভিলাষ!
আমরণ যথা নারী সতী সাধ্বী পতিব্রতা,

পতি সঙ্গে হাসিমুখে হয় মাগো অনুমৃতা।
যথা গৃহ অন্তরালে নারী লক্ষ্মী স্বরূপিণী
মূর্তিমতী অন্নপূর্ণা চিরধর্ম-সহায়িনী।
যথায় কামিনী, চাঁপা, কুমুদ কহ্লার হাসে,
বার মাস সমীরণ বহে শতফুলবাসে।
সেই মা ভারত তুমি দীপ্ত শত মহিমায়
নহিলে মা এ ঐশ্বর্য কার আছে বসুধায়?
তোমারি মা দেবভূমে আসি হরি দয়াময়
কতবিধ রূপ ধরি করিল মা অভিনয়;
প্রথমে ভাসিল মহী 'প্রলয়-পয়োধি-জলে'
মীনরূপে চতুর্বেদ উদ্ধারিল কুতূহলে॥
কূর্মরূপে পৃষ্ঠদেশে আনন্দে মন্দর ধরি
মথিল মা তব সিন্ধু দেবাসুরে যত্ন করি;
মহাকায় বরাহের দংষ্ট্রা ধরি বসুমতী
জলমধ্যে মা তোমায় রাখিল যে পুণ্যবতী;
তোমারি মা পুণ্যক্ষেত্রে নরহরি রূপ ধরি
রক্ষিল যে ভক্তে হরি অসুরে বিদীর্ণ করি।
কোটি চন্দ্রপ্রভা মুখে, মা, তোমার পুণ্যদেশে
আপনি আসিয়া হরি অতি খর্বতর বেশে
মাগিয়া ত্রিপাদভূমি নভঃস্থল বসুধায়
ব্যাপিল কমল পদে পূর্ণব্রহ্ম মহিমায়।
ভৃগুপতি রূপে আসি কোটি-নররক্ত-জলে
বহাইল মা প্রবাহিনী খরতর করবালে।
বুদ্ধরূপে রুদ্ররূপে সম্বরিয়া পুনর্বার
"অহিংসা পরমধর্ম" করিল মা সুপ্রচার।
রামরূপে দেখাইল প্রেম-প্রীতি-ভক্তিচয়
পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণরূপে দেখাইল ধর্মে জয়।

ভারত-শ্মশান-মাঝে

আনন্দচন্দ্র মিত্র

ভারত-শ্মশান-মাঝে, আমি রে বিধবা বালা।
বিষের মূরতি ক'রে, বিধি আমায় পাঠাইলা!
জানি না কেমন পতি, মনে নাই রে সে মূরতি;
তথাপি যুবতী হ'য়ে পেটে অন্ন নাই দু বেলা।
বিবাহ কি তাও জানি নে, কেবলমাত্র পড়ে মনে,
অনিচ্ছাতে শৈশবেতে খেলেছি এক দুঃখের খেলা।
পিতা মাতা নিদয় হ'য়ে, পরের হাতে সঁপে দিয়ে;
ছিঁড়ে নিয়ে কমল কলি, কণ্টকে গাঁথিল মালা।
না বুঝিলেম ভালবাসা, নাহি সুখ নাহি আশা;
কারে ক'ব এ দুর্দশা, কে বুঝিবে মর্মজ্বালা।
পথিক বলে দেশাচারে, গেল ভারত ছারেখারে;
পাপিষ্ঠ ভারতবাসী, পাষাণ হ'য়ে না দেখিলা।

মৃত্যু-শয্যায়

গোবিন্দচন্দ্র দাস

১

মা!

এই বড় দুঃখ মনে রহিল আমার—
এই কাঙ্গালিনী বেশে,
এত কষ্টে—এত ক্লেশে,
এই বিমলিন মুখ—এই অশ্রুধার,
দেখিয়া যাইতে হ'ল জননী আমার!

২

দেখিয়া যাইতে হ'ল জননী তোমায়,
অন্নপূর্ণা উপবাসী,
আত্মগৃহে পরদাসী,
মুহূর্তে মুহূর্তে মর মর্ম-বেদনায়,
দেখিয়া মরিতে হ'ল জননী তোমায় !

৩

উঃ—ও !

এখনো মুমূর্ষ রক্ত উঠে উছলিয়া,
শতপুত্রে অভাগিনী,
শত্রুবাক্যে ভিখারিণী,
স্মরিতে মুমূর্ষ প্রাণ উঠে হুঙ্কারিয়া,
ধিক্কারে শিরায় রক্ত উঠিছে গর্জিয়া !

৪

নিরুদ্ধ হৃদয়ে হয় আবার স্পন্দন,
মৃত্যু যেন দূরে যায়,
মৃত্যু যেন ভয় পায়,
ঈর্ষ্যাদগ্ধ চিত্তের এ তীব্র উত্তেজন
থাকিতে মৃত্যু ও প্রাণ করে না গ্রহণ !

৫

নাহি শান্তি জননি ! মরে এ মৃত্যু-শয্যায়,
সুখ তুমি শান্তি তুমি,
স্বর্গ তুমি জন্মভূমি,
জননী ভগিনী জায়া তুমি সমুদায়,
মরণে সুখ মা কোথা তব দুর্দশায় ?

৬

কুটীর-নিবাসী আমি দরিদ্র ভিখারী,
জনমে পুরেনি আশা,
পাই নাই ভালবাসা।
নাহি মোর পুত্র কন্যা ভাই বন্ধু নারী,
পথের কাঙ্গাল আমি দরিদ্র ভিখারী।

৭

তথাপি জনমভূমি আছিল আমার,
ভার্যাসম অতি প্রিয়,
মাতৃসমা অদ্বিতীয়,
পূজনীয় সমতুলা পিতৃদেবতার,
স্নেহের পবিত্র মূর্তি কন্যা করুণার!

৮

তোমাকেই প্রাণ ভ'রে বাসিয়াছি ভাল,
তুমিই সকল ছিলে,
শান্তি দিলে সুখ দিলে,
তোমারি সন্তান বলে' সুখে দিন গেল;
তোমাকেই প্রাণ ভ'রে বাসিয়াছি ভাল!

৯

যদিও—
প্রাণের গভীর এই ভক্তি প্রেম স্নেহ,
সামান্য পল্লীতে বাস,
করিয়াছি বারমাস,
গোপনে বেসেছি ভাল নাহি জানে কেহ,
শত্রুমুখে বাগ্মীবেশে,
বলি নাই দেশে দেশে
তোমারে করেছি দত্ত ভক্তি প্রেম স্নেহ;
স্বদেশ-হিতৈষী বলি নাহি জানে কেহ!

১০

তবু মা তুমি ত জান হৃদয় আমার?
এ প্রাণে যন্ত্রণা কত,
এ হৃদয়ে জ্বালা যত,
নিত্য যে তোমার তরে কত অশ্রুধার
ফেলিয়াছি, জান তা'ত জননী আমার?

১১

কিন্তু মা এ বড় দুঃখ রহিল অন্তরে,
বৃথাই সে অশ্রুজল,
বহিয়াছে অবিরল,
যে তুমি সে তুমি আছ যুগ-যুগান্তরে,
হল না সার্থক চক্ষু দেখিয়া তোমারে !

১২

একবিন্দু রক্ত এই অশ্রুর বদলে
যদি পারিতাম দিতে,
অভাগিনী তোর হিতে,
যে রক্ত পচিয়া গেল দাসত্ব-গরলে—
হয়ত সার্থক চক্ষু হ'ত পুণ্য-ফলে।

১৩

যাক্ যাহা হয় নাই, হল না এখন,
মরিতে বসিয়া আর
বৃথা সে ভাবনা তার
বৃথা এ মুমূর্ষু প্রাণে মোদের স্বপন,
এ জনমে এ জীবনে বৃথা আকিঞ্চন।

১৪

কিন্তু মা,
যদিও বাসনা মম হল না সফল,
তথাপি আশার নেত্রে,
জাতীয় মিলন ক্ষেত্রে
দেখিতেছি ভবিষ্যৎ শক্তি মহাবল,
সজ্জিত করেছি তব প্রতিমা উজ্জ্বল।

১৫

শূন্য যেন কোহিনূর করি আহরণ,
শত সূর্য-রাগ-বিভা
কিরীট গড়িছে কিবা
জননি ! তোমার শিরে করিতে অর্পণ ;
চমকি ত্রিলোক যেন করে নিরীক্ষণ !

১৬

আবার শোভিবে তুমি রাজরাজেশ্বরী,
আগেকার হস্ত গুপ্ত
ম্লান অস্ত্র যে সমস্ত—
কলঙ্কিত শেল শূল অসি ভয়ঙ্করী,
মার্জ্জিত করিছে শত্রু-শোণিত, শঙ্করি !

১৭

কেন না জন্মিনু আরো শতবর্ষ পরে,
তখন জন্মিবে যারা
কত পুণ্যবান তারা,
স্বর্গের দেবতা তারা মানবের ঘরে।
জন্মিবে ভবিষ্য বংশ তোমার উদরে !

১৮

যদিও ব্যাকুল প্রাণ ব্যাধি-যন্ত্রণায়,
তোমার ভবিষ্য বেশ
করে চিত্তে মোহাবেশ,
মিশিব তোমারি বুকে তব মৃত্তিকায়,
ভয় কি, যাই মা তবে,—বিদায় ! বিদায় !

জন্মভূমি

গোবিন্দচন্দ্র দাস

জননি গো জন্মভূমি, তোমারি পবন
দিতেছে জীবন মোরে নিশ্বাসে নিশ্বাসে !
সুন্দর শশাঙ্কমুখ, উজ্জ্বল তপন,
হেরেছি প্রথমে আমি তোমারি আকাশে।

ত্যজিয়ে মায়ের কোল, তোমারি কোলেতে
শিখিয়াছি ধূলি-খেলা, তোমারি ধূলিতে।
তোমারি শ্যামল ক্ষেত্র অন্ন করি' দান
শৈশবের দেহ মোর ক'রেছে বর্ধিত!
তোমারি তড়াগ মোর রাখিয়াছে প্রাণ,
দিয়ে বারি, জননীর স্তন্যের সহিত।
জননীর করাঙ্গুলি করিয়ে ধারণ
শিখেছি তোমারি বক্ষে বাড়া'তে চরণ।
তোমারি তরুর তলে কুড়ায়েছি ফল,
তোমারি লতার ফুলে গাঁথিয়াছি মালা,
সঙ্গীদের সঙ্গে সুখে করি কোলাহল
তোমারি প্রান্তরে আমি করিয়াছি খেলা।
তোমারি মাটিতে, ধরি জনকের কর,
শিখেছি লিখিতে আমি প্রথম অক্ষর!
ত্যজিয়া তোমার কোল যৌবনে এখন
হেরিলাম কত দেশ কত সৌধমালা।
কিন্তু তৃপ্ত না হইল এ দগ্ধ নয়ন,
ফিরিয়া দেখিতে চাহে তব পর্ণশালা।
তোমার প্রান্তর, নদী, পথ, সরোবর,
অন্তরে উদিয়া মোর জুড়ায় অন্তর।
তোমাতে আমার পিতা পিতামহগণ,
জন্মেছিলা একদিন আমারই মতন।
তোমারি এ বায়ুতাপে তাঁহাদের দেহ
পুষেছিলে, পুষিতেছ আমার যেমন।
জন্মভূমি জননী আমার যথা তুমি,
তাঁহাদেরও সেইরূপ তুমি—মাতৃভূমি!
তোমারি ক্রোড়েতে মোর পিতামহগণ
নিদ্রিত আছেন সুখে, জীবলীলা-শেষে।

তাঁদের শোণিত, অস্থি সকলি এখন
তোমার দেহের সঙ্গে গিয়েছে মা মিশে !
তোমার ধূলিতে গড়া এ দেহ আমার
তোমার ধূলিতে কালে মিশাবে আবার !

শত কণ্ঠে কর গান

স্বর্ণকুমারী দেবী

শত কণ্ঠে কর গান জননীর পূত নাম,
মায়ের রাখিব মান—লয়েছি এ মহাব্রত।
আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর এই শিক্ষা,
এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত।
সাক্ষী তুমি মহাশূন্য, না লব বিদেশী পণ্য,
ঘুচাব মায়ের দৈন্য,—করিলাম এ শপথ।
পরি ছিন্ন দেশী সাজ, মানি ধন্য ধন্য আজ।
মায়ের দীনতা-লাজ হবে দূর-পরাহত,
এই আমাদের ধর্ম, এই জীবনের কর্ম,
এই বস্ত্র, এই বর্ম, এই আমাদের মুক্তিপথ।
নমো নমো বঙ্গভূমি, মোদের জননী তুমি,
তোমার চরণে নমি, নরনারী মোরা যত।

তবু তারা হাসে

স্বর্ণকুমারী দেবী

তবু তারা হাসে !
মাগো ! ম্লান তব চন্দ্রানন, অশ্রুপূর্ণ দু'নয়ন,
ব্যথিত স্বতনু লৌহপাশে—
তবু তারা হাসে !

তবু তারা খেলে—
তুমি ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর, গৃহ ধনধান্যপূর,
অন্নজল তবু নাহি মেলে—
তবু তারা খেলে।
কেন তবে মরে না তাহারা ?
এ হাসি এ খেলাধূলা শুধু যে জ্বলন্ত চুলা
দেখিতে সুন্দর শুভ্র বালুক সাহারা !
কেন মরে না তাহারা !
এস, ভাই, ম'রে তবে বাঁচি !
ধর্ম্মহীন কর্ম্মহীন, হেয়, পদানত, দীন ;
বাঁচিয়া যে মরিয়াই আছি—
এস, ভাই, ম'রে তবে বাঁচি !
আয়, ভাই, আয় তবে আজি—
সাধিতে মায়ের কাজ, মুহূর্ত্ত না করি ব্যাজ
এক সূত্রে মরিবারে সাজি—
আয় তবে আয় সবে আজি !

(কবিতা ও গান, ১৮৯৫)

মা

দেবেন্দ্রনাথ সেন

তবু ভরিল না চিত্ত ! ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম ! বন্দিনু পুলকে
বৈদ্যনাথে ; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে ;
হেরিনু বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া ;
করিলাম পুণ্য-স্নান ত্রিবেণী-সঙ্গমে ;
"জয় বিশ্বেশ্বর" বলি ভৈরবে বেড়িয়া,

করিলাম কত নৃত্য ; প্রফুল্ল আশ্রমে,
রাধা-শ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
গীতগোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া
ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে ; পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বরগুঞ্জ-মালা।
তবু ভরিল না চিত্ত ! সর্ব-তীর্থ-সার,
তাই মা, তোমার পাশে, এসেছি আবার !

(অপূর্ব নৈবেদ্য, ১৯১২)

শিবাজী-উৎসব

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

আজি গাও গাও গাও খুলে মন প্রাণ—
ভারতের কথা ভারতের গাথা
ভারত-বীরের যশোগান।
সদা বীর-প্রসূ ভারত জননী
বীর-রত্ন-মালে কোহিনুর মণি
স্মর শিবমন্ত্র শিবাজী-কাহিনী
সহায় ভবানী অমূল্য দান।
গাও গাও গাও খুলে মন প্রাণ।
কত শিবময় সে শিব-কাহিনী
কত শক্তিময় সে শিব-বাহিনী
বলে শিব শিব জপ শিব-বাণী
নাশিবে অশিব সে শিব গান।
শিব-শিব মন্ত্রে ভারত দীক্ষিত
গাও দেখি বঙ্গ করিয়া কম্পিত
হর-হর-হর পুণ্যময় গীত
কোটি কোটি কণ্ঠে মিলায়ে তান।

ঋণ-শোধ

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

বুঝি এসেছে সে দিন।
কর পণ শোধিবারে মাতৃ-স্নেহ-ঋণ।
স্মরি সেই মহামতি,
প্রতাপ চিতোর-পতি,
হও দৃঢ় ব্রতে ব্রতী—স্ববশ স্বাধীন ;
লহ ব্রত শোধিবারে মাতৃ-স্নেহ-ঋণ।
যে বুঝে সর্বদা স্বীয়,
ভোগ কোথা তার প্রিয়,
সদা শোক কি দুর্ভোগ ভোগে পরাধীন।
সাধিলে সাধনা সিদ্ধ,
দেখ ঋষি বিশ্বামিত্র,
শক্রের ত্রিকুল মুক্ত সদা—চিরদিন ;
প্রাণ পণ করি শোধ মাতৃ-স্নেহ-ঋণ।

(স্বদেশিনী, ১৯০৬)

মাতৃ-স্তোত্র

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

নমো নমঃ জননি।
অশেষ-গুণ-ধারিণি।
নিত্য সরসা চিত্ত-হরষা,
রৌদ্র-কনক-বরণি।
শস্যশ্যামলা, কুন্দধবলা
অম্বু-মেখলা-ধারিণি।

নিত্যনবীনা, চিত্ত-দ্রাবিনা,
সপ্তস্বর-সুভাষিণি।
তুঙ্গ-হৃদয়া, দিক্‌-বলয়া,
স্নিগ্ধ-মলয়-শ্বাসিনি।
দীপ্তি-প্রোজ্জ্বলা, চন্দ্র-কুণ্ডলা,
অঙ্ক-বিলোল-লোচনি।
স্রোত-মধুরা, নীরক্ষীর-ধারা
সন্তাপ-জরা-নাশিনি।
পল্লী-শোভনা, মল্লী-ভরণা,
দ্রুম-চামর-ধারিণি।
লক্ষ-প্রসূতা, মোক্ষ-জ্ঞানদা,
অযুত-সুত-শালিনি।
কৃত্য-কুশলা, চিত্ত-বহুলা,
চিত্ত-বেদন-হারিণি,
জয়দে, জয়দায়িনি!

আদেশবাণী

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

ঐ শোন শোন কাহার আদেশ
হতেছে ধ্বনিত বিষাণে
পূরবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে
নৈঋতে অগ্নি ঈশানে।

সুখ-দুখ-শোক সকল পাসরি
চলেছে ছুটিয়া কোটি নরনারী;—
রাজা মহারাজ দরিদ্র ভিখারী
মিলিয়া ধরেছে নিশানে।

চলেছে ভাসিয়ে যে তরঙ্গ-যানে
কার সাধ্য এরে ফিরায় শাসনে ;
বাধা-বিঘ্ন সারি পড়িবে প্রসারি
বিপুল জীবন-সঙ্গমে ।

বাজ তবে শিঙা ঘন ঘন ঘোর,
বল ভারতের অমানিশা ভোর ;
যে আছে নিদ্রিত ভেঙ্গে যাক ঘোর—
নব-রবিচ্ছটা গগনে ।

নগরে নগরে গ্রাম গ্রামান্তরে
কার স্তুতি-গীতি কম্পিত সমীরে ;—
পত-পত-পত পতাকার শিরে
শোভিছে ভারত-গগনে ?

বাঙ্গালী-বিহারী-শিখ-উৎকল,
মারাঠা-পাঞ্জাবী-পাঠান-মোগল
চলেছে ধাইয়ে করি কোলাহল,—
কি জানি কাহার আহ্বানে ।

বাজ ওরে শিঙা ভঁয় ভঁয় ভোঁম
চমকিয়া ধরা মরুগিরি ব্যোম :
বল—সত্য জয় জয়স্ত ধরম—
কি ভয় হৃদয়-মিলনে ।

দেবের দুন্দুভি ভারত-গগনে
উঠেছে বাজিয়ে, ভয় কি মিলনে ;
যেখানে একতা সিদ্ধি সেইখানে
কি ভয় জননী-পূজনে ।

(স্বদেশিনী, ১৯০৬)

যায় যেন জীবন চলে

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

মা গো, যায় যেন জীবন চলে,
শুধু জগৎমাঝে তোমার কাযে
"বন্দে মাতরম্" বলে ॥
(যখন) মুদে নয়ন, করবো শয়ন
শমনের সেই শেষ কালে—
তখন, সবই আমার হবে আঁধার
স্থান দিও মা ঐ কোলে ॥
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥
(আমার) মান অপমান সবই সমান
দলুক না চরণ-তলে ।
যদি, সইতে পারি মায়ের পীড়ন,
মানুষ হ'ব কোন্ কালে ? (আর)
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥
লাল টুপি কি কালো কোর্ত্তা,
জুজুর ভয় কি আর চলে ?
(আমি) মায়ের সেবায় রইব রত
পাশব বলে দিক্ জেলে ॥
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥
আমার—বেত মেরে' কি "মা" ভোলাবে ?
আমি কি মা'র সেই ছেলে ?
দেখে, রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে ?
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥
আমি, ধন্য হব মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে ।

ওদের, বেত্রাঘাতে, কারাগারে
ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিলে ॥
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥
যে মা'র কোলে নাচি, শস্যে বাঁচি
তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে।
বল, লাঞ্ছনার ভয়, কার কোথা রয়
সে মায়ের নাম স্মরিলে ?
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥
বিশারদ কয় বিনা কষ্টে
সুখ হবে না ভূতলে।
সে ত, অধম হয়ে সইতে রাজি
উত্তমে চাও মুখ তুলে ॥
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে।

স্বদেশের ধূলি

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি'
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান ;
যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে
অনিলে মলয় সদা বহমান।

নন্দন কাননে কিবা শোভা ছার,
বনরাজিকান্তি অতুল তাহার
ফল শস্য তার সুধার আধার
স্বর্গ হতে সে যে মহাগরীয়ান ॥

এ দেহ তোমার তারি মাটি হতে
হয়েছে স্থজিত, পোষিত তাহাতে
মাটি হয়ে পুন মিশিবে তাহাতে
ভবলীলা যবে হবে অবসান।
পিতামহদের অস্থিমজ্জা যত
ধূলিরূপে তাহে আছে যে মিশ্রিত
এই মাটি হতে হবে যে উত্থিত
ভাবীকালে তব ভবিষ্য সন্তান।
কংস-কারাগারে দেবকীর মত
বক্ষেতে পাষাণ লৌহশৃঙ্খলিত
মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত
পরিচয় তুমি তাঁহারি সন্তান।
প্রকৃত সন্তান জেনো সেই জন,
নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জন,
যে করিবে মা'র দুঃখ-বিমোচন,
হবে তার মাতৃঋণ প্রতিদান।

সেই ত রয়েছ মা তুমি

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

সেই ত রয়েছ মা তুমি।
ফলফুলে সুশোভিতা শ্যামা জন্মভূমি॥
শিরোপরি গিরিবর
সেই শুভ্র কলেবর
পদতলে সেই সিন্ধু
আছে অনুগামী॥

তেমনি বিহঙ্গকুল
কলরবে সমাকুল
তেমনি শুনিতে পাই
মধুপ-ঝঙ্কার—
সেই ত সকলি আছে
তবে মা সবার পাছে
তোমার সন্তান কেন,
অধঃপথগামী ॥
কোথা তব সে গৌরব
সে সম্পদ কোথা সব
সকলি হয়েছে আজি
নিশার স্বপন—
ফিরিয়া আবার কি মা
আসিবে গো সে মহিমা
গাইবে তোমার কবি
তোমারে প্রণমি ॥
কি জানি কি পাপফলে
পড়ি পর পদতলে
শক্তিহীন তব সুত
ধূলাতে লুটায়—
বিশারদ সে বিষাদে
হতাশ হৃদয়ে কাঁদে,
তারে আজি কে দেখালে
এ দশা দশমী ॥

আহ্বান

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

আয় আজি আয় মরিবি কে?

পিশিতে অস্থি শুষিতে রুধির, নিশীথে শ্মশানে
পিশাচ অধীর,

থাকিতে তন্ত্র-সাধন-মন্ত্র প্রেতভয়ে ছি ছি ডরিবি কে?

মরার মতন না লভি মরণ, সাধকের মত মরিবি কে?

আয় আজি আয় মরিবি কে?

অসুর-নিধনে কিসের তরাস? পশুর নিধনে তোরা
কি ডরাস?

না গণি বিজন কানন ভীষণ বিষম বিপদ্ বরিবি কে?

নিঠুর অরি সংহার করি, বীরের মতন মরিবি কে?

আয় আজি আয় মরিবি কে?

আয় আজি আয় মরিবি কে?

উঠিছে সিন্ধু মথিয়া তুফান, ছুটিছে ঊর্মি পরশি বিমান,

সাহসেতে ভর করি সে সাগর হাসিমুখে তোরা তরিবি কে?

আয় আজি আয় মরিবি কে?

চরণের তলে দলি রিপুগণ লভিত নির্বাণে অমর জীবন,

তাদেরি অংশে তাদেরি বংশে জনম, সে কথা স্মরিবি কে?

লভিতে তূর্ণ ত্রিদিব-পুণ্য, আর্যের মত মরিবি কে?

আয় আজি আয় মরিবি কে?

মাতি সৌরভে যশ গৌরবে অমর হইয়া মরিবি কে?

আয় আজি আয় মরিবি কে?

উদ্বোধন

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

জাগো জাগো ভারত মাতা!

চরণতলে তব অভিনব উৎসব

করিব, রচিব নবগাথা।

অগণন-জনগণ-ধাত্রি!

অকথিত মহিমা অশেষ গরিমা

অনন্ত-সম্পদ-দাত্রি!

মঙ্গলযুত তব কীর্তি;

তব গুণ-গৌরব তব যশ-সৌরভ

ব্যাপিল বিশাল পৃথ্বী।

শূর-জননি সুর-পূজ্যে!

নিহত সুকৃতি তব হৃত সুখ গৌরব

দস্যু-দলিত নব রাজ্যে।

নব্য জগত-ইতিহাসে

নগণ্য তুমি মা! অগণ্য মহিমা

বিস্মৃত দেশ-বিদেশে।

জাগো জাগো ভারত মাতা!

চরণতলে তব রোদন উৎসব

করিব, রচিব নবগাথা।

(বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫)

বঙ্গভাষা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

আজি গো তোমার চরণে জননি !
আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান ;
ভক্তি-অশ্রু-সলিলে সিক্ত
শতেক ভক্ত দীনের গান !
মন্দির রচি মা তোমার লাগি',
পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি,'
তোমারে পূজিতে মিলেছি জননি
স্নেহের সরিতে করিয়া স্নান।
জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে
চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি
অমল-কমল-চরণে স্থান !

জান কি জননি জান কি কত যে
আমাদের এই কঠোর ব্রত !
হায় মা ! যাহারা তোমার ভক্ত
নিঃস্ব কি গো মা তারাই যত !
তবু সে লজ্জা তবু সে দৈন্য,
সহেছি মা সুখে তোমারি জন্য,
তাই দু'হস্তে তুলিয়া মস্তে'
ধরেছি যেন সে মহৎ মান।
জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে
চাহি না অর্থ চাহি না মান !
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি
অমল-কমল-চরণে স্থান !

নয়নে বহেছে নয়নের ধারা
জ্বলেছে জঠরে যখন ক্ষুধা,
মিটায়েছি সেই জঠর-জ্বালায়,
পিইয়া তোমার বচন-সুধা ;
মরুভূমি সম যখন তৃষায়,
আমাদের মা গো ছাতি ফেটে যায়,
মিটায়েছি মাগো সকল পিপাসা
তোমার হাসিটি করিয়া পান ।
জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে
চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি
অমল-কমল-চরণে স্থান !

পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই
তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি,
বাসনা তাহাই গুছায়ে যতনে
সাজাব তোমার চরণ দু'টি ।
চাহিনাক কিছু, তুমি মা আমার—
এই জানি শুধু নাহি জানি আর,
তুমি গো জননি হৃদয় আমার,
তুমি গো জননি আমার প্রাণ !
জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে
চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি
অমল-কমল-চরণে স্থান !

('গান')

আমার দেশ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বঙ্গ আমার! জননি আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ!
কেন-গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন-গো মা তোর রুক্ষ কেশ?
কেন-গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন-গো মা তোর মলিন বেশ?
ত্রিংশ কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে—"আমার দেশ!"

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ-জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর;
অশোক যাঁহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হ'তে জলধি-শেষ,
তুই কিনা মাগো তাঁদের জননি, তুই কিনা মাগো তাঁদের দেশ!

একদা যাহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণব-পোত ভ্রমিল ভারত-সাগরময়;
সন্তান যা'র তিব্বত-চীন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তা'র কিনা এই ধূলায় আসন, তা'র কিনা এই ছিন্ন-বেশ!

উঠিল যেখানে মুরজ-মন্দ্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস যেথা গাহিল গান।
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুই ত মা সেই ধন্য দেশ!
ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্তলেশ।

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘিরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর,
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য; মানুষ আমরা; নহি ত মেষ!
দেবি আমার! সাধনা আমার! স্বর্গ আমার! আমার দেশ!

কিসের দুঃখ; কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ।
ত্রিংশ-কোটি মিলিত-কণ্ঠে ডাকে যখন—"আমার দেশ"॥

('গান')

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে এ বিশ্বনিখিল তোমারি প্রতিমা ;
মন্দির তোমার কি গড়িব মা গো ! মন্দির যাহার দিগন্ত-নীলিমা !
তোমার প্রতিমা শশী, তারা, রবি,
সাগর, নির্ঝর, ভূধর, অটবী,
নিকুঞ্জভবন, বসন্তপবন, তরু, লতা, ফল, ফুলমধুরিমা।
সতীর পবিত্র প্রণয়-মধু,—মা !
শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা,
সাধুর ভকতি, প্রতিভা, শকতি,
—তোমারি মাধুরী, তোমারি মহিমা,
যেই দিকে চাই এ নিখিল ভূমি—
শতরূপে মা গো বিরাজিত তুমি,
বসন্তে, কি শীতে, দিবসে, নিশীথে,
বিকশিত তব বিভবগরিমা।
তথাপি মাটির এ প্রতিমা গড়ি,
তোমারে পূজিতে চাই মা ঈশ্বরি !
অমর কবির হৃদয় গভীর
ভাষায় যাহার দিতে নারে সীমা ;
খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা,
দেখি না আপনি দিয়েছ মা ধরা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে,
ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ি মা।

(পাষাণী, ১৮৮২)

জন্মভূমি

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কি মাধুর্য জন্মভূমি জননি তোমার।
হেরিব কি তোমারে মা নয়নে আবার।
কত দিন আছি ছাড়ি,
তবু কি ভুলিতে পারি,
তবুও জাগিছ মাতঃ হৃদয়ে আমার।
লালিত শৈশব যথা যাপিত যৌবন,
ভুলিতে যে প্রিয় দৃশ্য চাহে কি গো মন,
প্রতি তরুলতা সনে
মিশ্রিত জড়িত মনে,
স্মৃতিচোখে প্রিয় ছবি হেরি বার বার।
তোমা বিনা অন্য কারে মা বলে ডাকিতে,
কখন বাসনা মাতঃ নাহি হয় চিতে;
অভূষণ শোভারাশি,
মাতঃ তব ভালবাসি;
চাই না সুরম্য স্থান নানা অলঙ্কার
স্বর্গীয় মাধুর্যময় স্বদেশ আমার।

কেন মা তোমারি

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কেন মা তোমারি—
সহাস বদন আজ মলিন নেহারি।
আলুলিত কেশপাশ,
তব এ মলিন বাস;
হেরিতে না পারি।

নীরবে সজল আঁখি, ঊর্ধ্বভাবে স্থির রাখি,
ডাকিছ কাহারে বদ্ধ বাহুযুগ প্রসারি ;
কেমনে সন্তানগণ
করিছে মা দরশন
তব অশ্রুবারি।

(আর্যগাথা, ১৮৮২)

কাঁদিবে কি স্নেহময়ি

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কাঁদিবে কি স্নেহময়ি জননি আমার ;
পূজক সন্তান তব ত্যজিলে সংসার।
যে ভালবাসিত এত,
পূজিত মা অবিরত,
দিত আসি প্রতি সন্ধ্যা অশ্রু-ফুল-ভার ;
শেষ দিন যে তোমারে
বিদাইল নেত্রধারে,
তার তরে এক বিন্দু দিবে নেত্রাসার ?
স্থির পাণ্ডু মুখ পানে
চাহিয়ে স্থির নয়নে,
হবে কি ব্যথিত তব প্রাণ একবার ?
কাঁদিবে কি সেই দিন জননি আমার ?
অথবা মা গুণযুত
হেরিয়ে অপর সুত
এ দীন সন্তানে মনে থাকিবে না আর !
না মা, এ পুত্রেরও তরে
তরু-পত্র মরমরে,
গাবে অধোমুখে মৃত্যু-সঙ্গীত তাহার।

সান্ধ্য সমীরণোচ্ছ্বাসে
ফেলিবে মা দীর্ঘশ্বাসে,
ঝরিবে অমূল্য অশ্রু নিশীথ-নীহার
কাঁদিবে কাঁদিবে দেবি জননি আমার।

(আর্যগাথা, ১৮৮২)

ভারত আমার

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ভারত আমার, ভারত আমার,
যেখানে মানব মেলিল নেত্র ;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা,
এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগজ্জননি,
দর্শন ও উপনিষদে দীক্ষা,
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প,
কর্ম, ভক্তি, ধর্ম, শিক্ষা ;
(কোরাস) ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যাদি ॥

কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী,
কর্মজ্ঞানের তুমি মা জননী
ধর্মধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।
ভগবদ্গীতা গাহিল স্বয়ং
ভগবান যেই জাতির সঙ্গে
ভগবৎ-প্রেমে নাচিল গৌর
যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে,
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র
প্রচার করিল নীতির মর্ম ;

যাদের মধ্যে তরুণ তাপস
প্রচার করিল সোঽহং ধর্ম।
(কোরাস্) ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যাদি ॥

আর্য ঋষির অনাদি গভীর,
উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র ;
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি,
নহি কি আমরা তাদের গোত্র ?
তাঁদের গরিমা-স্মৃতির বর্ম্মে,
চলে যাব শির করিয়া উচ্চ,—
যাদের গরিমাময় এ অতীত,
তারা কখনোই নহে মা তুচ্ছ।
(কোরাস্) ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যাদি ॥

ভারত আমার, ভারত আমার,
সকল মহিমা হোক খর্ব ;
দুঃখ কি, যদি পাই মা তোমার
পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব ;
যদি মা বিলয় পায় এ জগৎ,
লুপ্ত হয় এ মানববংশ।
যাদের মহিমাময় এ অতীত,
তাদের কখনও হবে না ধ্বংস !
(কোরাস্) ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যাদি ॥

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া
অতীতের সেই মহা-আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে,
রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ !
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ ’পরে,
আছে বিধাতার করুণা-দৃষ্টি,
এ মহাজাতির মাথার উপরে,
করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি।
(কোরাস্) ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যাদি ॥

ক'রো না অপমান

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

যেই স্থানে আজ কর বিচরণ,
পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান ;
ছিল এ একদা দেব-লীলাভূমি,—
করোনা, করোনা তার অপমান !

আজিও বহিছে গঙ্গা, গোদাবরী
যমুনা, নর্ম্মদা, সিন্ধু বেগবান ;
অই আরাবলী, তুঙ্গ হিমগিরি ;—
করোনা, করোনা তার অপমান।
নাই কি চিতোর, নাই কি দেওয়ার,
পুণ্য হল্‌দীঘাট আজো বর্তমান।
নাই উজ্জয়িনী, অযোধ্যা, হস্তিনা ?—
করোনা, করোনা তার অপমান।

এ অমরাবতী, প্রতি পদে যার,
দলিছ চরণে ভারত-সন্তান ;
দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত,—
করোনা, করোনা তার অপমান।
আজো বুদ্ধ-আত্মা, প্রতাপের ছায়া,—
ভ্রমিছে হেথায়—হও সাবধান !
আদেশিছে শুন অভ্রান্ত ভাষায়,—
করোনা, করোনা তার অপমান।

বাণী-বন্দনা

মানকুমারী বসু

জননি আমার ! চরণে তোমার
করিছে প্রণতি এ দীন ভক্ত,
এস স্মিতাননে, শ্বেতপদ্মাসনে,
সন্তানে কর মা ! সমর্থ শক্ত ।
যবে উরিলে এ ভারতবর্ষে,
বেদগীতি গাহে বিরিঞ্চি হর্ষে,
মহিমা-মণ্ডিত চরণ-স্পর্শে,
ভূলোকে জাগিল দ্যুলোক স্বর্গ ;
ত্রিদিব-বাঞ্ছিত ও পাদপদ্ম,
বন্দিল সাধক গাহিয়া ছন্দ,
অনল অনিল তপন চন্দ্র,
সম্ভ্রমে সঁপিল ভকতি-অর্ঘ্য ;
কূজিল বনে বিহগপুঞ্জ,
গুঞ্জরিল ভৃঙ্গ মধুর গুঞ্জ,
কুসুমে ভরিল কানন-কুঞ্জ,
সে ললিত শোভা নিখিল-পূজ্য ;
হিমাদ্রি শেখরে ছুটিল গঙ্গা,
ছুটিল তরঙ্গ পুলক-সংজ্ঞা,
সুবর্ণে শোভিল কাঞ্চনজঙ্ঘা,
আকাশে উঠিল প্রথম সূর্য্য !
শুভদাত্রী শিবে ! ও পাদপদ্মে,
এ দীন সন্তানে কাতরে বলে
তোমার বীণার সুতান ছন্দে,
জাগাও আঁধারে বিমল দীপ্তি ;

মনে রেখ শরণাগত এ ভক্ত,
শ্রীপদে ঢালিছে বুকের রক্ত,
তুমি মা! কর গো সমর্থ শক্ত,
তোমাতে হউক সকল তৃপ্তি।

(বিভূতি)

মাতৃপূজা

কামিনী রায়

যেইদিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনম-ভূমি,—মা আমার, মা আমার!
অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে;
ছোটখাটো সুখ-দুঃখ—কে হিসাব রাখে তার
তুমি যবে চাহ কাজ,—মা আমার, মা আমার!
অতীতের কথা কহি' বর্ত্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়;
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে,—মা আমার, মা আমার!
মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে?
যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলঙ্ক-ভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ,—মা আমার, মা আমার!

বঙ্গভূমি

অক্ষয়কুমার বড়াল

প্রণমি তোমারে আমি, সাগর-উত্থিতে,
ষড়ৈশ্বর্যময়ি, অয়ি জননি আমার ;
তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার।

শত শৃঙ্গ-বাহু তুলি' হিমাদ্রি-শিয়রে
করিছেন আশীর্বাদ—স্থির নেত্রে চাহি ;
শুভ্র মেঘ-জটাজালে দুলে বায়ুভরে,
স্নেহ-অশ্রু শতধারে ঝরে বক্ষ বাহি'।

জ্বলিছে কিরীট তব—বিদায়—তপন,
ছুটিতেছে দিকে দিকে দীপ্ত-রশ্মি-শিখা ;
জ্বলিয়া-জ্বলিয়া উঠে শুষ্ক কাশবন,
নদীতট-বালুকায় সুবর্ণ-কণিকা।

গভীর সুন্দরবনে তুমি শ্যামাঙ্গিনী
বসি' স্নিগ্ধ বটমূলে—নেত্র নিদ্রাকুল।
শিরে ধরে ফণাচ্ছত্র কাল-ভুজঙ্গিনী,
অবলেহে পা দু'খানি আগ্রহে শার্দুল।

নব-বরষার চূর্ণ জলদ-কুন্তল
উড়িয়ে—ছড়িয়ে পড়ে মুখ আবরি' !
চাতকী ডাকিছে দূরে, শিখিনী চঞ্চল,
মেঘমন্দ্রে কৃষকের চিত্ত যায় ভরি'।

বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে
বসে আছ মেঘস্তূপে অসিত-বরণা!
নক্রকুল নত-তুণ্ড পড়ি' পদমূলে,
তুলি শুণ্ড করিযূথ করিছে বন্দনা।

সরে মেঘ, ফুটে ধীরে বদন-চন্দ্রমা!
বিভোর চকোর উড়ে নয়ন-সোহাগে;
লুটে ভূমে শ্রীঅঙ্গের শ্যামল সুষমা,
চরণ অলক্ত-রাগ তড়াগে তড়াগে!

মূর্তিমতী হয়ে সতী, এস ঘরে ঘরে,
রাখ ক্ষুদ্র কপর্দকে রাঙ্গা পা ছ'খানি!
ধান্যশীর্ষ স্বর্ণঝাঁপি লও রাঙ্গা করে—
ভুলে' যাই—সর্ব দৈন্য, সর্ব দুঃখ-গ্লানি।

ছুটি নবোৎসাহে মাঠে ল'য়ে গাভীদল,
হিমসিক্ত তৃণভূমি, শুষ্ক পদ্মদল,
হরিদ্র ধান্যের ক্ষেত্র, পীত-রৌদ্র-তলে
বিছায়ে দিয়েছ তব সুবর্ণ অঞ্চল!

কুজ্ঝটি সায়াহ্নে হেরি—মৃগযূথ সাথে
ছুটিছ নির্ঝর-তীরে চকিতা চঞ্চলা!
মদির মধুক-বনে ম্লান জ্যোৎস্না-রাতে
ল'য়ে তুমি ঋক্ষ-শিশু ক্রীড়ায় বিহ্বলা!

নিস্তব্ধ জয়ন্তী-চূড়ে সান্দ্র অন্ধকার
কণ্টকী-লতায় গেছে গোবিভূমি ভরি;
গহ্বরে গহ্বরে বন্য-বরাহ-ঘূৎকার
বহিছে উত্তর বায়ু শিহরি শিহরি।

হেরি তুমি সাশ্রুনেত্রে, অবনত শিরে
পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ দুঃখিনী।
ভগ্নস্তূপে, শিলাখণ্ডে, বিনষ্ট মন্দিরে
খুঁজিছ পুত্রের কীর্তি অতীত কাহিনী!

অশোকে কিংশুকে গেছে ছাইয়া প্রান্তর ;
পিককণ্ঠ-কলতান উঠে দিকে দিকে ;
চূত-মুকুলের গন্ধে মরুৎ মন্থর
এস হৃৎপদ্মাসনে সর্বার্থসাধিকে !
এস চণ্ডীদাস গীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি !
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্ছা, গণেশ-সুকৃতি,
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননি।

শঙ্খ, ১৯১০)

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়

রজনীকান্ত সেন

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই ;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সূতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই।
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।
ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই ;
তবু, তাই বেচে কাচ, সাবান মোজা,
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।

আয় রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা ক'রব ভাই ;
পরের জিনিষ কিন্‌বো না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিষ পাই।

(১৯০৫)

বঙ্গ-প্রশস্তি

নিত্যকৃষ্ণ বসু

কে আছে অধিনী হেন অবনী-মাঝারে ?
হেরি নিত্য বিদলিত পর-পদতলে
স্বর্ণতনুখানি মাগো ! তপ্ত অশ্রুজলে
সপ্তকোটি শিশু কা'র করে হাহাকার ?
কিন্তু অয়ি জন্মদাত্রি জননি আমার,
আজিও এ বক্ষ মোর উল্লাসে উথলে
স্মরি' কীর্তিরাশি তোর ;—প্রেমপুণ্য-বলে
আজিও অজেয় তুই, গর্ব বসুধার।
যে মহিমা-শৈল-শিরে, রাজরাজেশ্বরি,
আছিস্ বসিয়া, দেবভোগ্য সে বিভব
আর লভিয়াছে কেবা এ মরভুবনে ?
কি ছার সম্পদ-সুখ ?—চঞ্চল লহরী
কাল-সিন্ধু-নীরে যথা নশ্বর সে সব।—
অনশ্বর স্বর্গ মা গো তোর ও চরণে।

(সাহিত্য পত্রিকা, ১৯০০)

ভারত-লক্ষ্মী

অতুলপ্রসাদ সেন

উঠ গো, ভারত-লক্ষ্মী! উঠ আদি জগত-জন-পূজ্যা!
দুঃখ দৈন্য সব নাশি', কর দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড়গো, ছাড় শোক-শয্যা, কর সজ্জা
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে!
জননি গো, লহ তুলে বক্ষে, সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণতলে ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।
কাণ্ডারি! নাহিক কমলা, দুখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর-কম্পন-দর্শে,
তোমার অভয়-পদ-স্পর্শে, নব হর্ষে,
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে।
জননি গো, লহ তুলে বক্ষে, সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণতলে ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।
ভারত-শ্মশান কর পূর্ণ পুনঃ কোকিল-কূজিত কুঞ্জে.
দ্বেষ-হিংসা করি' চূর্ণ, কর পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে
দূরিত করি পাপ-পুঞ্জে, তপঃ-পুঞ্জে,
পুনঃ বিমল কর ভারত-পুণ্যে।
জননি গো, লহ তুলে বক্ষে, সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণতলে ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।

বল, বল, বল সবে

অতুলপ্রসাদ সেন

বল, বল, বল সবে, শত বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে!

আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
ঘিরি তিনদিক নাচিছে লহরী,
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী, এখনও অমৃতবাহিনী।
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা বন,
প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন, কহিছে গৌরব-কাহিনী।
বিদুষী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী,
সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র-প্রসূতি, আমরা তাঁদেরই সন্ততি॥
ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা,
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা,
নানক, নিমাই করেছিল ভাই, সকল ভারত-নন্দনে।
ভুলি ধর্ম-দ্বেষ জাতি-অভিমান,
ত্রিশকোটি দেহ হবে এক প্রাণ, একজাতি প্রেম-বন্ধনে॥
মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে,
ঋষি-রাজকুল জন্মেনি মিছে,
দুদিনের তরে হীনতা সহিছে, জাগিবে আবার জাগিবে।
আসিবে শিল্প-ধন-বাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা-বিনয়-বীর্য, আসিবে আবার আসিবে॥
এস হে কৃষক কুটির-নিবাসী,
এস অনার্য গিরি-বনবাসী,
এস হে সংসারী, এস হে সন্ন্যাসী,—মিল হে মায়ের চরণে।
এস অবনত, এস হে শিক্ষিত,
পরহিত-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত,—মিল হে মায়ের চরণে।
এস হে হিন্দু, এস মুসলমান,
এস হে পারসী, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়ান্,—মিল হে মায়ের চরণে॥

হও ধরমেতে ধীর

অতুলপ্রসাদ সেন

হও ধরমেতে ধীর   হও করমেতে বীর,
হও উন্নত-শির, নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ-জ্ঞান,   হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান,—হবে জয়।
নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্;
দেখিয়া ভারতে মহা-জাতির উত্থান—জগজন মানিবে বিস্ময়!
তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ,
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন!
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন—ঐ দেখ প্রভাত-উদয়!
ন্যায় বিরাজিত যাদের করে, বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে;
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে—সত্যের নাহি পরাজয়॥

বাংলা ভাষা

অতুলপ্রসাদ সেন

মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা!
কি যাদু বাংলা গানে! গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
(এমন কোথা আর আছে গো!)
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা॥
ঐ ভাষাতেই নিতাই গোরা, আনল দেশে ভক্তি-ধারা,
(মরি হায়, হায়রে!)
আছে কৈ এমন ভাষা এমন দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা॥

বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন ;
(আরও কত মধুপ গো !)
ঐ ফুলেরই মধুর রসে বাঁধলো সুখে মধুর বাসা ॥
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আন্‌লো মালা জগৎ জিনে !
(গরব কোথায় রাখি গো !)
তোমার চরণ-তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া-আসা ॥
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাকৃনু মায়ে "মা, মা" ব'লে ;
ঐ ভাষাতেই বল্‌বো হরি, সাঙ্গ হ'লে কাঁদা হাসা ॥

বাঙ্গালীর মা

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

হিমাদ্রি তোমার শিরে তুষারের শ্বেতছত্র ধরে
মেঘের ঝালর তায় ঢেউ খেলি দিক শোভা করে
গর্জে নিয়ে গর গর লক্ষ-ফণা অজগর
বঙ্গসিন্ধু পদযুগ শিরে রাখি যতনে ধোয়ায়,
অঙ্গে অঙ্গে পুষ্পগন্ধ, মিষ্ট বায়ু চামর ঢুলায় ।
তব মুক্ত বেণী সম শোভা পায় সুনীল অটবী
কাঞ্চী সম কটি বেড়ি ধ্বনিতেছে নাচিয়া জাহ্নবী
হিরণ-হরিতে গড়া সরসী-সরিতে ভরা
আনন্দ-কানন তব আমোদিত বিহগের গীতি,
স্বর্গ নামে তব দ্বারে তোমার ও ধূলায় লুটিতে ;
চরে তব শ্যাম গোঠে বেণু-রবে ধবলী শ্যামলী,
কুঞ্জ দেয় ফুলপুঞ্জে পাদপদ্মে পরাণ অঞ্জলি ।
রবি দেয় নিত্য প্রাতে কিরণ-কমল হাতে
জ্যোৎস্না নামে মৃদুপদে ঝাঁপি লয়ে লক্ষ্মীর মতন,
রঞ্জিতে অলক্তরাগে তোমার ও রাতুল চরণ ।
তোমার গহনে সদা উচ্ছ্বসিছে কল কল রব,
মেলি সকরুণ আঁখি দেখিতেছে বোবার উৎসব ;

ময়ূর কলাপ ধরে, কোকিল কূজন করে,
করিশিশু সনে খেলে রঙ্গ-ভরে স্নেহার্দ্র করিণী,
অবিচ্ছেদে খেলে সুখে প্রেমমুগ্ধ হরিণ হরিণী।
ব্রহ্মপুত্র দামোদর জলসখা দুটি বৈতালিক,
ভীমা পদ্মা নৃত্যে যার টলমল নিত্য দশদিক ;
নিনাদি তোমার পুরী, ভৈরব বাজায় তুরী,
তব নভ-স্বর্গ হ'তে ঝর্ ঝর্ ঝরিছে অমিয়'
ক্ষুধিতে যোগায় অন্ন পিপাসিতে শীতল পানীয়।
নিখিল-সাগর-বক্ষে তুমি যেন কমলে-কামিনী
বসে আছ পদ্মাসনে মহাধ্যানে দিবসযামিনী ;
ঋদ্ধি সিদ্ধি দুই করী শান্তি-ঘট শুণ্ডে ধরি
ঢালিতেছে তব শিরে দেবতার পাদোদক-সুধা,
নিজে রহি অনশনে হরিতেছ জগতের ক্ষুধা।
উষা আনে প্রতিদিন ধূপগন্ধ তোমার আগারে,
সন্ধ্যা আসে দীপ লয়ে করিবারে আরতি তোমারে ;
মন্দিরে মন্দিরে শাঁখ 'মা' বলিয়া দেয় ডাক,
তুমি যেন অমরার পুঞ্জীভূত দূর্বা আর ধান,
তোমায় আশীষি পুনঃ নমেন আপনি ভগবান্।

বঙ্গভাষা

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

আহা, দীনা বঙ্গভাষা !
ভাঙ্গে নাই যেন তন্দ্রা-অলস,
মুছেনি শীতের কুহেলি-তমস,
কেবল উষার অরুণ-পরশ
বহিয়া আনিছে আশা :
আহা, দীনা বঙ্গভাষা !
আহা দীনা বঙ্গভাষা !

আধখানি কথা ফুটেছে সরমে ;
আধখানি ব্যথা লুটিছে মরমে,
ছলকি ঝলকি তবু মধুক্রমে
করিছে তৃষ্ণানাশা ;
আহা, দীনা বঙ্গভাষা !

ছিলে মুগ্ধা কামপুষ্পিতশয়নে,
শিরীষকোমল বচনরচনে,
ভাঙিল কুহক, দুন্দুভির স্বনে
জাগিয়া উঠিলে কবে ?

রৌদ্র, বীর-রসে উঠিলে মাতিয়া,
বাঁশরী-আলাপ ক্ষণেক ভুলিয়া,
তেজস্বিনী-সমা দিলে কাঁপাইয়া
বিস্ময় মানিল সবে ।

শুনাইলে ব্যাস, বাল্মীকি এ বঙ্গে
ডুবিল কৌরব বিদ্বেষ-তরঙ্গে ;
পিতৃসত্য লাগি ভ্রাতা ভার্যা সঙ্গে
হন রাম বনবাসী ।

দেখাইলা—ভীষ্ম, পার্থ, যদুপতি,
দ্রৌপদী, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সতী ;
উদিল তৃষিত বঙ্গে জ্ঞানজ্যোতি,
নিবিড় তমিস্র নাশি ।

আবার যথায় ব্রজকুঞ্জবন,
"ললিতলবঙ্গলতার শীলন—"
ভুলিয়া—শুনিব গাহিছে কেমন,
তোমার বৈষ্ণব কবি :—

"সহিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি—"
প্রেমে মাতোয়ারা ধায় গোপধনী,
দেখিব তথায় রাধা, ব্রজ-মণি,
ভক্তের 'মাধুর্য-ছবি !'

প্রতীচ্য প্রাচ্যের ভাবসংমিশ্রণে,
সেজেছ কি এক অপূর্ব ভূষণে ;—
ধ্রুবজ্যোতি সম উজলি কিরণে
সাহিত্য-জগদাকাশে !

মধুর ভাণ্ডার আনিলে লুটিয়া,
ত্রিদিবের গন্ধ আনিলে বহিয়া,
নব আনন্দে উঠিলে ফুটিয়া,
কোমল কোরকাবাসে !

অয়ি সালঙ্কারে ! স্বভাবসুন্দরি !
মধুর-করুণ-রস-অধীশ্বরি !
কবিতার চির-প্রিয়-সহচরি
আরো এস চ'লে কাছে !

ধন্য, ধন্য, হে ভাববিচিত্রে !
নহ তুমি দীনা,—তব ছত্রে ছত্রে
যৌবনপুলক ; তব পত্রে পত্রে
বসন্ত চুমিয়া আছে !

(পন্না, ১৮৯৮)

উপহার

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

জানি, তাহা জানি আমি, অয়ি মাতৃভূমি,
সব ভাল, ভালবেসে যা দিয়েছ তুমি।
তোমার দিবস নিশি, তোমার আকাশ,
তোমার আলোক ভাল, তোমার বাতাস ;

তরু তব ছায়া দেয়, সাজি ফল-ফুলে,
তটিনী মিটায় তৃষা ফিরি কূলে কূলে ;
তব গ্রন্থে করি আমি জ্ঞানসুধা পান ;
শিরে তুলে ঘরে আনি আশীর্বাদী ধান।
তুমি দাও স্বাস্থ্য, মাতা, তুমি দাও ধন ;
বক্ষে ধরি আছ মোর গৃহ পরিজন।
তোমারে ঘিরিয়া নিত্য হয় মহোৎসব ;
অনিমেষ নেত্রে শুধু হেরিতেছি সব।
যাহা আনি, মনে হয় তুচ্ছ উপহার,
তোরি ভাষা দিয়ে তোর কণ্ঠে দিব হার।

(গীতিকা, ১৯১৩)

বঙ্গভূমি

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

নম বঙ্গভূমি-শ্যামাঙ্গিনি,
যুগে যুগে জননি-লোকপালিনি !
সুদূর নীলাম্বর-প্রান্ত সঙ্গে
নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে ;
চুমি পদধূলি বহে নদীগুলি,
রূপসী প্রেয়সী হিতকারিণি !
তাল-তমালদল নীরবে বন্দে,
বিহগস্তুতি করে ললিত সুছন্দে ;
আনন্দে জাগ, অয়ি কাঙ্গালিনি !
কিসের দুঃখ, মাগো, কেন এ দৈন্য,
শূন্য শিল্প তব, বিচূর্ণ পণ্য !
হা অন্ন, হা অন্ন, কাঁদে পুত্রগণ !

ডাক মেঘমন্দ্রে সুষুপ্ত সবে,
চাহ দেখি-সেবা জননী-গরবে,
জাগিবে শক্তি, উঠিবে ভক্তি ;
জান না আপনায় সন্তানশালিনি !

গীতিকা

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

কি শ্লোক রচিব আজি তোমার লাগিয়া,
অয়ি বঙ্গভাষা,
সোহাগ-সান্ত্বনা-পাশে কেন জড়াইলে দাসে,
জাগায়ে তুলিলে কেন ভক্তের অন্তরে
মধুর পিপাসা,
পূজিবার আশা !
তোমার নন্দনলোক, বহু ঊর্ধ্বে দেখা যায়,
মহিমায় জ্বলে ।
দিশাহারা পক্ষীসম মানসসঙ্গিনী মম
অতদূর যেতে যেতে যদি শ্রান্তিভরে
নামে পলে পলে
লুটাতে ভূতলে !
কোন্ ধ্বনি তব কণ্ঠে শুনাইবে ভাল,
আমি কি তা জানি ?
নাহি বুঝি, ভালবেসে কোন্ গান নিবে শেষে :
আমি কি যোগাতে পারি ওই সুধামুখে
সুধাময়ী বাণী,
অয়ি বীণাপাণি !
তবে মুখপানে চাহি করিও না দ্ব· ।
করুণ প্রত্যাশা ;

তব তৃষা সুগভীর, কোথা পাব তার নীর ;
কোন্ বলে কোন্ ছলে কেমনে ভুলিব
আমার নিরাশা,
অয়ি মাতৃভাষা ?
তবু যদি চাহ সেবা, দিব আনি পদে
আমার সকল ;
ভগ্ন-মনোরথ মাঝে মণি-মুক্তা নাহি সাজে
ভিখারীর ক্ষুধা সম, দাসের গীতিকা
দৈন্যের সম্বল,
শুধু অশ্রুজল।

(গীতিকা, ১৯১৩)

উদ্বোধন

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

শুধু স্নেহে কাজ নাই, ক্ষমা কর দূর ;
মাতৃযোগ্য গর্বভরা, তেজতপ্ত সুর
আন, মাতা, রুদ্ধকণ্ঠে। তব দীন ভাষা
ধ্বনিতে পারে না কি, মা, অভ্রভেদী আশা
নিশ্চল অন্তর মাঝে ? ও আকুল স্বরে
জাগুক নিশ্চিন্ত যারা, মহাব্রত তরে
সভয়ে সলজ্জে ত্রস্তে ! তীব্র অভিমানে
হের, মাতা, এই সব অবাধ্য সন্তানে ;
দিকে দিকে নির্বাসিত করে দাও শেষে
লভিতে নবীন জ্ঞান দূর দেশে দেশে।

আলস্য সঞ্চয় করি, এরা কোণে বসি
বলিছে বৈরাগ্য তারে ! তুমি মাঝে পশি
দ্বিধা দাও ভাঙ্গি ; আরোহি' কর্মের রথে
সবাই করুক্ যাত্রা দীপ্ত দিব্যপথে ।

(গীতিকা, ১৯১৩)

নমো হিন্দুস্থান

সরলা দেবী চৌধুরাণী

অতীত-গৌরববাহিনী মম বাণি ! গাহ আজি হিন্দুস্থান !
মহাসভা-উন্মাদিনী মম বাণি ! গাহ আজি হিন্দুস্থান !
কর বিক্রম-বিভব-যশঃ-সৌরভ পূরিত সেই নামগান !
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান !
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান !
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান !"
(কোরাস্) জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান—
"নমো হিন্দুস্থান !"
ভেদ-রিপুবিনাশিনি মম বাণি ! গাহ আজি ঐক্যগান !
মহাবল-বিধায়িনি মম বাণি ! গাহ আজি ঐক্যগান !
মিলাও দুঃখে, সৌখ্যে সখ্যে, লক্ষ্যে, কায় মনঃ প্রাণ !
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান !
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান !
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান !"
(কোরাস্) জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান
"নমো হিন্দুস্থান !"

সকল-জন-উৎসাহিনি মম বাণি! গাহ আজি নূতন তান!
মহাজাতি-সংগঠনি মম বাণি! গাহ আজি নূতন তান!
উঠাও কর্ম-নিশান! ধর্ম-বিষাণ! বাজাও চেতায়ে প্রাণ!
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান!
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান!"
(কোরাস্) জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান—
"নমো হিন্দুস্থান—"

(শতগান, ১৯০০)

[১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা-কংগ্রেসে গীত]

জয় যুগ আলোকময়

সরলা দেবী চৌধুরাণী

জয় যুগ আলোকময়,
হল অন্যায় চ্যুত শাসন
নিষ্ঠুরাচার নাশন
সংস্কার-দৃঢ়-আসন
হল ক্ষয়,
দিলে বরাভয়
যুগ আলোকময়,
আজি তেজভরিত ভারত-বক্ষ
নির্মলবোধপুষ্ট-পক্ষ,
মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ
গাহে জয়।

জয় যুগ, জয় যুগ, জয় যুগ আলোকময়।
আলো—আলো—আলোকময়।
হল অজ্ঞানতমো ছেদন
ভ্রান্তির জাল ভেদন
আত্মার শত ক্রেদন
অপনয়,
দিলে বরাভয়,
যুগ আলোকময়।
আজি তেজভরিত ভারত-বক্ষ
নির্মলবোধপুষ্ট-পক্ষ
মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ
গাহে জয়।
জয় যুগ, জয় যুগ, জয় যুগ আলোকময়,
আলো—আলো—আলোকময়।

হল বুদ্ধির মোহ মোচন
যুক্তি অতি-রোচন
উন্মেলি শুভ লোচন
হে সদয়,
দিলে বরাভয়
যুগ আলোকময়,
আজি তেজভরিত ভারত-বক্ষ
নির্মলবোধপুষ্ট-পক্ষ
মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ
গাহে জয়।
জয় যুগ, জয় যুগ, জয় যুগ, আলোকময়,
আলো—আলো—আলোকময়।

হল শক্তির পুন বোধন
পৌরুষ-ঋণ-শোধন

আর্ত্তের প্রাণ মোদন
বীর্য্যোদয়,
দিলে বরাভয়,
যুগ আলোকময়।
আজি তেজভরিত ভারত-বক্ষ
নির্মলবোধপুষ্ট-পক্ষ।
মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ
গাহে জয়।
জয় যুগ, জয় যুগ, জয় যুগ, আলোকময়,
আলো—আলো—আলোকময়।

(শতগান, ১৯০০)

ভারত-জননী

সরলা দেবী চৌধুরাণী

বন্দি তোমায় ভারত-জননি, বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি
বর-পুত্রের তপ-অর্জ্জিত গৌরব-মণি-মালিনি!
কোটি-সন্তান-আঁখি-তর্পণ-হৃদি-আনন্দ-কারিণি—
মরি বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি!
যুগ-যুগান্ত তিমির-অন্তে হাস মা কমল-বরণি!
আশার আলোকে ফুল্ল হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী।
নব জীবনের পসরা বহিয়া
আসিছে কালের তরণী, হাস মা কমল-বরণি!
এসেছে বিদ্যা, আসিবে ঋদ্ধি
শৌর্য-বীর্যশালিনি!

আবার তোমায় দেখিব জননি
সুখে দশদিক্-পালিনী।
অপমান-ক্ষত জুড়াইবি মাতঃ
খর্পর-করবালিনি! শৌর্যবীর্যশালিনি।

(শতগান, ১৯০০)

বঙ্গ-জননী

সুরমাসুন্দরী ঘোষ

আমার জনমভূমি,
অভাগিনী মা গো!
আর ঘুমায়ো না তুমি,
জাগো, স্নেহে জাগো!
শত কবি গান গায়, অর্ঘ্য দেয় তব পায়,
আজন্ম দিতেছে ভরি অঞ্জলি অঞ্জলি।
সেই স্তব-স্তুতি বিফল সকলি?
দুঃখিনী জননী, ওগো
বিষাদ-প্রতিমা,
ভাসাবে কি অশ্রুজলে
তোমার মহিমা?

চারিদিকে শুন সব আনন্দ-উৎসাহ-রব,
তুমি একা বসে আছ, ধূলিবিমলিনা,
হে আমার জন্মভূমি, অভাগি` দীনা।
পতিতা, তাপিতা।

হে আমার জন্মভূমি,
মুখে তব অন্ন নাই,
বুকে জলে চিতা !
ঘরে ঘরে, মা, তোমার, উঠে শুধু হাহাকার,
তুমি হাসিতেছ বসি, চির-উদাসীনা !

তাই মা, তোমার লাগি বাজে না এ বীণা !
তাই ত ধিক্কার উঠে
হৃদয় মাঝার,
মা যাহারে ছেড়ে আছে
মিছে গর্ব তার ।

তাই ছিন্ন হীনবল তোমার সন্তানদল
নাই শক্তি নাই ভক্তি, নাই মান অপমান,
আছে শুধু সভ্যতার লক্ষ কোটি ভাণ ।

(রঙ্গিনী, ১৯০২)

অমৃত-সন্ধান

সুরমাসুন্দরী ঘোষ

আজ টুটিয়াছে মোর মোহের বন্ধন,
গেছে শঙ্কা, গেছে লাজ, জেগেছে ক্রন্দন—
বহিছে জীবন-স্রোত দ্রুত বেগভরে,
সহসা লাগিবে ভাঁটা উচ্ছল সাগরে ।
অতীতের খেলাধূলা মিশাবে ধূলায়,
আমি বসে থাকি তবে কার প্রতীক্ষায় ?
কৈশোরে ঘোমটা-ঢাকা এই দুটি চোক,
দেখে নাই জগতের অক্ষয় আলোক ।

আজ বুঝিয়াছি আছে আমারও কাজ
কেহ বৃথা জন্মে নাই ধরণীর মাঝ !
মুক্ত রহিয়াছে মোর স্মৃতির দুয়ার,
পশিবে না মৃতপ্রাণে সুরভি-সম্ভার !
কল্পনা-কবিতা-গীতি উথলি নিমেষে,
নিবে মোরে উড়াইয়া অমৃতের দেশে।

(রঙ্গিনী, ১৯০২)

নূতন রাগিণী

মৃণালিনী সেন

শুধুই গাহিতে গান যদি গো ! জনম মম,
তবে দেবি ! গানে মোর দাও সেই সুর,
যে সুরে মৃতেরো প্রাণে অমৃতলহরী বহে,
যে সুরে জড়েরো করে অবসাদ দূর !
মরুতে জনমে তরু, পাষাণেতে বহে নদী,
অঙ্গার সে হয়ে যায় সহসা হীরক !
যে তীব্র উন্মত্ত সুর তড়িৎ সঞ্চারি দেয়
হৃদয় হইতে হৃদে, ফেলিতে পলক।
এমন করিয়া শুধু গতানুগতের মত
কেবলি জ্যোছনা, পুষ্প, কল্পনা-বধূর
সহিত করিয়া খেলা, জীবন স্বপ্নের মত
করিতে চাহিনা আর সমাপ্ত মধুর।
আমি অগ্রসর হ'ব সত্যের ধরিয়া হাত,
সূর্যের রশ্মির মত কিরণ যাহার ?
নিখিল বিশ্বের সর্ব-স্বচ্ছ মুকুরের সম,
সবাই হেরিবে তাহে চিত্র আপনার।

ক্ষুদ্র যশ অপযশ থাকে ক্ষুদ্র গৃহ-কোণে ;
—এ সঙ্কীর্ণ সীমা মম দাও বাড়াইয়া,
কেবল আমারি তরে রেখো না অস্তিত্ব মম,
—আমারে অনন্ত মাঝে দাও হারাইয়া।
ব্রহ্মাণ্ডের সাথে মম দাও এক করি দেবি !
দাও যোগ করি দেবি ! হৃদয়ের তার,
ওই ক্ষুদ্র তৃণগাছি, ওরো সুখ, ওরো দুখ,
—অনুভব করি যেন আমায় আমার !

(মনোবীণা, ১৯০০)

দেশভক্তি

যোগীন্দ্রনাথ বসু

সত্য কি তোমারে আমি বাসি ভালো ? স্বদেশ জননি !
কহি বটে; সাধনার ধন তুমি, নয়নের মণি !
কিন্তু যবে অন্তরের অন্তরেতে করি নিরীক্ষণ,
বুঝি সব শূন্যগর্ভ, অর্থহীন অলীক বচন।
প্রবঞ্চিত প্রবঞ্চক হ'য়ে হেন র'ব কতকাল ?
পূত, শুদ্ধ কর মা গো, দূর কর মনের জঞ্জাল।
পারিতাম সত্য যদি মাতৃরূপে ভাবিতে তোমারে,
হইতাম বধির কি এত ডাকে, এত হাহাকারে ?
দারিদ্র্যের কশাঘাতে কাঁদে ভ্রাতা, কাঁদে ভগ্নী মোর,
বিলাসে নিমগ্ন আমি, কই ঝরে নয়নের লোর ?
অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছে কোটি কোটি জন,—
একটিও দীপ আমি নাহি করি কেন প্রজ্বালন ?

কোটি কণ্ঠে রোগে শোকে শুনি উঠে তীব্র আর্তনাদ
আমি হাসি হা-হা ক'রে, নাহি চিন্তা নাহিক' বিষাদ !
সত্য দেশভক্তি যাহা, এ তাহার নহে পরিচয় ;
দেশভক্তি ত্যাগে, ধর্মে, কর্মে, প্রেমে,—বচনেতে নয়।
বাক্যভারে ভারাক্রান্ত, অবসন্ন হয়ে গেছে প্রাণ,
কর্মক্ষেত্রে শক্তি, স্ফূর্তি, অন্তর্যামী ! কর মোরে দান।
অকপটে তব পদে এই ভিক্ষা চাহি পরমেশ !
সত্য সত্য বুঝি যেন মাতৃরূপা আমার স্বদেশ !

সোনার স্বপন মোহে

কামিনীকুমার ভট্টাচার্য

সোনার স্বপন-মোহে ভুলিও না, ভাই, সাধনা !
এ যে আলেয়ার আলো, মায়া-মরীচিকা, আশ্বাস-ঢাকা ছলনা !
ওদের রুদ্ধ দুয়ারে করি' করাঘাত, পেয়েছ করে বেদনা ;
ওরা বুঝিল কি তব মর্মকাহিনী, বুঝিল কি তব যাতনা ?

ওরে ঘৃণা করে মোদের বর্ণ, মোদের আহ্বানে বধির কর্ণ ;
তুচ্ছ ফুৎকারে দেয় ভেঙ্গে চূরে, সকল সঞ্চিত কামনা !
ওরা মোদের দৈন্যে করি' পরিহাস, কেড়ে নিতে চায় মুখের গ্রাস ;
তবু যুক্তকরে ওদের দুয়ারে কেন নিত্য নিষ্ফল যাচনা ?

এখন আপনার পানে ফিরাও নয়ন, জাগাও আপন শক্তি ;
পরের চরণ না করি' লেহন, কর আপনার মায়ের ভক্তি ;
তবে জাগিবে নবীন রঙ্গে, নবজীবন নববঙ্গে ;
বিশ্ব কাঁপায়ে উঠিবে বাজিয়া রুদ্র-বিজয় বাজনা !

শাসন-সংযত কণ্ঠ

কামিনীকুমার ভট্টাচার্য

শাসন-সংযত কণ্ঠ জননি ! গাহিতে পারি না গান !
(তাই) মরম-বেদনা লুকাই মরমে, আঁধারে ঢাকি মা প্রাণ।
সহি প্রতিদিন কোটী অত্যাচার,
কোটী পদাঘাত কোটী অবিচার,
তবু হাসি মুখে বলি বার বার,—
'সুখী কেবা আর মোদের সমান ?'
বিনা অপরাধে অস্ত্রহীন কর,
অন্নাভাবে অতি শীর্ণ কলেবর
তবু আশে পাশে শত গুপ্তচর,
প্রতি পলে লয় মোদের সন্ধান।
শোষণে শূন্য কমলা-ভাণ্ডার,
গৃহে গৃহে মর্মভেদী হাহাকার,
যে বলে একথা, অপরাধ তার,
হায় হায় একি কঠোর বিধান !
না জানি জননি ! কত দিন আর
নীরবে সহিব হেন অত্যাচার
উঠিবে কি কভু বাজিয়ে আবার
স্বাধীন ভারতে বিজয়-বিষাণ ?

জননী

কামিনীকুমার ভট্টাচার্য

জাগো। ওগো কাঙ্গালিনি, জননি !

তব কুটীর-দ্বারে আজি মিলিত তব সন্তান,

দেশ দেশান্তর করি' অনুসন্ধান—কুসুম চন্দন

এনেছি জননি, পূজিতে তব চরণ।

মঙ্গল মন্ত্রে হিন্দু মুসলমান, বিস্মৃত গর্ব ভেদ

অভিমান, নব-আশা-পুলকিত প্রাণ,

দেহি নব শিক্ষা—নব দীক্ষা জননি ! মেলি মুদিত নয়ন।

কর আশীষ তুলি পুণ্যপাণি, শুনাও নন্দনে তব অভয় বাণী,

শত বিষাদ দৈন্ত সরম মানি' পড়ুক সরিয়া,

দিকে দিকে তব বিজয়-শঙ্খ উঠুক বাজিয়া বাজিয়া,

পুলক-উৎসবে হোক্ পরিপূরিত তব দীন ভবন।

তৃতীয় খণ্ড ঃ গার্হস্থ্যজীবন-কবিতা

গার্হস্থ্যজীবন-কবিতা

প্রবাসীর বিলাপ

দীনবন্ধু মিত্র

কোথায় জনমভূমি শুভ বঙ্গদেশ !
তব ক্ষেত্রে শস্যরূপে বিরাজে ধনেশ,
বাহিনী তোমার অঙ্গে পবিত্র জাহ্নবী,
শ্রেষ্ঠতম হেরি তব প্রান্তর অটবী,
তব কোলে দোলে বিদ্যা, দেশ-অনুরাগ,
সুজনতা, সুবিচার, সৌহার্দ্য, সোহাগ ;
তোমা বিনা কাঁদে প্রাণ মনে সুখ নাই,
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই ।

আর কি দেখিতে পাব পিতার চরণ,
স্নেহ-বিকসিত মুখ শঙ্কা-নিবারণ !
বিপুল আয়াসে শিক্ষা করেছেন দান,
পটুতা হেরিলে কত সুখী হত প্রাণ ।
শৈশবে পিতার পাতে বসিয়ে পুলকে,
খাইতাম সুখে অন্ন এলোমেলো ব'কে,
বাসনা পিতার পাতে আজো বসে খাই,
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই ।

পরম-আরাধ্যা দেবী জননী কোথায়,
বিপদ ব্যসন ব্যথা যে নামে পলায় !
না হেরে আমায় মাতা ব্যাকুলিত-মনে
গিয়াছেন পরলোকে বিভু-দরশনে ।

স্বর্গীয় জননী-স্নেহ এত দিনে হত,
মা বলা হইল শেষ জনমের মত ;
ভিক্ষা করি খাব দেশে, যদি মাতা পাই,
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই ।

সহোদর সুসহায় সংসার-ভিতর,
রক্ষিতে সোদরে সদা বদ্ধ পরিকর,
আনন্দ-প্রফুল্ল মুখে অমিয় বচন,
হাসিয়ে করেন দান স্নেহ-আলিঙ্গন,
না হেরে সোদর-মুখ বিদরে অন্তর,
কত দিন রব আর হয়ে দেশান্তর ?
ধিক ধন-অনুরোধে ছেড়ে আছি ভাই !
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই ।

স্নেহের লতিকা মম সুশীলা ভগিনি !
কত শত দিন গত তোমায় দেখিনি ।
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন সহোদরা-ঘরে
আনন্দ-উৎসব হয় তুষিতে সোদরে,
সমাদরে সহোদরে ভাই-ফোঁটা দান,
বসন চন্দন ধান গুয়া গোটা পান,
জন্মে জন্মে হই যেন ভগিনীর ভাই,
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই ।

নীরস হৃদয় মম প্রণয়বিহীন,
কেমনে কামিনী ভুলে আছি এত দিন ?
ভুলি নাই, বামাঙ্গিনি পবিত্র-লোচনে !
দিবা-নিশি হেরি মুখ মনের নয়নে,
ভাবিতে ভাবিতে কান্তি একতান-মনে,
ভ্রমবশে আলিঙ্গন করি সমীরণে,
রহিব তোমার পাশে, স্বর্গে দিব ছাই,
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই ।

কোথায় হৃদয়-নিধি তনয়-নিচয়,
কবে তোমা সনে হেরে জুড়াব হৃদয় ?
কেহ পাঠে দেবে মন, কেহ দৌড়াইবে,
কেহ কেহ কোল লয়ে বিবাদ করিবে,
কেহ করতালি দেবে, কেহ বা নাচিবে,
আধ বোলে বাবা ব'লে কেহ বা হাসিবে।
দেখিতে এসব পেলে স্বর্গ নাহি চাই,
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই।

মায়ার মৃণাল সম মেয়েটি কোথায় ?
মরি রে জননি ! কোলে না লয়ে তোমায়,
চিত্রিত পুতুল পেলে সুখী শিশুকুল,
আমি শিশু, তুমি মম খেলার পুতুল।
কবে নব-তামরস-দাম রসনায়
লেহন করিতে নাসা শৈশব-লীলায়,
তাই তাই 'তমালিনি' তাই তাই তাই ;
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই।

বিপদ-নিস্তার বন্ধুনিকর কোথায় ?
আনন্দে হৃদয় নাচে যাদের কথায়,
উল্লসিত হয় যারা আমায় হেরিয়ে,
অশুভ ঘটিলে এসে পড়ে বুক দিয়ে,
কবে তোমাদের কাছে বসিব হাসিয়ে,
মন খুলে কব কথা সরম ছাড়িয়ে,
বন্ধুর নিকটে দিন নিমেষে কাটাই ;
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই।

কোথায় যমুনা নদী তপন-নন্দিনি ?
শৈবাল বিরাজে অঙ্গে কত কুমুদিনী,
কেমন বিমল বারি সুমধুর তার,
আমোদে মাতিয়ে তায় দিতাম সাঁতার,

কত তরী কত লোক বিজয়ার দিন,
কৈলাসে চলিছে গৌরী কাঁদিয়ে মলিন,
বাসনা যমুনা-জলে এ দেহ ভাসাই ;
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই।

কোথা সে বিলের কূলে বিটপী বিশাল ?
চন্দ্রাতপ পায় যার আতপে রাখাল,
যথায় বিকালে বন-ভোজনের দিন,
সমবেত কত পুরমহিলা প্রবীণ,
আনন্দে ভোজন করে শতদল-দলে,
লাফালাফি খেলে মাঠে বালকেরা বলে,
বসিনা তাদের সনে লাফিয়ে বেড়াই,
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই ॥

(দ্বাদশ কবিতা)

সন্ধ্যার প্রদীপ

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

(১)

হের দেখ জ্বলিয়াছে প্রদীপ সন্ধ্যার,
দেব-রূপ দৃশ্য ধরা'পরে,
চারিদিকে ছায়া পড়ে কাঞ্চন কায়ার,
আলো-দ্বীপ আন্ধার-সাগরে।
ললিত লীলায় কায়,
হেলে দুলে বীণা বায়,
শিখার শরীর মাঝে নড়ে যেন প্রাণ,
দীপ নয়,—যেন কোন দেব বিদ্যমান।

(২)

দূর হ'তে রূপ কিবা হয় দরশন,
চৌদিকে কিরণ পড়ে চিরে,
আন্ধারের মাঝে তায় দেখায় কেমন,—
জবা যেন যমুনার নীরে।
আন্ধারের কলি কায়,
তায় অস্ত্রাঘাত প্রায়,
দীপ দেখি রক্তমাখা ক্ষতস্থান হেন,
কাল কেশে কামিনীর পদ্মরাগ যেন।

(৩)

জ্বালিয়া প্রদীপ, ঝাঁপি বসন-অঞ্চলে,
রূপসী প্রবেশে নিজ পুর,
রক্ত-আভা-মাখা রক্ত বদনমণ্ডলে
রক্তশিখা সীমন্তে সিন্দূর,
চঞ্চল নয়নে চায়,
প্রদীপ চঞ্চল বায়,
পায় পায় কাঁপে স্তন, শিখা মনোলোভা,—
কারে ছেড়ে কারে দেখি কে অধিক শোভা।

(৪)

কি ফুল ফুটেছে আহা অন্ধকার বনে,—
নদী-পারে প্রদীপ সন্ধ্যার,
প্রিয়া-মুখ-ধ্যান যেন প্রবাসীর মনে,
যেন শিশু-সুত বিধবার,
হয়ে গেছে সর্বনাশ,
আছে একমাত্র আশ,
হেন নর-হৃদয়ের দেখায় আভাস
মেঘের মণ্ডলে যেন মঙ্গল*-প্রকাশ।

* মঙ্গলগ্রহ

(৫)

ক্রমে ঘোর হ'য়ে এল সন্ধ্যার অম্বর,
পান্থ অতি ক্লান্ত পর্যটনে,
অজানিত দেশ, শুধু চৌদিকে প্রান্তর,
দামিনী চমকে ক্ষণে ক্ষণে ;
হেন কালে হেন স্থলে,
দূরে সন্ধ্যা-দীপ জ্বলে,
পথিকের প্রাণে পুন আশার সঞ্চার ;
সে জানে কি বস্তু তুমি প্রদীপ সন্ধ্যার !

(৬)

বদনের কাছে বাতি জননী ঢুলায়,
খল খল হাসে শিশু তায়,
আভায় আভায় মিশে শোভায় শোভায়,
হেরে মাতা স্নেহের নেশায় ;
আগারে বালক-মেলা,
ছায়া-ধরাধরি খেলা,
হেরে প্রবীণেরা হাসে, গণে না আপন,
ছায়া-ধরা খেলাতেই কাটালে জীবন।

('নলিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত, ১৮৮০/পরে 'প্রদীপ'-এ প্রকাশিত, ১৯০০)

শিশুর হাসি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কি মধু-মাখানো, বিধি, হাসিটি অমন
দিয়াছ শিশুর মুখে !
স্বর্গেতে আছে কি ফুল
মর্ত্তে যার নাহি তুল,
তারি মধু দিয়ে, কি হে, করিলে সৃজন ?
সৃজিলে কি নিজ সুখে ?
কিম্বা, বিধি নর-দুঃখে
মনে করে,—ও হাসিটি করেছ অমন ?

জানি না তুমিই কিনা আপনি ভুলিলে
স্বজনের কালে, বিধি ?
গড়েছ ত এত নিধি ?
উহার মতন, বল, কি আর, গড়িলে ?

নবনীর সর ছাঁকা,
সুন্দর শরৎ-রাকা,
তরুণ প্রভাত কি হে কোমল অমন ?

কারে গড়েছিলে আগে,
কারে বেশি অনুরাগে,
সৃজন করিলে, বিধি, সৃজিলে যখন ?

ফুলের লাবণ্য, বাস
অথবা শিশুর হাস
কারে, বিধি, আগে ধ্যানে করিলে ধারণ ?

ছিল কি হে নরজাতি-সৃজনের আগে
এ কল্পনা তব মনে ?
অথবা শিশুর-কিরণে
গড়িলে যখন—এরে গড়' সেই রাগে ?

দেখায়েছিলে কি উঠি সৃজিলে যখন
অমৃত-পিপাসু দেবে ?
কি বলিল তারা সবে
দেখিল যখন অই হাসিটি মোহন ?

অমৃত কি, অহে বিধি, ভাল এর চেয়ে ?
তবে কেন ছাড়ে তারা
সুধা-অন্ধ দেবতারা—
অমৃত-অধিক মধু ও হাসিটি পেয়ে ?

কিম্বা চেয়েছিল তারা তুমিই না দিলে ;
দিয়াছ এতই হায়,
চিরসুখী দেবতায়,
দুঃখী মানবের তরে ওটুকু রাখিলে ?

দেখিলে শিশুর হাসি জীবিত যে জন
কে না ভাসে, কে না চায়
আবার দেখিতে তায় ?
একমাত্র আছে অই অখিল মোহন—

জাতি দেশ বর্ণভেদ ধর্মভেদ নাই
শিশুর হাসির কাছে,
সবি পড়ে থাকে পাছে,
যেখানে যখনি দেখি তখনি জুড়াই !

নাহি পর, আপনার, নাহি দুঃখ সুখ,
দেখিলে তখনি মন
মাধুরীতে নিমগন,
কি যেন উথলি উঠে পূর্ণ করে বুক !

আয় আয় আয়, শিশু, অধরে ফুটায়ে
অই স্বরগের উষা,
অই অমরের ভূষা
তুলিয়া হৃদয়ে—দে রে মানবে ভুলায়ে

হে বিধি, নিয়াছ সব, করেছ উদাসী,
এক হৃদয়ের আলো
উহারে করো না কালো,
অতুলনা দীপ ওটি—নিও না ও হাসি !

চাহি না শীতল বায়ু, মুকুল-অমিয়,
চন্দ্রকর বারি-কোলে
নাচিয়া নাচিয়া দোলে,
তাও নাহি চাই, বিধি—ও হাসিটি দিও !

ভাস রে চাঁদের কর—হাস রে প্রভাত,
ডাক্ পাখী প্রিয় স্বরে
দোল্ পাতা ঝুরে ঝুরে
পিঠে করি প্রভাকর-কিরণ-প্রপাত ;

উঠুক মানবকণ্ঠে ললিত সঙ্গীত,
বাজুক "অর্গান" বাঁশী,
তরল তালের রাশি
ছুটুক্ নর্তকী-পায় করিয়া মোহিত ;—

কিছুই কিছুই নয়
ও হাসির তুলনায়,
জগতে কিছুই নাই উহার মতন !
কি মধুমাখানো, বিধি, হাসিটি অমন
দিয়াছ শিশুর মুখে !

(বিবিধ কবিতা, ১৮৯৩)

ভীরু

শিবনাথ শাস্ত্রী

লজ্জাবগুণ্ঠনে কেন সুধাংশু-বদন,
ঝাঁপ বোন ! ভয় নাই আমি লো সরলে,
ও পবিত্র মুখে তব নীচের মতন
ফেলিব না পাপদৃষ্টি চাও মন খুলে ।

দগ্ধ হোক দৃষ্টি তার, পুড়ুক হৃদয়,
যার প্রাণে, প্রস্ফুটিত-কুসুম-নিন্দিত
সুকোমল কান্তি তব পবিত্রতাময়
দেখে, নীচ পাপচিন্তা হয়লো উদিত।

ওই মুখে স্বর্গশোভা, সে চক্ষে নিরয়,
ওই নিষ্কলঙ্ক দৃষ্টি তাহার ভর্ৎসনা ;
সতীত্ব-উন্নত-শৃঙ্গে তোমার আলয়,
কীট সম ভূলুণ্ঠিত তাহার বাসনা।

শুন গো ললনে ! প্রাতে বিহগী যেমতি
তরল তপনালোকে খেলে নিজ মনে,
কোথা ব্যাধ ধরা-পৃষ্ঠে ! তুমি লো তেমতি
পুণ্যালোকে বিহরিছ ফেলিয়া সেজনে।

বালকে কুসুম তোলে, পণ্ডিত তাহার
সৌরভে আনন্দ পান, তুলিলে সে ফুল,
ম্লান হয়, যায় শোভা, যায় গন্ধ-ভার ;
থাক বৃক্ষে, গন্ধে দেশ করলো আকুল।

তুমি নারী, জান নাকি নারী এ জগতে
এ মরু-জগতে যেন বটচ্ছায়া-সমা,
নারী আতপত্র এই জীবনের পথে
গৃহলক্ষ্মী কুললক্ষ্মী নারী নিরুপমা।

কিন্তু বঙ্গে নারীজন্ম বড় বিড়ম্বনা,
তাই ভাবি ও বিশাল সুন্দর নয়নে,
বহে না ত ধারা বোন ! নারীর যাতনা
এ বঙ্গ-সংসারে দেখে কাঁদিলো নির্জনে।

কে এত সহিষ্ণু বঙ্গবালার সমান !
বন-মৃগী সম ভীরু, লাজে নিমীলিতা,
প্রেমের কিরণ-স্পর্শে প্রফুল্লিত প্রাণ,
সে কিরণে তবে কেন তারাও বঞ্চিতা।

দেখ বোন ! তোমা সম অনেক যুবতী
এই বঙ্গে পশুসম পুরুষে ভজিয়ে,
কাঁদিতেছে দিবারাতি ! প্রেমে পূজে সতী
পতি সে পবিত্র প্রেম আসে বিকাইয়ে।

আরো কত বঙ্গবালা নিরাশ-সলিলে,
প্রেম-আশা বিসর্জিয়ে বৈধব্য-আগারে
বসি কাঁদে, বল দেখি সে কথা স্মরিয়ে
এ বঙ্গে রমণী-জন্ম কে চাহিতে পারে ?

তুমি-ভার তোমারো কি তিনি লো সুন্দরি !
আশা যেন তাই হয় ! হৃদয়ে হৃদয়ে
প্রাণে প্রাণে মিশে সুখে বহুক লহরী
প্রণয় আনন্দ শান্তি থাকুক আলয়ে।

বুঝেছ কি কি পদার্থ প্রণয় জগতে ?
প্রাণে প্রাণে সদা কথা, প্রাণে প্রাণে লয়,
এক প্রাণ স্রোতে যেন অন্য প্রাণে বয়,
ভাঙ্গে না ছেঁড়ে না প্রেম যেন কোনমতে।

প্রণয় সহিষ্ণু, প্রেম মধুরতাময়,
চক্ষের কজ্জল প্রেম, হৃদয়ে চন্দন,
প্রাণে সুধা-বিন্দু-সেক, প্রেম জ্যোতির্ময়,
বিষম-বিপত্তি-ঘোরে, নির্জনে সজন।

প্রেমে ভীরু দুঃসাহসী, বোবারে বলায়,
নির্বোধে সুবুদ্ধি করে, হাসায় দুঃখীরে,
ভুলায় আহার নিদ্রা, স্বার্থ দূরে যায়,
মজে প্রাণ করি স্নান সুধা-সিন্ধু-নীরে।

এ প্রণয়ে বাঁধা কান্ত আছে কি তোমার!
ভাল বেস ভাল বাসা মিলিবে তখনি!
সমগ্র প্রাণটি ধরে দিও উপহার,
সমগ্র প্রাণটি হাতে পাইবে অমনি!

কবি আমি দিতে পারি প্রণয়ের শিক্ষা;
এই মন্ত্র মনে রেখ ক'রো লো সাধনা,
এই মন্ত্রে নিজ কান্তে করাইও দীক্ষা;
বিমল আনন্দ-স্রোতে ভাসিবে দু'জনা!

(পুষ্পমালা, ১৮৭৫)

নির্বাসিতের বিলাপ

শিবনাথ শাস্ত্রী

[নির্বাচিত অংশ]

হায় মা! রহিলে কোথা; এই রসাতলে
যাই মা! জনম মত সাগরের জলে;
নমস্কার, নমস্কার! দেও মা! বিদায়,
অভাগা তনয় তব যমালয়ে যায়।
জননি! তোমার ভালে এ হেন যাতনা
লিখেছিল পোড়া বিধি, মনের বাসনা
রহিল মা! মনে মনে; যাই মা! এখন
মনে রেখ দয়াময়ি! জন্মের মতন।

তোমার মহৎ ঋণ রহিল সমান,
তিলমাত্র না শুধিনু আমি কুসন্তান !
লইয়া সে গুরু ঋণ যমালয়ে যাই,
তোমাকে জননী যেন লোকান্তরে পাই।

কোথায় রহিলে প্রিয়ে ; চলিনু সুন্দরী,
তোমাকে ভবের মাঝে একা পরিহরি,
দেও লো বিদায়, যাই জন্মের মতন
আর কেন খুলে ফেল অঙ্গের ভূষণ,
এত দিনে বিধুমুখি ! হারালে আমায়
বিধাতা বিধবা আজি করিল তোমায় !
বড় আশা ছিল মনে, দেখিয়া তোমার
প্রেম-পূর্ণ মুখখানি, ছাড়িব সংসার !
বড় আশা ছিল মনে, মরণ-শয্যায়
বসায়ে তোমারে পাশে, লইয়া বিদায়,
চারি চক্ষু এক করে মুদিব নয়ন !
আজি সে সুখের আশা দিনু বিসর্জন,
একাকী বিজন দেশে জীবন হারাই,
পামরের তরে কেহ কাঁদিবার নাই ;
এখন রহিলে কোথা জীবনের ধন !
এস এস একবার করসে রোদন।
আর যে পাব না দেখা জনমের মত,
এস এস, বলে যাই কথা গুটিকত।
আজি সিন্ধু মুক্তি দিল বুঝিবা আমায় ;
সুখে থেকো প্রাণেশ্বরি, বিদায় ! বিদায় !

কোথা রে অভাগা শিশু ! পাপীর সন্তান !
জনমের মত পিতা করিল প্রস্থান
বাছা রে তোমার দুখে ফাটিছে হৃদয়,
করেছি জীবন তোর আমি বিষময়,

না পাইলে করিবারে পিতৃ সম্ভাষণ,
না দেখিলে জননীর প্রসন্ন বদন !
জন্মাবধি দুঃখভোগে কাটাইলে কাল,
বয়োবৃদ্ধি হবে যত বাড়িবে জঞ্জাল !
পাপীর সন্তান বলি ঘৃণা হবে মনে,
থাকিবে লোকের মাঝে মুদিত বদনে,
এই সে পাপিষ্ঠ পিতা যমালয়ে যায়,
মনে রেখো বাছাধন, বিদায় ! বিদায় !

(নির্বাসিতের বিলাপ, ১৮৬৮)

মাতৃহারা

মানকুমারী বসু

১

মা আমার ! মা আমার !
আমারে একেলা ফেলে
কোথা মাগো চলি গেলে,
এখানে থাকিতে আমি পারি না যে আর,
দশদিক করে ধু ধু,
আঁধার আঁধার শুধু,
আকাশ-অবনীভরা শুধু অন্ধকার।

২

মা আমার ! মা আমার !
মাতৃস্নেহ-পিপাসায়
হিয়া যে শুকায়ে যায়
চাতকের তৃষ্ণা যে মা তব তনয়ার ;
কই মা, মমতা কই,
তোমারি করুণা বই
কভু যে এ মহাতৃষা মিটে না আমার।

৩

মা আমার ! মা আমার !
খুঁজিতেছি প্রতি ঘরে
ডাকিতেছি এত ক'রে,
কোথা যে মিলে না মাগো কিছুই তোমার,
সে দেবী-মুরতিখানি
সে অমৃত-মাখা বাণী,
সীমাহীন, রেখাহীন, স্নেহ-পারাবার।

৪

মা আমার ! মা আমার !
ধরার বিষাক্ত বায়
লাগে পাছে মম গায়,
তাই যে রাখিতে ঢাকি আঁচলে তোমার,
আজি কোথা সেই ছায়া,
কোথা সে মমতা মায়া,
কোথা সে আরামদাত্রী অভয়া আমার !

৫

মা আমার ! মা আমার !
বৎস যথা গাভীহীন,
বারি বিনা যথা মীন,
আশাশূন্য চিত্ত যথা চিত্র বেদনার,
তেমনি (হারায়ে তোমা)
আমি হয়ে আছি ও মা !
কেমনে সহিছ তুমি এ ব্যথা আমার !

৬

মা আমার ! মা আমার !
কে নিঠুর নিরমম
ভীষণ ভীষণতম,
করি গেল অনায়াসে হেন অত্যাচার,

মা'র কোল নিল কাড়ি,
মরু মাঝে দিল ছাড়ি,
সরবস্ব নিল তব অভাগী কন্যার!

৭

মা আমার! মা আমার!
নিদারুণ চৈত্রমাস
করি গেল সর্বনাশ,
সিত নবমীর তিথি বৃহস্পতিবার—
জলদে লুকাল রবি,
মসীমাখা বিশ্ব-ছবি,
পড়িল আকাশ থেকে অশ্রু দেবতার!
মুক্তিপ্রদ প্রাণারাম,
সে তারকব্রহ্মনাম,
উচ্চারিত শতমুখে হরিধ্বনি আর!
আমারে মা দিয়ে ফাঁকি
তখনি মুদিলে আঁখি
জনমের মত ফিরে চাহিলে না আর!

৮

মা আমার! মা আমার!
মুখে দিনু গঙ্গাজল,
শিরে দিনু পদতল,
মা মা বলি ডাকিলাম করি হাহাকার।
হায় মা, নিঠুর মেয়ে,
তবু দেখিলে না চেয়ে,
বুঝিলে না কি যে গতি হবে অনাথার!

৯

মা আমার! মা আমার!
তোমা বিনা বসুন্ধরা,
হবে যে কালাগ্নি-ভরা,
তোমা বিনা কে করিবে সঙ্কটে নিস্তার?

কক্ষভ্রষ্ট গ্রহসম,
এ দীর্ঘ জীবন মম,
ছিঁড়ে চিরে, ভেঙ্গে চূরে করে চূরমার !

১০

মা আমার ! মা আমার !
অত দয়া অত স্নেহ,
হারালে কি বাঁচে কেহ,
হোক্ না মানব-ভাগ্য কর্মফল তার।
হোক্ না সে শক্তিহীন,
হোক্ না অদৃষ্টাধীন,
তবু তো ক্ষমতা তার চাহি সহিবার !

১১

মা আমার ! মা আমার !
তোমারি চরণ নিত্য,
মার সর্ব পুণ্যতীর্থ,
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি এ জগতে সার,
তার শিরে বজ্র হানি
কে তোমারে নিল টানি'
জানি না এ নির্মমতা কার সুবিচার।

১২

মা আমার ! মা আমার !
আজি আমি বড় দীনা,
আজি আমি মাতৃহীনা,
'গৃহধর্ম', সব কর্ম ঘুচেছে আমার,
তোমারে বিদায় দিয়ে
রব আর কিবা নিয়ে,
সকল কাজের শেষ তব সেবিকার।

১৩

মা আমার ! মা আমার !
ওমা সতী ! পুণ্যবতী !
ধর্ম্মপ্রাণা শুদ্ধমতি ;
তিনকুল উজ্জলিয়া করেছ সংসার ;
বিশ্বের আরামদাত্রী
অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী,
তোমারে মা রূপে পাওয়া সিদ্ধি তপস্যার !
পোহালে এ কালরাতি,
দিও দিও কোল পাতি,
দেখাইয়া দিও পথ বৈতরণী পার,
তোমার মা-হারা মেয়ে,
পুনঃ মার কোল পেয়ে,
লভিবে সে শান্তি তৃপ্তি, আনন্দ আবার,
পুণ্যদাত্রী মুক্তিদাত্রী তুমি মা আমার।

('বিভূতি')

নবমীর সন্ধ্যা

(বিজয়া)

রজনীকান্ত সেন

দেখিয়া পিয়াস না মিটিতে, উমা
বছরের মতন হও অদর্শন ;
'মা' ডাক শুনিয়া, না জুড়াতে হিয়া,
নিস্তব্ধ হয়, মা, অভাগীর ভবন।
কোলে নিয়ে আমার না জুড়া'তে বুক,
কেড়ে নিয়ে যায়, মা, বিধাতা বিমুখ,
(আমার) বছরের আগুনে, ঘৃতাহুতি দিয়ে,
পাষাণ হয়ে, কর কৈলাসে গমন ;

তোমার আগমনে চাঁদ হাতে পাই,
সুখের সাথে শঙ্কা, কখন্ বা হারাই।
এই) আকাশ হতে খসি', কখন কৈলাস-শশী,
কৈলাসের আকাশে সমুদিত হন।

কোন্‌বার এসে আমায় করবি শঙ্কাশূন্য ?
এত ভাগ্য কোথায় ? কি করেছি পুণ্য ?
তোর আগমনানন্দে বিরহের আতঙ্ক
জড়িয়ে থাকে, তাইতে পাইনে আস্বাদন।

কত কি খাওয়াব, সব ভুলে যাই,
বড় ব্যাকুল হিয়া, স্মৃতি ভাল নাই,
গৌরি ! তোমায় পূজে প্রফুল্ল সবাই,
আমার পক্ষে বিধান অশ্রু-বরিষণ।

ঐ অস্ত গেল, অকরুণ রবি,
নবমীর শশী, পাষাণের ছবি
ঐ দেখা যায়,—আয় কোলে আয় ;
কান্ত বলে, মা, আর করিস্‌নে রোদন।

('আনন্দময়ী')

মা

রজনীকান্ত সেন

স্নেহ-বিহ্বল, করুণা-ছলছল,
শিয়রে জাগে কার আঁখি রে !
মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে, অশরণ লাগি রে।

শ্রান্ত অবিরত যামিনী-জাগরণে,
অবশ কৃশ তনু মলিন অনশনে ;
আত্মহারা, সদা বিমুখী নিজ সুখে,
তপ্ত তনু মম, করুণা-ভরা বুকে
টানিয়া লয় তুলি', যাতনা-তাপ ভুলি',
বদন-পানে চেয়ে থাকি রে !
করুণে বরষিছে মধুর সান্ত্বনা,
শান্ত করি' মম গভীর যন্ত্রণা ;
স্নেহ-অঞ্চলে মুছায়ে আঁখিজল,
ব্যথিত মস্তক চুমে অবিরল,
চরণ-ধূলি সাথে, আশীষ রাখে মাথে,
সুপ্ত হৃদি উঠে জাগি রে !
আপনি মঙ্গলা, মাতৃরূপে আসি',
শিয়রে দিল দেখা পুণ্য-স্নেহরাশি,
বক্ষে ধরি' চির-পীযূষ-নির্ঝর,
নিরাশ্রয়-শিশু-অসীম-নির্ভর ;
নমো নমো নমঃ, জননি দেবি মম !
অচলা মতি পদে মাগি রে !

('বাণী')

অদ্ভুত রোদন

দেবেন্দ্রনাথ সেন

"এতদিনে মহাব্রত সাঙ্গ হ'ল মোর—
রাখ্ বোন ফুল, তেল, গুঁজিকাটি তোর ;
সময় বহিয়া যায়, কি হবে মান-সজ্জায় ?
রুক্ষবেশে, রুক্ষকেশে ভেটিব তাঁহায়।

পরেছি সিন্দূর আমি, গৃহে এসেছেন স্বামী,
মঙ্গলের বাকি তবে কি রহিল হায় ?
চল্ বোন রান্নাঘরে, আজি পরিপাটি করে'
রাঁধি দুইজনে মিলি পায়স ব্যঞ্জন ;
বিদেশ বিভূঁয়ে হায়, অনাহারে অনিদ্রায়
কত কষ্ট পাইয়াছে গরীব ব্রাহ্মণ !"—
বাড়ী ফিরে এল পতি চিরবিরহিণী সতী
হাসিছে মধুরে কিবা গালভরা হাসি !
গেল গেল মোর নেত্র অশ্রুজলে ভাসি'।

পড়ে গেল হুলস্থূল পাড়ার ভিতরে।
ফাঁকিয়ে শ্বশুর-ঘর বহু বহুদিন পর
এসেছে, এসেছে কন্যা নিজ পিতৃঘরে।
বহুক্ষণ মা'র কাছে, খানিক পিতার কাছে,
খোকারে পিঠেতে তুলি খানিক বাগানে ;
খুকির ধরিয়া কর দেখে তার খেলাঘর,
দুটি কথা খানিক সইর কাণে কাণে ;
ঝি-মারে বসায়ে দূরে সলিতা পাকায় ধীরে,
কভু কাটে ফলমূল মার কাছে বসে' ;
ছোট বৌ'র হাত হ'তে কাড়ি' লয়ে আচম্বিতে
নিজে কভু সাজে পান মনের হরষে।
বহু বহুদিন পরে কন্যা আসি পিতৃ-ঘরে
মূর্তিমান হাসি যেন ছুটিয়া বেড়ায়—
হায় রে আমার চক্ষু জলে ভেসে যায় !

কৌটার সিন্দুর

দেবেন্দ্রনাথ সেন

কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দুর !

সেই আঙুলের দাগ কৌটা মাঝে লেগে থাক্,

অধরে লাগিয়ে থাক্ চুম্বন মধুর ;

কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দুর ?

রঙে-রঙে ঘেঁসাঘেঁসি, রাগে-রাগে মেশামেশি,

থাক্, থাক্, নিও না ও কৌটার সিন্দুর !

ও রাগ মিলায়ে যাবে, কৌটা বড় দুঃখ পাবে !

মিলন-মধুর হবে বিরহ-বিধুর !

কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দুর ?

রেখে দে যতন ক'রে ;—দেখিস্ তখন

দুঃখিনীর হবে যবে অন্তিম শয়ন।*

অবাক হইয়ে যাবি, মনে কত ভয় পাবি,

সিন্দূরের কৌটা খোলে আপনা আপনি !

তাম্বূলের বাটা খোলে আপনা আপনি !

অধরে তাম্বূল-রাগ, ললাটে সিন্দুর-দাগ,

চ'লে যাবে উচ্চ কণ্ঠে গাহিয়ে রাগিণী,

তোহাদেরি মাঝ দিয়া বিধবা ভামিনী !

তোরা সব এয়ো মিলে, কৌটা খুলে নিস ঢেলে,

ললাটে সিন্দুর-ফোঁটা দিস্ ভরপুর ;

আহা এবে থাক্ প'ড়ে কৌটার সিন্দুর !

(অশোকগুচ্ছ, ১৯০০)

রাণীর চুমো

দেবেন্দ্রনাথ সেন

"দাও রাণি, চুমো দাও"—দু'বাহু জড়ায়ে
মার গলে, রাণী গিয়া করিল চুম্বন !
উষার উৎসঙ্গে উঠি, উল্লাসে ঘুমায়ে,
পড়িল রে প্রজাপতি বিচিত্র-বরণ !
শুক্র-তারকার রশ্মি পড়িল ছড়ায়ে,
হেরি যেন হিমাংশুর পাণ্ডুর বদন !
কনক-চম্পক হেন পড়িল গড়ায়ে,
ভূমি-চম্পকের শাখে ; মরি কি মিলন !
মরি মরি কি মিলন !—কত ভাগ্য-ফলে,
দুঃখী মোরা পাইয়াছি তোরে ওরে রাণি !
ধন গেছে, সুখ গেছে, আশা গেছে চ'লে,
তবু ফল-ফুলে ভরা দাবদগ্ধ প্রাণী !
আয় রাণি, বুকে আয়—থাকুক্ কবিতা,
চুমো খাই—ভুলে যাই বিশ্বের বারতা !

(অপূর্ব শিশুমঙ্গল, ১৯১২)

খোকাবাবু

দেবেন্দ্রনাথ সেন

কহিলাম চুপি চুপি, "ধরণ তোদের
সকলি রহস্যময় ! শিশু-রাজত্বের
ব্যবস্থা, আইন, বিধি অদ্ভুত সকলি !
কেন আকাশের পানে তাকায়ে কে বলি
করিস্ দেয়ালা ? কেন পায়ের আঙুল
চুষিস্ অনন্যমনে ? হায় রে বাতুল !"

কে যেন উত্তর দিল নীরব ভাষায়—
"স্বর্গ-অমৃতের স্বাদ ভোলা কভু যায় ?
এখনও যায় নাই আলোকের নেশা ;
এখনও ঘোচে নাই আঁধার-কুয়াশা ;
এখনও চুষি-কাটি আর ঝুনঝুনি
সাধেনি তাদের কাজ—এখনও শুনি,
শিয়রেতে দেবশিশু বাজায় নূপুর,
নারদের বীণা বাজে মধুর মধুর !
তাই শুনে গদ গদ আহ্লাদে ভাসিয়া
করি গো দেয়ালা ; তাই থাকিয়া থাকিয়া,
নীরবে চুম্বন করি আপন চরণ,
যখনি সে সুখস্মৃতি হয় গো স্মরণ !
উর্বশী অমৃত-বাটি আনন্দে ধরিত !
ইন্দ্রাণী সে সুধারাশি পিয়াইয়া দিত !"

(অপূর্ব শিশুমঙ্গল, ১৯১২

ডাকাত

দেবেন্দ্রনাথ সেন

মহা আস্ফালন করি, গৃহে যবে আইল ডাকাত,
কপাট খুলিয়া দিনু,—দিনু তারে ধনরত্নরাশি
যত ছিল, কিন্তু সে গো হাসি হাসি, আসি অকস্মাৎ,
বুকে উঠি, দুটি বাহু প্রসারিয়া,—গলে দিল ফাঁশি !
তার কাছে ত্রস্ত হয় পরিজন, যত দাস দাসী !
বর্গি যেন দেশে এল ! "দস্যুরাজ" শিবাজী সাক্ষাৎ !
ওরে দস্যু ! আর কেন ? ক্ষমা কর, যোড় করি হাত,—
হৃদয়-ভাণ্ডার খালি ! সব তুমি লুটিয়াছ আসি !

ওরে শিশু ! নাহি তোর ঢাল, খাঁড়া, শাণিত কৃপাণ ;
কিন্তু তোর দন্তহীন দু-অধরে ওই চারু হাসি,
কাড়িয়া লয়েছে মোর ভালবাসা-স্নেহরত্নরাশি !
তোর হাতে কি দুর্দশা ! আমি এবে ভিখারী-সমান !
কেবা শোনে কার কথা ! দস্যু মোর কেশরাশি ধরি,
হাসিতেছে খল্‌খল্‌—চারিধারে মুক্তা পড়ে ঝরি !

(অপূর্ব শিশুমঙ্গল, ১৯১২)

খোকাবাবু

দেবেন্দ্রনাথ সেন

মোর কণ্ঠ জড়াইয়া, শিশু কহে "সবারি কবিতা
হ'য়ে গেল !—মোর কই ? মোর প্রতি নাহি ভালবাসা ?"
খোকার সে কাঁদো কাঁদো মুখখানি, আধো আধো ভাষা
নিরখি, হইল মোর চিত্ত-রাধা দুঃখিতা, লজ্জিতা !
কহিলাম মনে মনে "খোকাবাবু, ভ্রাতা, ভগ্নী, পিতা,
সবারি তুলনা আছে ! সৃষ্টিছাড়া ! কোথা তোর বাসা ?
চন্দ্র হারে, তারা হারে তোর কাছে !—একি রে তামাসা !
লাজে তাই অধোমুখী আমারো এ বাসন্তী কবিতা ।"
শাদা কুন্দ নিরানন্দ হেরি তোর অতি শুভ্র হাসি ;
লাল পদ্ম লাজ পায়, হেরি তোর টুক্‌-টুকে মুখ !
কেমনে কবিতা লিখি ? যাদু ! তুই আনন্দের রাশি !
তোরে হেরি আশা, প্রেম, প্রীতি, স্নেহে, ভরি গেল বুক !
অপূর্ব বাৎসল্য-ভাব চিতে জাগে !—বুঝি এত কালে,
পাব আমি নীলকান্ত-মণি-ধনে, ননীচোরা লালে ।

(অপূর্ব শিশুমঙ্গল, ১৯১২)

শিশিরকুমার

দেবেন্দ্রনাথ সেন

১

আয় যাদু শিশিরকুমার ;
আয় আয়, এ বুকে আমার !
হেরি তোর মুখ-ইন্দু
উথলিছে সুধা-সিন্ধু,—
কল্লোল-হিল্লোলময় প্রীতি-পারাবার !
ওরে মোর অতুল, অতুল,
নব বসন্তের নব ফুল,
রক্তপদ্ম, গোলাপ গরবী,
গন্ধরাজ, টগর, করবী,
ইহাদের সাথে আজি করিব না ও মুখের তুল !
সুগভীর অরণ্য-অটবী—
দক্ষিণ-কাননে এক হেরেছিনু জ্যোতির্ম্ময় ফুল,
মহিমার ছবি !
বন আলো করি ফুল হেসেছিল, অজানা, অচেনা,
রূপ তার ফাটি পড়ে,
অঙ্গে অঙ্গে দ্যুতি ঝরে !
চন্দ্রকান্তমণি-দেহে ঝরে যথা চাঁদের জোছনা।
বিভোর বিভোর ফুল নিজ গরিমায় !
নামের কলঙ্ক-চিহ্ন নাহি তার গায় !
ওরে যাদু, তুই সেই ফুল,
অতুল, অতুল !

২

ওরে মোর মনচোর,
সরল হাসিতে তোর,
ধরা পড়িয়াছে মরি,
আদি-রহস্যের কায়া !
বড়ই লাগেরে ভাল,
তোর ফুট্‌ফুটে আলো ;
পলায়েছে
সংশয়ের, সন্দেহের আব্‌ছায়া !
উষার আলোক
উছলিছে মুখে তোর,—
দেখা যায় ভূলোক, দ্যুলোক !

৩

রে স্বচ্ছ সরসী !
বিস্মিত বদনে তোর,
নীহারিকা, পূর্ণিমার শশী !
একি স্থির নীর !
পরিষ্কার, পরিস্ফুট ! দেখা যায় অন্তর, বাহির :

৪

চিত্তসরে, নিদাঘে নিঝুম,
আমার এ প্রাণবৃন্তে ছিল আহা কুমুদ কুসুম !—
তোর ও মোহন স্পর্শে,
জাগিয়া উঠিছে হর্ষে,
আমার এ যামিনী-কুসুম !
বুঝিয়াছি, মর্তধামে, দেবতার করুণার নীর,
শিশুর পরশসুধা ! সঞ্জীবনী নিশির শিশির !

(অপূর্ব শিশুমঙ্গল, ১৯১২)

শিশুর স্তন্যপান

দেবেন্দ্রনাথ সেন

১

লোকে বলে অতুলনা কালিদাসী উপমা—
নিক্তিতে ওজন ক'রে,
দেখ দেখি ভাল ক'রে,
বোঝা যাক্ কার কত উপমার গরিমা!
বলিহারি, বলিহারি,
মোর পাল্লা হ'ল ভারি,
খর্ব-গর্ব হ'য়ে গেল সর্ব-কবি-মহিমা!

২

"ওই দেখ প্রজাপতি ব'সে আছে কুসুমে—
নাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া,
আত্মহারা, দিশেহারা,
চক্ষু বুজে, করবীর মুখ চুমে নিঝুমে!
কারো ঠাঞি, কোনো ঠাঞি,
ইহার তুলনা নাই;
কে পারে দেখাতে এর উপমা নিখিল ভূমে?"

৩

ও তুলনা মোর কাছে তুল না হে তুল না!
সৌন্দর্য-ঐশ্বর্য লাগি
আমি গো সর্বস্বত্যাগী;
বিবাগী-বৈরাগী-সাথে কোরো না রে ছলনা!
রেখে তব রঙ্গ ছল,
দুই চক্ষে দিয়ে জল,
শুদ্ধ-অন্তঃপুরে গিয়ে দেখে এস সুষমা!
শুক্রতারা ক্রোড়ে ল'য়ে ব'সে আছে চন্দ্রমা!

৪

চুপ্! চুপ্! চুপে এসে, ঐখানে থাক ব'সে—
জননী-উৎসঙ্গে শিশু দুগ্ধ খায় নীরবে ;
গৃহখানি গেছে ভরি পারিজাত-সৌরভে !
অনুপম, অপরূপ ! দেখিছ না ? চুপ ! চুপ !
দেখিছেন দেব সব এই দৃশ্য নীরবে !
এক স্তন হস্তে ধরি, অন্য স্তন মুখে পুরি,
চক্ষু বুজি !—ভৃঙ্গ যেন কমলের আসবে !
স্ফীত বুক !—রাজা যেন বৈভবের গরবে !
আত্মহারা ! প্রজাপতি যেন পুষ্প-গরভে !
তুমিও গো চুপে এসে, এইখানে থাক ব'সে—
একটি প্রহর ধরি দৃশ্য দেখ নীরবে !—
ভাতিছে স্বর্গের আলো ওই দেখ পূরবে !

৫

লোকে বলে অতুলনা কালিদাসী উপমা—
নিক্তিতে ওজন ক'রে,
দেখ দেখি ভাল ক'রে
বোঝা যাক্ কার কত উপমার গরিমা !
বলিহারি, বলিহারি,
মোর পাল্লা হ'ল ভারি,
খর্ব-গর্ব হ'য়ে গেল সর্ব-কবি-মহিমা !

(অপূর্ব শিশুমঙ্গল, ১৯১২)

ভয়ে ভয়ে

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

ভয়ে ভয়ে কেন, বাছা, যাস্ ফিরে ফিরে ?
কচি কচি ঠোঁট দুটি কেন কাঁপে ধীরে ?
বিষাদ-গম্ভীর মুখ,
দেখে কি কাঁপিছে বুক ?

—ঢল ঢল আঁখি-যুগ ছল ছল নীরে !
আসিতে সাহস নাই,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে চাই',
ডাকিলেই আস ধাই, আজ কেন চেয়ে রে !

আমার স্নেহের লতা,
তুমি কি বুঝেছ ব্যথা !
কাঁপিছে অধর-পাতা, অভিমানী মেয়ে রে !
মুচেছি, মা, আঁখি-জলে ;
ভয় কি, মা, আয় কোলে !
ডাকি দেখ্ 'মা' 'মা' বলে, আয় বুকে, রাণি রে !
—আয় বুকে অবশিষ্ট সুখ-হাসিখানি রে !

(অশ্রুকণা, ১৮৮৭)

চোর

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

কোথা হ'তে এলি তুই, ওরে ওরে ওরে চোর ;
সর্বস্ব লইলি হরি যাহা কিছু ছিল মোর।
কোলের উপরে বসে'
হৃদয় লইলি চুষে'—
বুকেতে কাটিয়া সিঁধ, এমনি সাহস তোর :
কোথা হ'তে এলি রে তুঁদে রে ক্ষুদে সিঁধেল চোর
কিছু থুতে সাধ নাই,
সকলি তুহার চাই ;
মুখের তাম্বুলটুকু,
সিঁথির সিন্দুরটুকু,
গলার হাঁসুলি হার—বাহুর কনক ডোর ;—
চাই আকাশের চাঁদ কপালের টিপ্ তোর।

হায়রে সিঁধেল চোর,
আরো নিতে বাকি তোর !
নয়নের নিদ্রা নিলি, উদরের ক্ষুধা,
তৃষার পানীয় নিলি, নিলি স্নেহ-সুধা ।—
নিলি যৌবনের চারু
কান্তি মনোহর ;
মরমে কাটিয়া সিঁধ
নিলি সর্বস্তর ।—
কোথা হ'তে এলি তুই রে ক্ষুদে তস্কর !

নেই ভয় নেই শ্রান্তি,
অম্লান-কুসুম-কান্তি,
গুড়ি গুড়ি হামাগুড়ি এ ঘর ও ঘর ।—
বঙ্কিম অধরপুটে
দুধে দাঁত দুটি ফুটে ;—
পলকে পলকে ছুটে হাসির লহর !
ভূত ভবিষ্যৎ নিলি,—
নিলি বর্তমান ;
হরিলি সমগ্র ধরা
জগতের প্রাণ ;

আপনা হারায়ে শেষে হাসি-ভাবে ভোর,—
কোথা হ'তে এলি তুই ওরে ক্ষুদে চোর ।
এই কান্না এই হাসি,
রোদ বৃষ্টি পাশাপাশি ;—
গলায় তুলিয়া দিয়া কচি বাহু-ডোর,
সর্বস্ব লইলি হরি ক্ষুদে দুঁদে চোর !

(শিখা, ১৮৯৬)

গ্রাম্য-ছবি

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

মাটিতে নিকানো ঘর, দাওয়া-গুলি মনোহর,
সমুখেতে মাটির উঠান।
খ'ড়ো-চাল-খানি ছাটা, লতিয়া করলা-লতা
মাচা বেয়ে ক'রেছে উত্থান!
পিঁজারায় বদ্ধ বাঁধা, 'বউ-কথা' কহে কথা,
বিড়ালটি শুইয়া দাবাতে;
মঞ্চে তুলসীর চারা, গৃহে শিল্প কড়ি-ঝার,
খোকা শুয়ে দড়ির দোলাতে।
কাণে দুল, দুল্-দুল্, গাছ-ভরা পাকা কুল্,
ধীরে ধীরে পাড়ে দুটি বোনে!
ছোট হাতে জোর করে, শাখাটি নোয়ায়ে ধরে,
কাঁটা ফুটে হাত লয় টেনে।
পুকুরে নির্মল জল, ঘেরা কলমীর দল,
হাঁস দুটি করে সন্তরণ;
পুকুরের পাড়ে বাঁশ-বন।
শূন্য জন-কোলাহল, কিচিমিচি পাখী-দল,
সাঁই সাঁই বায়ুর স্বনন,
রোদ-টুকু সোনার বরণ।
লুটায় চুলের গোছা, বালা দুটি হাতে গোঁজা,
একাকিনী আপনার মনে
ধান নাড়ে বসিয়া প্রাঙ্গণে।
শান্ত, স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে গ্রাম্য মাঠে গোরু চরে;
তরু-তলে রাখাল শয়ান;
সরু মেঠো রাস্তা দিয়ে পথিক চ'লেছে গেয়ে,
মনে পড়ে সেই মিঠে তান।

আজি এই দ্বিপ্রহরে,   বাল্য-স্মৃতি মনে পড়ে,—
মনে পড়ে ঘুঘুর সে গান।
সুধাময়ি জন্মভূমি,   তেমতি আছ কি তুমি,
শান্তি-মাখা, স্নিগ্ধ, শ্যাম প্রাণ!

(অশ্রুকণা, ১৮৮৭)

গার্হস্থ্য চিত্র

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

ফুট্‌ফুটে জোছনায়,   ধব্‌ধবে আঙ্গিনায়,
একখানি মাদুর পাতিয়ে,
ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে,   জননী শুইয়া আছে,
গৃহকাজে অবসর পেয়ে।
সাদা সাদা মুখ তুলি',   জুঁই, শেফালিকাগুলি,
উঠানের চৌদিকে ফুটিয়ে;
প্রাচীরেতে সুশোভিতা   রাধিকা, ঝুমুকালতা,
দুলিতেছে চন্দ্র-করে নেয়ে।
মৃদু ঝুরু ঝুরু বায়   বসন কাঁপায়ে যায়,
ঝ'রে পড়ে কামিনীর ফুল;
প্রশান্ত মুখের পরে   কালো কেশ উড়ে পড়ে,
অলসেতে আঁখি ঢুলু ঢুলু।
মৃদু মৃদু ধীর হাতে,   আঘাতি শিশুর মাথে,
গায় ঘুম-পাড়ানিয়া গান।
মোহিয়া সুস্বর ভাষে,   আকুল কি ফুলবাসে,
পিঞ্জরে ধরেছে পাখী পিউ পিউ তান!
শিয়রেতে জেগে শশী,   যেন সে সৌন্দর্যরাশি,
নেহারিছে মগ্ন হ'য়ে ভাবে।

ছেলে ডাকে 'আয় চাঁদ', মা বলিছে 'আয় চাঁদ',
কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে!
মা নাই ঘরেতে যার, ছেলে কোলে নাই যার,
যত কিছু সব তার মিছে!
চাঁদে চাঁদে হাসা-হাসি, চাঁদে চাঁদে মেশামেশি,
স্বর্গে মর্ত্তে প্রভেদ কি আছে!

(অশ্রুকণা, ১৮৮৭)

ভিখারিণী মেয়ে

মানকুমারী বসু

১

দিনমান যায় যায় প্রায়,
গেল রোদ গাছের আগায় :
কে ও গায় পথে বসি' এমন সময়?—
না না না, আমারি ভুল, গান ও তো নয়;
পরাণে কত কি ব্যথা পেয়ে,
কাঁদে এক ভিখারিণী মেয়ে!

২

কত দুখে আহা রে! না জানি,
শুকায়েছে সোণা মুখখানি!
ছেঁড়া বাস জুড়ে তেড়ে ঢাকিয়াছে কায়,
কত দিন তেল বুঝি পড়েনি মাথায়!
অই শুন! বড় বেদনায়
নিজে কেঁদে পরেরে কাঁদায়!

৩

"এ জগতে কেউ মোর নাই
আমি আছি ভিখারিণী তাই ;
দুয়ারে দুয়ারে ডাকি 'ভিক্ষা দাও' ব'লে,
ঘর নাই, রে'তে তাই থাকি তরুতলে ;
কিছু নাই আমার সম্বল,
সবে ধন নয়নের জল !

৪

ছেলে মেয়ে পথ বেয়ে যায়,
অভাগিনী নীরবে তাকায় ;
'পাছে রাগ করে' ভেবে কথা বলি নাই ;
তারা কেউ নহে মোর বোন কিংবা ভাই ;
তাই তারা আমারে ডাকে না,
মোর পানে চেয়েও দেখে না !

৫

এ জগতে কে আছে আমার,
আমায় বলিবে 'আপনার' ;
আপনা আপনি কাঁদি কেউ নাহি শুনে,
আমারে জগতে কি গো ! কেউ নাহি চিনে ?
এ দেশে তো এত আছে লোক,
মোর তরে কেবা করে শোক ?

৬

হায় বিধি ! আমার কপালে,
মরণ আছে কি কোনো কালে ?
বাবা গেছে, দাদা গেছে, মা'ও গেছে চ'লে,
একা আমি প'ড়ে আছি, এত সব' বলে,
ভাগ্যবান্ তাড়াতাড়ি মরে,
অভাগারে যমে ভয় করে ।

৭

তিনদিন ভাত নাই পেটে,
চলিতে পারিনে পথ হেঁটে ,
আকাশে উঠিছে মেঘ উড়িছে পরাণ,
যদি আসে ঝড় জল কোথা পাব স্থান ?
এইমাত্র ভিক্ষা দাও হরি !
আজ যেন একেবারে মরি !

৮

দারুণ দুঃখের জ্বালা স'য়ে,
বেঁচে আছি আধমরা হ'য়ে ,
এখন বাসনা শুধু, জনম-মতন—
মরণের কোল পাই করিতে শয়ন ,
এ জগতে কেউ যার নাই,
মরণ ! তুমিই তার ভাই !"

৯

কচি মুখে এ বিষাদ-গান,
শুনে কা'র কাঁদে না পরাণ ?
আয় তোরা ভাই বোন, সবে মিলে যাই
দুখিনীর আঁখি-জল যতনে মুছাই ,
আমাদের মানুষের প্রাণ,
কেন হবে নিরেট পাষাণ ?

১০

চল্ ! তোরা ওর হাত ধ'রে,
ডেকে আনি আমাদের ঘরে ,
এ জগতে কেউ ওর আপনার নাই,
কেউ হ'ব বোন মোরা কেউ হ'ব ভাই ,
তা হ'লে ও বেদনা ভুলিবে,
তা হ'লে বা পুলকে হাসিবে !

(কাব্যকুসুমাঞ্জলি, ১৮৯৩)

অতিথি

শ্যামকুমারী বসু

(কোন সন্তোজাত শিশুর মৃত্যু-উপলক্ষে লিখিত)

১

তুমি আসিবে তা' করিয়া শ্রবণ,
দেখায়েছে আশা সুখের স্বপন ;
হেরিব একটী অমূল্য রতন,
খেলিতে পাইব একটী সাথী ;
তোমারে আনিতে আগু বাড়াইব,
আদরের ধন আদরে আনিব,
সুমঙ্গল শাখ সুখে বাজাইব,
ঘরে জ্বালাইব মঙ্গল-বাতি ।

২

জড়ায়ে ধরিয়া জননী উষায়,
শিশু রবি রাঙা কিরণ ছড়ায়,
তাদের ডাকিয়া এনেছি হেথায়,
দেখা'তে তোমারে সোহাগ-ভরে ;
তুমিই আসিবে, তুমিই হাসিবে,
এ আনন্দ-ধামে আনন্দ বাড়িবে,
রাঙা পা দু'খানি যেখানে রাখিবে,
কুসুম ফুটিবে কুসুম পরে ।

৩

কিন্তু, হা ! কল্পিত সে সুখ-কামনা
মনেই রহিল—কাজে তা' হ'ল না
ভেঙে দিল ঘুম—নিঠুর চেতনা !
দেখিলাম, তুমি যেতেছ দূরে ;

সেই রবি পুন পশ্চিমে হেলিল,
ঊষার সে আলো আঁধারে মিলিল,
বীণা বাঁশী সব বেসুরা বাজিল,
হায়! তুমি গেলে অজানা পুরে!

৪

একদিন—মরি! তাও দাঁড়ালে না,
কেন এসেছিলে বলিয়া গেলে না,
ফুটিতে আসিয়া ফুটিতে পেলে না,
গোলাপ-মুকুল পড়িলে ঝরি!
দ্বিতীয়ার সেই শিশু-শশি-সম,
একবিন্দুখানি—তবু নিরুপম!
নিদয় নিঠুর কাল নিরমম
দেখিতে দিল না নয়ন ভরি!

৫

মা'র বুকে ভরা অমৃতের সিন্ধু,
পেলে না'ক স্বাদ তার একবিন্দু,
দেখিতে পেলে না রবি, তারা, ইন্দু,
আশীষ আদর সকলি ফেলে,
আতপ-তাপিত ফুল-কলি হেন
ফুটিতে ফুটিতে শুকাইলে যেন,
তোমা লাগি চোখে জল আসে কেন?
তুমি তো "অতিথি" চলিয়া গেলে!

(কনকাঞ্জলি, ১৮৯৬)

অভ্যর্থনা

মানকুমারী বসু

(কোনও সদ্যোজাত শিশুর প্রতি)

পথ ভুলে এ মর-জগতে
এলি যদি যাদু ! আয় আয় !
হৃদয়ের সোহাগ-মমতা,
দিব তোরে সহস্র ধারায় ।
স্বরগের এক বিন্দু সুধা,
কিন্নরের "মোহিনী"র তান—
পরশনে সুখে ভেসে যায়
আমাদের মানব পরাণ ।
চিরদিন অতৃপ্ত হিয়ায়
ধরা বুঝি ছিল তোর তরে,
সাধ-আশা পথ চেয়ে ছিল
তোরি লাগি অতৃপ্ত অন্তরে ।
ফুলে ফুলে উঠিত কি ভেসে
অই কচি দেহের জ্যোছনা ?
মলয়ায় পড়িত কি এসে
তোরি গন্ধ অমর-বাসনা ?
জগতের ভালবাসারাশি
রাখিতে কি নাহি ছিল ঠাঁই ?
আমাদের মাটির ধরায়,
যাদুমণি ! তুমি এলে তাই ?
আমাদের বিষাক্ত নিশ্বাস,
বুকে বুকে লুকানো অনল,
পরাণেও পাপের কালিমা ;
তোরে যাদু ! কোথা থোব বল্ ?

তবু যদি—দয়াময় বিধি—
দেছে তোরে এ মর ধরায়,
দূর হোক্ বেদনা যাতনা,
অয়ি যাদু! বুকে আয় আয়!
উষার নবীন আলো-কণা
চাঁদের প্রথম হাসি-রেখা,
থাক্ সুখে থাক্ চিরদিন
শুভ হোক্ বিধাতার লেখা।
তোর অই ক্ষুদ্র হিয়াতলে
থাকে যেন মহত জীবন,
তোমারে করুন জগদীশ,
মরতের উজ্জ্বল রতন।
এই মোর প্রাণের আশীষ,
এই মোর প্রীতি-উপহার,
ধর মোর শুভ 'অভ্যর্থনা'
আমি কি কোথায় পাব আর?'

(কাব্যকুসুমাঞ্জলি, ১৮৯৩)

বুলবুল্

মানকুমারী বসু

১

সে যে বুল্‌বুল্—
কি বা দিব পরিচয়,
কোকিল পাপিয়া নয়
তার গানে ক্ষিপ্ত নহে প্রাচ্য কবিকুল;
সে যে অতি ক্ষুদ্র পাখী,
উষার অমিয় মাখি
এসেছে হেমন্ত দিনে হ'য়ে অনুকূল;
আমার আঁধার ঘরে রাঙা বুল্‌বুল্।

২

সে যে বুল্‌বুল্‌
মন্দার তরুর শিরে,
সোনার বিহঙ্গ কিরে
গাহিয়া নন্দন বনে সঙ্গীত অমূল ;
তাজের একটি সাথী
(আঁধারে জ্বালাতে বাতি)
এসেছে মানব-পুরে আনন্দ-আকুল !
তাই মোর ভাঙ্গা ঘরে রাঙা বুল্‌বুল্‌।

৩

সে যে বুল্‌বুল্‌—
এতদিন বসুন্ধরা,
ছিল শত দুঃখভরা,
প্রকৃতি-দেবতা ছিল বিষাদ-ব্যাকুল ,
কি যেন কি ছিল দৃশ্য,—
অপূর্ণ, বিষন্ন বিশ্ব,
যাহা বিনা ছিল সবে হ'য়ে ক্ষোভাকুল,
সেইটুকু যেন এই রাঙা বুল্‌বুল্‌ !

৪

সে যে বুল্‌বুল্‌—
তাই তার মুখ চেয়ে,
পাখী উঠে গান গেয়ে
আকাশে চাঁদিমা হাসে বাগানে পারুল !
সে যবে উল্লাস ভরে,
মধুর ঝঙ্কার করে,
বসন্ত ছুটিয়া আসে হইয়া আকুল !
বিধির আশীষ যেন ক্ষুদে বুল্‌বুল্‌ !

৫

সে যে বুল্‌বুল্—
অনাহূত অমানিত,
তাহাতে, "অপরিচিত !"
তবে সে লইল লুটি হৃদয় আমূল ;
বিশ্বের সোহাগ নিতে
সে এসেছে অবনীতে,
কোথাও দেখিনা "চোর" তার সমতুল,
কোথাকার যাদুকর, ক্ষুদে বুল্‌বুল্ !

৬

সে যে বুল্‌বুল্—
শত বরষের পরে,
টেনে নিয়ে খেলাঘরে,
আমারে খেলায় খেলা দিয়া শতভুল !
তারি জয় মোর হারি
তবু পলাইতে নারি,
তবু হ'য়ে আছি তারি "খেলার পুতুল"
আমারে মজালে সেই ক্ষুদে বুল্‌বুল্ !

৭

সে যে বুল্‌বুল্—
যা কিছু আমার ছিল,
সবি সে কাড়িয়া নিল,
তবুও মিটে না তার কামনা বহুল,
নিল নিদ্রা, নিল স্মৃতি,
নিল সে কবিতা গীতি,
নিতি লয় লক্ষ চুমা, ছিঁড়ে লয় চুল ;
দারুণ দুরন্তপনা,
শুনে না করিলে মানা,
বোঝে না সে রীতিনীতি মানে না সে "কুল্ !"

(আমি) "ভীরু কাপুরুষ" মত,
পরিহার মাগি যত,
তত সে করিতে চাহে সংগ্রাম তুমুল,
আমারে মজা'লে সেই ক্ষুদে বুল্‌বুল্‌।

৮

সে যে বুল্‌বুল্‌—
তার সে হাসির ঘা'য়
চপলা চমকি' যায়
সরমে ঝরিয়া পড়ে গোলাপ-মুকুল।

সেই হাসি মুখে মাখি
খুলি নীলপদ্ম আঁখি
চেয়ে থাকে মুখপানে দিঠি ঢুলঢুল,
সে চাহনি দেখি হায়,
কোথা দিয়া দিন যায়,

রাখিতে হিসাব হয় আগাগোড়া ভুল!
শুধু তারি স্রোতে হিয়া,
দিয়ে আছি ভাসাইয়া,
কে পারিবে এ তুফানে হ'তে প্রতিকূল?

আর কি বলিব বেশী,
ছদ্মবেশে দেবদেশী
আমার ব্রহ্মাণ্ড বুঝি ক'রে দিল ভুল,
ভবসিন্ধু দিতে পাড়ি
মানিলাম পুনঃ হারি
আসিলাম খেলাঘরে সাজিয়া পুতুল,
বিধির আশীষ সম রাঙা বুল্‌বুল্‌।

(বিভূতি, ১৯২৪)

চাহিবে না ফিরে ?

কামিনী রায়

পথে দেখে', ঘৃণাভরে, কত কেহ গেল সরে',
উপহাস করি কেহ যায় পায়ে ঠেলে ;
কেহ বা নিকটে আসি, বরষি গঞ্জনারাশি
ব্যথিতেরে ব্যথা দিয়া যায় শেষে ফেলে'।
পতিত মানব তরে নাহি কি গো এ সংসারে
একটি ব্যথিত প্রাণ, দুটি অশ্রুধার,
পথে পড়ে' অসহায়, পদে তারে দলে' যায়
দুখানি স্নেহের কর নাহি বাড়াবার ?
সত্য, দোষে আপনার চরণ স্খলিত তার ;
তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও শিরে ?
তাই তার আর্তরবে সকলে বধির হবে,
যে যাহার চলে যাবে—চাহিবে না ফিরে ?
বর্তিকা লইয়া হাতে, চলেছিল এক সাথে,
পথে নিবে গেল আলো, পড়িয়াছে তাই ;
তোমরা কি দয়া করে' তুলিবে না হাত ধরে,
অর্ধদণ্ড তার লাগি থামিবে না, ভাই ?
তোমাদের বাতি দিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া,
তোমাদেরি হাত ধরি' হোক্ অগ্রসর ;
পথ মাঝে অন্ধকারে ফেলে যদি যাও তারে,
আঁধার রজনী তার রবে নিরন্তর।

(আলো ও ছায়া, ১৮৮৯)

ডেকে আন্

কামিনী রায়

পথ ভুলে গিয়াছিল, আবার এসেছে ফিরে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে দূরে, লাজে ভয়ে নত শিরে ;
সম্মুখে চলে না পদ, তুলিতে পারে না আঁখি,
কাছে গিয়ে, হাত ধরে, ওরে তারে আন্ ডাকি।

ফিরাসনে মুখ আজ নীরব ধিক্কার করি,
আজি আন্ স্নেহ-সুধা লোচন বচন ভরি।
অতীতে বরষি ঘৃণা কিবা আর হবে ফল ?
আঁধার ভবিষ্য ভাবি, হাত ধরে লয়ে চল্।

স্নেহের অভাবে পাছে এই লজ্জানত প্রাণ,
সঙ্কোচ হারায়ে ফেলে—আন্ ওরে ডেকে আন্।
আসিয়াছে ধরা দিতে, শত স্নেহ-বাহু-পাশে
বেঁধে ফেল্ ; আজ গেলে আর যদি না-ই আসে।

দিনেকের অবহেলা, দিনেকের ঘৃণাক্রোধ,
একটি জীবন তোরা হারাবি জীবন-শোধ।
তোরা কি জীবন দিবি ? উপেক্ষা যে বিষবাণ,
দুঃখ-ভরা ক্ষমা লয়ে, আন্, ওরে ডেকে আন্।

(আলো ও ছায়া, ১৮৮৯)

প্রসূতির পূর্বরাগ

নিত্যকৃষ্ণ বসু

১

কে জানে কাহার লাগি ব্যাকুল বাসনা-রাশি !
কার আশে রয়েছি বাঁচিয়া !
নীরব মায়ের কোলে সুখের শৈশব-হাসি
কেবা সেই হাসিবে আসিয়া ?

২

কেমন শিরীষ-সম কোমল মু'খানি তার !
কেমন সে নয়ন-কমল !
আগাগুলি বাঁকা-বাঁকা চিকণ কেশের ভার ;
ওষ্ঠ দুটি রক্তিম-তরল !

৩

কেমন লাবণ্য-ঘেরা ননীর শরীরখানি,—
লতাটি আবৃত জোছনায় ;
কেমন সে অর্ধভরা অস্ফুট অমিয়-বাণী,
বাণী-বীণা বচনের প্রায় !

৪

গোধূলির স্নিগ্ধকোলে সে কি গো উঠিবে তারা,
সন্ধ্যা তাই রয়েছে চাহিয়া ?
না—না ! সে যে প্রভাতের অরুণ-কিরণ-ধারা,
নিশি তাই উঠেছে জাগিয়া ।

৫

বুঝি সে বিহগ-সম গাহিবে বসিবে ডালে ;
তরু তাই সেজেছে মধুর !
তাই বুঝি মধু ঋতু কচি কিশলয়জালে
উপবন রচেছে প্রচুর !

৬

বুঝি সে ফুলের মত ফুটিবে বিজন বাসে
সৌরভেতে ভরিয়া কানন ;
চুমো খেয়ে, গান গেয়ে দোলন দিবার আশে
আসে তাই মলয়-পবন ।

৭

না—না ! সে নন্দন-বায়ু, বসন্ত-রাগিণী তুলি
মেঘ-পথে আসিবে ভাসিয়া ;

সরল স্নেহের ছলে মন্দার-মুকুলগুলি
মার বুকে দিবে বিকশিয়া !

৮

উষার আলোকে তার নিশার তমস নাশি
এ জীবন যেতেছে বহিয়া ;—
কে জানে কাহার লাগি ব্যাকুল বাসনারাশি,
কার আশে রয়েছি বাঁচিয়া !

('সাহিত্য', ১৮৯৬)

অবোধ ব্যথা

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

সাত বৎসরের ছেলে, এতক্ষণে তার
শত ক্ষুদ্র অত্যাচার সহ্য হ'ত ভার।
আজি শূন্যে সকরুণ আঁখি-তারা তুলি
সে রয়েছে কোণে গিয়ে খেলা-ধূলো ভুলি।
হেরি' সকৌতুক স্নেহ জাগিল অন্তরে ;
ছোট দুটি হাতে ধরে' সুধিনু আদরে—
কি হয়েছে তোর ?—গুমরি, গুমরি, পরে,
কম্পমান ওষ্ঠটুকু জানাল কাতরে—
তার বোন্—মাসীমারও মেয়ে বটে সে ;
একলাটি ফেলে কিনা চলে গেল দেশে !
শুনিনু, উঠিল যেন কাঁদিয়া বাতাসে
শিশুর অবোধ ব্যথা উদাস আকাশে ;
ভাবিনু, সে কোন্ দূরে আরেকটি হিয়া
এমনি বেদনাভরে পড়িছে নুইয়া !

(গীতিকা, ১৯১৩)

সেকাল আর একাল

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

অন্তঃপুরে দিদিমার শুভ সিংহাসন
কে নিল কাড়িয়া কবে! আছে কি এখন?
মাদুর বিছায়ে শত অঙ্গনে অঙ্গনে
দিদিমা আছেন বসি সহাস্য আননে;
সন্ধ্যাবেলা ঘিরে তাঁরে বালিকাবালক
রূপকথা শুনিতেছে আঁখি অপলক;
চলিতেছে কৌতূহল, অদ্ভুত কল্পনা
কত প্রশ্ন, কত ব্যাখ্যা, সরল জল্পনা!
দিদিমার স্নিগ্ধ কোল, ধৈর্য-ক্ষমাময়,
লালন করিত আগে শিশুর হৃদয়;
শৈশবের দিনগুলি স্নেহের ছায়ায়
অবাধে ফুটিতে পেত স্বাধীন শোভায়।
এখন লয়েছে সেই সোনার আসন
কঠোর কর্তব্য আর শাণিত শাসন।

(গীতিকা, ১৯১৯)

দাদার চিঠি

কুসুমকুমারী দাশ

আয়রে মনা, ভুতো, বুলী আয়রে তাড়াতাড়ি,
দাদার চিঠি এসেছে আজ, শুনাই তোদের পড়ি।
"কল্‌কাতাতে এসেছি ভাই কাল্‌কে সকালবেলা,
হেথায় কত গাড়ি, ঘোড়া, কত লোকের মেলা।
পথের পাশে সারি সারি দু'কাতারে বাড়ী
দিন রাত্তির হুস্ হুস্ করে ছুটেছে রেলের গাড়ী।
আমি কি ভাই গেছি ভুলে তোদের মলিন মুখ,
মনে পড়লে এখনও যে কেঁপে ওঠে বুক।
সেই যে মায়ের জলে-ভরা স্নেহের নয়ন দু'টি
সেই যে আমার হাতটি ছেড়ে দিতে চায়নি পুঁটি—

ভূতি মনার আবদেরে ভাব, দাদা, কোথায় যাবে ?
যদি তুমি যেতে চাও তো সঙ্গে মোদের নেবে।
সেই যে বুলী ঠোঁট কাঁপায়ে চুলের গোছা ছেড়ে
'যেতে নাহি দিব' ব'লে দাঁড়ায়েছিল দোরে—
সেই যে নলিন ষ্টেশন-ঘরে চোখে কাপড় দিয়ে
কাঁদছিলি তুই হাতখানি মোর তোর হাতেতে নিয়ে।
সে সব কথা মনে প'ড়ে চোখে আসছে জল
দিনে দিনে কমে যাচ্ছে ভরা বুকের বল।
এসব কথা মায়ের কাছে বলোনাক' ভাই,
আজকে আমি এখান হ'তে বিদায় হ'তে চাই।
আর এক কথা, নিয়মমত লিখো আমায় চিঠি
কেমন আছে ভূতি, মনা, বুলী, ছোট পুঁটি ?
মা বাবাকে প্রণাম দিয়ে বলবে আমার কথা,
সিটি কলেজ খুললে আমি ভর্তি হব তথা।
দু'চার দিন আর আছে বাকি, ভাল আছি আমি
আমার হ'য়ে ভাইবোনদের চুমু দিও তুমি।
বিদেশ এলে বুঝতে পারবে কেমন করে প্রাণ,
বুঝেছি ভাই, কাকে ব'লে এক রক্তের টান্।
এখন আমার চোখের কাছে যেন জগৎখানা
ভাসছে নিয়ে ভূতো, পুঁটি, বুলী, ননী, মনা।"

('মুকুল', ১৮৯৫)

খোকার বিড়াল ছানা

কুসুমকুমারী দাশ

সোনার ছেলে খোকামণি, তিনটি বিড়াল তার,
একদণ্ড নাহি তাদের করবে চোখের আড়।
খেতে শুতে সকল সময় থাকবে তারা কাছে,
না হ'লে কি খোকামণির খাওয়া দাওয়া আছে ?

এত আদর পেয়ে পেয়ে বিড়ালছানাগুলি,
দাদা, দিদি, মাসি, পিসি সকল গেছে ভুলি।
সোনামুখী, সোহাগিনী, চাঁদের কণা ব'লে
ডাকে খোকা, ছানাগুলি যায় আদরে গলে।
'সোনামুখী' সবার বড় খোকার কোলে বসে,
'সোহাগিনী' ছোট যেটি বসে মাথার পাশে।
মাঝখানেতে মানে মানে বসে' 'চাঁদের কণা',
একে একে সবাই কোলে করবে আনাগোনা।

('মুকুল', ১৮৯৫)

দেবশিশু

রমণীমোহন ঘোষ

নগ্ন শিশুটি পথ পাশে বসি'
খেলিছে মনের সুখে,
কচি হাতে লয়ে মুঠা মুঠা ধূলি
মাখিছে মাথায় বুকে।
ফুলের মতন মুখখানি ভরা
মৃদু নির্মল হাস,
পাখীর কাকলী— সম সুমধুর
কণ্ঠে অস্ফুট ভাষ।
তস্কর সেথা আসি' হেন কালে
দেখে—কোথা নাই কেহ,
খেলিছে একেলা সুকুমার শিশু
স্বর্ণভূষিত দেহ।
ত্বরিতে শিশুর দেহ হতে খুলি'
নিল আভরণরাশি,
কাঁদিল না শিশু, মুখ চেয়ে তার
কেবল উঠিল হাসি'।

নিমেষের তরে রিক্ত-ভূষণ
গৌর শিশুর পানে
চাহি'—কি বেদনা উঠিল জাগিয়া
চোরের কঠোর প্রাণে।
মরি মরি! একি অপরূপ রূপ!
ধূলি-ধূসরিত কায়
সোনার পুতলী, শিশু-সন্ন্যাসী!
আয় বাছা, কোলে আয়!
সযতনে চোর কোলে লয়ে তা'রে
ধূলি মুছি দিল ধীরে,
যেখানে যা ছিল— রতনে ভূষণে
সাজাইয়া দিল ফিরে'।
কোথা গেল তা'র অর্থ-লালসা,
কোথা গেল পাপে মতি,
মুগ্ধ নয়নে রহিল চাহিয়া
গৌর শিশুর প্রতি।

(দীপশিখা)

চতুর্থ খণ্ড
প্রকৃতি-কবিতা

প্রকৃতি-কবিতা

সাগরে তরী

মধুসূদন দত্ত

হেরিনু নিশায় তরী অপথ সাগরে
মহাকায়া, নিশাচরী, যেন মায়া-বলে
বিহঙ্গিনী-রূপ ধরি ধীরে ধীরে চলে,
সু-ধবল পাখা মরি বিস্তারি অম্বরে।
রতনের চূড়া-রূপে শিরোদেশে জ্বলে
দীপাবলী, মনোহরা নানাবর্ণ করে,
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত মিশ্রিত পিঙ্গলে।
চারিদিকে ফেনাময় তরঙ্গ সুস্বরে—
গাইছে আনন্দে যেন, হেরি এ সুন্দরী
বামারে বাখানি রূপ, সাহস, আকৃতি।
ছাড়িতেছে পথ সবে আস্তে-ব্যস্তে সরি,
নীচ জন হেরি যথা কুলের যুবতী।
চলিছে গুমরে বামা পথ আলো করি,
শিরোমণি-তেজে যথা ফণিনীর গতি ;

(চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৬)

সায়ংকাল

মধুসূদন দত্ত

চেয়ে দেখ চলিছেন মুদে অস্তাচলে
দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ন রাশি রাশি
আকাশে, কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি
ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আঁচলে !

কে না জানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলাসী?
অতি-ত্বরা গড়ি ধনী দৈব-মায়াবলে
বহুদিন অলঙ্কার পরিবে লো হাসি,
কনক-কঙ্কণ হাতে স্বর্ণমালা গলে।
সাজাইবে গজ, বাজী; পর্বতের শিরে
সুবর্ণ-কিরীট দিবে; বহাবে অম্বরে
নদস্রোতঃ, উজ্জ্বলিত স্বর্ণবর্ণ-নীরে।
সুবর্ণের গাছ রোপি শাখার উপরে
হেমাঙ্গ বিহঙ্গ থোবে!—এ বাজীকরীরে
শুভক্ষণে দিনকর কর-দান করে।

(চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৬)

সায়ংকালের তারা

মধুসূদন দত্ত

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
গোধূলির! কি ফণিনী, যার সু-কবরী
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জ্বলে?—
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র মণ্ডলে
কি হেতু? ভাল কি তোমা বাসে না শর্বরী?
হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ন-মনে
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল-সনে,
যবে কেলি করে তারা সুহাস অম্বরে?
কিন্তু কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গনে!
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির-আঁখি স্মরে।

(চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৬)

পরিচয়

মধুসূদন দত্ত

(১)

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে সুমধুর-কলে
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী ; যে দেশে ভেদি বারিদমণ্ডলে
(তুষারে বপিত বাস উর্ধ্ব-কলেবরে,
রজতের উপবীত স্রোতোরূপে গলে)
শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে

(স্বচ্ছ-দরপণ) হেরি ভীষণ মুরতি ;
যে দেশে কুহরে পিক বসন্ত-কাননে,—
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী,—
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে ;—
সে দেশে জনম মম ; জননী ভারতী ;
তেঁই প্রেমদাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে !

(২)

কে না জানে কবি-কুল প্রেমদাস ভবে,
কুসুমের দাস যথা মারুত, সুন্দরি !
ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে
এ বৃথা সংশয় কেন ? কুসুম-মঞ্জরী
মদনের কুঞ্জে তুমি । কভু পিক-রবে
তব গুণ গায় কবি ; কভু রূপ ধরি
অলির, যাচে সে মধু ও কানে গুঞ্জরি',
ব্রজে যথা রসরাজ রাসের পরবে ।

কামের নিকুঞ্জ এই। কত যে কি ফলে,
হে রসিক, এ নিকুঞ্জে, ভাবি দেখ মনে!
সরঃ ত্যজি সরোজিনী ফুটিছে ও স্থলে,
কদম্ব, বিম্বিকা, রম্ভা, চম্পকের সনে।
সাপিনীরে হেরি ভয়ে লুকাইছে গলে
কোকিল; কুরঙ্গ গেছে রাখি দু'নয়নে।

(চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৬)

প্রকৃতি-রমণী

বিহারীলাল চক্রবর্তী

প্রণয় করেছি আমি
প্রকৃতি-রমণী সনে,
যাহার লাবণ্যচ্ছটা
মোহিত করেছে মনে;
মুখ—পূর্ণ সুধাকর,
কেশজাল—জলধর,
অধর—পল্লব নব
রঞ্জিত যেন রঞ্জনে,

সমুজ্জ্বল তারাগণ,
শোভে হীরক ভূষণ,
শ্বেত ঘন সুবসন
উড়ে পড়ে সমীরণে,
বায়ুর প্রতি হিল্লোলে
লতাগুলি হেলে দোলে
কৌতুকিনী কুতূহলে
নাচে চঞ্চল চরণে;

হেলিয়ে স্তবক-ভরে
মরি কত লীলা করে,
পয়োধরভারভরে
ঢলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে ;
প্রফুল্ল কুসুমরাশি,
অধরে উজ্জ্বল হাসি,
বাজায় মধুর বাঁশী
অলির সুধা-গুঞ্জনে,
কমল-নয়নে চায়,
আহা কি মাধুরী তায় !
মুনিমন মোহ যায়,
হেরিলে স্থির নয়নে ;
পাখীর ললিত তান,
প্রাণপ্রিয়া গায় গান,
উদাস করয়ে প্রাণ,
সুধা বরষে শ্রবণে ;

যখন যথায় যাই,
প্রকৃতি তো ছাড়া নাই,
ছায়াসমা প্রিয়তমা
সদা আছে মনে মনে !
তেমন সরল প্রাণ
দেখিনি কারো কখন,
মৃদু মধু হাসি, যেন
লেগে রয়েছে আননে !

হেরিয়ে তাহার মুখ
অন্তরে পরম সুখ,
নাহি জানি কোন দুখ
সদা তার সুসেবনে ;

ক্ষুধায় সুস্বাদু ফল,
তৃষায় শীতল জল
যখন যা প্রয়োজন,
যোগায় অতি যতনে ;

সাধের বসন্তকালে
চাঁদের হাসির তলে
নিদ্রা আকর্ষণ হ'লে
ঢুলায় ধীরে ব্যজনে ;
যাহাতে না হই দুখী,
যাহাতে হইব সুখী,
সর্বদাই বিধুমুখী
আছে তার অন্বেষণে ;
(যথা যার ভালবাসা,
পাছু পাছু ধায় আশা,)
ইহার কামনা নাই,
ভালবাসে অকারণে।

একান্ত সঁপেছে মন,
সমভাব অনুক্ষণ,
এত করিয়ে যতন
করিবে কি অন্য জনে ?

যেমন রূপ শোভন,
তেমনি গুণ শোভন,
এমন অমূল্য ধন
কি আছে আর ত্রিভুবনে।

(সঙ্গীত শতক, ১৮৬২)

গোধূলি

বিহারীলাল চক্রবর্তী

(১)

শান্ত গোধূলি-বেলা !
নদীর পুতুলগুলি ভুলিয়াছে খেলাদেলা।
চেয়ে দেখ কুতূহলে
সূর্য যায় অস্তাচলে,—
কেমন প্রশান্ত মূর্তি, কোথায় চলিয়া গেল !
লাল নীল মেঘে মাখা,
কিরণের শেষ রেখা,
আর নাহি যায় দেখা, আঁধার হইয়া এল।

(২)

বসিয়ে মায়ের কোলে
আদর করিয়া দোলে,
আকাশের পানে চায় তারা ফোটা দেখিতে,
হয়েছে নূতন আলো চাঁদমুখের হাসিতে !

(৩)

চিবুক্ ধরিয়ে মা'র
সুধাইছে বারেবার
কত কথা শতবার, ফুরাইতে পারে না !
দিগন্তের কালো গায়
মেঘ চলে পায় পায়,
চাতক বেড়ায় উড়ে, কোথা যায় জানে না।

(৪)

সুশীতল সমীরণ,
কোথা ছিলে এতক্ষণ ?
জুড়াল শরীর মন, জুড়াইল ধরণী,
ফুটিল গোলাপ ফুল, ঘুমাইল নলিনী।

(৫)

গঙ্গা বহে কুলু কুলু,
যেন ঘুমে ঢুলু ঢুলু;
ধীরে ধীরে দোলে তরী, ধীরে ধীরে বেয়ে যায়,
মাঝিরা নিমগ্নমনে ঝুমুর পূরবী গায়।

(৬)

তিমিরে করিয়া স্নান
নিমগন দিনমান;
সীমন্তে সাঁজের তারা, মন্থরগামিনী,
বিরাম-আরামময়ী আসিছেন যামিনী।

(সাধের আসন, ২য় সর্গ, ১৮৮৮

মধ্যাহ্নসঙ্গীত

বিহারীলাল চক্রবর্তী

চরাচরব্যাপী অনন্ত আকাশে
প্রখর তপন ভায়,
দিগ্‌দিগন্ত উদাস মুরতি
উদার স্ফুরতি পায়।

বিমল নীল নিথর শূন্য,
শূন্য—শূন্য—শূন্য—অগম শূন্য;
দূর—অতি দূর দু'পাখা ছড়িয়ে
শকুন ভাসিয়া যায়।

শুভ্র শুভ্র অভ্ররাজি
ধবলা শিখরী সাজি,
চলিয়াছে ধীরে ধীরে, না জানি কোথায়

নীরব মেদিনী, পাদপ নিঝুম,
নত-মুখ ফুল ফল,
নত-মুখী লতা নেতিয়ে প'ড়েছে
স্তবধ সরসী-জল।

শান্ত সঞ্চরণ, শান্ত অরণ্যানী,
মূক বিহঙ্গম, মূঢ় পশু প্রাণী,
'ঘুঘূঘ্—ঘুঘূঘ্' কাতরা কপোতী
করুণা করিয়া গায়!

স্তবধ নগর, স্তবধ ভূধর,
স্তব্ধ হ'য়ে আছে উদার সাগর,
ধূ-ধূ মরুস্থলী, বিহ্বলা হরিণী
চমকি চমকি চায়।

স্তবধ ভুবন, স্তবধ গগন,
প্রাণের ভিতর করিছে কেমন,
তৃষায় কাতর, কঠোর মরুত
একটুও নাহি বায়!

বিরামদায়িনী কোথা নিশীথিনী
স্নিগ্ধ-চন্দ্র-তারা-নক্ষত্র-মালিনী
মহা-মহেশ্বর-করুণা-রূপিণী
মোহিনী মায়ার প্রায়!

ল'য়ে এস সেই মেদুর সমীর,
ঝুরু—ঝুরু—ঝুরু, মধুর অধীর,
স্নেহ-আলিঙ্গনে জুড়াব জীবন,
জুড়াব তাপিত কায়।

(শরৎকাল)

ঝটিকার পরদিনের প্রভাত

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

"হাহাকুলং তস্য বভূব সর্ব্বং"

—বাল্মীকি

১

কই, ভাল হয় নাই ফরসা তেমন,
এখনও বেশ জোরে বহিছে বাতাস,
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিবিন্দু হ'য়েছে পতন,
জলে মেঘে ঘোলা হয়ে রয়েছে আকাশ।

২

হেরিয়া নিসর্গ-দেব সংসারের প্রতি
পবন-দুর্দান্ত-পুত্র-কৃত অত্যাচার,
দাঁড়ায়ে আছেন যেন হ'য়ে ভ্রান্তমতি,
নিস্তব্ধ গম্ভীর মূর্ত্তি, বিষণ্ণ বদন।

৩

ধরা অচেতনা হয়ে প'ড়ে পদতলে,
ছিন্ন-ভিন্ন কেশ-বেশ, বিকল ভূষণ,
লাবণ্য মিলায়ে গেছে আনন-কমলে,
বুঝি আর দেহে এর নাহিক জীবন।

৪

দিগঙ্গনা সখীগণে মলিন বদনে
স্তব্ধ হয়ে দূরে দূরে দাঁড়াইয়ে আছে,
অবিরল অশ্রুজল বহিছে নয়নে,
যেন আর জন-প্রাণী কেহ নাই কাছে!

৫

হা জননী ধরণী গো, কেন হেন বেশ,
কেন মা পড়িয়ে আজি হয়ে অচেতন ?
জানি না কতই তুমি পাইয়াছ ক্লেশ,
কত না কাতর হয়ে করেছ রোদন !

৬

কি কাণ্ড করেছ রে রে দুরন্ত বাতাস !
স্থল জল গগন সকল শোভাহীন,
ভূচর খেচর নর বেতর উদাস,
ব্রহ্মাণ্ড হয়েছে যেন বিষাদে বিলীন !

৭

ওই সব বিশীর্ণ প্রাসাদ-পরম্পরা
দাঁড়াইয়ে ছিল কাল প্রফুল্ল বদনে ;
আজ ওরা লণ্ড-ভণ্ড, চুরমার-করা,
হাতী যেন দলে গেছে কমল-কাননে !

৮

একি দশা হেরি তব উপবনেশ্বরি,
কাল তুমি সেজেছিলে কেমন সুন্দর !
বিবাহের মাঙ্গলিক বেশভুষা পরি—
যেমন রূপসী কনে সাজে মনোহর ;

৯

সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে একেবারে,
প্রাণ ত্যেজে প'ড়ে আজি কেন গো ধরায় ?
সাধের বাসর-ঘরে কোন্ দুরাচারে,
এমন করিয়ে খুন করেছে তোমায় ?

১০

খোলার কুটীর ওই সব গেছে মারা,
ভেঙ্গে চুরে প'ড়ে আছে হয়ে অবনত ;
না জানি উহায় কত গরীব বেচারা,
ঘুমাইয়ে আছে হায় জনমের মত !

১১

কাল তা'রা জানিত না স্বপনে কখন,
উঠিয়াছে অন্ন-জল চিরকাল তরে ;
জননীর কোলে শিশু ঘুমায় যেমন,
ধরণীর কোলে ছিল নির্ভয় অন্তরে।

১২

এখনো ধাইছ দেব অশান্ত পবন,
দয়া-মায়া নাই কি গো তোমার হৃদয়ে ?
স্থির হও, খুলে দাও মেঘ-আবরণ,
বাঁচুক ধরার প্রাণ অরুণ-উদয়ে !

(নিসর্গ-সন্দর্শন, ১৮৭০)

বৈকালিক ঝড়

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

সাজিয়াছে বায়ুকোণে মেঘ ভয়ঙ্কর ;
ক্রোধভরে রাহু যেন গ্রাসিছে অম্বর ;
ধীরে ধীরে দক্ষিণেতে আসিছে বাড়িয়া.
পাকাম ধরিয়া শিখী নাচিছে দেখিয়া।
দেখিতে দেখিতে মেঘ ঢাকিল গগন,
মরি কি বিচিত্র ভাব নিরখি এখন।
প্রগাঢ় সবুজ নীল বরণে ভূষিয়া,
রাশি রাশি তূলা যেন বেড়ায় উড়িয়া।

কতগুলি দক্ষিণে যাইছে বেগভরে,
ঊর্ধ্বে তার কতগুলো ধাইছে উত্তরে।
কিছু দূর যেয়ে পুন অন্য দিকে যায়,
ভেদিয়া নামার মেঘ নীচপানে ধায়।
নীলাম্বরী পরা গায় সবুজ মকমল,
নাচে রে প্রকৃতি যেন উড়ায়ে অঞ্চল।
ধীরে ধীরে দক্ষিণের বায়ু এতক্ষণ,
বহিয়াছে কিন্তু আর বহে না এখন।
নড়ে না গাছের পাতা নড়ে না পুকুর,
বোধ হয় বায়ুশূন্য হল বিশ্বপুর।
দেখরে ভাবুক দেখ দেখরে কেমন,
হয়েছে গভীর স্থির প্রকৃতি এখন।
শকুন শকুনী চিল এইত গগনে,
পুলকে উড়িতেছিল মণ্ডলগমনে ;
দেখিয়া জলদ-ঘটা বিপদ ভাবিয়া,
দ্রুতগতি ধরাতলে আসিছে ধাইয়া।
দু পাশের ডানা দুটি উঁচু করি কেহ
সোজাসুজি ছাড়িয়া দিয়াছে দেখ দেহ।
কেহবা বাঁকিয়া ডানা বাঁকা পথ ধরি,
ছুটেছে নক্ষত্রবেগে উপহাস করি।
রাখাল গরুর পাল লইয়া সত্বরে,
ধাইল গোয়াল-পানে সভয় অন্তরে।
উচ্চপুচ্ছ ধেনুগণ হাম্বা রবে ধায়,
সম্মুখের তৃণ প্রতি ফিরিয়া না চায়।
ব্যাকুল পথিকগণ আশ্রয় লাগিয়া,
ঝটপট লোকালয়ে চলিছে ধাইয়া।
কেহ বা বৃক্ষের মূলে আশ্রয় করিছে,
অকূল প্রান্তরে কেউ প্রমাদ গণিছে।

পড়িল তটিনী-তীরে সার সার শোর,
নেয়ে মাঝি তাড়াতাড়ি ফেলায় নঙ্গোর।
যাদের নঙ্গোর নাই, খুঁটো গাড়ে তারা,
এঁটে বাঁধে দড়ি তাতে, কেহ পুঁতে পাড়া।

আসিতেছে পাড়ী দিয়া যে সকল নেয়ে,
উড়িল তাদের প্রাণ মেঘপানে চেয়ে।
কসে কসে টানে দাঁড় ঘনাইতে পারে,
থেকে থেকে 'বদর' 'বদর' ডাক ছাড়ে।

লোকালয়ে ঘন ঘন শঙ্খনাদ হয়,
কি হয়, কি হয় আজি ভাবে গৃহিচয়।
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে কপাট পড়িল,
আঁধার দেখিয়া কেহ প্রদীপ জ্বালিল।

ওকি ওকি বায়ুকোণে হুঁ হুঁ শব্দ হয়,
বুঝি আজ উপস্থিত হইল প্রলয়!
ভয়ানক ঝড় এ যে ভয়ানক ঝড়,
মর্ম্মরিছে গাছগুলি মড় মড় মড়!
দুলিছে দুপাশে ঘন বাঁকাইয়া কায়,
মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে বুঝি হায়!
নুইছে বাঁশের আগা মাটির উপরে,
থামাইতে বায়ুদেবে যেন নতি করে।
নারিকেল তাল পূগ আদি তরু কত,
মাঝামাঝি ভাঙ্গিয়া পড়িছে শত শত,
যুঝিয়া বীরেন্দ্রগণ সম্মুখ সমরে,
শুইছে সমর-ক্ষেত্রে যেন শত্রুশরে।
উন্মূলিত সহকার মাধবী দেখিয়া,
অমনি ধরণী পরে পড়ে আছড়িয়া;
সুচারু কুসুমরূপ অলঙ্কার যত,
খুলিয়া ফেলিল ধনী শোকে ইতস্ততঃ।

অই দেখ মহাবৃক্ষ পড়িছে পিপ্পল,
চড় চড় ছিঁড়িতেছে শিকড় সকল।
আশ্রিত বিহঙ্গগণ প্রমাদ গণিয়া,
দ্রুতগতি স্থানে স্থানে যাইছে উড়িয়া;
যেদিকে বহিছে ঝড় সেইদিকে ধায়,
আশ্রয় করিছে তাহা সমুখে যা পায়।
ও পাখীটা কেন কেন না যায় উড়িয়া?
যতনে রেখেছে ঢেকে কি ও পাখা দিয়া?
ছানা দুটি! বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি তাই,
পরাণ বাঁচাতে এর অভিলাষ নাই;
প্রাণ দিবে ছানা ফেলে না যাবে কোথায়,
ধন্য রে মায়ের স্নেহ! বাখানি তোমায়।

অই দেখ কত ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িছে,
গৃহিগণ অন্য ঘরে সভয়ে ঢুকিছে।
কোন খান বাঁকা হয়ে হেলিয়া রহিল,
বোধ হয় কোন খান পড়িল পড়িল।
উড়ে গেল চাল কার, উড়ে গেল খড়,
দেখিয়া গৃহীর দশা ব্যাকুল অন্তর।
পড়িল সকল ঘরে রোদনের ডাক,
প্রাণভয়ে ছাড়ে সবে ত্রাহি ত্রাহি ডাক।

দেখ দেখ এসময় তটিনী কেমন,
ধরিয়াছে উগ্রতর মূরতি ভীষণ;
শাঁ-শাঁ-শাঁ-শাঁ শ্বাসিতেছে শুনে লাগে ভয়,
ভ্রূকুটি দেখিয়া ধড়ে পরাণ না রয়।
উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা তোলপাড় করে,
বহিছে জলের স্রোত মহাবেগভরে।
ধূনিত কার্পাসময় নীর সমুদায়
কে ধুনিছে এ কার্পাস বুঝা নাহি যায়।

স্থানে স্থানে পড়িয়াছে ভয়ানক পাক,
ছাড়িতেছে মুহুর্মুহু হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ ডাক।
বিস্তারিতে অধিকার-সীমা আপনার,
করিছে পুলিনে নদী সজোরে প্রহার।

সহে সে প্রহার তীর পারে যতক্ষণ,
যখন না পারে করে আত্মসমর্পণ।
হায়রে! তরণীগুলি নঙ্গোর ছিঁড়িয়া
যাইছে নদীর মাঝে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
হাল ধরে কর্ণধার বসে ঝিঁকে মারে,
তবু সে ঘূর্ণিত তরী স্থিরিতে না পারে।
আরোহীরা কেঁদে বলে মলেম মলেম,
পড়িয়া বিপাকে আজি প্রাণ হারালেম!

আরে রে অবোধগণ! কি ফল রোদনে,
নির্ভর কররে সেই অভয় চরণে।
ক্রমেই প্রবলবেগে বহিছে পবন,
উলটিতে ধরা বুঝি হয়েছে—মনন।

শপাশপ্ শপাশপ্ ঝাপ্টা চলিছে,
দিগঙ্গনা গুম্ গুম্ নিনাদ করিছে।
জলধর ঝমাঝম বরষিছে নীর,
গরজিছে ঘন ঘন কেমন গভীর।

তড় তড় তড় তড় শিলাপাত হয়,
উজলে চপলা মুহুর্মুহু ভূ-বলয়।
সংহার করিতে সৃষ্টি এই লয় মনে,
কোটিশ, কামান কেহ জুড়িছে গগনে,
মেঘনাদ—নাদ তার, চপলা—অনল,
অন্ধকার—ধূঁয়া, গুলি, করকা সকল।
ধন্য ধন্য জগদীশ! শকতি তোমার!
অন্ত নাই অন্ত নাই অন্ত নাই তার।

এই ঝড় এই বৃষ্টি এই জলধর,
এই ক্ষণপ্রভা, এই করকা-নিকর,
এই স-তরঙ্গ নদী, এই চরাচর,
প্রকাশিছে তোমার শকতি, মহেশ্বর !

(সদ্ভাবশতক, ১৮৬১)

পাপ-কেতকী

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

একদিন ধীরে ধীরে মনের উল্লাসে
উপনীত কেতকী-কুসুমশ্রেণী পাশে ।
হেরিলাম কত শত শত মধুকর,
সুসৌরভে হয়ে তারা বিমুগ্ধ-অন্তর,
মধুপূর্ণ কমল করিয়া পরিহার,
মধু-আশে কেতকীতে করিছে বিহার ;
কিন্তু মধু কোথা পাবে সে কেতকীফুলে !
শুধু হয় ছিন্নপক্ষ কণ্টকের হুলে ।
তথাপি সে বিমূঢ় অবোধ অলিগণ,
উড়িয়া কমলদলে না করে গমন ।
ভাবিলাম এইরূপ মানব সকল,
ত্যজি পরিমলপূর্ণ তত্ত্ব-শতদল ;
সুখ-সুধা আশে সদা প্রফুল্ল অন্তরে,
বিষয়-কেতকীবনে অনুক্ষণ চরে ।
কোথা পাবে সে অমিয় ব্যর্থ আকিঞ্চন,
সার দুঃখ কণ্টকের যাতনা ভীষণ ।
তবু তত্ত্ব-সরসিজে না করে বিহার ;
ধিক্ রে মানব তোরে ধিক্ শতবার ।

(সদ্ভাবশতক, ১৮৬১)

শারদ-তরঙ্গিণী

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

একদিন এ সময় তরঙ্গিণী-তীরে,
চলিলাম চিন্তাকুল চিতে ধীরে ধীরে।
তটিনীর তটোপরি সিকতা-আসনে,
বসিলাম ভাবময়ী কল্পনার সনে।
তরঙ্গিণী-তনু তনু শারদাগমনে,
নিরখি নয়নে আমি নিরখি নয়নে :
সুধালেম "অয়ি কলস্বরা স্রোতস্বতি !
আজ কেন তোমা হেরি দীনা ক্ষীণা অতি ?
বরষার সময়জ প্রভাবনিচয়,
কেন কেন কেন আজ দৃশ্য নাহি হয় ?
তরঙ্গিণী ! কোথা তব তরঙ্গের রঙ্গ,
হেরি যাহা, পোতারোহী পাইত আতঙ্ক ?
যে সকল লহরী, করিয়া ঘোর স্বন,
তরণীর হৃদয় করিত বিদারণ,
কোথা তাহা ? কোথা সেই দ্রুতগামী নীর
চলিত যা মদগর্বে অতিক্রমি তীর ?
কূলস্থ বিহঙ্গাশ্রম মহীরুহগণ
করিত তাদের কোপে মূল উন্মূলন !
অয়ি ধুনি ! কোথা তব সেই মহাধ্বনি,
ভয় জন্মাইত মনে যার প্রতিধ্বনি ?"
শুনিয়া আমার ভাব অতি কলস্বরে,
তরঙ্গিণী উত্তর করিলা তদন্তরে—
"শুনহে ভাবুক ! এই জানিবে নিশ্চয়,
চিরদিন এক দশা কাহারো না রয়।"

(সদ্ভাবশতক, ১৮৬১)

রজনী

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

যে কালে রজনী, নিদ্রা সজনীর সনে,
আবির্ভূতা হয় আসি অবনী-ভবনে ;
যে কালে সুমন্দ গতি করিয়া ধারণ
জুড়ায় জগৎ-প্রাণ জগৎ-জীবন ;
যে কালেতে সীমাশূন্য আকাশমণ্ডল
অসংখ্য তারকাজালে হয় সমুজ্জ্বল ;
যে কালে বিরল ক্ষুদ্র, জলধর দলে
অনতিবেগেতে ধায় গগন-মণ্ডলে ;
যে কালে যামিনীনাথ সুধাময় করে
ধরণীর তপ্ত তনু সুশীতল করে ;
যে কালে নিরখি স্বীয় প্রিয় প্রাণেশ্বরে
কুমুদিনী প্রফুল্লিত হয় সরোবরে ;
যে কালে অমৃতপায়ী চকোর-নিকরে
সুধা পিয়ে প্রিয়গুণ গায় কলস্বরে,
যে কালে রজনী পরি চন্দ্রিকা-বসন,
স্বকান্তের সনে করে প্রিয় সম্ভাষণ ;
যে কালে প্রকৃতি করি ধীরতা ধারণ
ভাবুকের ভাবপুঞ্জ করে উদ্দীপন ;
যে কালে কোবিদকুল কল্পনার সনে
রত হয় নব নব সদ্ভাব-চিন্তনে ;
ধিক্ ধিক্ বৃথা তার মানব জনম
এ কালে অলীকামোদে মত্ত যার মন।
ভবের ভাবের ভাবুক যে বা নয়,
নিদ্রায় বিমুগ্ধ সেই রহে এসময়।

এ সময় ভক্তি-রস-প্রবণ অন্তরে,
ধন্য সে, যে স্মরে অখিল ঈশ্বরে।
বিবেক-আসনে হয়ে সমাসীন মন।
এ সময় স্মর না সে সংসার-শরণ?

(সদ্ভাব শতক, ১৮৬১)

জলে ফুল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১

কে ভাসাল জলে তোরে কানন-সুন্দরি।
বসিয়া পল্লবাসনে, ফুটেছিলে কোন্ বনে,
নাচিতে পবন সনে, কোন বৃক্ষোপরি?
কে ছিঁড়িল শাখা হতে শাখার মঞ্জরী?

২

কে আনিল তোরে ফুল, তরঙ্গিণী-তীরে?
কাহার কুলের বালা, আনিয়া ফুলের ডালা,
ফুলের আঙ্গুলে তুলে ফুল দিল নীরে?
ফুল হতে ফুল খসি, জলে ভাসে ধীরে?

৩

ভাসিছ সলিলে যেন, আকাশেতে তারা।
কিম্বা কাদম্বিনী-গায়, যেন বিহঙ্গিনী-প্রায়,
কিম্বা যেন মাঠে ভ্রমে, নারী পথহারা;
কোথায় চলেছ ধরি তরঙ্গিণীধারা?

৪

একাকিনী ভাসি যাও, কোথায় অবলে!
তরঙ্গের রাশি রাশি, হাসিয়া বিকট হাসি,
তাড়াতাড়ি করি তোরে খেলে কুতূহলে?
কে ভাসাল তোরে ফুল কাল-নদীজলে।

৫

কে ভাসাল তোরে ফুল, কে ভাসাল মোরে !
কাল-স্রোতে তোর (ই) মত, ভাসি আমি অবিরত,
কে ফেলেছে মোরে এই তরঙ্গের ঘোরে ?
ফেলিছে তুলিছে কভু, আছাড়িছে জোরে !

৬

শাখার মঞ্জরী আমি, তোরই মত ফুল।
বোঁটা ছিঁড়ে শাখা ছেড়ে, ঘুরি আমি স্রোতে পড়ে,
আশার আবর্ত বেড়ে, নাহি পাই কূল।
তোরই মত আমি ফুল, তরঙ্গে আকুল।

৭

তুই যাবি ভেসে ফুল, আমি যাব ভেসে।
কেহ না ধরিবে তোরে, কেহ না ধরিবে মোরে,
অনন্ত সাগরে তুই, মিশাইবি শেষে।
চল যাই দুইজনে অনন্ত-উদ্দেশে।

(কবিতা-পুস্তক, ১৮৭৮)

বাজিয়ে যাব মল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে,
বাঁশতলাতে জল।
আয় আয় সই, জল আনি গে,
জল আনি গে চল॥

ঘাটটি জুড়ে, গাছটি বেড়ে,
ফুটল ফুলের দল।
আয় আয় সই, জল আনি গে,
জল আনি গে চল॥

বিনোদ বেশে, মুচ্‌কে হেসে,
খুল্‌ব হাসির কল।
কলসী ধরে, গরব করে,
বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সই, জল আনি গে,
জল আনি গে চল॥

গহনা গায়ে, আল্‌তা পায়ে,
কল্কাদার আঁচল।
ঢিমে চালে, তালে তালে,
বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সই, জল আনি গে,
জল আনি গে চল॥

যত ছেলে, খেলা ফেলে
ফির্‌বে দলে দল।
কত বুড়ী, জুজুবুড়ী,
ধর্‌বে কত জল।

আমরা মুচ্‌কে হেসে, বিনোদ বেশে,
বাজিয়ে যাব মল।
আমরা বাজিয়ে যাব মল;
সই বাজিয়ে যাব মল॥

('ইন্দিরা' উপন্যাস, ১৮৭৩)

প্রভাত

দীনবন্ধু মিত্র

রাত পোহাল, ফরসা হলো, ফুটলো কত ফুল,
কাঁপিয়ে পাখা, নীল পতাকা জুটলো অলিকুল।
পূর্বভাগে, নবীন রাগে, উঠলো দিবাকর,
সোনার বরণ, তরুণ তপন, দেখতে মনোহর।
হেরে আলো, চোখ জুড়ালো, কোকিল করে গান,
বৌ-কথা কয়, করে বিনয়, ভাঙচে বোয়ের মান।
ঘরের চালে, পালে পালে, ডাকচে কত কাক,
পূজা-বাটিতে, জোড়-কাঠিতে, বাজচে যেন ঢাক।
পতি-বিরহে, পদ্ম দহে, পদ্ম বিরহিণী,
ঝরিয়ে নয়ন, ভিজিয়ে বসন, কাটিয়েছে যামিনী ;
গেল রজনী, হাসলো ধনী, পতির পানে চায়,
মুখ চুমিয়ে, আতর নিয়ে, যাচ্চে ঊষার বায়।
মাথা তুলি, মরালগুলি, নদীর কূলে ধায়,
চরণ দিয়ে, জল কাটিয়ে, সাঁতার দিয়ে যায়।
ঘোমটা দিয়ে, ঘাটে বসিয়ে, ছোট বৌয়ের কুল,
মাজচে বাসন, বাজচে কেমন, তাবিজ ল'ঙ্গফুল ;
পরস্পরে মধু স্বরে, মনের কথা কয়,
ঘোমটা থেকে, থেকে থেকে, হাসির ধ্বনি হয়।
অনেক মেয়ে, গামছা দিয়ে, ঘষছে কোমল গা,
পশি জলে, মুখে বলে, নিস্তার' গো মা ;
উঠে কূলে, এসো চুলে, বসে সুলোচনা,
মাটি দিয়ে, শিব গড়িয়ে, কচ্চে উপাসনা।
কত কুমারী, সারি সারি, দুলচে কানে দুল ;
কানন হতে কচুর পাতে, আনচে তুলে ফুল।

আস্তে ঝাড়ি, তুষের হাঁড়ি, আগুন করে বায়,
খর্সান খেয়ে, লাঙ্গল নিয়ে, যাচ্চে চাষার সায়।
পান্তা খেয়ে, শান্ত হয়ে, কাপড় দিয়ে গায়,
গরু চরাতে, পাঁচন হাতে, রাখাল গেয়ে যায়।
গাভীর পালে, দোয় গোয়ালে, দুধে কেঁড়ে ভরে,
গজগামিনী, গোয়ালিনী, ব'সে বাছুর ধরে।
হাস্‌চে বালা, রূপের ডালা, মুচকে মধুর মুখ,
গোপের মনে, দুধের সনে, উঠছে কেঁপে সুখ।
গাছের তলে, বেড়ে অনলে, বলে ববম্ বম্।
জটাশিরে, সন্ন্যাসী রে, মার্‌চে গাঁজায় দম্।
ভাড়ী বগলে, ছেলের দলে, পাঠশালেতে যায়,
পথে যেতে, কোঁচড় হতে, খাবার নিয়ে খায়।
এই বেলা, সকালবেলা, পাঠে দিলে মন,
বৈকালেতে, গৌরবেতে, রবে যাদু ধন ॥

(পদ্যসংগ্রহ)

যমুনাতটে

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল!
সমীরণ মৃদু মৃদু ফুলমধু বয়,
কল কল করে ধীরে তরঙ্গিণী-জল!
কুসুম, পল্লব-লতা নিশার তুষারে
শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ায়,
জোনাকির পাঁতি শোভে তরুশাখা 'পরে,
নিরিবিলি ঝিঁ ঝিঁ ডাকে, জগতে ঘুমায়;—
হেন নিশি একা আসি, যমুনার তটে বসি,
হেরি শশী দুলে দুলে জলে ভাসি যায়।

(২)

কে আছে এ ভূ-মণ্ডলে, যখন পরাণ
জীবন-পিঞ্জরে কাঁদে যমের তাড়নে,
যখন পাগল মন ত্যজে এ শ্মশান
ধায় শূন্যে দিবানিশি প্রাণ অন্বেষণে,
তখন বিজন বন, শান্ত বিভাবরী,
শান্ত নিশানাথ-জ্যোতিঃ বিমল আকাশে,
প্রশস্ত নদীর তট, পর্বত উপরি,
কার না তাপিত মন জুড়ায় বাতাসে।
কি সুখ যে হেনকালে, গৃহ ছাড়ি বনে গেলে,
সেই জানে প্রাণ যার পুড়েছে হুতাশে।

(৩)

ভাসায়ে অকূল নীরে ভবের সাগরে
জীবনের ধ্রুবতারা ডুবেছে যাহার,
নিবেছে সুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে,
হু হু করে' দিবানিশি প্রাণ কাঁদে যার,
সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূরতি,
হেরিলে বিরলে বসি গভীর নিশিতে,
শুনিলে গভীর-ধ্বনি পবনের গতি,
কি সান্ত্বনা হয় মনে মধুর ভাবেতে।
না জানি মানব-মন, হয় হেন কি কারণ,
অনন্ত চিন্তার গামী বিজন ভূমিতে।

(৪)

হায় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী-দিবা-প্রভেদে এমন,
কেন হেন উঠে [illegible] চিন্তার লহরী ?
কেন দিবসেতে ভুলি থাকি সে সকলে
শমন করিয়া চুরি নিয়াছে যাহায় ?

কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জলে,
প্রাণের দোসর ভাই, প্রিয়ার ব্যথায় ?
কেন বা উৎসবে মাতি থাকি কভু দিবা রাতি.
আবার নির্জনে কেন কাঁদি পুনরায় ?

(৫)

বসিয়া যমুনাতটে হেরিয়া গগন,
ক্ষণে ক্ষণে হলো মনে কত যে ভাবনা,
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম, আত্ম-বন্ধু জন,
জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না !
কত আশা, কত ভয়, কতই আহ্লাদ,
কতই বিষাদ আসি হৃদয় পূরিল,
কত ভাঙি, কত গড়ি, কত করি সাধ,
কত হাসি, কত কাঁদি, প্রাণ জুড়াইল !
রজনীতে কি আহ্লাদ, কি মধুর রসাস্বাদ,
বৃন্তভাঙা মন যার সেই সে বুঝিল।

(কবিতাবলী, ১৮৭০)

অশোক তরু

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১

কে তোমারে তরুবর, করে এত মনোহর,
রাখিল এ ধরাতলে, ধরা ধন্য ক'রে ?
এত শোভা আছে কি এ পৃথিবী ভিতরে ?
দেখ দেখ কি সুন্দর, পুষ্পগুচ্ছ থরে থর,
বিরাজে শাখার 'পর সদা হাস্যভরে—
সিন্দূরের ঝারা যেন বিটপী উপরে !
মরি কিবা মনোলোভা, ছড়ায়ে রয়েছে শোভা,
আভা যেন উথলিয়া পড়িছে অম্বরে।—
কে আনিল হেন তরু পৃথিবী ভিতরে ?

২

বল বল তরুবর, তুমি যে এত সুন্দর,
অন্তরও তোমার কি হে, ইহারি মতন ?
কিম্বা শুধু নেত্রশোভা, মানব যেমন ?
আমি দুঃখী তরুবর, তাপিত মম অন্তর,
না জানি মনের সুখ, সন্তোষ কেমন ;
তরুবর, তুমি বুঝি না হবে তেমন ?
অরে তরু খুলে বল, শুনে হই সুশীতল
ধরণীতে সদানন্দ আছে একজন—
না হয় সন্তাপে যারে করিতে ক্রন্দন।

৩

জানিতাম, তরুবর, যদি হে তব অন্তর,
দেখাতাম একবার পৃথিবী তোমায়—
মানবের মানচিত্রে কি আছে কোথায় !
কত মরু, বালুস্তূপ, কত কাঁটা, শুষ্ক কূপ,
ধূ ধূ করে নিরবধি অন্ধ ঝটিকায়—
সরসী, নির্ঝর, নদী, কিছু নাহি তায়।
তা হলে বুঝিতে তুমি, কেন ত্যজি বাসভূমি,
নিত্য আসি কাঁদি বসি তোমার তলায় ;
ত্যজে নর, ধরি কেন তোমার গলায় !

৪

তুমি তরু নিরন্তর, আনন্দে অবনী 'পর,
বিরাজ বন্ধুর মাঝে, স্বজন-সোহাগে !
তরুবর, কেহ নাহি তোমারে বিরাগে।
ধরণী করান পান, সরস সুধা সমান
দিবানিশি বারমাস সম অনুরাগে,—
পবন তোমার তরে যামিনীতে জাগে।
স্রোতোধারা ধরি পায়, কুলু কুলু করি ধায়,
আপনি বরষা নীর ঢালে শিরোভাগে ;
তরু রে বসন্ত তোরে স্নেহ করে আগে।

কলকণ্ঠ মধুমাসে, তোমারি নিকটে আসে,
শুনাতে আনন্দে ব'সে কুহু কুহু রব ;
তরুবর তোমার কি সুখের বিভব !
তলদেশে মখমল, তৃণ করে ঢল ঢল,
পতঙ্গ তাহাতে সুখে কেলি করে সব,
কতই সুখেতে তরু, শুন ঝিল্লীরব !
আসি সুখে পাঁতি পাঁতি, ছড়ায়ে বিমল ভাতি,
খদ্যোৎ যখন তব সাজায় পল্লব—
কি আনন্দ তরু তোর হয় অনুভব !

৬

তরু যে আমার মন, তাপদগ্ধ অনুক্ষণ,
কেহ নাই শোকানলে ঢালে বারিধারা ;
আমি তরু, জগতের স্নেহ-সুখহারা !
জায়া, বন্ধু, পরিবার, সকলি আছে আমার,
তবু এ সংসার যেন বিষতুল্য কারা ;—
মনে ভাল, কেহ মোরে, বাসে না তাহারা !
এ দোষ কাহারো নয়, আমিই কলঙ্কময়,
আমারি অন্তর হায়, কলঙ্কেতে ভরা—
আমি, তরু, বড় পাপী, তাই ঠেলে তারা।

৭

বড় দুঃখী তরু আমি, জানেন অন্তরযামী,
তোমার তলায় আমি ভাসি অশ্রুনীরে,
দেখিয়া জীবের সুখ ভবের মন্দিরে।
এই ভিন্ন সুখ নাই, তরু তাই ভিক্ষা চাই,
পাই যেন এইরূপে কাঁদিতে গম্ভীরে,
যতদিন নাহি যাই বৈতরণী-তীরে।
এক ভিক্ষা আছে আর অন্য যদি কেহ আর,
আমার মতন দুঃখী আসে এই স্থানে,
তরু, তারে দয়া করে তুমিও পরাণে।

(কবিতাবলী, ১৮৭০)

কৌমুদী

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হাস রে কৌমুদী হাস সুনির্ম্মল গগনে,
এমন মধুর আর নাহি কিছু ভুবনে ;
সুধা পেয়ে সিন্ধুতলে
দেবতারা সুকৌশলে
লুকাইলা চন্দ্র-কোলে :—লেখা আছে পুরাণে,
বুঝি কথা মিথ্যা নয়,
নহিলে চন্দ্র-উদয়,
কেন হেন সুধাময় ব্রহ্মাণ্ডের নয়নে।
আহা কি শীতল রশ্মি চন্দ্রমার কিরণে,
যেখানে যখন পড়ে,
প্রাণ যেন লয় কেড়ে,
ভুলে যাই সমুদয়,
চেতনা নাহিক রয়,
জাগিয়া আছি কি আমি কিম্বা আছি স্বপনে।
আহা কি অমিয়খনি শরতের গগনে !
কিবা সন্ধ্যা কিবা নিশি,
যেই হেরি পূর্ণ শশী,
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যাই,
শুধু সেই দিকে চাই,
হেরি পূর্ণ সুধাকরে অনিমিষ নয়নে।
পড়ে কিরণের ঝারা ঢাকি হৃদি বদনে,
যত হেরি সুধাকরে,
হৃদয়ের জ্বালা হরে,
কোথা যেন যাই চলে,
স্বপ্নময় ভূমণ্ডলে,
সংসারের সুখদুঃখ নাহি থাকে স্মরণে ॥

(চিত্তবিকাশ, ১৮৭৮)

কল্পনা

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কি দেখিনু আহা আহা,
আর কি দেখিব তাহা,
অপূর্ব সুন্দরী এক শূন্য আলো করি,
চাঁদের মণ্ডল হ'তে,
উঠিছে আকাশ-পথে,
অসীম মাধুরী অঙ্গে পড়িতেছে ঝরি।

ভাব-ভরা মুখখানি,
আহা মরি কি চাহনি,
কটাক্ষে ভুলায় নর অমর ঋষিরে,
কি ললাট কিবা নাসা,
মন-ভাষা-পরকাশা,
ওষ্ঠাধরে হাসিরেখা নৃত্য করি ফিরে।

বিচিত্র বসন গায়,
ইন্দ্র-ধনু শোভা পায়,
বিবিধ বরণে ফুটে কিরণে খেলায়,
যেখানে উদয় হয়,
সুগন্ধি মলয় বয়,
অঙ্গের সৌরভে দিক্ আমোদে পূরায়।

কখন শিখর-শিরে,
বসিয়া নির্ঝর-তীরে,
মিশায়ে বীণার স্বরে গানে মত্ত হয়।
কভু কোন কুঞ্জবনে,
প্রবেশি প্রমত্ত মনে,
নৃত্য করে নিজমনে অধীরা হইয়া;

কখন তটিনী-নীরে,
ধৌত করি কলেবরে,
তরঙ্গে মিশিয়া ফিরে সঙ্গীত ধরিয়া।

কভু মরুভূমি-গায়,
ফুলোদ্যান রচি' তায়,
শুনিয়া পাখীর গান করয়ে ভ্রমণ।

কভু কি ভাবিয়া মনে,
একাকী প্রবেশি বনে,
হাসে কাঁদে নিজমনে উন্মাদ যেমন।

কখন মন্দিরে ধায়,
পূজা করে দেবতায়,
জগৎ-মাতানো গীত প্রেমানন্দে গায়।

কখন অদৃশ্য হ'য়ে
ছায়াপথে লুকাইয়ে,
দেখায় কতই ছলা কত রূপ ধরি।

সদাই আনন্দ মন,
সর্বত্র করে গমন,
বেড়ায় ব্রহ্মাণ্ডময় প্রাণী-দুঃখ হরি।

স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল,
সব(ই) তার লীলাস্থল,
কোথাও গমন তার নিষেধ না মানে,

তিনলোকে আসে যায়,
সর্বত্র আদর পায়
সে মনোমোহিনী মূর্তি সকলেই জানে।

কভু ছায়াপথ ছাড়ি,
আর(ও) শূন্যে দিয়া পাড়ি,
দেখায় অপূর্ব কত ত্রিলোক মোহিয়া,

উঠিতে উঠিতে বালা,
দেখাইছে কত ছলা,
কত রূপে কত মতে নাচিয়া গাহিয়া।

নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড-প্রাণী,
হেরিয়া আশ্চর্য মানি,
বিস্ফারিত-নেত্রে সবে বামা পানে চায়;

ধরা উলটিয়া ফেলে,
স্বর্গ আনে ধরাতলে,
অমরাবতীর শোভা ধরাতে দেখায়।

চলে রামা বায়ুপথে,
পুরাইয়া মনোরথে,
যখনি যেখানে সাধ সেখানে উদয়।

কখন(ও) পাতালপুরী
আলোকে উজ্জ্বল করি,
ঘোর অন্ধকার হরি করে সূর্যোদয়,

মরুতে উদ্যান রচে,
মরে' প্রাণী পুনঃ বাঁচে,
উত্তপ্ত কিরণ চাঁদে, ভানু স্নিগ্ধ-কায়।

চপলা চাপিয়া রাখে,
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমে পলকে,
অপরূপ কত হেন ভুবনে দেখায়।

কতই বিস্ময়-কর
কার্য হেন হেরি তার,
সুচতুর বাজিকর যাদুর সমান

হেলায় পুরায় সাধ,
সাগরে বাঁধিয়া বাঁধ,
অগাধ-জলধি-জলে ভাসা'য়ে পাষাণ।

পশুপক্ষী কথা কয়,
"বানরে সঙ্গীত গায়",
গিরি অঙ্গে পাখা দিয়া আকাশে উড়ায়

কখন নাবিক-দলে
ছলিবারে কুতূহলে,
অতল-সাগর জলে কমল ফুটায়।

ক্ষণনিমিষের মাঝে
মহানগরীর সাজে,
সাজায় কখন বন গহন কাননে

কখন বা মহারঙ্গে,
ভাঙিয়া ধরণী-অঙ্গে,
সৌধমালা অট্টালিকা, মথয়ে চরণে।

কভু মহাশূন্য-পারে,
সৌর জগতের ধারে,
দেখায় নূতন সূর্য নূতন আকাশ,
নবীন মেঘের মালা,
নবীন বিজুলী-খেলা,
নব কলাধর-শশী-কিরণ প্রকাশ।

স্বর্গশূন্য ধরা 'পর,
কত হেন কল্পনার,
অলোকসামান্য কাণ্ড দেখিতে দেখিতে,

বিচরি ব্রহ্মাণ্ডময়,
হর্ষ-পুলকিত কায়,
হেরি কত অস্তোদয় হয় ধরণীতে।

ভাবি কত দূর যাই
যেন তার অন্ত নাই,
শেষে না দেখিতে পাই কোথা যায় চলে ;

সুদূর গগন-গায়,
শেষে মিলাইয়া যায়,
চপলা চমকে যেন মেঘের মণ্ডলে।

সহসা চৌদিকে চাই,
তখন দেখিতে পাই,
সেই আমি সেই ধরা সেই তরুজল,

যাইনি নিমেষ পল,
ছাড়িয়া এ ধরাতল,
তবুও ভ্রমিনু স্বর্গ মর্ত্য রসাতল।

এ হেন প্রভাব যার,
প্রসাদ লভিতে তার,
কি দুঃখ এ জগতের ভুলিতে না পারি।

প্রতিদিন কল্পনারে,
পাই যদি পূজিবারে,
নিরানন্দ মাতৃভূমি চিরানন্দ কবি।

এ চির মনের সাধ
মিটিল না, অপবাধ
লয়ো না দুঃখিনী মাগো, দৈব প্রতিকূল,

কমলা ঠেলিলা পায়,
রোষ কৈলা সারদায়,
শুষ্ক আশা-তরু মম বিনা ফল ফুল।

(চিত্তবিকাশ, ১৮৭৮)

কমল-বিলাসী

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আহা মরি কিবা দেখিনু সুন্দর
মধুর স্বপন-লহরী !
নবীন প্রদেশে নবীন গগন,
মধুর মধুর শীতল পবন,
সরসে সরসে নীরদ-বরণ
সলিল ভ্রমিছে বিহরি ।
কত সরোজিনী সরোবর-পরে,
পরিমলময় সদা নৃত্য করে,
ফুটে ফুটে জলে, শত থরে থরে,
অপূর্ব সুবাস বিতরি ।
সরোবর-তীরে ঘ্রাণেতে বিহ্বল,
ভ্রমে কত প্রাণী হেরে সে কমল,
পরাণ শরীর সুবাসে শীতল
বাজায়ে বাজায়ে বাঁশরী ।
ভ্রমে কত সুখে, কত সে আনন্দ,
যেন মাতোয়ারা লভিয়া সে গন্ধ,
সরোবরে পশি পিয়ে মকরন্দ—
চিন্তা শোক তাপ পাশরি ।
ভাঙ্গে পদ্মকলি, ভাঙ্গে পদ্মনাল,
ঢালে পদ্মমধু পূর্ণ করি গাল ;
ভখয়ে সুরস নবীন মৃণাল
কতই যতনে আহরি ।
আনন্দে বিভোর মধুমত্ত মন
ত্যজে বারি পুনঃ উঠে কতক্ষণ
তীরে বসি ধীরে সেবে সমীরণ—
হৃদয়ে সুখের লহরী ।

পুনঃ গিয়ে জলে তুলে পদ্মদল,
কোরক-বিকচ নলিনী অমল ,
মকরন্দ লয়ে ঢালে অবিরল
পূরিয়া পূরিয়া গাগরী ।

পুনঃ উঠে তীরে মৃদু মন্দ বায়,
ধীরে ধীরে সবে তরুতলে যায় ;
নিকুঞ্জ ছাড়িয়া তখন সেথায়
প্রবেশে কতই সুন্দরী ।

মধুমাখা হাসি বদনে বিকাশ,
পদ্মমধু-বাসে পরাণে উল্লাস,
পদ্মসুধা পিয়ে মিটায়ে পিয়াস—
কুবলয়ে বান্ধে কবরী ।

বিছায়ে কোমল কমল-পাতায়,
সুশীতল শয্যা ভূতলে সাজায়,
চারু মনোহার উপাধান তায়,
গ্রথিত নলিনীমঞ্জরী ।

তরু তলে তলে হেন মনোহর
কমলের শয্যা কোমল সুন্দর .
দুগ্ধফেননিভ সুচারু অম্বর
যেন রে মেদিনী-উপরি ।

এরূপে পাতিয়া কুসুম-শয়ন,
হাসিয়া হাসিয়া বিলাসিনীগণ,
হৃদয়বল্লভ পারশ তখন
ছড়ায় বিলাসলহরী ।

কেহ বা খুলিয়া গ্রীবার ভূষণ,
হেমময় মালা জড়িত রতন,
পরায়ে প্রিয়েরে করিয়া যতন,
খেলায় নয়ন-সফরী ;

অলকার চুল কেহ বা খুলিয়া
জড়ায়ে জড়ায়ে বিননী গাঁথিয়া
বঁধুরে বাঁধয়ে সোহাগে গলিয়া,
অধরে হাসির মাধুরী,
কেহ বা আপন নয়ন-অঞ্জন
তুলিয়া বিলাসে করে বিলেপন
প্রিয়-আঁখি'পরে—সলজ্জ বদন,
চঞ্চল বসনে সম্বরি,
কোনো বা ললনা ছলিয়া চাতরে,
রাঙ্গাপদ তুলি প্রিয়হৃদি-পরে,
অলক্তলাঞ্ছনে দেহে চিহ্ন করে,
জানাতে প্রেমের চাকরি।
এরূপে বসিয়া যতেক ললনা,
হাব, ভাব, হাসি প্রকাশে ছলনা,
কেহ বা শিয়রে, কোনো বা অঙ্গনা
চরণ-পারশে প্রহরী।
বসিয়া প্রভাতে যতেক সুন্দরী,
মধুর ললিত মোহন বাঁশরী,
সুবেতে বাঁধিয়া আলাপ-আচরি,
পূরিছে পল্লব-বল্লরী।
সে সুরতরঙ্গে মিলিয়া তখন
উঠিল সঙ্গীত পূরিয়া কানন—
শ্যামা কলকণ্ঠ, শারী অগণন
'বউ কথা কও' সুন্দরী,
উঠিল ডাকিয়া পূরি চারিদিক—
জগৎ-সংসার করিল অলীক
বেণু-বীণা-রব হ'তে সমধিক
মধুর গীতের লহরী।

বাঁশীতে বাজিছে—'কিবা সে সংসার'
কোকিলা ভাবিছে—'সে সব মিছার'
'প্রেম, আশা, ভ্রম—সকলি অসার'
প্রতিধ্বনি উঠে কুহরি ;—
"কি হবে জীবনে, প্রেমের আমোদে
পরাণ যদি না মাতে।
রসের বাগান—সখের মেদিনী—
নারীফুল ফুটে তাতে।
যে জানে মথিতে এ সুখজলধি
সেই সে পীযূষ পায় ;
সখের বাজার—সুখের মেদিনী—
রসের বেসাতি তায় !"

* * *

"হায়, সে পীযূষ ! কিবা তার সম
ভাব রে ভাবুক মনে !
হায়, ধন, মান, যশ—প্রাণের নিগড়,
কণ্টক আশার বনে !
এ যে, সুখের ধরণী ! ভাবনা-হুতাশ
ইহাতে নাহিক সাজে,
হেথা, প্রাণের সারঙ্গ, প্রমোদে মজিলে
তবে সে আনন্দে বাজে !
শুধু, রসিক যে জন, রসের ধরায়
সেই সে হরষ পায় ;
ডুবে, নারীসুধাকূপে, লভে প্রেমসুধা,
দ্বিজ এই গীত গায়।"
বিহগ, বিটপী, বাঁশরী, বীণাতে
এই গীত শুধু বরিষে প্রপাতে ;
প্রকৃতি যেন বা মাতিল তাহাতে
বিলাসি বেশের চাতুরী।

চারু কিশলয় হইল বিকাশ ;
তরুরাজি-কোলে মৃদু মৃদু শ্বাস,
কুসুম চুম্বিল মলয় বাতাস,
লতিকা উঠিল শিহরি ;
তুলিয়া কলাপ মদন-বিধুর
নাচিতে লাগিল উন্মত্ত ময়ূর ;
নবীন জলদ নিনাদি মধুর
গগন রাখিল আবরি ।

গাঢ়তর আরো বাজিল বাদন,
গাঢ়তর আরো গীত-বরিষণ,
গাঢ়তর বেশ আরো সে ভুবন
আঁধারিল যেন শর্বরী ।
যত তরু ছিল পড়িল লুটিয়া,
বিটপে বিটপে লতা বিনাইয়া,
করিল মণ্ডপ কুসুমে ডুবিয়া,
ধীর নামে মৃদু মর্মরি !

মণ্ডপে মণ্ডপে যুগল যুগল,
সুতন্দ্রা অলসে শরীর নিচল,
পড়িল পরাণী—অসাড় সকল—
রহিল চেতনা সম্বরি ।
একাকী তখন ভ্রমিনু সে দেশ ;
চারিদিকে খালি হেরি চারু-বেশ
কমল সরসী, কোমল প্রদেশ
রাজিছে ভূতল উপরি ।

পাতিয়া নলিনী যত প্রাণিগণ,
সরোবর-তীরে সুখে নিমগন,
কেবলি নিরখি, যতই ভ্রমণ
করি, সে অপূর্ব নগরী ।

ষড় ঋতু ধীরে ক্রমে আসে যায়—
প্রাবৃটের কোলে নিদাঘ জুড়ায়,
প্রাবৃট আবার শরতে লুকায় ;
হাসিল শারদ শর্বরী ;
শিশিরের কোলে হিম ঋতু আসে,
নিশি-অশ্রুজলে তরুদল ভাসে ;
তখন(ও) উন্মত্ত অচেত বিলাসে
যতেক নাগর নাগরী !

যতদিন ক্ষুধা জঠরে না জ্বলে
সেইভাবে তারা পড়িয়া ভূতলে
অচেতন চিতে থাকয়ে বিহ্বলে
জগত-সংসার পাশরি।

বসন্ত ফিরিয়া আইলে আবার
জাগিয়া করয়ে মৃণাল আগার,
কমল-পীযূষ পিয়ে পুনর্বার,
পড়য়ে চেতনা সম্বরি।

কত যে আনন্দে প্রকৃতি খেলায়
ঋতুতে ঋতুতে ঘটনা ছলায় !—
নাহি জানে তারা—দিবস-নিশায়
স্বভাবের কত চাতুরী !

নাহি জানে কিবা ঘোরতর সুখ !
ঘোরতর যবে প্রকৃতির মুখ
ঘনঘটাজালে—পতন-উন্মুখ
বিজলী বেড়ায় বিচরি।

না বুঝিতে পারে কি তেজ তখন !
গগনের কোলে যবে প্রভঞ্জন
চলে দম্ভ করি ছাড়িয়া গর্জন—
নাচায়ে প্রকৃতি-সুন্দরী।

তখন হৃদয়ে যে ভাব গভীর
করে আন্দোলন, অধীর শরীর—
না জানে তাহারা, না ভাবে মহীর
    কত সে ঐশ্বর্য-লহরী

যে ভাব-পরশে প্রাণে পুষ্প ফুটে
থাকে চিরকাল প্রাণী চিত্তপুটে,
নিত্য পরিমল নিত্য যাহে উঠে
    জগতে সঞ্চারি মাধুরী ;—

যে ভাব-পরশে মানবের মন
বেড়ায় জগত করি বিদারণ,
করে তেজোজালে পৃথিবী দাহন,
    মৃত্যুর মুরতি বিস্মরি ;—

না পরশে কভু তাদের পরাণ ;
জীবন কাটায় করি মধু পান ;
নারীগত মান—নারীগত প্রাণ—
    নারী-পায়ে ধরা চাকরি !

এইরূপে হেরি সে চারু অঞ্চল ;
গেল কতকাল ভ্রমিতে কেবল ;
শেষে যেন প্রাণ হইল বিকল
    ভাবিয়া সে ঘোর শর্বরী।

ভাবিয়া হৃদয়ে উদয় ধিক্কার,
নরজাতি বুঝি নাহি হেন আর ?
ধূধূ করে শূন্য পুরাবৃত্ত যার—
    হেরে উঠে প্রাণ শিহরি।

কালচিত্রপটে যদি ফিরে চায়,
গুরুদত্ত ধন কি দেখিতে পায় ?
কিবা সে সঙ্কেত আছে রে কোথায়
    ভ্রমিতে সংসার-ভিতরি !

পিতৃকুল গত কোন্ মহাভাগে
দিয়াছে সুমন্ত্র, শুনে অনুরাগে
পুনঃ জীয়ে প্রাণ, পুনঃ ছুটে আগে
ভবিষ্য তরঙ্গে উতরি ?

নরজাতি যত হের ধরা-মাঝে
সকলেরি চিহ্ন কালবক্ষে সাজে ;
নিরখিলে তায় হৃদি-তন্ত্রী বাজে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় পাশরি !

এ ছার জাতির কি আছে তেমন,
কালের কপালে সঙ্কেত-লিখন ?
অপূর্ব কিবা সে নূতন কেতন
উড়িছে ভবিষ্য-উপরি ?

ভাবিতে ভাবিতে কত দূর(ই) যাই,
পুরী-প্রান্তভাগ নিরখিতে পাই—
তেমতি সরস কোমল সে ঠাঁই,
সজ্জিত পল্লববল্লরী।

প্রাণিগণ সেথা করিয়ে বিলাস,
তেমতি আকৃতি প্রকৃতি আভাস,
সেই নিদ্রা ঘোর তরুতলে বাস,
সেইরূপে নারী প্রহরী।

সেখানে রমণী আরো সুচতুরা,
জানে কত আরো ছলনা মধুরা,
সদা মনে ভয় পাছে সে বঁধুরা,
ছাড়িয়া পলায় নগরী ;

কাছে কাছে আছে সোনার পিঞ্জর,
সুবর্ণ শিকলি শতেক লহর ;
যদি কেহ উঠে শুনে অস্ত স্বর
বিলাস-প্রমোদ পাসরি ;—

তখনি তাহারে বাঁধিয়া শৃঙ্খলে ;
অমনি পিঞ্জরে পুরে কত ছলে,
কত কাঁদে প্রাণী ভাসে চক্ষু-জলে,
তবু নাহি ছাড়ে সুন্দরী।

দেখে কাঁপে প্রাণ ভেবে সে প্রথায় ;
ভাবি কেন হায় প্রবেশি সেথায়,
কিরূপে বাঁচিব, করি কি উপায়,
কিরূপে ছাড়ি সে নগরী।

হেন কালে দেখি বিস্ফারি নয়ন,
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ সেই প্রাণিগণ,
আমার স্বদেশী—নহে সে স্বপন!
খেলিছে বঙ্গের উপরি!—

আহা মরি কিবা দেখিনু সুন্দর
অপূর্ব স্বপনলহরী।

(কবিতাবলী, ১৮৭০।৮০)

পদ্মফুল

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যতবার হেরি তোরে কেন ভুলি বল,
ওরে শতদল পদ্ম?
কি আছে ও শ্বেতবর্ণে,
কি আছে ও নীলপর্ণে,
যখনি নিরখি—আঁখি তখনি শীতল!
যতবার হেরি তোরে কেন ভুলি বল,
ওরে প্রস্ফুটিত পদ্ম?

যখন সূর্যের রশ্মি মাখিয়া শরীরে,
হাসিটী ছড়ায়ে মুখে
ভাসো নীল বারি-বুকে
টলটল তনুখানি কতই সুখী রে—
হেরিলে তখন কেন আমিও হাসি রে
ওরে মোহকর পদ্ম ?
আমারও অধরে হাসি অমনি মধুর
ফোটে রে আপনি আসি,
তোমারি হাসির হাসি
পরকাশে হৃদিতলে—আহা কি মধুর !
কেন, বা, না হেরে তোরে হৃদয় বিধুর
ওরে সর-শোভা পদ্ম ?
আবার যখন, আহা, শিশিরের জলে
ভিজিয়া মনের খেদে,
গোট করি কেঁদে কেঁদে
দলগুলি মোদ, ফুল, গুণ্ঠনের তলে—
তখন হেরিলে কেন মম হৃদি গলে
ওরে রে মুদিত পদ্ম ?
দেখিলে তখন তোরে আমিও হৃদয়ে
পাই রে কতই ব্যথা,
মনে পড়ে কত কথা,
ফুটিত হৃদয়ে যাহা জীবন-উদয়ে—
খেলাত চঞ্চল মনে উন্মাদিত হয়ে !
ওরে আচ্ছাদিত পদ্ম !
কি যে কোমলতা তোর থরে থরে থরে,
পত্রদলে, শতদল !
হৃদি তোর কি কোমল !
সেই জানে কোমলতা হৃদে যার ঝরে !—
আমি ভিন্ন কেহ আর জানে কি অপরে
হে কমলবাসী পদ্ম ?

ফোটে ত রে এত ফুল তড়াগের কোলে
শুভ্র নীল লাল আভা,
কাহার শরীর-প্রভা,
কই ত আমার মনে ওরূপে না খোলে,
এত সুখে চিত্ত কই দেখি না ত দোলে
রে চিত্তমাদক পদ্ম ?

দেখেছি ত পুষ্প তোরে আগেতে কতই
সকালে খেলেছি যবে,
সখারা মিলিয়া সবে,
তৃণময় হ্রদতীরে বিহ্বলিত হই—
ওরে ভাবময় পদ্ম ?

তখন এ গাঢ়ভাবে ডুবিনি ত কই
এত যে লুকানো তোতে আগে ত
জানিনে !
যৌবনেতে সুখোদয়
হায় রে সকলে কয়—
প্রৌঢ়-সুখ কাছে আমি সে সুখ মানিনে !
পরিণত সুখ বিনা সুখ কি জানি নে
ওরে মনোহর পদ্ম !

যে বাস তোমাতে, হায়, সে বাস কি আর
আছে অন্য কোন ফুলে ?
অমন বাতাস তুলে
ছোটে কি সুরভিগন্ধ জুঁই মল্লিকার ?
তোরি বাসে কেন হৃদি মুগ্ধ রে আমার
রে কুন্দলাঞ্ছন পদ্ম ?

গোলাপ, কেতকী, চাঁপা, কামিনীর থরে
এত কি শোভে রে বন ?
এত কি মোহে রে মন ?

হেরি যবে তোরে ফুল্ল হ্রদের লহরে,
কি যেন খেলে রে রঙ্গে হৃদয়-নির্ঝরে
হে মনোরঞ্জন পদ্ম ?
কথাটি ত নাহি মুখে—জানো না ত বাণী—
তবু, ওরে শতদল,
কেমনে প্রকাশে, বল্,
যে কথা হৃদয়ে তোর—কেমনে বা জানি
ওরে গুপ্তভাষী পদ্ম ?
কেহ কি দেখে না আর এ তোর সরল
মাধুরী-প্রতিমাখানি ?
কেহ কি শোনে না বাণী
তোর ও কমল মুখে ?—আমিই পাগল !
আমিই একা কি মত্ত পিয়ে ও গরল
ওরে উন্মাদক পদ্ম ?
কেন, বল, এইরূপে ঘুরি নিরন্তর
যেখানে তোমার দল
ফুটিয়া সাজায় জল ?
না দেখিলে কেন হয় এরূপ অন্তর—
কেন দেখি শূন্য মহী যেন বা গহ্বর,
বল হৃদিগ্রাহী পদ্ম ?
ঘুরি ত কতই স্থানে—কত দেখি, হায়,
রাজগৃহ, বন্ধু-গেহ,
পাই ত কতই স্নেহ,
তবু কেন, বল্, চিত্ত তোরি দিকে ধায়—
বল্ রে নিকটে তোর ধায় কি আশায়,
ওরে চিত্তচোর পদ্ম ?
ধন, মান, বিভবের সৌরভ-শোভায়
এত ত মোহে না হৃদি,
থাকে না ত প্রাণে বিঁধি

এমন সুরুচি-শোভা সংসার-লীলায়
ভ্রমেছি ত এতকাল খেলায় সেথায়
রে ক্রীড়াকুশল পদ্ম ?

কতবার করি মনে ভুলিব রে তোরে,
ধরিব সংসারী সাজ
ভাঁজিয়া হৃদয়-ভাঁজ,
অন্য সাধে হৃদে ধরি ঘুরি মর্ত্য-ঘোরে—
ভুলে যাই শুক্লবর্ণে, ভুলে যাই তোরে।
হায়, মোহকর পদ্ম,—

না পশিতে চিত্ততলে সে কল্পনা-মূল
শুকায় সে সাধ-লতা !
ভুলি রে সে সব কথা !
ভুলিতে পারি না কিন্তু একমাত্র ভুল—
কি মাধুরী-ডোর তোর, হায় রে, অতুল
ওরে মধুময় পদ্ম !

সত্য কি রে তোরি দেহে এত শোভা বাস ?
কিম্বা সে আমারি মন
প্রমাদে হয়ে মগন,
ভাবে আপনার প্রভা তো'তে পরকাশ—
চেতন ভাবিয়া তোরে শোনে নিজ ভাষ,
ওরে জড়দেহ পদ্ম ?

যাই হোক যে, বিধানে আমার হৃদয়
মিশুক মাধুর্যে তোর,
হ'লে জীবনের ভোর,
তবুও স্বপনে তুই হবি রে উদয়—
ভুলিব না তবু তোরে, রে সুষমাময়,
সুগন্ধ-নিবাস পদ্ম !

ভাবি শুধু কেন বিধি করিলা এমন—
এত শোভা বাস যার
পঙ্কেতে জনম তার,
পঙ্কজ বলিয়া তারে ডাকে সাধু জন ?
জানি না বিধির হায়, রহস্য কেমন,
ওরে শুদ্ধচেতা পদ্ম !
হায়, বিধি, এ মনও কি তেমতি বিধানে
বাঁধিলা এ দেহপুটে ?
কলুষ-পঙ্কেতে ফুটে,
তাই এত ক্ষিপ্তমন ডোবে ভাসে বানে ?
বুঝেছি, রে শতদল অচ্ছেদ্য বন্ধনে
তাই তুই আমি বাঁধা,
একসঙ্গে হাসা কাঁদা,
তাই ওরে পদ্মফুল, এ মিল দু'জনে।
ভুলিব না তোরে, পদ্ম,—
ভুলিব না—ভুলিব না—জীবনে মরণে !

(বিবিধ কবিতা, ১৮৯৩)

চাতকপক্ষীর প্রতি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(শেলি রচিত 'স্কাইলার্ক'-এর অনুকরণে)

(১)

কে তুমি রে বল পাখী,
সোণার বরণ মাখি,
গগনে উধাও হয়ে,
মেঘেতে মিশায়ে রয়ে,
এত সুখে সুধামাখা সঙ্গীত শুনাও ?

(২)

বিহঙ্গ নহ ত তুমি ;
তুচ্ছ করি মর্ত্যভূমি
জ্বলন্ত অনল প্রায়
উঠিয়া মেঘের গায়,
ছুটিয়া অনিল পথে সুস্বর ছড়াও ?

(৩)

অরুণ-উদয়-কালে,
সন্ধ্যার কিরণ-জালে
দূর গগনেতে উঠি,
গাও সুখে ছুটি ছুটি,
সুখের তরঙ্গে যেন ভাসিয়া বেড়াও।

(৪)

আকাশের তারাসহ
মধ্যাহ্নে লুকায়ে রহ,
কিন্তু শুনি উচ্চস্বরে
শূন্যেতে সঙ্গীত ঝরে ;
আনন্দ-প্রবাহ ঢেলে পৃথিবী জুড়াও ?

(৫)

একাকী তোমার স্বরে
জগত প্লাবিত করে,
শরতের পূর্ণ শশী
বিমল আকাশে বসি,
কৌমুদী ঢালিয়া যথা ব্রহ্মাণ্ড ভাসায়,

(৬)

কবি যথা লুকাইয়ে,
হৃদয়ে কিরণ লয়ে,
উন্মত্ত হইয়া গায় ;
পৃথিবী মাতিয়ে তায়
আশা মোহ মায়া ভয় অন্তরে জুড়ায়।

(৭)

রাজার কুমারী যথা
পেয়ে প্রণয়ের ব্যথা
গোপনে প্রসাদ'পরে
বিরহ সান্ত্বনা করে
মধুর প্রেমের মত মধুর গাথায় !

(৮)

যেমন খদ্যোৎ জ্বলে
বিরলে বিপিন তলে,
কুসুম তৃণের মাঝে
আতোষী আলোক সাজে
ভিজিয়া শিশির নীরে আঁধার নিশায় ।

(৯)

পাতায় নিকুঞ্জ গাঁথা
গোলাপ অদৃশ্য যথা
সৌরভ লুকায়ে রয়,
যখন পবন বয়,
সুগন্ধ উথলি উঠি বায়ুরে ক্ষেপায় ।

(১০)

সেইরূপ তুমি, পাখী,
অদৃশ্য গগনে থাকি,
কর সুখে বরিষণ
সুধাস্বর অনুক্ষণ
ভাসাইতে ভূমণ্ডল সুধার ধারায় ।

(১১)

কেবা তুমি জানি নাই,
তুলনা কোথায় পাই ;
জলধনু চূর্ণ হয়ে
পড়ে যদি শূন্য বয়ে,
তাহাও অপূর্ব হেন নাহিক দেখায় ।

(১২)

যত কিছু ভূমণ্ডলে
সুন্দর মধুর বলে—
নবীন মেঘের জল,
মুক্তা-মাখা তৃণদল—
তোমার মধুর স্বরে পরাজিত হয়।

(১৩)

পাখী কিম্বা হও পরী
বল রে প্রকাশ করি
কি সুখ-চিন্তায় তোর
আনন্দ হয়েছে ভোর ?
এমন আহ্লাদ আহা স্বরে দেখি নাই !

(১৪)

সুধা-প্রণয়ের গীত
প্রাণ করে পুলকিত—
তারো সুললিত স্বর
নহে এত মনোহর
এত সুধাময় কিছু না হেরি কোথাই।

(১৫)

বিবাহ-উৎসব-রব
বিজয়ার জয়-স্তব,—
তোর স্বর তুলনায়
অসার দেখি রে তায়—
মেটে না মনের সাধ, পূর্ণ নাহি হয়।

(১৬)

তোর এ আনন্দময়
সুখ-উৎস কোথা রয়,
বন কিম্বা মাঠ গিরি
গগন-হিল্লোল হেরি—
কারে ভালবেসে এত ভুল সমুদয় ?

(১৭)

তুমিই থাক রে সুখে
জান না ঔদাস্ত দুখে,
বিরক্তি কাহারে বলে
জান না রে কোন কালে
প্রেমের অরুচি ভোগে হলাহল কত।

(১৮)

আমরা এ মর্ত্তবাসী
কভু কাঁদি কভু হাসি,
আগে পাছে দেখে যাই
যদি কিছু নাহি পাই,
অমনি হতাশ হয়ে ভাবি অবিরত।

(১৯)

যত হাসি প্রাণভরে
যাতনা থাকে ভিতরে,
এ দুঃখের ভূমণ্ডলে
শোকে পরিপূর্ণ হ'লে
মধুর সঙ্গীত হয় কতই মধুর!

(২০)

ঘৃণা ভয় অহঙ্কার
দূরে করি পরিহার,
পাখী রে তোমার মত
যদি না কাঁদিতে হ'ত—
না জানি পেতেম কত আনন্দ প্রচুর!

(২১)

গগন-বিহারী পাখী
জগতে নাহিরে দেখি,
গীত বাত্ত মধুস্বর
হেন কিছু মনোহর
তুলনা হইতে পারে তোমার বাহায়।

(২২)

যে আনন্দে আছ ভোরে
তাহার তিলেক মোরে
পাখী তুমি কর দান,
তা হ'লে উন্মত্ত প্রাণ
কবিতা-তরঙ্গে ঢালি দেখাই ধরায়

(কবিতাবলী)

বাসন্তী পদাবলী

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মধু ঋতু এল ধরণীমাঝে।
হেলে দোলে লতা মোহন সাজে॥
অমৃত বরিষে মৃদু সমীর '
পরাণ লভয়ে মৃত শরীর॥
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিছে বায়।
ঝরিয়া পড়িছে বকুল তায়॥
মধু-মালতীর ফুটিছে কলি—
চারিদিকে আর ঘুরিয়া অলি
গুনগুনায়িছে নব রসিক।
পহরে পহরে কুহরে ফিরি॥
ফুলের কে পায় কূল-কিনারা।
অগণন যেন গগন-তারা॥
তরো তরো ফুল, রঙ-বে-রঙ।
শতেক ফুলের শতেক ঢঙ॥
কেহ বা দোলে, কেহ বা ঝোলে,
কেহ বা মুখের ঘোমটা খোলে॥
কেহ বা ছড়ায় কনক-রেণু—
রাখাল যেথায় বাজায় বেণু॥
রাশিরাশি ফুলে ভরিল সাজি।
ঘরে ফিরি চলো, আর না আজি॥

(কাব্যমালা ১৯২০, রচনাকাল ১৮৮০-১৯০০)

সায়ং-চিন্তা

নবীনচন্দ্র সেন

১

সুশীতল সন্ধ্যানিলে জুড়াতে জীবন,
ডুবাতে দিবস-শ্রম বিস্মৃতি-সলিলে,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে, উঠিলাম গিরিশিরে,
বাসনা, জুড়াতে স্রোতঃসম্ভূত অনিলে,
কার্য-ক্লান্ত কলেবর, সন্তাপিত মন।

২

রজনীর প্রতীক্ষায় প্রকৃতি সুন্দরী
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু পরিল তখন,
রবি অস্তমিতপ্রায়, সুবর্ণে মণ্ডিতকায়,
উজলিয়া গগনের সুনীল প্রাঙ্গণে,
ভাসিতেছে স্থানে স্থানে রক্ত কাদম্বিনী।

৩

রঞ্জিত আকাশতলে, নীলতরঙ্গিণী
দেখাইছে প্রতিবিম্ব বিমল দর্পণে!
ভাসে তাহে মেঘগণ, কাঁপে তরু অগণন,
নাচিছে হিল্লোলমালা মন্দ সমীরণে,
বহিতেছে গিরিমূল চুম্বিয়া তটিনী।

৪

মনের আনন্দে গায় বিহঙ্গনিচয়;
সুন্দর শ্যামল মাঠে চরে গাভীগণ;
নিরুদ্বেগে তরুতলে, তটিনীর কলকলে
গাইছে রাখাল-শিশু মধুর গায়ন,
নাহি কোন চিন্তা, নাহি ভবিষ্যৎ ভয়।

৫

ওই দেখ তরুতলে প্রফুল্ল হৃদয়ে
গাইতেছে উচ্চৈঃস্বরে না জানে কি গায় ;—
লতাপাতা জড় করি, কভু ভাঙ্গি পুনঃ গড়ি,
হাসিতে হাসিতে দেখ পড়িছে ধরায়,
হায় রে শৈশবকাল সুখের সময়।

৬

চিন্তা কাল-ভুজঙ্গিনী করে না দংশন ;
নিরাশ প্রণয়-দুঃখে, দহে না জীবন ;
দুরাকাঙ্ক্ষা পারাবার, বিশাল লহরী তার,
খেলে না হৃদয়ে ; আহা ! জানে না এখন,
মানব-জনম তার, দাসত্ব-জীবন।

৭

হাস হাস হাস শিশু ! নহে দিন দূর,
সংসার-সাগর-পারে বসিয়ে যখন,
বিষাদ-তরঙ্গমালা, গণিতে গণিতে কালা,
হইবে প্রফুল্ল মুখ ; জানিবে তখন,
নির্মল শৈশবক্রীড়া সুখের স্বপন।

৮

আমিও ইহার মত ছিলাম নির্মল,
ছিলাম পরম সুখে সুপ্রসন্ন মনে,
আমার জীবন-কলি, (দিতে সুখে জলাঞ্জলি)
কে ফুটাল, পোড়াইতে ভীম হুতাশনে ?
কে সুখ-সাগরে মম মিশাল গরল ?

৯

কেন বা ফুটিল মম জ্ঞানের নয়ন,
কেনই বিবেক-শক্তি হ'ল বিকসিত,
উথলিতে অভাগার, শোকসিন্ধু অনিবার,
নিজ হীন অবস্থায় করিতে দুঃখিত,
কেনই ভাঙ্গিল মম শৈশব-স্বপন।

(অবকাশরঞ্জিনী ২য়, ১৮৭১-১৮৭৭)

অশোকবনে সীতা

নবীনচন্দ্র সেন

চিত্র-নভঃ-কিরীটিনী সচন্দ্র রজনী,
চিত্রি' বিকসিত নৈশ কুসুম-মালায়
উদ্যান, সরসী-নীর ; অযুত রতনে
চিত্রি' সচঞ্চল চির নীল নীরনিধি,
ভাসিছে নিদাঘাকাশে। বিশ্ব চরাচর
নীরবে শান্তির সুধা করিতেছে পান।
চন্দ্রের একটি রশ্মি শিবিরের দ্বারে
রহিয়াছে শতরঞ্জি উপরে পড়িয়া,
যেন স্থির উল্কাখণ্ড, স্থিরতর জ্যোতিঃ।
নিরখিয়া সেই রশ্মি বিমল উজ্জ্বল,
উদাস হইল প্রাণ, পর্যঙ্ক ত্যজিয়া
শিবির-বাহিরে নব-শ্যাম দূর্বাদলে
বসিলাম মন-সুখে ; সম্মুখে আমার
অনন্ত অসীম সিন্ধু! চন্দ্রের কিরণে
খেলিছে অনিলসহ সলিল-লহরী,
চুম্বি' মৃদু কলকলে মম পদতলে
রজত-বালুকাকীর্ণ ধবল সৈকত।
দক্ষিণে আমার—মৃদু সুমধুর কলে
ছুটিয়াছে কল্লোলিনী* নাচিয়া নাচিয়া,
আলিঙ্গিয়া প্রতিকূল তীরে গিরিচয় ;
ধবল উত্তরী যেন মাধবের গলে।
অপূর্ব প্রকৃতি-শোভা! অদূর ভূধর
শোভিতেছে মেঘবৎ আকাশের গায়ে ;
কেবল কোথায় কোন উচ্চ তরুবর
অরণ্য হইতে তুলি' উচ্চতর শির,
করিতেছে আকাশের সীমা নিরূপণ।

---

* কর্ণফুলী নদী

চিত্রিত আকাশ-চন্দ্র-ভূধর-সাগর,
চিত্তবিমোহিনী শোভা! মরি কি সুন্দর!

"এমন সময়ে" আমি ভাবিলাম মনে,
নিশা-হন্তা 'মেকবেথ' সাধিল মানস
সুপ্ত 'ডন্‌কেনের' রক্তে; এমন সময়ে
নিভাইল অশ্বত্থামা, ভজিয়া ধূর্জটী,
পাণ্ডব বংশের পঞ্চ প্রদীপ উজ্জ্বল;
এমন সময়ে লঙ্ঘি উদ্যান-প্রাচীর,
ভেটিল 'রোমিও' প্রাণ-প্রিয় 'জুলিয়েটে',
নিরখিল চন্দ্র-সূর্য একত্র উদয়;
এমন সময়ে, হায়! প্রণয়-যন্ত্রণা
নিবাইতে সাগরিকা উদ্যান-বল্লরী
লয়েছিল করে, দিতে কোমল গ্রীবায়,
উদ্বন্ধনে বিনাশিতে দুঃখের জীবন;
এমন সময়ে সুপ্ত কনক-লঙ্কায়,
একাকিনী শোকাকুলা পতির বিরহে
কাঁদিলা অশোক বনে সীতা অভাগিনী;

"এমন সময়ে" সেই সমুদ্রের কূলে
ভাবিতে ভাবিতে দেহ হইল অবশ;
ক্রমে অজানিত সেই সমুদ্র-বেলায়
শুইলাম, সুকোমল দূর্বাদলময়ী
শ্যামল শয্যায়! স্নিগ্ধ সমুদ্র-নীরজ
অনিল বহিতেছিল অতি ধীরে ধীরে;
পশিলাম ক্রমে নিদ্রা-স্বপন-মন্দিরে।

রত্ন-সৌধ-কিরীটিনী স্বর্ণলঙ্কা জিনি,
দেখিনু শোভিছে রাজ্য জলধি-হৃদয়ে
শত লঙ্কা পরিসরে; বাঁধা ছিল বলে
এক চন্দ্র, এক সূর্য রাবণ-দুয়ারে,

এইখানে সুকুমার প্রণয়-শৃঙ্খলে
কত চন্দ্র, কত সূর্য প্রতি ঘরে ঘরে
রহিয়াছে শৃঙ্খলিত। বহিতেছে বেগে
যেই রম্য রথশ্রেণী বাষ্পে, হুতাশনে,
অতি তুচ্ছ তার কাছে পুষ্পকের গতি।

চপলা সন্দেশবহা; যাহার পরশে
মরে জীব, সে বিদ্যুৎ দেশদেশান্তরে,
কভু ছায়া-পথে, কভু জলধির তলে,
বহিতেছে রাজ-আজ্ঞা। অপূর্ব কৌশল
বিরাজিয়া স্থানে স্থানে গণে অনায়াসে
সময়ের গতি, কিংবা আকাশের তারা।

লঙ্কার অমৃত ফল বানরের করে
হইল নিঃশেষ, কিন্তু এ অপূর্ব পুরে
জাতীয়-গৌরব রূপ যে অমৃত ফল
ফলিতেছে অনিবার, বিনাশিতে তা'রে
পারিবে না নরে কিংবা সমরে অমরে।

এমন অমৃত পানে পুরবাসিগণ,
আনন্দে শান্তির কোলে করিয়া শয়ন,
নিদ্রা যায় মন-সুখে, হায় রে! কেবল
অন্ধকার কারাগারে বসি' একাকিনী
একটি রমণীমূর্তি করিছে রোদন।

কতকাল রমণীর নয়নের জল
ঝরিয়াছে, কে বলিবে? সেই অশ্রুজলে
হইয়াছে দুঃখিনীর অঙ্কিত কপোল;
কবরী অবেণীবদ্ধ, জটায় এখন
হইয়াছে পরিণত; হায়! করাঘাতে কত
বিক্ষত ললাট, স্থানে স্থানে কলঙ্কিত।
বহুমূল্য পরিধেয় নীল-বস্ত্রখানি

হইয়াছে জীর্ণ শীর্ণ—নিতান্ত মলিন,
ততোধিক রমণীর মলিন বরণ !
বহুমূল্য রত্নরাজি আছিল যথায়,
চরণে, প্রকোষ্ঠে, অংসে, উরসে, গ্রীবায়,
উদ্বন্ধন-লতিকার চিহ্নের মতন,
শ্বেতরেখামাত্র এবে সর্ব কলেবরে
রহিয়াছে বিদ্যমান, বাম করোপরে
রক্ষিত বদন-চন্দ্র ;—ফাটিল হৃদয়
এই মূর্তিমতী শোক করি দরশন ;
জিজ্ঞাসিনু—"বল মাতা ! কে তুমি দুঃখিনি ?
এমন বিষাদ-মূর্তি কিসের কারণ ?"
বলিলা রমণী অশ্রু মুছিয়া অঞ্চলে,—
"দুঃখিনী ভারত-লক্ষ্মী আমি, বাছাধন !
আমিই অশোক-বনে সীতা বিষাদিনী ।"

(অবকাশরঞ্জিনী, ১৮৭১-৭৭)

গোলাপ ফুল

মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়

দেখ দেখ চেয়ে দেখ গোলাপ সুন্দর,
কিবা চমৎকার শোভা, কেমন মোহন আভা !
অন্য ফুলে উপবন হয় মনোহর ;
দেখিলে গোলাপ ফুল জুড়ায় অন্তর ।

আহা কিবা শান্তভাব গোলাপ ফুলের !
সৌরভ কোমল অতি, সুকোমল মুখ-জ্যোতি,
হেরিলে পবিত্র কান্তি তৃপ্তি নয়নের ;
কতই উদয় হয় বাসনা মনের ।

ফুটন্ত গোলাপ ফুল হয় যে সময়,
যেন কত লজ্জা-ভরে, মুখখানি হেঁট করে,
একটি একটি করি খোলে দলচয় ;
ভয়ে যেন ঘোমটা খোলে, পাছে কেহ দেখে ফেলে,
লজ্জা-ভরে মৃদু হেসে আড়ে যেন চায়,
লজ্জা-মাখা মুখখানি নত করি রয়।

সকল ফুলের শ্রেষ্ঠ সৌরভ উহার,
এত যে সুগন্ধ ধরে, তবু না ছড়ায় দূরে,
নিকটে লইলে ঘ্রাণ যেন সুধাধার,
সুশীতল সুমধুর গন্ধ কিবা তার !

শুখালেও নাহি যায় গোলাপের গন্ধ ;
মৃদু মৃদু কি শীতল, সুগন্ধ গোলাপ জল,
গোলাপ আতরে কিবা বাস মৃদু মন্দ !
গোলাপ আতরে কত, সৌরভ অপরিমিত,
ধুইলেও বহুকালে না যায় সে গন্ধ,
সে আতরে মানবের কতই আনন্দ !

পুত্রবতী সাধ্বী সতী নারী যদি মরে,
মরিয়া সে নহে মৃতা, সতত থাকে জীবিতা,
তার নাম চিরকাল থাকয়ে সংসারে ;
সেইরূপ গোলাপের গুণে মুগ্ধ নরে।

এতেক সদ্গুণ যেবা ধরে একাধারে
তার (ও) এবে হায় হায় ! বয়সে আদর যায়,
বাসি হ'লে কেহ নাহি ছোঁয় গোলাপেরে ;
অভিমানে পাতাগুলি যায় সব ঝরে।

কেহ আর ফিরে নাহি করে দরশন,
যৌবন গিয়াছে হায়, নিঃশব্দে ঝরিয়া যায়,
এ সময় কেবা আর করে সম্ভাষণ ?
যৌবন হয়েছে গত, তবুও সৌন্দর্য কত।
ঝরে পড়ে তবু নহে মলিন বদন ;
সুন্দর গোলাপ ফুল নয়ন-রঞ্জন।

(বনপ্রসূন, ১৮৮২)

বসন্তের উদয়

অক্ষয় চৌধুরী

[উদাসিনী কাব্যের দশম সর্গ হইতে উদ্ধৃত। বহু বাধা-বিপত্তি ও সংঘাতের শেষে সুরেন্দ্র-সরলার মিলন ঘটিয়াছে। এখন বনদেবী অকস্মাৎ রতি-দেবীরূপে দেখা দিলেন এবং ছদ্মবেশী পথিক স্মর-মূর্তি গ্রহণ করিলেন। সহসা সেই পর্বত-শৃঙ্গে বসন্তের উদয় হইল।]

হের হের ঐ দেখিতে দেখিতে
কি শোভা উদয় মেদিনী মাঝে,
বনদেবী ঐ দেখরে চকিতে
রতিদেবী-রূপে সমুখে রাজে।

২

সে শান্ত মূরতি কোথায় লুকালো ?
নয়ন শীতলে যে রূপরাশি।
কোথা সে চরণ সুকোমল আলো ?
কোথা সে সুমৃদু অমিয় হাসি ?

৩

লক্ষ্মীর প্রতিমা কোথা সে এখন ?
ভকতি-রসে যা পুলকে তনু ।
যে ভাব দেখিলে দুরন্ত মদন
সভয়ে শিহরি পাশরে ধনু ।

৪

এ কিরে (আবার ?) নূতন ব্যাপার
নূতন প্রকার রূপের ছটা,
শত শত শশী যেন একাকার
পিছনে গভীর জলদ-ঘটা ।

৫

নয়ন ঝলসে চরণের ভাসে
অমিয় অধরে অমৃত ক্ষরে,
বিলাস-লালসা নয়নে বিকাশে
অলস-গমনা রূপের ভরে ।

৬

চিকণ অঞ্জন ঘন কেশরাশি
অবাধে লুটায় ধরণী 'পরে,
বাঁকাইয়া গ্রীবা মৃদু মৃদু হাসি
অপাঙ্গে অঙ্গনে তাহাই হেরে ।

৭

মরি মরি কিবে মালতী-মালিকা—
দুলে দুলে দোলে বিনোদ গলে,
দুলিছে কেমন কমলকলিকা
সমীর-পরশে শ্রবণতলে ।

৮

ফুলে ফুলে গাঁথা হাতের বলয় ।
পদ্মমালা গলে কেমন রাজে ।
বেল জুঁই জাতী কুসুমনিচয়
তারকা ঝলকে কেশের মাঝে ।

৯

দেখিতে দেখিতে হের আচম্বিতে
অধীর পথিক মোহের ঘোরে,
সরম-বারণ পাশরিয়ে চিতে
প্রসারিয়ে ভুজ বামারে ধরে।

১০

"ক্ষম অপরাধ, জীবন-রূপিণী !"
কহিল পথিক কাতর স্বরে,
"এত অভিমান সাজে কি মানিনী
মদন-মোহিনি ! মদন পরে।"

১২

ঝক্ ঝক্ জ্বলে চরণ বিমল,
কষিত-কাঞ্চন-সোহাগে মাখা,
ঢল ঢল করে মুখ-শতদল
ঢুলু ঢুলু প্রেমে নয়ন বাঁকা।

১৩

ফুলের মালিকা শোভিতেছে মাথে
পিছনে শোভিছে ফুলের তূণ,
ফুলে ফুলময় শোভিতেছে হাতে
ফুলের ধনুক ফুলের গুণ।

১৪

সহসা বসন্ত হইল উদয়,
কোথা হতে সাড়া দিতেছে পিক্,
সমীর সুরভি মেখে · গন্ধে বয়,
আমোদে আকুল সকল দিক্।

(উদাসিনী, ১৮৭৪)

অকাল-কুসুম

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী

১

এ অকালে কেন আজি বল গো, প্রকৃতি বালা!
পরা'লে এ কুঞ্জ-কণ্ঠে এ নব-কুসুম-মালা?
এখনো শারদ-শেষে
হিমানী আসেনি দেশে,
রূপসী মুক্তার মালা না ছিঁড়িতে দূর্বাদলে,
এ ফুলে এ কুঞ্জ কেন সাজাইলে কুতূহলে?

২

গোলাপ রূপসী অই হিমানী দেশের রাণী,
নব বৃন্তে অলকান্তে বদন রেখেছে টানি;
এই সবে নব কলি,
কাননে আসেনি অলি,
গোপনে রেখেছে সতী বুকে ধরি পরিমল,
মাতাইতে অলি-বঁধু এখনো খোলেনি দল।

৩

তবে কেন রক্ত রাগ এ পীত বরণে সাজি,
অকালে শারদ-শেষে ফুটিল এ ফুল-রাজি?
সলাজে বদনখানি
ঢাকিয়া শিশির রাণী,
সোহাগাশ্রু-রূপে করি নীহারের বিমোচন,
ফুটাইবে আসিয়া যে এ কুসুম নিরুপম।

৪

না আসিতে হিমবালা, কিন্তু অই থরে থরে
ফুটেছে কুসুম কত নিকুঞ্জ উজ্জ্বল ক'রে !
বদনে লাবণ্য তুলি,
এক বৃন্তে ফুলগুলি,
রূপের গরবে যেন ঢলিয়াছে গরবিনী,
যৌবনের রঙ্গ-রসে, মরি কত প্রমোদিনী !

৫

নন্দনে মমতা করি স্নেহবারি বরিষণে,
নন্দনের শোভারাশি চারিদিকে বিকীরণে,
বরিষার আবাহনে,
অকালের উদ্বোধনে,
বহুদিন পরে শুনি কাতর বিকল বাণী ;
এসেছ কি কবি-কুঞ্জে তুমি আজি বীণাপাণি !

৬

তাই কি মা সাজাইতে কমল চরণ তব,
ফুটিয়াছে আজি কুঞ্জে অকালে কুসুম নব ?
তাই কি সরসী-কোলে,
সরোজী বদন খোলে ?
ফুটেছে লবঙ্গ-লতা অকালে বিজনে বনে ?
কবি-কুঞ্জে কত শোভা দেখ আজি, শ্বেতাসনে !

৭

অচলা-বিজলী-সম এস মা কমলেশ্বরি !
তরল-রজত-রূপে নীলাম্বর আলো করি ;
দেখ দেবি, প্রাণ খুলে,
ও রাঙা কুসুম [illegible]ল,
অকালে পূজিব আজি চরণ কমলামল,
উপহার দিয়ে মাগো গলিত নয়ন-জল !

৮

দেখ মা গো নাহি হেথা হেমরত্ন সিংহাসন,
বসাইয়া যথা দেবি, পূজিব ও শ্রীচরণ!
নব-দূর্বাদল ছাটি,
সৃজিয়াছি পরিপাটি—
কোমল-আসনখানি ফুটন্ত-শেফালি-তলে,
ছড়াইয়া নিপতিত-শেফালিকা দলে দলে।

৯

অই শেফালির তলে দাঁড়াইয়া দূর্বাসনে,
ভক্তির উচ্ছ্বাসে গাঁথা লহ পূজা, মনোরমে
ভক্তির উচ্ছ্বাস-বীণা,
জলন্ত মরমে লীনা;
কি আছে, মা দয়াময়ি, দরিদ্রের ধরাতলে,
যাহা দিয়া পূজিব মা ও চরণ শ্রীকমলে!

১০

আশৈশব হইতে মা সঞ্চিত নয়ন-জল,
সেই জলে আমরণ পূজিব চরণ-তল;
কৃতান্তের কাল-অসি,
মরম ভিতরে পশি,
যে আঘাতে কাটিয়াছে হৃদয়ের প্রতি স্তরে,
শুখাইবে সেই ক্ষত আর কি অবনী 'পরে?

(মালতীমালা, ১৮৮৯)

যামিনীর প্রতি

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী

১

কোথা যাও অয়ি নিশি শ্যামলবরণে!
খুলিয়া ললাটমণি,
হিমাংশু রজতখনি;
যেও না যেও না দেবি মিনতি চরণে।

২

উঠিলে সরোজনাথ পূরব গগনে,
সুখের প্রভাত এলে,
এ আনন্দ যাবে চলে,
সুখপ্রদায়িনী এই যামিনীর সনে।

৩

তুমি নিশি দয়াময়ী পার্থিব ভুবনে ;
এলে তুমি বিনোদিনী
কত পতি-সোহাগিনী,
বসায় জীবননাথে হৃদয়-আসনে।

৪

অয়ি নিশি! একদিন তোমারি কৃপায়,
মনোদুঃখ নিরন্তর,
বিরহেতে দর দর,
রেখেছিনু বক্ষঃস্থলে প্রেম-প্রতিমায়।

৫

অয়ি নিশি তমস্বিনী, প্রণয়দায়িনী!
দিনেক হৃদয় যদি,
জুড়াইলে নিরবধি,
আজি কেন তবে তুমি কৃতান্ত-রূপিণী?

৬

যেও না রজনী তবে সুশ্যামা সুন্দরী!
ফুলময়ী যামিনী রে,
স্থির প্রবাহিনী-নীরে,
তুলো না আবার দেবি চপল-লহরী।

৭

ডুবো না অস্তিমাচলে, দেব শশধর!
সুনীল আসনে বসি,
হাস মৃদু তুমি শশী,
হাসাইয়া কুমুদীরে, বিশ্ব-চরাচর!

৮

অয়ি শশী, কতদিন প্রাসাদশিখরে,
হেরি তোমা সুগগনে,
বসিতাম নিরাসনে,
দুইজনে বিকচিত সপ্রেম অন্তরে।

৯

দেখিতাম, খেলাইত দূর সরো-জলে
চন্দ্রমা সলিল সনে,
কিন্তু তুমি মনোরমে,
দেখাইতে কত চন্দ্র বদন অমলে।

১০

বিহরিত নৈশানিল, শান্ত, সুকোমল,
কাঁপাইয়া পত্রদল,
নবলতা অবিরল,
কাঁপায়ে চিকুরজাল, বিমুক্ত অঞ্চল।

১১

থাকিবে কি এ জীবন সে সুখ বিহনে ?
লো নিশি! চরণে ধরে, —
কাতরে মিনতি করে,
যেও না যেও না দেবি ত্বরিত গমনে।

(বিনোদমালা, ১৮৭৮)

সন্ধ্যা

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী

উজলি গগন-পাত,
অস্ত যায় দিননাথ,
সোনার কিরীটখানি ধীরে ধীরে খুলিছে

দলে দলে দিগঙ্গনে,
চারু রূপজ্যোতিঃ সনে,
সুনীল আঁচলে কত সৌদামিনী বাঁধিছে।
তরুর শিখরে মরি!
কিরণ-কিরীট পরি'—
কচি কচি নব দল সন্ধ্যানিলে দুলিছে।
কলকণ্ঠ কোকিলায়,
পঞ্চমে ঝঙ্কারি গায়;
কাকলী-লহরী-লীলা সমীরণে ভাসিছে।
চুম্বি' স্ফুট মল্লিকারে,
অচল সৌরভ-ভারে,
মন্থরে দক্ষিণ শীত গন্ধবহ বহিছে।
স্বর্ণ-জ্যোতিঃ-কিরীটিনী,
ম্লান মুখে বিষাদিনী,—
ভানু-বিলাসিনী দিবা অন্ধকারে ডুবিছে
পরিয়া নবমী শশী—
ললাটে, উজলি দিশি
অমৃতমালিনী সন্ধ্যা ধরাতলে নামিছে।

(সন্ধ্যামণি, ১৯২৬)

শারদ-জ্যোৎস্নায়

স্বর্ণকুমারী দেবী

শরতের হিম জ্যোছনায়
নিশীথিনী আকুল নয়নে চায়,
বহুদিন পরে যেন পেয়েছে প্রণয়ী জনে
অশ্রুর লহরী মাখা সুখের আলোক ভায়!

বসন্তের প্রথম বাতাস—
সুখের মাঝারে যথা জাগায় হুতাশ,—
প্রাণ কেঁদে ওঠে হেরি নিশার ও ম্লানহাসি,
হারান স্মৃতির ছায়া বেড়ায় সমুখে ভাসি।
ও ছায়া কাহার ছায়া? ও মূরতি কার মায়া?
চিনিতে পারিনে যেন চিনি চিনি যত করি!
আকুল ব্যাকুল প্রাণ ধরিবারে আগুয়ান,
যতই ধরিতে যাই ধীরে ধীরে যায় সরি!
বড় যেন আপনার ছিল রে সে এ জনার!
আজ কি ভাবিছে হেথা পাবেনা আশ্রয়?
কাছে এসে তাই ফিরে পর ভেবে যায় ফিরে?
ফুটন্ত জোছনা-হাসি করি অশ্রুময়!
তাই প্রাণ কেঁদে ওঠে বুঝি এ সময়!

(কবিতা ও গান, ১৮৯৫)

বসন্ত-জ্যোৎস্নায়

স্বর্ণকুমারী দেবী

জোছনা-হসিত নিশা, বসন্ত-পূরিত দিশা,
প্রকৃতি-নয়নে ঘুম-ঘোর;
কুসুম-সুবাস-হিয়া উঠিতেছে উছলিয়া,
চাঁদ পানে চেয়ে ভাবভোর!
উদাস মলয় বায় আনমনে বহে যায়,
প্রাণে মেশে প্রাণের পিয়াস;
সে মধু পরশ লাগে, তটিনী চমকি জাগে,
ধীরে বহে সুখের নিশ্বাস।

উপকূলে তরুগণ নেহারিয়ে কি স্বপন
কে জানে হরষে মাতোয়ারা ;
সুনীল অম্বর পাশে তারাটি মুচকি হাসে,
কোথা থেকে বহে গীতধারা !
মধুর স্বপন-বেশ, মধুর স্বপন-দেশ,
সঙ্গীতের মধুর উচ্ছ্বাস ;
বিহ্বল চাঁদিনী নিশি, বিহ্বল বাসন্তী দিশি,
প্রাণে জাগে আকুল পিয়াস !

(কবিতা ও গান, ১৮৯৫)

শ্রাবণ

স্বর্ণকুমারী দেবী

সখি, নব শ্রাবণ মাস !
জলদ-ঘনঘটা, দিবসে সাঁঝছটা,
ঝুপ ঝুপ ঝরিছে আকাশ !
ঝিমিকি ঝম ঝম, নিনাদ মনোরম,
মুহুর্মুহু দামিনী-আভাস !
পবন বহে মাতি, তুহিন-কণাভাতি
দিকে দিকে রজত উচ্ছ্বাস !
উছলে সরোবর, পত্র মরমর—
কম্পে থর থর পান্থ নিরাশ !
যুবতী-যুবাজনা, পরম প্রীতমনা,
দুঁহু দোঁহে বাঁধা ভুজপাশ ।
বিরহে যাপি যামী, ঘুমায়ে ছিনু আমি,
স্বপনেতে মিলন-উল্লাস !
সহসা বজ্রপাত কড়াকড় নিনাদ
কাঁপি উঠি, হৃদয়ে তরাস !

নয়ন মেলি চাই, কোথায় কেহ নাই,
উথলিত আকুল নিশ্বাস !
আমার বঁধুয়া পরবাস !

(কবিতা ও গান, ১৮৯৫)

শ্রাবণে

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

বিজন গৃহে একা, মেঘের ছায়ে ভোর,
অলস-মুকুলিত, নয়নে ঘুম ঘোর ।—
পূর্ণিমা নিশি আজি, আবৃত ঘননীলে,
কখন কিছু সরে—ঝলকি রূপ ঝলে ।
বিমুক্ত বাতায়ন—সম্মুখে শেজখানি,
কোমল আলো মুখে, বুলায়ে যায় পাণি ;
মানস-গৃহে মম, শুধু সে আমি একা,
বিমল হৃদিতল, বিহীন-ছায়া-রেখা ।
কখন গেছে ঘুমে, মুদিয়া আঁখি দুটি,
চেতনা চুপে চুপে, কখন নেছে ছুটি,
মুদিত আঁখিদ্বার, নিজন রুদ্ধ ঘরে,
জানি না, এসেছিল, কেমন পথ ধ'রে !
আবদ্ধ গৃহদ্বার, শিথিল নহে খিল,
প্রবেশপথ কোথা ছিল না এক তিল ।
নীরবে গেয়ে গেছে কি গীত কাণে কাণে,
তাহারি সুররেশ—জাগিয়া বাজে প্রাণে !
মুদিত আঁখিপানে, কি ক'রে গেছে চেয়ে,
কোমল ঘুম ঘোর ব্যাপিয়া সারা হিয়ে !
কি মোহে মেখে গেছে ঘুমন্ত আঁখি দুটি,
গানের মত মোর প্রাণে কি উঠে ফুটি !

(শিখা, ১৮৯৬)

সন্ধ্যায়

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

উজ্জ্বল সীমন্ত-মণি শোভিত শিরসে,
ধীরে ধীরে মৃদু পদে সন্ধ্যা নেমে আসে ;
নিবিড়-তিমির-কেশ-চুম্বিত-চরণা,
ধূসর অম্বরাবৃতা আনত-নয়না,
আরক্ত চরণ-রাগ পশ্চিম গগনে
সুধীরে মিলায়ে যায় ;—ফিরে গৃহ পানে
শ্যামল প্রান্তর হ'তে শ্রান্ত গাভীগুলি।
পরিব্যাপ্ত গ্রামপথে উত্থিত গো-ধূলি।
জ্বলে উঠে একে একে প্রাসাদের আঁখি
প্রদীপ্ত গবাক্ষ পথে ;—করে ডাকাডাকি
দিকে দিকে শত শঙ্খ মঙ্গল গম্ভীরে ;—
ত্রস্তগতি নভশ্চর গৃহে যায় ফিরে,
দিক্ বিদিক্ হ'তে সবে কুলায়ে আপন—
সারা দিবসের কাজ করে সমাপন।
গৃহে গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বালে কুলাঙ্গনা,
বেজে ওঠে আরতির মঙ্গল বাজনা।
কুটীরেতে কুণ্ডলিত উঠে ধূমরেখা ;
সুদূরে মিলায়ে আসে দিগন্তের রেখা !
হে নর, জীবন-যুদ্ধ ক'রে সমাপন
স্থির হও ক্ষণতরে ;—কর দরশন,
প্রদীপ্ত যৌবন-গর্ব খসে ধীরে ধীরে,
ডুবিছে কেমনে ধরা গভীর তিমিরে !
পশিল দিবস এক কাল-সিন্ধুনীরে,
কোন্ কার্য দিলে ওর দুটি কর ভ'রে,
অতীতের কোষাগারে কি হলো সঞ্চয় ?
ভাব শুধু মুহূর্তেক ;—বেশী কিছু নয়।

প্রতিদিন ঝরে পড়ে জীবনের কণা,
রহিল অপূর্ণ কত সমুচ্চ বাসনা ;
কি ব্যথা জাগায়ে তুলে কোন্ বিফলতা ?
কত দূরে নিয়ে যায় সান্ধ্য নীরবতা !

(শিখা, ১৮৯৬)

ভাদরে

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

এ নয় গো আষাঢ়ের প্রথম দিবস,
নব নীল মেঘখণ্ড আকাশের গায়,—
ক্রীড়ারত মত্ত করী সম না দেখায়।
এ ভরা ভাদর দিন, আচ্ছন্ন বাদরে,
ঘননীল-মেঘমালা-আবৃত আকাশ ;
ঘন গাঢ় শ্যামলিমা, কাননে প্রান্তরে ;—
তরল-কুয়াসাব্যাপ্ত বিরহী-নিশ্বাস।
যেন কেঁদে উড়িতেছে কাহারে চাহিয়া,
শত শত বিরহীর বাষ্পময় হিয়া !
অবিশ্রান্ত বর্ষণার্দ্র রুদ্ধ সৌধাবলী,
কেশসংস্কার-ধূপে নয় সুরভিত,
পারাবার মাঝে যেন শৈল শির তুলি ;—
যেন কোন মন্ত্রবলে জগত স্তিমিত।
বন-নদী-তীরে ক্লান্তা কুসুমচয়নে,
ফিরে না ক' পুষ্পলাবী কামিনীর কুল,
রুদ্ধ গৃহে রুদ্যমানা বরিহা দুর্দিনে,
নব-অশ্রু-কণ-সিক্ত হৃদয়-মুকুল।
অবিশ্রান্ত বরষণ নয়নের নীর,
শোকাচ্ছন্ন মুখচ্ছবি সারা ধরণীর।

কোথা মধুকরপদ্মা কটাক্ষকুশলা ?
নাহি জনপদবধূ মুগ্ধ-বিলোকন ।
কোথা উজ্জয়িনী-রামা অপাঙ্গ-বিলোলা,
কনক-নিকষ-স্নিগ্ধ বিদ্যুৎ-স্ফুরণ ?
নাহি ইথে আষাঢ়ের বিভব সুন্দর,
গ্রাম-বৃদ্ধ-উদয়ন-গল্প মনোহর ।
শুধু স্তূপীকৃত ঘনীভূত বৃহৎ অতীত
করিয়া কেবল রুদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটন,
শত বিরহীর হিয়া স্মিরিতি-মথিত,
কোটী অশ্রুসিক্ত আঁখি নীরবে মগন !

(শিখা, ১৮৯৬)

জলধি

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

এ ঘোর আবেগ-রাশি অর্পিয়া তোমার বুকে
নিশ্চিন্ত আছেন যিনি গভীর সুষুপ্তি-সুখে,—
তাঁরে কি জাগাতে তব এ গুরু-গর্জন-গান ?
চিরদিন চিররাত্রি নাহি তিল অবসান !
উদ্গীরিত ফেনরাশি যেন কার্পাসের মেলা,
আছাড়িয়া ক্ষোভে রোষে আস্ফালিয়া ভাঙ্গো বেলা ;
উত্তাল তরঙ্গরাশি ছুটে এসে মাথা কুটে'
নিষ্ফল আক্রোশে ফুলি' শৈলপাদে পড়ে লুটে ।
অচল অটল গিরি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া,
গর্জনে ক্রন্দনে শত গলে নাক' বিন্দু হিয়া !
দুরন্ত বালিকা যেন হস্ত পদ আছাড়িয়া
কভু কাঁদ, কভু হাস, কভু পড় লুটাইয়া !
অটল ভূধর স্থির,—স্থবির জনক সম
অকম্পিত ; দেখে চেয়ে মনোরম পরাক্রম ।

প্রশান্ত মাতার সম ও তব উৎপাত-খেলা
অবিরাম অবিশ্রাম সহিছে জননী-বেলা !
কিবা তুমি উন্মাদিনী,—কে কৈল পাগল তোরে ?
প্রশান্ত গম্ভীর হিয়া কে দিল চঞ্চল ক'রে ?
সুনীল দিগন্ত ওই সাদরে বেষ্টিয়া হিয়া
দিয়াছে সুনীল হৃদে নীল হৃদি মিশাইয়া।
তবু তুমি উন্মাদিনী ! কি চাও—কাহারে পেতে ?
সুনীল অঞ্চলে তোর শিশু রবি উঠে প্রাতে—
প্রদানে কিরণ-রাশি ; পুলকে জগত ভোর ;
তাই মর মাথা কুটে'—ধরণী সপত্নী তোর !
ছুটে এস' গ্রাসিবারে শত শত ফণা তুলি'।
সপত্নী-বিদ্বেষে শেষে উর্ম্মিলে ! উন্মত্ত হ'লি !
কিবা, আজো দেবাসুরে মন্থন করিছে তোরে ;
প্রোথিত মন্থন-দণ্ড নীলগিরি—নীল-নীরে ;—
তাহা উত্থিত ঘর্ঘর ঘোর বিকীরিত ফেনোচ্ছল !
উন্মত্ত অধীর তাই প্রশান্ত সুনীল জল !
অমরে অমৃত দিলি,—নীলকণ্ঠে হলাহল ;
রত্নময়ী সুনীলে গো ! মানবে দিলি কি বল ?

(সিন্ধুগাথা, ১৯০৭)

বর্ষা-সঙ্গীত

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

কেন ঘন ঘোর মেঘে
এমন পরাণ মাতে ?
কি লেখা লিখেছে কে গো
সজল জলদ-পাতে !

শত বিরহীর হিয়া,
ওর মাঝে মিশাইয়া,
আপন গোপন ব্যথা
লুকায়ে দিয়েছে তাতে।
বিন্দু বিন্দু ঝর ঝর,
ওকি তার অশ্রুথর ?
তড়িৎ-চমক ওকি—
বাসনার বহ্নি তাতে ?
আর্দ্র এ শীতল বায়,
কেবা জাগে কে ঘুমায়,
মধুর স্বপন কারো,
নিমীলিত আঁখিপাতে ;
কি লেখা লিখেছে সে গো
সজল জলদ-পাতে।
কি লেখা লিখেছে সে গো,
ফুটে না উঠিছে ফুটি।
উদাসে হৃদয় শুধু ;
নীরে ভরে আঁখি দুটি—
যেন, জগৎ জড়িত করে,
নিবিড় বাহুর পাশে ;
শুধু, একাকী আকুল হিয়া
বিরহ-অকূলে ভাসে।

(শিখা, ১৮৯৬)

কামিনী

দেবেন্দ্রনাথ সেন

১

প্রাঙ্গণে ফুটেছ তুমি কামিনী সুন্দরি,
নিশিভোর না হইতে, ভাল করে না ফুটিতে,
কি ভাব-আবেশে ফুল যাও তুমি ঝরি ?
সত্য করি বল মোরে কামিনী সুন্দরি।

২

হায় রে তোমারি মত নারীর যৌবন।
ভাল করি না ফুটিতে, সুসৌরভ না ছুটিতে,
স্মৃতি-দর্পণের তলে হয় রে পতন ;
তাই কি কৌশলে ছলে করাও স্মরণ ?

৩

অথবা শিখাও তুমি বঙ্গ-কামিনীরে,
এইরূপে প্রেমাবেশে মুখ খুলি হেসে হেসে
মুখ-মধু ঢেলে দিতে পতির অধরে,
নিতি নব নব ভাবে তুষিতে আদরে।

৪

শোভিতেছ তুমি, সখি যথা এ প্রাঙ্গণে,
হেন ভাবে অন্যস্থানে মোহিয়া দর্শক-প্রাণে
শোভিবে না কভু তুমি ; বঙ্গকুলবালা,
গৃহের বাহিরে কভু হয় না উজলা।

৫

থাক, থাক, ফোট ফুল, থাক এইখানে ;
আবার যখন প্রিয়া তোর তলে দাঁড়াইয়া
তাকাইবে তোর পানে, প্রিয়সখী জ্ঞানে,
ঝরিয়া পড়িও ফুল তাহার আননে।

৬

প্রাঙ্গণে ফুটেছ তুমি কামিনী সুন্দরি,
নিশিভোর না হইতে, ভাল করে না ফুটিতে,
নিতি নিতি কেন ফুল যাও তুমি ঝরি ?
প্রিয়ারে কি শিক্ষা দাও কামিনী সুন্দরি ?

(ফুলবালা, ১৮৮০)

সূর্যমুখী

দেবেন্দ্রনাথ সেন

১

ঊর্ধ্বমুখে এক দৃষ্টে সহাস বদনে
কে তুমি রে ফুল ?
তপনের তাপে হায়, ধরণী পুড়িয়ে যায়,
তুমি কিন্তু ফুল ! তায় হও না আকুল ;
হাসি ধরে না যে ফুল !

২

জানি তোমা ভাল করে সূর্যমুখী তুমি
তপন-বাসনা ;
প্রেম অতি মহাবল, প্রেমের অদ্ভুত বল,
ভূতলে উদয় তব হয়েছে ললনা !
তাই করিতে ঘোষণা।

৩

যতই নিষ্ঠুর রবি করে গো দাহন
তোমায় সুমুখি ?
ততই আনন্দ চিতে কিরণ জড়াও হৃদে
প্রণয় ও মধুদানে হইতে বিমুখী
কভু তোমায় না দেখি !

৪

এইরূপে দেখিয়াছি বঙ্গের কামিনী
কত ঘরে ঘরে,
দয়াহীন পতি তারে বক্ষে পদাঘাত মারে,
"পায়ে কি লাগিল নাথ" সুধায় পতিরে ;
খেদে লাজে যাই মরে!

৫

পুরুষের রীতিমত তোমারো তপন
কভু স্থির নয়,
প্রেমদানে তুষ্ট করে নিত্য নব নলিনীরে,
এক বই অন্য রবি তোর কিন্তু নয় ;
তোর দেহ প্রেমময়।

৬

এইরূপে বঙ্গঘরে কুলীন-কামিনী
পতির চিন্তায়
চারু বপুঃ করে ক্ষয় ; পতি কিন্তু নিরদয়,
ভুলিয়াও একবার ফিরিয়া না চায়,
চির বিরহে ডুবায়।

৭

এইরূপে ঊর্ধ্বদিকে চাহিতেছ তুমি
তপন-সুন্দরি!
সন্ধ্যাকালে পতি তব হারাইবে এ বিভব,
তখনো তুষিবে তারে সতী ফুলেশ্বরি,
তব যৌবন-মাধুরী।

৮

এই শিক্ষা শিখিলাম তোর কাছে আজি
তপন-সুন্দরি!
নারী হয় প্রেমময়ী প্রেম তার বিশ্বজয়ী,
ভূধর যদ্যপি টলে টলে নাগো নারী ;
প্রেমে যাই বলিহারি!

(ফুলবালা, ১৮৮০)

অশোক-তরু

দেবেন্দ্রনাথ সেন

হে অশোক, কোন্ রাঙ্গা-চরণ-চুম্বনে
মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া হ'লি লালে-লাল ?
কোন্ দোল-পূর্ণিমায় নব-বৃন্দাবনে
সহর্ষে মাখিলি ফাগ্ প্রকৃতি-দুলাল ?
কোন চির-সধবার ব্রত-উদ্‌যাপনে
পাইলি বাসন্তী শাড়ী সিন্দূর-বরণ ?
কোন বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে
এক রাশি ব্রীড়া-হাসি করিলি চয়ন ?
বৃথা চেষ্টা—হায় ! এই অবনী-মাঝারে
কেহ নহে জাতিস্মর—তরু-জীব-প্রাণী !
পরাণে লাগিয়া ধাঁ ধাঁ আলোক-আঁধারে,
তরুও গিয়াছে ভুলে অশোক-কাহিনী !
শৈশবের আবছায়ে শিশুর 'দেয়ালা' ;
তেমতি, অশোক, তোর লালে-লাল খেলা !

(অশোকগুচ্ছ, ১৯০০)

লক্ষ্ণৌর আতা

দেবেন্দ্রনাথ সেন

চাহি না 'আনার'—যেন অভিমানে ক্রূর
আরক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ ব্রজসুন্দরীর !
চাহি নাক' 'সেউ'—যেন বিরহ-বিধুর
জানকীর চির-পাণ্ডু বদন-রুচির !

একটুকু রসে ভরা, চাহি না আঙুর,
সলজ্জ চুম্বন যেন নব বধূটির!
চাহি না 'গন্না'র স্বাদ! কঠিনে মধুর
প্রগাঢ় আলাপ যেন প্রৌঢ়-দম্পতীর!
দাও মোরে সেই জাতি সুবৃহৎ আতা
থাকিত যা নবাবের উদ্যানে ঝুলিয়া;
চঞ্চলা বেগম কোন্ হ'য়ে উল্লসিতা
ভাঙ্গিত; সে স্পর্শে হর্ষে যাইত ফাটিয়া!
অহো কি বিচিত্র মৃত্যু! আনন্দে গুমরি
যেত মরি রসিকার রসনা উপরি!

(অশোকগুচ্ছ, ১৯০০)

নববর্ষের প্রতি

দেবেন্দ্রনাথ সেন

১

অশোকের বীরবোলী দোলে তব কাণে!
বালার্কের ফোঁটা তব ভালে।
কে গো তুমি দাঁড়াইয়া, বিজন উদ্যানে?
হাসিরাশি নয়ন বিশালে!
পীত ধড়া, পীত তনু, অধরে বাঁশরী,—
কি গাহিছ, হে কুহকি, প্রাণ-মন হরি?

২

অপূর্ব এ বৃন্দাবন সৃজিলে নিমেষে,
কে গো তুমি দেব বংশীধারী!
মুরলীর গান-রসে আনন্দ-আবেশে,
মুগ্ধ শুব্ধ যত নরনারী!
আম্র-মুকুলের মালা দোলে তব গলে!
সুরভি-বকুল-বাস নিশ্বাসে উথলে!

৩

বংশীর সুধার ধারা গলি গলি পড়ে,—
কি হরষ, হে নব বরষ !
ধরিত্রীর মুখে আজি আনন্দ না ধরে,
পেয়ে তব মঙ্গল-পরশ !
শ্যামাঙ্গী, প্রবীণা ধনী, প্রাচীনা অবনী,
স্পর্শে তব, গৌরবর্ণা, তরুণা রমণী !

৪

অসাড় বাঙ্গালি-প্রাণ শ্লথ এ রুধির,
হে কুহকি, শুনি তব গান,
জাগিয়াছে সাধ প্রাণে, হয়ে ভক্তবীর,
সাধিবারে বঙ্গের কল্যাণ !
ভক্তি-দুর্গাপূজা-পর্বে, সুপুত্র সাজিয়া,
পূজিব রাতুল পদ, পুলকে মাতিয়া !

৫

হে বরষ, শত হস্তে উদ্যমের লাটি,
শত হস্তে উৎসাহের ঢাল,
সাজাইব পূজা-মঞ্চ, অতি পরিপাটী,
পরাভক্তি-দেবীর ছাবাল !
হে বরষ, তোমার ও বৈশাখী পরশে,
নিদ্রিত বঙ্গের প্রাণ জেগেছে হরষে !

(গোলাপগুচ্ছ, ১৯১২

চাঁদ

দেবেন্দ্রনাথ সেন

হে সুধাংশু, হেরি তব শোভা নিরুপম,
কি ভাব যে উথলে এ চিতে,
হায় গো বোবার সুখ-স্বপনের সম,
বাক্যে তাহা নারি প্রকাশিতে !
সুনীল সাগরে তুমি সোনার কমল !
আনন্দ-নির্ঝরে তুমি শোভার উৎপল !
তোমার সৌন্দর্য-গৃহে বসি, সুধাকর,
প্রাণ ভরি সুধা করি পান,
জ্বালা-তৃষ্ণা দূরে যায়, জুড়ায় অন্তর,—
ভরি যায় দাব-দগ্ধ প্রাণ
ফলফুলময় মরি তরু-লতিকায় !
হে কুহকি, কি কুহকে ভুলালে আমায় !
সাধে কি কুমুদী হাসে হেরিয়া তোমায় ?
শিখা-পুচ্ছে নাহি হেন রূপ !
সাধে কি হে স্বর্ণ-পদ্ম তোমারেই চায়,
শিশু-আঁখি-ভ্রমর লোলুপ ?
মার কোলে শিশু হাসে, বাহু পসারিয়া !
পিয়ে যাদু মনোসাধে, অমিয়া ছানিয়া !
কি আনন্দ ! জলধির তরঙ্গ যেমন,
নেচে উঠে হেরিয়া তোমায়,
চন্দ্র, তব চন্দ্রমুখ করিয়া দর্শন,
চিত্তে মোর হর্ষ উথলায় !
হে সুধাংশু, মম চিত্ত-বনরাজি-গায়,
তোমার ও জ্যোৎস্না-হাসি কি অপূর্ব ভায় ।

হে শশাঙ্ক, হেরি আজি ও মধুর রূপ,
কি বলিব ? কি বলিব আমি ?
আজি যেন হেরিতেছি—একি অপরূপ !
শতচন্দ্র ! অখিলের স্বামী
শতচন্দ্র রূপ ধরি, হাসিয়া হাসিয়া,
দেহ, মন, চিত্ত, বুদ্ধি লইল কাড়িয়া !
আহা কি মধুর রূপ ! এই বেশে, হরি,
এস নিত্য এ চিত্ত-আকাশে !
হৃদয়ের অন্ধকার গেল সব সরি,
তোমার ও লাবণ্য-প্রকাশে।
পাগল চকোর সম. উধাও হইয়া,
পিব আমি, পিব আমি, ও রূপ-অমিয়া !

(গোলাপগুচ্ছ, ১৯১২)

প্রকৃতি

দেবেন্দ্রনাথ সেন

১

চিরদিন, চিরদিন, রূপের পূজারি আমি,
রূপের পূজারি !
সারা সন্ধ্যা, সারা নিশি, রূপ-বৃন্দাবনে বসি,
হিন্দোলায় দোলে নারী, আনন্দে নেহারি।
অধরে রঙ্গের হাস, বিদ্যুতের পরকাশ,
কেশের তরঙ্গে নাচে নাগের কুমারী !
বাসন্তী ওড়োনা-সাজে, প্রকৃতি-রাধিকা রাজে,
চরণে ঘুঙ্ঘুর বাজে, আনন্দে ঝঙ্কারি,—
নগনা, দোলনা-কোলে, মগনা রাধিকা দোলে,
কবি-চিত্ত-কল্পনার অলকা উঘারি !

আমি সে অমৃত-বিষ, পান করি অহর্নিশ,
সংসারের ব্রজবনে বিপিন-বিহারী।
গীতের ঝঙ্কারে তোর, মাধুর্যের নাহি ওর,
কি যাদু মাখান আছে, যাই বলিহারি,
(তোর) কঙ্কণ-তাড়না-মাঝে, অয়ি বরনারি।

২

অয়ি বরনারি,
চিরদিন, চিরদিন, তুহারি পূজারি আমি,
তুহারি পূজারি।
ত্রিদিব-আনন্দময়ী, ষোড়শী রূপসী তুই,
তোরে হেরি দুঃস্বপন গিয়াছি বিসারি।
দুষ্ট ফণী পেয়ে ক্ষোভ, হলাহল মোহ লোভ
ভুলিয়াছে। মুক্ত কর, ছিলাম প্রসারি,—
কি আশ্চর্য। একি হেরি, নয়ন বিস্ফারি?
জল্ জল্ দীপ্তি ভায়। দু'চক্ষু ঝলসি যায়,—
মুগ্ধ ফণী দিল মোরে মাণিক্য তাহারি
আঁধার হইল দূর, বিশ্বে এল সুরপুর
উর্বশী মেনকা রম্ভা ফুল্ল কুলনারী,
যৌবনের ফুলদানী শোভে সারি সারি।

৩

সঙ্গলিপ্সা, ভোগ-ইচ্ছা, মায়া-মোহ সব,—
তুমি মম ঐশ্বর্য-বিভব।
অকূলে পেয়েছি কূল, তুমি এবে অনুকূল
জলধি-গর্জন এবে হয়েছে নীরব।
প্রশান্ত এ বেলা মাঝে, তোমার সুমূর্তি রাজে,
পঙ্কজবাসিনী যেন বারিধি-কুমারী।
কর দেবী এ আশীষ,— মহানন্দে, অহর্নিশ,
হে কবি-চির-বাঞ্ছিত, তোমারি, তোমারি,
পারি যেন হইবারে প্রকৃত পূজারি!

(গোলাপগুচ্ছ, ১৯১২)

রজনীগন্ধা

দেবেন্দ্রনাথ সেন

১

না আসিতে কাছে ফুল মাথা গেল ধরে :
কুসুমকামিনী সব মৃত্যু করে অনুভব,
যাই হেন গুণের বালাই লয়ে মরে !
হবে না চেনাতে আর চিনিয়াছি তোরে ।

২

হায় এ পৃথিবী 'পরে গুণের বিকার
বড়ই কদর্য হয়, তিক্ত হয় অতিশয়,
অধিক পাকিলে দেব-ফল সহকার
হয় যথা আঁখি-শূল কীটের আগার ।

৩

দেখি যবে সভামধ্যে অধিক বাচাল,
অনর্গল স্রোত বয় কার সাধ্য কথা কয়,
তোরে ফুল মনে হয় হেরি সে জঞ্জাল ;
গুণের বিকার ফুল হয় বড় কাল ।

৪

দুঃখী বাঙ্গালীর পক্ষে সুখের রজনী !
মসীব সলিলে ভেসে সারাদিন খেটে এসে,
পায় যদি নিশিগন্ধা সঙ্গের সঙ্গিনী ;
আঁধার জীবন তার আঁধার অবনী ।

৫

না আসিতে কাছে ফুল মাথা গেল ধরে ;
কুসুমকামিনী সব মৃত্যু করে অনুভব,
যাই হেন গুণের বালাই লয়ে মরে !
হবে না চেনাতে আর চিনিয়াছি তোরে ।

(ফুলবালা, ১৮৮০)

মধ্যাহ্নে

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

শরতের দ্বিপ্রহরে সুধীর সমীর-পরে
জল-ঝরা শাদা শাদা মেঘ উড়ে যায় ;
ভাবি, একদৃষ্টে চেয়ে— যদি ঊর্ধ্ব পথ বেয়ে
শুভ্র অনাসক্ত প্রাণ অভ্র ভেদি ধায় !
ঝরে যায় অশ্রুজল, বেদনার কল-কল
অধীর বিদ্যুৎ-দীপ্তি, দৃপ্ত গরজন !
বাসনা-বন্ধন ছিঁড়ে, স্নিগ্ধ নীলিমার নীরে
ধীরে ধীরে শূন্য ঘিরে করি সন্তরণ।
অতি শুদ্ধ বন-ভূমে ছায়া আছে শুয়ে ঘুমে,
সানুতলে সূর্যকর অলসে লুটায় ;
তুঙ্গ শৃঙ্গ-শিরে নীল অতি গাঢ়, অনাবিল ;
স্বগতের ধ্যান যেন জগৎ ফুটায়।
পাখা দিয়ে বিশ্ব জুড়ে, বসে আছে শৈল-চূড়ে
অতিকায় প্রশান্ততা ; শুদ্ধ চরাচর।
এড়াইয়ে দুঃখ শোক, স্বর্গ আর পরলোক,
স্থাবর জঙ্গম আজি অজর অমর।
মিলাইয়ে গেছে আধা— জল-ঝরা মেঘ শাদা
শরতের দ্বিপ্রহরে তুঙ্গ শৈল-গায়।
গাঢ় নীলে শাদা দাগ্ আরো মিলাইয়ে যাক্ ;
আমি যাই মিশে, ভেসে, সীমাহীনতায়।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ, আশা, বাসনার ভালবাসা,
ঝরে যাক্, মরে যাক্, আত্ম-বেদনায় !
চরণে বন্ধন নাই, পরাণে স্পন্দন নাই ;
নির্বাণে জাগিয়া থাকি স্থির চেতনায়।

(পঞ্চকমালা, ১৯১০)

শীতে বাসরে

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

শুষ্ক পত্র মর্ম্মরিয়া নিশ্বসিছে কাননে পবন,—
কোথা সে শারদ শ্যামলতা ?
কোথা সে বসন্তভুক্ত অতি স্নিগ্ধ ফুল্ল উপবন
পরিমলে কুসুমিত লতা ?
প্রকৃতির প্রফুল্লতা, সুখগাথা, লুকাল কোথায়
শীত-ক্লিষ্ট নিস্তব্ধ বিজনে ?
যৌবন গিয়াছে মরে, মর্ম্মভরা প্রেমের ব্যথায়,
জরা আজি বিচরে জীবনে।
আসিবে না সে যৌবন, ফিরে নিয়ে সুখ-উন্মাদনা ?
কেন তারে চাও তুমি কবি ?
শ্বসিওনা বহি বুকে সুষমার বিরহ-বেদনা,
ভোল সে কোমল শ্যাম-ছবি।
তীব্র দাহে কোথা তৃপ্তি ? ক্ষিপ্ততায় কোথা প্রফুল্লতা ?
বাঁধ আজি স্থিরতায় প্রাণ।
জলদ-গর্জ্জনে প্রাণে হানে ঘন দীপ্ত বিদ্যুল্লতা ;
কি লাভ, বিলাপে গাহি গান ?
দুঃখ শোকে নিপীড়িত, প্রপীড়িত শত অত্যাচারে,
ঘরে ঘরে কাঁদে নর নারী :
সুগতের মুক্তি-মন্ত্র শুনাইয়া শান্ত কর তারে
কাছে গিয়ে মোছ অশ্রুবারি।
উন্মনা কল্পনা নিয়ে, ওহে কবি, রচিয়োনা গান ;
দীপ্তি ওর-চঞ্চলতাটুক্।
কোরো না উন্মাদ তুমি ক্ষিপ্তস্বরে বিশ্বের পরাণ ;
বিলাস-লালসা নহে সুখ।

হোক্ শুষ্ক, কিম্বা পুষ্পে সুভূষিত যত তরুলতা,
শরত-বসন্ত-বর্ষা-শীতে ;—
চঞ্চল বাসনা সহ ঝরিয়া পড়ুক তরুণতা ;
আজি তায় দুঃখ নাই চিতে।
মেঘ-মুক্ত প্রশান্ততা দীপ্ত হোক্ প্রীতির কিরণে,
ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ উড়ে যাক্ ;
নবজন্ম লভি' প্রীতি,—স্বার্থের মরণে—
বক্ষ আর বিশ্ব জুড়ে থাক্

(পঙ্কমালা, ১৯১০)

শারদ প্রভাতে

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

১

গিরি বন, নদী রঞ্জিয়া রবি,
ফুটায় ধরায় সুহাসি।
হেরি সে ফুল্ল প্রভাতের ছবি
প্রবাসে চিত্ত উদাসী।
এ প্রবাস-বাসে মানস-নেত্রে
নেহারি তোমার বঙ্গ !
সমতল ভূমে ধান্যক্ষেত্রে
স্নিগ্ধ উজল অঙ্গ !

২

নাহিক এমন তটিনী তথায়
উপলে ত্বরিত-চরণা ;
ভূধর প্রান্তে তরুর ছায়ায়
নাচে না এমন ঝরণা।

নাহিক বঙ্গে নিবিড় বিজন
বিশাল বনের গরিমা ;
তবু প্রেমভরে করি গো পূজন
সে সুখ-শারদ-প্রতিমা ।

৩

ভূষিয়া পদ্মে কুমুদে অঙ্গ
সাজ গো সরসী বঙ্গে ;
কাদামাখা জলে তোল তরঙ্গ
বঙ্গ-পাবনী গঙ্গে !
দুলাও ধরণী, হরিৎ বসন,
গাহ বিহঙ্গ প্রভাতে ;
শেফালি-গন্ধে আমোদি ভবন
এস উৎসব ধরাতে ।

৪

আজি গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে
জাগেরে সুখ আনন্দ ;
হেথায় পবন, বহিয়ে আনরে—
দূর উৎসব-গন্ধ ।
রঞ্জি প্রবাস, ওগো কল্পনে
মানস-আলোক-শোভাতে,
বঙ্গ-মাধুরী এ দূর ভবনে
বিকাশ শারদ প্রভাতে ।

(পঞ্চকমালা, ১৯১০)

বর্ষাশেষে

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

বর্ষাশেষের ছত্রভঙ্গ মেঘের অঙ্গ রাঙ্গিয়ে ভোরে
সূর্য ছিল পাহাড়গুলোর পিছনে ;
দাঁড়িয়ে ছিল বনস্থলী আলোকিত পুরীর দোরে,
ঘন পাতার কাতার-বাঁধা বিজনে ;
স্বর্ণ-মেঘের পর্ণগুলির সুরঞ্জিত স্তরের মাঝে
ফুটেছিল নীরব নীলের মুগ্ধতা ;
শ্যামল বনের কোমলতার তরঙ্গিত ভাঁজে ভাঁজে
জড়িয়েছিল সেই নীলিমার শুদ্ধতা।
দাঁড়িয়ে দুটি ছেলে মেয়ে নদীর কূলে বালির চড়ায়,
উজল চোখে কিরণ প্রতিবিম্বিত ;
কুচ্‌কুচে সেই কাল গায়ে আলোর ধারা ল্লেসে গড়ায়,
মুক্ত কেশে বাতাস মৃদু কম্পিত।
নৌকাখানির পরে আমি— বালির বাঁধের তীরে তীরে
পড়েছিলাম প্রাণের পাখা ছড়িয়ে ;
ভেসে গেলাম দূরে দূরে বাঁকে বাঁকে ফিরে ঘুরে,
পাখার পালক আলোকেতে জড়িয়ে।
কোথায় গেল আলোর ঝরা মোহের শীকর ছিটিয়ে দিয়ে,
ফুটিয়ে হাসি সরল চারু নয়নে ?
কোথায় গেল ভোরের বাতাস ফুল্ল লঘু গন্ধ নিয়ে,
স্বপ্ন-তরুর নব-কুসুম-চয়নে ?
দাঁড়ের ঘায়ে কাল নদীর বিচলিত জলের পরে
জ্বলে শিখা-বাঁধা ধোঁয়ার সোনা কি ?
চম্‌কে ওঠে আলোর কণা মনের বিজন ছায়া-স্তরে,
আঁধার বনে যেন হাজার জোনাকি।

আবার কবে প্রভাত হবে সুপ্তি-সিন্ধুর স্তব্ধ নীরে
জাগরণের অরুণ কিরণ বিম্বিয়া ?
এই তটিনীর সেই কাননের, ওই আকাশের তীরে তীরে
ঝর্‌বে আলো শ্যামলতা চুম্বিয়া ?
এই জীবনের, সেই নয়নের, ওই ভুবনের উপর দিয়ে,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে আস্‌বে বয়ে মাধুরী ?
জমাট-বাঁধা দৃঢ় অচল— মৃত্যু-শিলা উজলিয়ে
জাগরণে জাগ্‌বে যাদুর চাতুরী ?

(হেঁয়ালি, ১৯১৫)

হিমাচলে

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

জলে শৈলে সূর্য-কিরণ-বিম্ব,
দলিত ছিন্ন কুজ্ঝটি ;
যেন তুষারে ধবলগিরির শৃঙ্গ—
ধেয়ান-মগ্ন ধূর্জটি ।
ঐ সানুর সোপান-মালার ঊর্ধ্বে
শৃঙ্গ-চরণ-রঞ্জিকা ;
শোভে অভ্র-সুষমা, যেন রে শুদ্ধা
গৌরকান্তি অম্বিকা ।
তথা অর্ধ-ধূসর ভূধর-খণ্ড
দাঁড়ায়ে প্রান্তে গৌরবে ;
যেন নন্দীর মত রুদ্র-প্রহরী
দলিছে চরণে রৌরবে !
সেথা শুদ্ধ চপল বাসনা মানসে,
হত লালসার উগ্রতা
রাজে মৌন মুক্ত শঙ্কর-পদে
তাপসীর চারু শুভ্রতা :

(হেঁয়ালি, ১৯১৫)

শিরীষ-কুসুম

মানকুমারী বসু

১

কেন আমি ভালবাসি শিরীষ-কুসুম ?
ধীরে ধীরে সোণামুখী
দেয় মধুমাখা উঁকি !
উষার সুরভি শ্বাস, বসন্তের ঘুম,
অমরার আলোকণা, শিরীষ-কুসুম !

২

শিরীষ-কুসুম এক লাজশীলা মেয়ে,
সদা জড়সড় থাকে,
আপনা লুকায়ে রাখে,
দেখে না তপন, শশী, আঁখি তুলি চেয়ে।
সে যেন কবির "কুন্দ" লাজে গেছে ছেয়ে।

৩

শিরীষ-কুসুম এক মোহিনী রাগিণী,
অতি মৃদু স্বরে বাঁধা,
মলয়-বাতাসে সাধা,
ছুঁইলে নুইয়া পড়ে, সদা আদরিণী,
সে যে উষা-বালিকার নবীন রাগিণী !

৪

শিরীষ-কুসুম বটে "ননীর পুতুল",
তার মত কোমলতা,
এ মরতে আর কোথা ?
কিবা তার উপমান, সবি দেখি ভুল !
পরশিলে অনুরাগে
গায়ে তার ব্যথা লাগে,
কেবা কোথা কচি মেয়ে, তার সমতুল,
কনক-লাবণ্যে হেন করে ঢুল-ঢুল ?

৫

শিরীষ-কুসুম মরি ! গত-সুখ-স্মৃতি—
বসতি হৃদয়-তলে,
বেঁচে থাকে অশ্রু-জলে,
মনে মনে "উপভোগ" এই তার রীতি !
সহে না আঁখির তাপ,
কে জানে কি অভিশাপ !—
চাহে না পরের কাছে সমাদর, প্রীতি,
শিরীষ-কুসুম যেন বিয়োগের স্মৃতি !

৬

বঙ্গের বালিকা বধূ শিরীষ-কুসুম—
সে গোলাপ, পদ্ম নয়,
নাহি দেয় পরিচয়,
চাহে না সপ্তমে চড়া সুযশের ধূম !
তার সে ঘোমটা মুখে,
মৃদু হাসি, ভরা সুখে,
আধ জাগরণ করে, আধ যায় ঘুম !
কে না ভালবাসে হেন শিরীষ-কুসুম ?

৭

শিরীষ-কুসুম কার ভাল নাহি লাগে ?
সদা স্নিগ্ধ শান্তরূপ,
মধুরতা অপরূপ !
কে না পূজে হৃদি-তলে প্রীতি-অনুরাগে ?
পরি' রাজরাণী-সাজ,
চাঁপা, গন্ধা, গন্ধরাজ,
প্রাণ করে ঝালাপালা, সুতীব্র সোহাগে,
শিরীষ-কুসুম, মোর তাই ভাল লাগে।

(কনকাঞ্জলি, ১৮৯৬)

বউ-কথা-কও পাখী

মানকুমারী বসু

১

এস এস আরো এস, আকাশের সখা !
দেখা আজি বহুদিন পরে,
সেই যে গিয়েছ চলে, আমি যেন একা,
উদাসীন প'ড়ে আছি ঘরে।

২

যতদিন খগবর, শুনি নাই কানে
তোমার সে মনোহর গীতি,
নিরালা নির্জন ছিল সমস্ত অবনী
কি যেন হারায়েছিল স্মৃতি !

৩

কারে যেন খুঁজিবারে যত কাছে যাই,
সে যে চলি যায় শতদূরে,
তপ্ত দীর্ঘশ্বাস সহ উপেক্ষা তাহার
রহে মোর হিয়াখানি পূরে।

৪

মিলনের কত হাসি জাগিত জগতে,
আমি শুধু হয়েছিনু পর,
কারে কভু দিতে নিতে পারি নাই কিছু
কারো সাথে বাঁধি নাই ঘর।

৫

অজ্ঞাতে শ্রবণ-যুগ থাকিত কেবল,
অই দূর নীলিমা আকাশে,
কখন আসিবে তুমি অমৃত ছুটায়ে,
পুষ্পরথে মলয় বাতাসে।

৬

সহসা বিকালে আজি শুনিনু শ্রবণে
অই চিরপরিচিত গান,—
"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া
আকুল করিল মোর প্রাণ !"

৭

কোন্ জন্মে কোন্ যুগে কে অভিমানিনী
ও হৃদয়ে দিয়েছিল ব্যথা,
প্রেমিক সাধক আজো স্বরগ-বীণায়
সাধিতেছ—"বউ কও কথা।"

৮

কিন্নরের কণ্ঠে বহে যে মধুর গীতি
সে অমিয় ছোটে তব তানে,
কত কথা—কারে যেন হয় নাই বলা,
সে অতৃপ্তি মাখা তোর গানে।

৯

প্রবাসী উদাসী যেই সতত একাকী
তুমি তারে আন হে সাধিয়া,
স্নিগ্ধ শান্ত গৃহ-তলে সবাকার সাথে
দাও তার পরাণ গাঁথিয়া।

১০

কতদিন গিয়েছে যে বহুদূরে চলি,
তুমি তারে জাগাও স্মরণে,
কত সোহাগের হাসি কত অভিমান,
উথলয়ে বিশুষ্ক জীবনে।

১১

তুমি যে শ্যামের বাঁশী যমুনার কূলে,
মরতের সুধা সঞ্জীবনী,
বিশ্বের সকল দৈন্য সকল হীনতা
ঘুচি যায় শুনিলে ও ধ্বনি !

১২

গাও পাখী, গাও সখা ভরিয়া আকাশ,
যাক্ গীতি মন্দাকিনী-তীরে,
যেথা যে গিয়েছে চলে—যুগ-যুগান্তর,
তোর ডাকে আসে কি সে ফিরে?

(বিভূতি, ১৯২৯)

প্রলয়

মানকুমারী বসু

দেবতা গো!
গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙিয়া চূরিয়া,
সহসা অসহ্য তাপে অবনীর হিয়া কাঁপে,
প্রাণে প্রাণে অগ্নিপিণ্ড উঠিছে জ্বলিয়া;
উত্তপ্ত জগৎ-ভার বহিতে না পারি আর,
বাসুকি সে লক্ষ ফণা ফেলে আছাড়িয়া—
লক্ষ মুখে রক্ত উঠে, লক্ষ শ্বাসে বহ্নি ছোটে,
লক্ষ ভালে কাল ঘাম উঠে উচ্ছ্বসিয়া—
বিশ্বের পঞ্জরগুলি, হ'ল বুঝি গুঁড়ি ধূলি,
হিমালয় কুমারিকা গেল যে মিশিয়া—
গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙ্গিয়া চূরিয়া!

দেবতা গো!
গেল যে তোমার সব ভাঙিয়া চূরিয়া,
গভীর গরজি সিন্ধু, পরশিছে রবি ইন্দু
উন্মত্ত তরঙ্গ ব্যোমে ফেলে যে গ্রাসিয়া!—
পাইয়া বিষম ত্রাস, আচ্ছাদি জলদ-বাস,
মার্ত্তণ্ড ঢাকিছে মুখ পশ্চিমে হেলিয়া।

বুঝি বা পাতালবাসী ফেন হয়ে আসে ভাসি,
তাদের সে অস্থি মজ্জা গিয়াছে ভাঙ্গিয়া,
বিচূর্ণ অর্ণব-যান আরোহী লইয়া !

দেবতা গো !
গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙ্গিয়া চূরিয়া—
বিশাল বিটপী-কূলে, উপাড়ি পড়িছে মূলে
লতা, গুল্ম, তৃণ ভয়ে পড়িছে ঢলিয়া ;
আকুল বিহঙ্গ দল, দাঁড়াইতে নাহি স্থল,
পরাণ বাঁচাতে চাহে আকাশে মিশিয়া ?
মহাকায় মহীধর জানিত না ভয় ডর,
সে বুঝি আছাড় খায় ভূতলে পড়িয়া।
ক্ষুদ্রতম মহত্তম, এবে যে গো সবি সম,
ডাকিছে কালান্ত কাল বিকট গর্জিয়া ;
উহু হু ! গেল যে সব ভাঙ্গিয়া চূরিয়া !

দেবতা গো !
গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙ্গিয়া চূরিয়া—
লোকালয়ে বাড়ী ঘর, কাঁপিতেছে থর থর,
পড়িছে প্রাসাদ-শির ভূতলে লুটিয়া :
বিবশা মা কাঁপি কাঁপি শিশুরে হৃদয়ে চাপি,
পলাইতে স্থান চাহে ধরণী ছাড়িয়া !—
সন্তান আতঙ্কভরে, মায়েরে জড়িয়ে ধরে,
স্থবির রাখিছে নেত্র করে আবরিয়া !
কেহ করে প্রাণায়াম, কেহ জপে ইষ্টনাম,
কেহ স্মরে প্রিয়মুখ "অন্তিম" জানিয়া !
মহামরণের তরে, সকলে প্রতীক্ষা করে,
আপনি আঁখির পাতা আসিছে মুদিয়া ;
কালান্তক মহাকাল, পাতিয়াছে মৃত্যু-জাল
মরণে মরণে দিবে ব্রহ্মাণ্ডে ছাইয়া !

এখনি যে হবে ধরা অনন্ত মরণে ভরা,
রাশি রাশি শব শুধু রহিবে পড়িয়া ;
আর কেহ জাগিবে না, আর কেহ কাঁদিবে না,
কেহ কারো আঁখিজল দিবে না মুছিয়া।

চিরলব্ধ সরবস্ব, মুহূর্তে হইবে ভস্ম,
জগতের ইতিহাস যাইবে ঘুচিয়া—
অনন্ত প্রলয়ে বিশ্ব বিচূর্ণ হইয়া!
কেন মা ধরিত্রি! হেন নিঠুর হইয়া
আজি এ সায়াহ্ন বেলা, খেলিছ ভীষণ খেলা
সত্যই করিবে স্নান জীব-রক্ত দিয়া?

তোমার স্নেহের বুকে, আশ্বাসে বিশ্বাসে সুখে
সকলে রয়েছে তাহা গেলে কি ভুলিয়া?
তুমি যে মা চিরদিন, বিরক্তি-বিষাদ-হীন?
"সর্বংসহা" নাম তব নিখিল যুড়িয়া!

মহাপাপে হোক পাপী, শত তাপে হোক তাপী,
স্বজনে করুক ঘৃণা চরণে দলিয়া,
তবু সে কোলের ছেলে, কবে মা দিয়াছে ফেলে,
তোমার মতন হেন পাষাণ হইয়া?

ঝড়-বৃষ্টি বজ্রাঘাত, অগণ্য বিপৎপাত,
সহে প্রাণী তব কোলে মুখ লুকাইয়া,
আজি যে দাঁড়াতে ঠাঁই, কোথাও তিলেক নাই
তুমি যে কোলের শিশু ফেলিছ ছুঁড়িয়া।
আমরা কোথায় যাব দেহ তা' বলিয়া?
একদিন—কতদিন গিয়াছে চলিয়া—

অসুরে বিনাশি রণে, বিজয়-উল্লাস মনে,
শ্যামা মা নাচিলা সাথে সখিগণে নিয়া;
সে দিনো এমনি হায়, বিশ্ব রসাতলে যায়—
ভয়ে দিলা ভূতনাথ হৃদয় পাতিয়া!—

আজিকে আবার তবে— তেমনি কি কিছু হবে—
মরিল অমর-রিপু সমরে পড়িয়া ?—
সে মহা-আনন্দ সুখে, অট্টহাসি হাসিমুখে,
নাচে মা প্রকৃতি শত করতালি দিয়া ?—
রাখিতে "ব্রহ্মাণ্ডটুক" দেবতা কি পেতে বুক
নিবারিবে এ যুগান্ত শাস্তি-সুধা দিয়া—
এই কি সে মহা "লাস্য" বিশ্ব বিপ্লাবিয়া ?
দেবতা গো !
যে হোক্ সে হোক্ তুমি দেখ গো চাহিয়া,
মৃত্যু করে উপহাস, সর্বব্যাপী সর্বনাশ
সত্যই তোমার বিশ্ব পড়ে উপাড়িয়া ।—
আমাদের কিসে ক্ষতি, তুমি অগতির গতি,
জীবনে মরণে দিবে কোল পসারিয়া—
কিন্তু তব বসুন্ধরা, অনন্ত সৌন্দর্যভরা
এতকাল এত করে রেখেছ পালিয়া,
আজি তা চলিল দূরে, অনন্ত ধ্বংসের পুরে
তুমিই কাঁদিবে দেব ! সে দৃশ্য দেখিয়া !—
শব রাশি স্তূপে স্তূপে, বহিবে পর্বতরূপে
অসহ্য মরণে বিশ্ব রহিবে মরিয়া—
তুমিই কাঁদিবে দেব ! সে দৃশ্য দেখিয়া !—
এত শ্রম স্নেহরাশি কি ফল এরূপে নাশি,
বিফলে ভাঙ্গিবে কেন এতটা গড়িয়া—
তাই তব পায়ে পড়ি—ভাঙ্গিও না লহ গড়ি,
উঠ গো করুণাসিন্ধো ? "মাভৈঃ !" ডাকিয়া—
মৃত্যুমুখে সৃষ্টি তব লহ বাঁচাইয়া !

(বিভূতি, ১৯২৪)
(ভয়ানক ভূমিকম্প উপলক্ষে লিখিত)

সন্ধ্যা

অক্ষয়কুমার বড়াল

ধীরে সুমেরুর শিরে আসে সন্ধ্যারাণী,
সুনীল দুকূলে ঢাকি ফুলতনুখানি।
তরল গুণ্ঠন-আড়ে
মুখশশী উঁকি মারে,
কম্পিত কঞ্চুলী-ধারে হৃদয়ের বাণী!
নব নীলোৎপল মত
লাজে দিঠি অবনত,
সম্ভ্রমে সঙ্কোচে কত বাধিছে চরণ!
পতির পবিত্র ঘরে
সতী পরবেশ করে—
হাতে সুবর্ণের দীপ, হৃদয়ে কম্পন।
নয়নে সুনীল তৃপ্তি—
ক্ষীরোদ-সমুদ্রে-দীপ্তি,
অধরে চন্দ্রিকা হাসি—বিজয়-বিশ্রাম;
নিশ্বাসে মলয়াবেগ,
অলকে অলক-মেঘ,
শুক্রতারা-সুবেশরে নৃত্য অভিরাম।
আসে ধনী আথিবিথি—
কপালে তারকা-সিঁথি,
সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু—দিনান্ত-তপন;
গুচ্ছে গুচ্ছে কাল চুলে
স্তব্ধ অন্ধকার দুলে,
অয়ন বসনাঞ্চলে কত না রতন!
গলে নীহারিকা-মালা,
করে সপ্ত-ঋষি বালা,
রাশিচক্র-মেখলায় কি ক্রীড়া-মঙ্গল!

জলদ চরণতলে
কান্দিছে মঞ্জীরচ্ছলে,
বনানী-বসন-প্রান্তে—চিত্র ঝলমল্।

অপূর্ব—অপূর্ব দৃশ্য,
সম্ভ্রমে প্রণমে বিশ্ব,
দেবতা আশীষছলে বরষে শিশির,
নদীমুখে কলগীতি,
সমুদ্র-হৃদয়ে স্ফীতি,
অগুরু চন্দনে ধূপে অলস সমীর।

ঘরে ঘরে দীপ জ্বলে,
পুলিনে তুলসীতলে,—
যেন শত চক্ষু মেলে হেরিছে ধরণী।

মন্দিরে মঙ্গলারতি,
বালা পূজে সন্ধ্যাসতী,
পুরনারী গলবস্ত্রে দেয় হুলুধ্বনি।

এস প্রিয়া, প্রাণাধিকা—
জীবন-হোমাগ্নি-শিখা!
দিবসের পাপ তাপ হোক্ হতমান।
ওই প্রেমে—প্রেমানন্দে,
ওই স্পর্শে—বাহুবন্ধে
আবার জাগুক—মনে আমি যে মহান্,
একেশ্বর, অদ্বিতীয় অনন্ত-প্রধান।

['সাহিত্য' ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৮৯৪]
(শান্ধ, ১৯১০)

শ্রাবণে

অক্ষয়কুমার বড়াল

সারাদিন একখানি জল-ভরা কালো মেঘ
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ ;
বসে' জানালার পাশে, সারাদিন আছি চেয়ে—
জীবনের আজি অবকাশ !
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, তরুগুলি হেলে-দোলে,
ফুলগুলি পড়েছে খসিয়া ;
লতাদের মাথাগুলি মাটিতে পড়েছে লুটি' ;
পাখীগুলি ভিজিছে বসিয়া।
কোথা সাড়া-শব্দ নাই, পথে লোক-জন নাই ;
হেথা-হোথা দাঁড়ায়েছে জল ;
ভিজা ঘাসঝাড় হ'তে লাফায় ফড়িঙ্গ কভু,
জলায় ডাকিছে ভেকদল।
চাতক ঝাড়িয়া পাখা, ডাকিয়া ফটিক-জল,
ছাড়ি' নীড়, উঠিছে আকাশে ;
কদম্ব-কেতকী-বাস কাঁপিছে বাতাসে ধীরে ;
গেছে ধরা ঢেকে' শ্যাম ঘাসে।
দীঘিটি গিয়াছে ভরে' সিঁড়িটি গিয়াছে ডুবে',
কাণায় কাণায় কাঁপে জল ;
বৃষ্টি-ভরে—বায়ু-ভরে নুয়ে পড়ে বার বার
আধ-ফোটা কুমুদ কমল।
তীরে নারিকেল-মূলে থল্-থল্ করে জল,
ডাহুক ডাহুকী কূলে ডাকে ;
সারি দিয়া মরালীরা ভাসিছে তুলিয়া গ্রীবা,
লুকাইছে কভু দাম-ঝাঁকে।

পাড়ে পাড়ে চকা চকী বসে' আছে দুটি দুটি ;
বলাকা মেঘের কোলে ভাসে ;
ক্বচিৎ গ্রামের বধূ শূন্য কুম্ভ ল'য়ে কাঁখে,
তরু-তল দিয়া ধীরে আসে।
ক্বচিৎ অশ্বত্থ-তলে ভিজিছে একটী গাভী,
টোকা মাথে যায় কোন চাষী ;
ক্বচিৎ মেঘের কোলে, মুমূর্ষুর হাসি সম,
চমকিছে বিজলীর হাসি।
মাঠে নবশ্যাম ক্ষেতে কচি কচি ধান-গাছ
মাথাগুলি জাগাইয়া আছে—
কোলে লুটিতেছে জল টল্-মল্ থল্ থল্,
বুকে বায়ু থর-থর নাচে।
সুদূরে মাঠের শেষে জমে' আছে অন্ধকার,
কোথা যেন হ'তেছে প্রলয় !
কুটীরে বসিয়া গৃহী পুত্র-পরিবার সহ
কত দুর্যোগের কথা কয়।
চেয়ে আছি শূন্য পানে, কোন কাজ হাতে নাই—
কোন কাজে নাহি বসে মন !
তন্দ্রা আছে, নিদ্রা নাই ; দেহ আছে, মন নাই ;
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন !
এই উঠি, এই বসি ; কেন উঠি, কেন বসি !
এই শুই, এই গান গাই।
কি গান—কাহার গান ! কি সুর !—কি ভাব তার !
ছিল কভু, আজ মনে নাই !

(প্রদীপ, ১৮৮৪)

অপরাহ্নে

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আবার বাঁধিনু তরী আর ঘাটে এসে,
ঝিকিমিকি বেলাটুকু উপনীত শেষে।
কলস লইয়া কাঁখে গ্রামবধূজন
গ্রামপথে হেসে দুলে করিছে গমন।
দুই ধারে শস্যক্ষেত্র লুটায় চরণে,
ফুলরেণু উড়ি' আসি' লাগিছে বদনে।
তুলিয়া বসনখানি জানুর উপরে
জলে নেমে আসে বধূ অবলীলাভরে ;
পূর্ণ করি' শূন্য কুম্ভ তুলে' লয় ধীরে,
চলে' যেতে বার বার দেখে ফিরে' ফিরে'
গৃহতটিনীর পানে সকরুণ চোখে—
কি জানি আবার দেখা না হয় এ লোকে।
তপোবনমৃগসম প্রকৃতির নীড়ে
চিরজন্ম বর্দ্ধিত সে এই নদীতীরে।

(শ্রাবণী, ১৮৯৭)

শ্রাবণী

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিত্য নব ছন্দোতরে চিত্ত ভরি' উঠে,
হে বরষা, তব ওই দীর্ণ বক্ষ টুটে'।
এত ধ্বনি, এত বর্ণ, এত মেঘখেলা,
এত পুষ্প, এত গন্ধ, লাবণ্যের মেলা,
এত নৃত্য, এত গান, এতেক ঝঙ্কার,
কোথা তব ছিল ঢাকা এত মনোভার

কি নির্ঝরে বাহিরিল মুক্ত নব প্রাণ,
কি প্রবাহে মুখরিল পূর্ণ কলতান ;
কি আলোকে, হে মায়াবি, তুলিলে ফুটায়ে
বিচিত্র এ চিত্রলেখা, কি ঘন ছায়ায়
নিবিড় করিয়া আন নিখিল সংসারে
অন্তরকুলায় মাঝে ; কি কুহক-হারে
হৃদয়ে হৃদয়ে কর চকিত-বন্ধন ;
কূল নাহি পেয়ে কোথা' আকুল যৌবন !

(শ্রাবণী, ১৮৯৭)

শারদীয় বোধন

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

বর্ষারে বিদায় দিয়ে শূন্যচিত্ত উদাস আকাশ
ধরি অভিনব মূর্তি, নবনীল পরি বেশ-বাস
আহ্বানিল কারে !
দিগ্বধূরা মুছি আঁখি, নীলাম্বরে তনু ঢাকি
নমিল তাঁহারে।
উদিলা শরৎ-লক্ষ্মী আপনার প্রফুল্ল প্রভাবে
বিশ্বের দুয়ারে !
কূলগ্রাসী নদীজল নেমে গেল পাদপদ্ম চুমি ;
ফুলে ফুলে বিরচিয়া পাতি দিল তাঁরে বনভূমি
হৃদয়-আসন ;
পাখীরা আবেগভরে ছুটিল ঘোষণা করে'
শুভ আগমন ;
হরিৎ শস্যের ক্ষেত্র জানাইল নত করি শির
নীরব বোধন !

মহেন্দ্রের মায়াধনু ঝলসিল অমরাপ্রাঙ্গণে ;
লাঞ্ছিত সুধাংশু পুন শোভিলেন রাজ-সিংহাসনে
কিরীট-কুণ্ডলে ;
জাগি লক্ষ তারা-বালা পরাইল মণিমালা
প্রকৃতি-কুন্তলে ;—
মধুর উৎসব এল শুভ শঙ্খ বাজারে মধুরে
গম্ভীর ভূতলে !

(গীতিকা, ১৯১৩)

আসন্ন-দৃশ্য

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

ওই যায়, চ'লে যায় অপরাহ্ণ বেলা ;
এখনি ভাঙ্গিয়া যাবে দিবসের খেলা।
অতি ধীর সন্তর্পণে ধরি অস্তপথ
চলিছে বিদায়-ক্ষুণ্ণ আলোকের রথ।
নিশার আবাস-যাত্রী রাজহংসগুলি
উৎসুক উন্মুখ পক্ষে আছে গ্রীবা তুলি।
মন্দ বায়ে নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষোপরে
ভাসিছে মন্থর তরী শুভ্র পালভরে।
ছায়াস্নিগ্ধ শ্যামগোষ্ঠে আরাম-শয়নে
গাভীরা রোমন্থ করে মুদিত নয়নে ;
হাট করি পল্লিপথে বোঝা রাখি শিরে,
মুখর জনতাশ্রেণী গৃহপানে ফিরে।
ভরা-ঘট ছলকিয়া ভিজায় আঁচল ;
শেষবার গ্রাম্যবধূ লয়ে যায় জল।

(গীতিকা, ১৯১৩)

রাত্রির প্রতি রজনীগন্ধা

বিনয়কুমারী ধর

একবার দেখিয়া যাও, ওগো মহা অন্ধকার !
পদতলে বনপ্রান্তে ফুরায় জীবন কার ?
গোপন মর্ম্মের কথা ক্ষণেক শুনিয়া যাও,
নামায়ে করুণ নেত্র মুমূর্ষুর মুখে চাও :
তুমি ত জান না কিছু কখন্ কে মুগ্ধ প্রাণে,
মেলিয়া মুকুল-আঁখি চেয়েছিল তোমা পানে ।
শোন তবে, জীবনের নবীন প্রদোষে যবে,
তরুণ শ্যামল মূর্ত্তি, দেখা দিলে সুনীরবে ;
অধরে লাগিয়াছিল হাসির চন্দ্রমারেখা ।
ললাটে পড়িয়াছিল সন্ধ্যার কনকলেখা !

আনন্দে উঠিনু ফুটে, তোমারি পূজার তরে
সমস্ত হৃদয় দেহ যৌবনে উঠিল ভরে ।
সব গন্ধ সব মধু তব তরে লয়ে বুকে,
অপূর্ব পুলকে আমি চাইনু তোমার মুখে ।
শত লক্ষ এই তারা-খচিত নীলিমাসনে
যখন বসিলে তুমি প্রশান্ত গম্ভীরাননে,
যোগ্য অধিপতি জেনে আপনাকে সমর্পিয়া
ধরণী চরণতলে পড়ে তব ঘুমাইয়া ।

আঁধারে খুলিয়া হিয়া অর্পিনু তোমার পায়
প্রেমের সৌরভ-ভার ; তখন বুঝিনি হায়
তুমি চেয়ে কার মুখ ! কোন্ পুষ্প-কুঁড়িটিরে,
নিভৃত হৃদয় দিয়ে যতনে রেখেছ ঘিরে ।
এখন সে নিজ নিধি দিয়ে প্রভাতের বুকে
ফেলিয়া শিশির অশ্রু না জানি চলেছ দুঃখে
কোন্ নিরুদ্দেশে তুমি । ফুরায় জীবন মোর ।

আসিছে আলোক অই আঁধার করিয়া ভোর,
পিকগান অলিতান হরষে হিল্লোল লয়ে
নবস্ফুট হৃদিতরে। তব অন্তরালে রয়ে
ফুটেছি, যেতেছি ম'রে কিছুই চাহিনা আর।
শেষ সুবাসিত শ্বাস প্রণয়ের উপহার,
দিতেছি অন্তিমে ; ওগো, এ নিশ্বাসে অনুক্ষণ,
স্নিগ্ধ রহে যেন তব শূন্য অন্ধকার মন।

('ভারতী', ১৮৯৩)

প্রেম

অন্নদাসুন্দরী ঘোষ

তুষার-মণ্ডিত শুভ্র হিমাদ্রি-অচল,
কিংবা ঘনঘটাজালে মূর্তি প্রকৃতির ;
নিরূর্মি সাগরবক্ষ, ধীর অচঞ্চল,
ধ্যানমগ্ন তাপসের মূরতি গম্ভীর !
অথবা নিরুদ্ধবায় বিটপিস্তম্ভন,
উদার সে অভ্রভালে তারকা-নিকর,
শান্ত ছায়াপথ—কবি-মানসমোহন !
প্রশান্ত চন্দ্রিমা-হাসি স্নিগ্ধ, মনোহর !
না পশে সেথানে কভু বিলাস-বাসনা।
ইন্দ্রিয়-তরঙ্গোচ্ছ্বাস মথে না জীবন।
নাহি আবিলতা, নাহি স্বার্থের কামনা,
আমার একত্ব শুধু প্রাণের সাধন !
অতীন্দ্রিয়, অচপল, সংসারের সার,
অনাবিল প্রেমচ্ছবি দৃশ্য চমৎকার।

[১৮৯৬-তে রচিত]

(কবিতাবলী, ১৯৪০)

মধ্যাহ্ন

সরোজকুমারী দেবী

কেমন হয়েছে প্রাণ অলস আবেশে।
যেন কি স্বপন ঘোর ছাইতেছে এসে।
বিষণ্ণ অবশ প্রাণে যেন কি করুণ তানে
বিশ্বের রাগিণী আজি যাইতেছে মিশে।

নিরালা বিজন এই স্তব্ধ দুপ্রহরে ;
একাকিনী বসে আছি বাতায়ন-পরে।
সমুখেতে লীলাময়ী নাচিছে তটিনী অই
ভরা বরষার প্রতি-তরঙ্গের ভরে।

চারিপাশে শৈলশৃঙ্গ পরশে গগন।
ঘনশ্যাম বৃক্ষলতা বনানী গহন।
বরষার অশ্রুজলে অঙ্কুরিত দলে দলে
শুষ্ক শস্পরাশি সব নবীন এখন।

ঘন পল্লবের তলে লুকাইয়া কায় ;
ঘুঘু দুটি সকাতরে কোন্ গান গায় !
কাঁপাইয়া ক্ষুদ্র শাখা নাড়িতেছে আর্দ্র পাখা,
বায়স কর্কশ কণ্ঠে হৃদয় কাঁপায়।

আমি চেয়ে সমুখের তটিনীর পানে।
কি যে মোহ বহে যায় কম্পিত পরাণে।
প্রতি শিলাখণ্ডে পড়ি কাঁপিছে চঞ্চল বারি
হিল্লোলে কল্লোল তার জাগায় সঘনে।

কবেকার স্বপ্ন আজি মনে হয় হায়।
এমনি আছিল সাধ এ ক্ষুদ্র হিয়ায়।
ক্ষুদ্র মোর গৃহ কোলে তটিনী বহিবে দুলে
নিবিড় বনানী যেন চারিদিকে ভায়।

আজ তটিনীর তীরে রয়েছি একেলা।
সুদীর্ঘ জীবন আজি কতই নিরালা।
এ প্রবাস যেন মোর দিতেছে যাতনা ঘোর
কি সুদীর্ঘ মনে হয় এ দুপুর বেলা।

অধীর হৃদয় আজি ঘুঘুর ও গানে,
তটিনী কি গাথা গায় আজি মধু তানে!
বহিছে শীতল বায় আমার হৃদয় হায়!
কি আবেশে অলসিত হয়েছে কে জানে!

(হাসি ও অশ্রু, ১৮৯৪)

নির্ঝরের আত্মসমর্পণ

সরলাবালা সরকার

অতি দূর পর্বত-শিখরে,
গিরি যেথা ঢাকে মেঘ জালে,
নিভৃত আঁধার গুহা কোলে
নির্ঝরিণী ছিল শিশুকালে,
দিন যত যায় দিনে দিনে,
কি যে চিন্তা উঠে তার মনে,
একা একা কুলু কুলু স্বরে,
গান গাহে কারে মনে করে,
গুহা আর ভাল নাহি লাগে,
না জানি সে যেতে চায় কোথা.
কে বুঝিবে নির্ঝরের ভাষা
কে বুঝিবে তার মর্ম-ব্যথা,
যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাসে,
নির্ঝরিণী ছুটে চলে আসে,

কোথা শিলা বাধা দেয় পথে,
ভুরু-ক্ষেপ নাহি তার তা'তে,
অনন্তের অজানা পথেতে
ক্ষুদ্র-প্রাণা এক নির্ঝরিণী
কোথা যেতে চায় নাহি জানি।
পর্বতের শিখর হইতে
ছুটে এসে শিলাময় পথে
ক্ষীণ স্রোতা নির্ঝরিণী এক
ঝাঁপায়ে পড়িল হ্রদ-স্রোতে।
চাহি দেখিল না আগু পিছু,
একবার ভাবিল না কিছু,
দূর হতে ছুটিয়া আসিয়ে,
একেবারে পড়িল ঝাঁপায়ে ;
যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাস,
যৌবনের মধু ভালবাসা,
যৌবনের গভীর আকাঙ্ক্ষা,
যৌবনের সুখ দুঃখ আশা,
সকলই মিশাইল, সে যে
হ্রদ-স্রোতে ঢালি তনুখানি,
সরলা সে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী !

(প্রবাহ, ১৯০৪)

সূর্যমুখী

পঙ্কজিনী বসু

চাহ নাকো প্রতিদান,
নাই মান, অভিমান,
মন কথা কয় বুঝি আঁখি সনে থাকি ?
নীরব প্রণয় তব একি সূর্যমুখী ?

কেমন নির্লজ্জ মেয়ে ;
তবু তার পানে চেয়ে
প্রত্যাখ্যান, অপমান সকল উপেখি,
"জগতের হিত তরে
মোর প্রিয় প্রাণ ধরে
কেমনে আমার হবে"—তাহাই ভাব কি ?
স্বরগের প্রেমরাশি একি সূর্যমুখী ?
মন খোলা, প্রাণ খোলা,
আপনা জগৎ ভোলা,
সুখ দুঃখ সর্বকালে হয়ে পূর্বমুখী
জানিনা কেমন করে
থেকে দূর দূরান্তরে
না পরশি, সাধ পুরে শুধুই নিরখি,
নিষ্কাম নিষ্ক্রিয় ব্রত একি সূর্যমুখী।

(স্মৃতিকণা, ১৯০২)

মধুময়

নিস্তারিণী দেবী

কিবা মধুময় হেরি আধ মুকুলিত ফুলে।
শিশির কি মধুময় চারু নব উষাকালে॥
মধুময় হয় শশী শারদীয় নভঃস্থলে ;
ধরিত্রী মাধুর্যে ভরা বসন্ত উদয় হলে ;
প্রভাতে মধুর ধ্বনি বিহগিনী কলরোলে।
প্রাবৃট্ মধুর রূপী বিজলী বারিদ-কোলে॥
নিশীথে বাঁশরী সুর হৃদি নাচে তালে-তালে।
শিশুর অস্ফুট রব পরাণে অমিয়া ঢালে॥

নবীন মিলনকালে, প্রেমে মধুরিমা ঝলে,
সোহাগিনী মধুমাখা করুণ নয়ন ভালে ॥
মধুর আধার হৃদি বিনয়ে সারল্য মিলে ॥
স্বরগ-মাধুরী ফুটে, পরদুঃখে প্রাণ গলে।
অনুপম অতুলন দুই ফোঁটা অশ্রুভালে ॥

(মনোজবা, ১৯০৪)

মধ্যাহ্নকালের সূর্য

বিরাজমোহিনী দাসী

১

মরি কি মধ্যাহ্নকালে প্রখর তপন !
হেরে হেন বোধ হয় যেন অগ্নিরাশি ,
ব্যাপিয়াছে চতুর্দিকে সবেগেতে আসি,
পোড়াইতে করেছে মনন ॥

২

পান্থগণ সে তাপেতে হইয়া তাপিত।
নাহি চলে পদ যেন জ্ঞানহীন-প্রায়,
অবিরত স্বেদবারি বহিতেছে গায়,
সঘনে ধাইছে বৃক্ষছায়া সন্নিহিত ॥

৩

পশুগণ অগণন সে তপ্ত তাপেতে,
ক্ষুধায় আকুল, তবু নাহি কাতরায়,
থাকে মৃত্যুবৎ পড়ি বৃক্ষের তলায় ;
রহে সুপ্তভাবে কত গিরি-গহ্বরেতে ॥

৪

এ তাপে বিহঙ্গদল চঞ্চল হইয়া
রহিতে না পারে স্থির হয়ে তরু 'পরে,
ব্যাকুল হইয়া ভুলি নিজ মধুস্বরে,
পত্রের আড়ালে রহে নিস্তব্ধ হইয়া ॥

৫

বৃক্ষহীন ক্ষেত্রমাঝে দুঃখী কৃষি-চয়।
প্রচণ্ড তপন-তাপ সহি' অবিরত,
ব্যস্ত চিত্তে আপন কার্যেতে আছে রত ;
তা'দের সে দুঃখ ভাবি হয় দুখোদয় ॥

৬

হে প্রচণ্ড দিবাকর, তব এ কিরণ।
সদাকাল সমভাবে রহি এ প্রকারে,
পারে কি সকল জীবে দগ্ধ করিবারে ?
জানিহ সম্ভব তাহা নহে কদাচন।

(কবিতাহার, ১৮৭৩)

পঞ্চম খণ্ড

বিষাদ-কবিতা

আত্মবিলাপ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

না বুঝিলে সারমর্ম হায় হায় হায় রে।

কে আমার আমি কার, আমার কে আছে আর,
যত দেখ আপনার, ভ্রমমাত্র তায় রে॥

আমার আত্মীয় কই, আত্মার আত্মীয় কই,
আত্মার আত্মীয় নই, আত্মা কই কায় রে॥

ইন্দ্রিয় যাহার বশ, ছোটে যশ দিক্ দশ,
পরম পীযূষ-রস, সুখে সেই খায় রে॥

নিজ নাভি-পদ্ম-গন্ধে, মৃগকুল ঘোর দ্বন্দ্বে,
যেমন মনের ধন্দে নানা দিকে ধায় রে॥

সেইরূপ অস্মদ্দেশ, করে রত্ন তাহে দ্বেষ,
ভ্রমিতেছ দেশ দেশ, অবোধের প্রায় রে॥

কেমন তোমার ভ্রম, মিছামিছি কেন ভ্রম,
করিছ যে পরিক্রম, ফল নাহি তায় রে।

আর কেন কর হেলা, ভাঙ্গিল দেহের খেলা,
অতএব এই বেলা ভাবহ উপায় রে॥

সংসার বিস্তার হাট, দেখিতে সুন্দর ঠাট,
নাটুয়ার ঘোর নাট সদাই নাচায় রে॥

ঠাট-নাট বুঝে যারা, নেচে নাহি হয় সারা,
পুতুল না চায় তারা পুতুল নাচায় রে॥

এ ব্রহ্মাণ্ড যার ভাণ্ড, কে বুঝে তাহার কাণ্ড,
হাটেতে ভাঙ্গিয়া ভাণ্ড কি খেলা খেলায় রে।

করিয়া কামনা-কল্প, ফাঁদিলে লোভের গল্প,
সেই গল্প নহে অল্প, নাহি তার সায় রে॥

বারবার ফিরে আসা, আসায় বাড়ায় আশা,
বাঁধিলে ভোগের বাসা, কর্মভোগ তায় রে।
বিষ ভেবে মকরন্দ, বিষয়ে করিছ দ্বন্দ্ব,
দীপধারী নিজে অন্ধ, দেখিতে না পায় রে॥
না জানিয়া আপনারে, আপন ভাবিছ কারে,
জান না যে এ সংসারে শত্রু পায় পায় রে।
অতি খল অবিমল, মহাবল রিপুদল,
দেবে শেষ রসাতল ছল যদি পায় রে॥
কার বলে তুমি চল, কার বলে কর বল,
বিশ্বাস কি আছে বল, মেঘের ছায়ায় রে।
না রহিলে নিজ পদে, ঢুলিলে অজ্ঞান-মদে,
উলিলে পাপের হ্রদে ভুলিলে মায়ায় রে॥
আমি যাহা ভাল কই, তুমি তাহা কর, কই,
মিছামিছি হই হই, শেল লাগে গায় রে।
গায়ের জ্বালায় জ্বলি, ডাক্ ছেড়ে তাই বলি,
ভাই-ভেয়ে দলাদলি, তোমায় আমায় রে॥
আমি বলি ঘরে চল, বনে যাই তুমি বল,
শিখালে এমন ছল, বল কে তোমায় রে।
আমার বচন লও, আমার নিকটে রও,
নিরুপায় কেন হও থাকিতে উপায় রে॥
যত্ন করি প্রাণপণে, সুখ-ফল অন্বেষণে,
বিষয়-বাসনা-বনে ভ্রমিছ বৃথায় রে।
ভয়ানক এই বন, সঙ্গে নাই লোকজন,
ফিরে যাই ওরে মন আয় আয় আয় রে॥

(ঈশ্বর-গ্রন্থাবলী)

হায় আমি কি করিলাম

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

হায়, আমি কি করিলাম এত দিন।
দিন যত গত তত, দিন দিন দীন॥

বৃথায় হইল জন্ম, বৃথায় হয়েছি মন্থ,
অতনু-শাসনে তনু তনু অনুদিন।

ভাবে নাহি ভাবি ভাবি, কার ভাবে মিছা ভাবি,
না ভাবিয়া ভবভাবী, ভেবে হই ক্ষীণ।

আমার ভাবিয়া সার, হারাইয়া সর্বসার,
কত বা গণিব আর এক দুই তিন।

সহজ আমার ভাই, সহজে না দেখা পাই,
জলে থেকে পিপাসায় মরে যথা মীন॥

সহজে যেরূপ কই, সহজে সেরূপ নই,
মিছা করি হই হই হয়ে বোধহীন।

নাহি হয় অনুভব, এ দেহ হইলে শব,
কোথা ভব, কোথা রব, কোথা হব লীন॥

প্রবৃত্তির অনুরোধে, মাতিয়া বিষম ক্রোধে,
এখন আপন বোধে হতেছি প্রবীণ।

কাল-করী-হরি, হরি, হরিনাম পরিহরি,
বৃথা কেন কাল হরি হয়ে পরাধীন।

ডাকে প্রভাকর-কর, কোথা প্রভাকর-কর,
প্রকাশিয়া প্রভাকর শুভদিন দিন॥

(কবিতা-সংগ্রহ)

আত্মবিলাপ

মধুসূদন দত্ত

১

আশার ছলনে ভুলি' কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে।
জীবন-প্রবাহ বহি' কালসিন্ধু-পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন—
তবু এ আশার নেশা, ছুটিল না, একি দায়!

২

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবি রে কবে?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুমভাতি
কত দিন রবে?
নীরবিন্দু দূর্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলমলে?
কে না জানে অম্বু-বিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি?

৩

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে কি সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে।
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে।
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি' পরিলি চরণে সাধে;
কি ফল লভিলি?
জলন্ত পাবকশিখা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি?

পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে।

৫

বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে
কমল তুলিতে।
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী ;
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে ?

৬

যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে ?
সুগন্ধ কুসুমগন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ !
এই কি লভিলি লাভ অনাহারে অনিদ্রায় ?

৭

মুকুতাফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু-জলতলে
ফেলিস, পামর।
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে ?

('তত্ত্ববোধিনী', ১৮৬১)

সহে না আর প্রাণে

বিহারীলাল চক্রবর্তী

প্রাণে, সহে না—সহে না—সহে নাক' আর !
জীবন-কুসুম-লতা কোথা রে আমার !
কোথা সে ত্রিদিব-জ্যোতি,
কোথা সে অমরাবতী,
ফুরাল স্বপন-খেলা সকলি আঁধার !

এই যে হইল আলো,
কই, কই কোথা গেল ;
কেন এল, দেখা দিল, লুকাল আবার !
আপনি আকাশ-মাঝে
কেন সেই বীণা বাজে,
সুধাংশু-মণ্ডলে রাজে প্রতিমা তাহার—
ওই দেখ প্রতিমা তাহার।
মৃদু মৃদু হাসি হাসি
বিলায় অমৃতরাশি,
করুণা-কটাক্ষ-দানে জুড়ায় সংসার।
ফুটে ফুটে চারি পাশে
পদ্ম পারিজাত হাসে,
সমীর সুরভিময় আসে অনিবার—
ধীরে ধীরে আসে অনিবার।

এ নীল মানস-সর,
আহা কি উদারতর,
উদার রূপসী শশী, সকলি উদার !
এখনো হৃদয় কেন
সদাই উদাস যেন,
কি যেন অমূল্য নিধি হারায়েছে তার।

(কবিতা ও সঙ্গীত)

বিভু কি দশা হবে আমার

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভু! কি দশা হবে আমার—

একটি কুঠারাঘাত, শিরে হানি অকস্মাৎ,

ঘুচাইলে ভবের স্বপন,—

সব আশা চূর্ণ ক'রে, রাখিলে অবনী 'পরে,

চিরদিন করিতে ক্রন্দন ॥

আমার সম্বল মাত্র, ছিল হস্ত পদ নেত্র,

অন্য ধন ছিল না এ ভবে,

সে নেত্র করে' হরণ, হরিলে সর্বস্ব-ধন,

ভাসাইয়া দিলে ভবার্ণবে ॥

চৌদিকে নিরাশা-ঢেউ, রাখিতে নাহিক কেউ,

সদা ভয়ে পরাণ শিহরে।

যখনি আগের কথা মনে পড়ে, পাই ব্যথা,

দিবানিশি চক্ষে জল ঝরে ॥

কোথা পুত্র কন্যা দারা, সকলই হয়েছি হারা,

গৃহ এবে হয়েছে শ্মশান।

ভাবিতে সে সব কথা হৃদয়ে দারুণ ব্যথা,

নিরাশাই হেরি মূর্তিমান্ ॥

সব ঘুচাইলে বিধি, হরে নিয়া চক্ষুর্নিধি,

মানবের অধম করিলে।

বল বিত্ত সব হীন, পর-প্রতিপাল্য দীন,

ক'রে ভবে বাঁধিয়া রাখিলে ॥

জীবের বাসনা যত, সকলই করিলে হত,

অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী;

না পাব দেখিতে আর, ভবের শোভা-ভাণ্ডার,

চির-অস্তমিত দিনমণি ॥

ধরা শূন্য স্থল জল, অরণ্যভূমি অচল,

না থাকিবে কিছুর (ই) বিচার।

না রবে নয়নে দৃষ্টি, তমোময় সব সৃষ্টি,
দশ দিক্ ঘোর অন্ধকার—
বিভু! কি দশা হবে আমার॥

প্রতি দিন অংশুমালী, সহস্র কিরণ ঢালি',
পুলকিত করিবে সকলে।
আমারি রজনী শেষ, হবে না কি? হে ভবেশ!
জানিব না দিবা কারে বলে॥

আর না সুধার সিন্ধু, আকাশে দেখিব ইন্দু,
প্রভাতে শিশির-বিন্দু জলে।
শিশির বসন্তকাল, আসে যাবে চিরকাল,
আমি না দেখিব কোন কালে॥

বিহঙ্গ পতঙ্গ নর, জগতের সুখকর,
তাও আর হবে না দর্শন,
থাকিয়া সংসার-ক্ষেত্রে, পাব না দেখিতে নেত্রে,
দেবতুল্য মানববদন।

নিজ পুত্র-কন্যা-মুখ পৃথিবীর সার সুখ,
তাও আর দেখিতে পাব না,
অপূর্ব ভবের চিত্র, থাকিবে স্মরণে মাত্র,
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা।

কি নিয়ে থাকিব ভবে, কি সাধনা সিদ্ধ হবে,
ভবলীলা ঘুচেছে আমার,
বৃথা এবে এ জীবন, হয় না কেন এখন,
বৃথা রাখা ধরণীর ভার।

ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই,
তুমিই হে আশ্রয়ের সার,
জীবনের শেষকালে সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার—
বিভু! কি দশা হবে আমার॥

(চিত্তবিকাশ, ১৮৯৮)

(হেমচন্দ্র ১৮৯৭-এর শেষে অন্ধ হইয়া যান, কবিতাটি তাহার পরে রচিত।)

জীবন-সঙ্গীত

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বলো না কাতর স্বরে, বৃথা জন্ম এ সংসারে,
এ জীবন নিশার স্বপন,
দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার
বলে' জীব করো না ক্রন্দন।
মানব-জনম সার এমন পাবে না আর
বাহ্যদৃশ্যে ভুলো না রে মন।
কর যত্ন হবে জয় জীবাত্মা অনিত্য নয়
অহে জীব কর আকিঞ্চন।
করো না সুখের আশ, প'রো না দুঃখের ফাঁস
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়,
সংসারে সংসারী সাজ কর নিত্য নিত্য কাজ
ভবের উন্নতি যাতে হয়।
দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির ;
সহায় সম্পদ বল সকলি ঘুচায় কাল
আয়ুঃ যেন শৈবালের নীর।
সংসার-সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে
ভয়ে ভীত হয়ো না মানব ;
কর যুদ্ধ বীর্যবান্ যায় যাবে যাক্ প্রাণ
মহিমাই জগতে দুর্লভ।
মনোহর মূর্তি হেরে অহে জীব অন্ধকারে
ভবিষ্যতে ক'রো না নির্ভর ;
অতীত সুখের দিনে পুনঃ আর ডেকে এনে
চিন্তা ক'রে হয়ো না কাতর।

সাধিতে আপন ব্রত স্বীয় কার্যে হও রত
এক মনে ডাক ভগবান্;
সঙ্কল্প সাধন হবে ধরাতলে কীর্তি রবে
সময়ের সার বর্তমান।
মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্তিধ্বজা ধ'রে
আমরাও হবো বরণীয়।
সময়-সাগর-তীরে পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে
আমরাও হব হে অমর;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে অন্য কোন জন পরে
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
ক'রো না মানবগণ বৃথা ক্ষয় এ জীবন
সংসার-সমরাঙ্গন-মাঝে;
সঙ্কল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।

(কবিতাবলী, ১৮৭০-১৮৮০)

পরশমণি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন?
অই যে অবনীতলে পরশমাণিক জ্বলে
বিধাতা-নির্মিত চারু মানব-নয়ন।
পরশমণির সনে লৌহ-অঙ্গ-পরশনে,
সে লৌহ কাঞ্চন হয় প্রবাদ-বচন,—
এ মণি পরশে যায়, মাণিক ঝলসে তায়,
বরিষে কিরণধারা নিখিল ভুবন।

কবির কল্পিত নিধি মানবে দিয়াছে বিধি,
ইহার পরশগুণে মানব-বদন
দেবতুল্য রূপ ধরি' আছে ধরা আলো করি',
মাটির অঙ্গেতে মাখা সোনার কিরণ।

পরশমাণিক যদি অলীক হইত,
কোথা বা এ শশধর, কোথা বা ভানুর কর,
কোথা বা নক্ষত্র-শোভা গগনে ফুটিত ?
কে রাখিত চিত্র করে চাঁদের জোছনা ধ'রে
তরঙ্গে মেঘের অঙ্গে এমন মাখায়ে ?

কে বা এই সুশীতল বিমল গঙ্গার জল
ভারত-ভূষণ করি রাখিত ছড়ায়ে ?
কে দেখা'ত তরুকুল, নানা রঙ্গে নানা ফুল,
মরাল, হরিণ, মৃগে পৃথিবী শোভিয়া ?

ইন্দ্রধনু-আলো তুলে সাজায়ে বিহঙ্গ-কুলে,
কে রাখিত শিখিপুচ্ছে শশাঙ্ক আঁকিয়া ?
দিয়াছে বিধাতা যাই এ পরশমণি—
স্বর্গের উপমাস্থল হয়েছে এ মহীতল,

সুখের আকর তাই হয়েছে ধরণী !
কি আছে ধরণী-অঙ্গে, নয়নমণির সঙ্গে
না হয় মানবচিত্তে আনন্দদায়িনী !
নদীজলে মীন খেলে, বিটপীতে পাতা হেলে,
চরে বালুকণা ফুটে, তৃণেতে হিমানী,
পক্ষী পাখে উড়ে যায়, কীটেরা শ্রেণীতে ধায়,
কঙ্করে তুষার পড়ে, ঝিনুক চিকণী।
তাতেও আনন্দ হয়— অরণ্য কুজ্ঝটিময়,
জলন্ত বিদ্যুৎলতা, তমিস্রা রজনী।

অপূর্ব মাণিক এই পরশ-কাঞ্চন!
জননী-বদন-ইন্দু জগতে করুণা-সিন্ধু
দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন।
শত শশি-রশ্মিমাখা চারু ইন্দীবর আঁকা
পুত্রের অধর-ওষ্ঠ নলিন-আনন;

সোদরের সুকোমল, স্বসা-মুখ নিরমল,
পবিত্র প্রণয়পাত্র, গৃহীর কাঞ্চন—
এই মণি পরশনে হয় সুখ দরশনে,
মানব-জনম সার, সফল জীবন—
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন?

(কবিতাবলী, ১৮৭০-৮০)

অন্তিম বাসনা

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অস্তাচলে গেল গো দিনমণি
আইল রজনী
উঠিল শশধর রজত-রুচি।
জীবনের সুখের দিন—হায়
এমনি চলি যায়
রঙ্গ-ভঙ্গ যায় চকিতে ঘুচি॥
ফুরায় গো ফুরায় খুসি-হাসি—
পোড়া অদৃষ্ট আসি
অন্তিম যবনিকা ফেলিতে বলে।
খেলা-ধূলা সকলি অবসান—
বন্ধুজন-বয়ান
ভাসে গো অবিরাম নয়ন-জলে॥

ভাব এক এমনি—মরি হায়
কি যেন মৃদু বায়—
যাবে চলি' আমার উপর দিয়া।
মনে হবে জীবন-যাত্রা মোর
হইয়ে এল ভোর,
বিশ্রাম করিবারে চাহিবে হিয়া॥
প্রিয় বন্ধু-সকল তোমরা কি
কাঁদিবে পাশে থাকি
গেছি আমি এ দুখ প্রাণে না স'য়ো ?
তবে মোর আত্মা যে-আকাশে
যেখানে থাক্-না সে
কাঁদিবে তোমাদের দোসর হ'য়ো॥
তুমি-ও হে ফেলিও এক বিন্দু
অধিক নহে বন্ধু
একটি-ফোঁটা শুধু নয়ন-লোর ;
ফুল-তুলি একটি প্রাণ-প্রিয়
মোর মাথায় দিও
সাধ মিটায়ো চেয়ো শয়নে মোর॥
পীরিতির সোহাগে ঢলঢল
সে তব অশ্রু-জল
মোরে তা সঁপি দিতে কর'না লাজ।
ত্রিভুবনে আছয়ে যত মণি
সবার সেরা গণি'
রাখিবে করি' তারে মাথার-সাজ॥

(কাব্যমালা, রচনা : ১৮৮০-১৯০০। প্রকাশ : ১৯২০)

অকালে বিজয়া

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

১

কেন রে অকালে কাল বিজয়া আইল, রে ?
সোনার প্রতিমা মম সহসা ডুবিল, রে ।
হৃদয়ের সিংহাসনে, না তুলিতে সযতনে,
না পূজিতে প্রেমফুলে, এমনি হইল, রে ।
এ কথা কহিব কায়, দুখে বুক ফাটি যায়,
আমার মনের আশা মনেই রহিল, রে ।

২

তুমি, দেবি, স্বর্গপুরে গিয়াছ ত চলিয়া
অভাগারে অসুখের ধরাধামে ফেলিয়া,
দেখি সব অন্ধকার, দেহে বল নাহি আর ;
কি কারণে গেলে মোরে মায়া করি ছলিয়া ?
মনেরে প্রবোধ দিব কোন্ কথা বলিয়া ?

৩

ভ্রমিতেছিলাম আমি সংসার-প্রান্তরে, রে
মেঘাচ্ছন্ন নিশাকালে চিন্তিত-অন্তরে, রে ,
সহসা হাসিলে তুমি, উজলিয়া মর্ত্ত্যভূমি,
সৌদামিনী হাসি যথা অন্ধকার চরে, রে ।
দেখিতে পেলাম পথ, ভাবিলাম মনোরথ
পথহারা পথিকের এবার পূরিবে, রে ।

৪

পুনরায় কি কারণে লুকাইয়া আঁধারে,
দ্বিগুণ তিমির মাঝে ফেলাইয়া আমারে ?
না পূরিল মনোরথ, পুনঃ হারালেম পথ ;
বিষম সঙ্কটে রক্ষা কে করিবে তাহারে,
আরাধ্য দেবতা, হায়, তেয়াগিল যাহারে ?

৫

একেবারে সুখাশায় জলাঞ্জলি দিয়েছি,
জীবনের অভিলাষ বিসর্জন করেছি,
সেই তপ, সেই ধ্যান, সেই জপ, সেই জ্ঞান,
অন্য সব বিষয়েতে উদাসীন হয়েছি ;
সেই বেদ, সেই তন্ত্র, সেই গুরু, সেই মন্ত্র,
সেই নাম লয়ে মুখে অবিরত রয়েছি।

৬

অন্তরেতে সেই মূর্তি নিরন্তর জাগিছে।
সেই সুমধুর বোল কর্ণে যেন বাজিছে,
বীণার বিনোদতান, বসন্ত-কোকিল-গান
তার সহ তুলনায় মিষ্ট নাহি লাগিছে।
কুত্রাপি মাধুর্য নাই, হলাহল বর্ষিছে।

৭

আমার জীবন, হায়, বিফল হইল, রে।
আমার মাথার মণি খসিয়া পড়িল, রে।
আমার হৃদয় ধন, কে করিল বিসর্জন ?
প্রেমের প্রতিমা মম সহসা ডুবিল, রে।
কেন রে অকালে কাল বিজয়া আইল, রে।

(কবিতামালা, ১৮৭৭)

একটি চিন্তা

নবীনচন্দ্র সেন

এস এস প্রিয় সখি কল্পনে! আমার,
বহুদিন করি নাই আলাপ তোমার।
বারেক আইস প্রিয়ে! ভ্রমি তব সনে,
নিরখি প্রকৃতিমূর্তি মনের নয়নে।

কিন্তু আহা ! কে দেখিবে আমিও যেমন,
শোকবাষ্পে পরিপূর্ণ মনের নয়ন।
নীরবে কাঁদিছে মন বসিয়া বিরলে,
অন্তরবাহিনী স্রোত বহে অশ্রুজলে।

কত করি বুঝাইনু মানে না বারণ,
নিজে না বুঝিলে কেবা প্রবোধিবে মন ?
কে কবে বেঁধেছে মন ধৈর্যের শৃঙ্খলে ?
বসনে কে বাঁধিয়াছে জ্বলন্ত অনলে ?
তাহে স্মৃতি পাপীয়সী ধরিয়া দর্পণ,
বিগত-জীবন-চিত্র করে প্রদর্শন।

যখন আনন্দময়ী জননীর কোলে
নাচিতাম, হাসিতাম, আনন্দ-হিল্লোলে !
যবে সুখে, প্রিয়তম সঙ্গিগণ লয়ে,
নেচে নেচে বেড়াতাম পুলক হৃদয়ে।
কভু তুঙ্গ শৃঙ্গে উঠি প্রফুল্লিত মনে,
দেখিতাম বিশ্বছবি সায়াহ্ন-পবনে।
দোলায়ে বসন্ত-লতা বহিত পবন,
মর্মরিত পত্রকুল, জুড়াত জীবন।

গাইত বিহঙ্গকুল বসিয়া আবাসে,
গাইতাম, তোমা নাথ ! মনের উল্লাসে
দেখিতাম দূর নদী রবির প্রভায়,
জন্মভূমি-কণ্ঠমূলে স্বর্ণ-রেখাপ্রায়।
অতি দূরে আম্রবন, স্রোতস্বতী-তটে,
চিত্রবৎ দেখাইত আকাশের পটে।
যবে রবি শোভিতেন ভূধর-কুন্তলে,
কিংবা যবে শশধর আকাশমণ্ডলে
হাসিতেন, হাসিতাম বসি নদীকূলে,
শিক্ষকের যত জ্বালা যাইতাম ভুলে।

নৈশ আকাশের মূর্তি অমল সলিলে,
দেখিতাম কাঁপিতেছে মলয় অনিলে।
কত শত পূর্ণশশী এলো-খেলো হয়ে,
বিরাজিত স্থনীলাম্বু-সরিত-হৃদয়ে।

কল্লোলিত যবে নীল তরঙ্গিনীচয়,
নীরবে থাকিত কি হে এ পোড়া হৃদয় ?
তা নয়, খুলিয়া আহা ! হৃদয়ের দ্বার,
—দুই ধারে বিগলিত অশ্রু, দুই ধার,—
গাইতাম তোমা নাথ ! মনের হরষে,
স্মরিলে, এখনো মন গলে ভক্তিরসে।
হা নাথ ! সে দিন মম ফিরিবে কি আর ?
বসিবে কি নদীকূলে আভাগা আবার ?
এবে কাঁদিতেছি বসে দুঃখ-নদীকূলে,
সে সকল স্থখ আমি গিয়াছি হে ভুলে।
সে সকল সঙ্গী নাই নিকটে আমার ;
আসিবে কি তারা কভু নিকটে আবার ?

কেন বা আসিবে ? আহা ! কে আসে এখন
অভাগার দীন ভাব করিয়া স্মরণ ?
যতদিন ধরে তরু ছায়া স্থশোভিত,
কে না হয় ছায়া-আশে তাহার আশ্রিত !
নিদাঘ-অনলে তারে পোড়ায় যখন,
ছায়া-আশে, তার কাছে, কে করে গমন ?

ভগ্ন উপকূল যবে হয় নিমগন,
কে যায় বল না তারে ধরিতে তখন ?
নাহি মম সৌভাগ্যের ছায়াপরিসর ;
শমিপ্রায় হৃদে অগ্নি জ্বলে নিরন্তর।
নাহি সেই দিন মম, নাহি ধন জন,
কে আমারে বন্ধু বলে ডাকিবে এখন ?

হৃদয়ের বন্ধু যারা ছিলেন আমার,
আমার হৃদয়াকাশ করিয়া আঁধার,
অস্তপ্রায়, নাহি আর তোষেন এখন,
করুণ-নয়নে নাহি করেন দর্শন।
হেন বন্ধু নাহি মম এই ধরাতলে,
ভাসিবে আমার দুঃখে নয়নের জলে।
"ভাই" বলে "দাদা" বলে ডাকিনু যে সবে,
গিয়াছে ছাড়িয়া তারা এ জীবিত শবে।
ওহে স্মৃতি! এ সকল দেখায়ো না আর,
কাঁদায়ে এ অভাগারে কি ফল তোমার?
অন্তরে রাখিয়া সব করহ যতন,
সুদিন হইলে তারা দিবে দরশন।
মরিয়া মরমে, জ্বলি চিন্তার অনলে,
যাইতাম সুখ-আশে সুহৃদমণ্ডলে;
ভুলিতাম যত দুঃখ কথায় কথায়।
ইথেও বিধাতা বুঝি বিমুখ আমায়।
আমার জীবন-পথ করিয়া উজ্জ্বল,
যে কয়টি তারা ছিল উদিত কেবল,
দুর্ভাগ্য-জলদাবৃত দেখিয়া আমায়,
লুকায়েছে সব আর দেখা নাহি যায়।
হা বিধাতঃ! এতই কি ছিল তব মনে?
কিন্তু আহা! তোমারে বা দূষিব কেমনে?
সংসারের এই গতি যেখানে সেখানে,
দুরদৃষ্ট যার আহা! কে তাহারে মানে?
তবে কেন করি মিছে সংসার সংসার,
সংসারের নহি, নহি সংসার আমার।
হা নাথ! দুঃখীর সখা কেহ নাহি আর,
একই সুহৃদ তুমি জানিলাম সার।

(অবকাশরঞ্জিনী, ১৮৭১-৭৭)

হতাশ

নবীনচন্দ্র সেন

অকস্মাৎ কেন আজি জলধর-প্রায়,
বিষাদে ঢাকিল মম হৃদয়-গগন ?
দুর্বল মানসতরী, ছিল আশা ভর করি,
চিন্তার সাগরে কেন হইল মগন ?
দুঃখের অনলে বুঝি আবার জ্বালায় !

কেন কাঁদে মন আহা ! কে দিবে বলিয়া ?
কে জানে এ অভাগার মনের বেদন ?
অন্তরে আছেন যিনি, কেবল জানেন তিনি,
যে অনলে এ হৃদয় করিছে দাহন ;
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ এ তাপ সহিয়া ?

কেন কাঁদে মন আহা ! ভাবি মনে মনে,
অমনি মুদিয়া আঁখি নিরখি হৃদয়,
চিন্তার অনল তায়, জ্বলিতেছে চিতাপ্রায়,
দীনতা পবনবেগে প্রবাহিত হয়,
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে বাঁচিবে কেমনে ?

অমানিশা কালে যথা শোভে নীলাম্বর
খচিত-মুকুতাহারে, তারার মালায়,
তেমতি এ অভাগার, হৃদয়েতে অনিবার,
শোভিত শতেক আশা, নক্ষত্রের প্রায়,
আজি দেখি সকলেই হয়েছে অন্তর।

বিষাদ-জলদ-রাশি আসি আচম্বিতে,
ঢাকিয়াছে আশা যত দেখা নাহি যায়,
দরিদ্রতা ভয়ঙ্কর, পিতৃশোক তদুপর,
কেবল জ্বলিছে ভীম দাবানল প্রায়,
তারা সাজাইবে চিতা জীয়ন্তে দহিতে ?

(অবকাশরঞ্জিনী, ১৮৭১-৭৭)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

নবীনচন্দ্র সেন

কৃতঘ্ন, মা বঙ্গভূমি! এত দিন তব
কবিতা-কানন,
যেই পিকবর-কল উছলিল, বনদল
উছলিত, ব্রজে শ্যাম বাঁশরী যেমন।

সে মধু-সখারে আজি পাষাণ পরাণে,
(কি বলিব, হায়!)
অযত্নে মা অনাদরে, বঙ্গকবিকুলেশ্বরে
ভিক্ষুকের বেশে, মাতা, দিয়াছ বিদায়!

মধুর কোকিল কণ্ঠে—অমৃত লহরী—
কে আর এখন,
দেশদেশান্তরে থাকি, কে 'শ্যামা জন্মদে' ডাকি'
নূতন নূতন তানে মোহিবে শ্রবণ?

তোমার মানস-খনি করিয়া বিদার,
কাল দুরাচার,
হরিল যে রত্ন, হায়! কত দিনে পুনরায়,
ফলিবে এমন রত্ন? ফলিবে কি আর?

শূন্য হ'ল আজি বঙ্গ-কবি-সিংহাসন,
মুদিল নয়ন
বঙ্গের অনন্ত কবি, কল্পনা-সরোজ-রবি,
বঙ্গের কবিতা-মধু হরিল শমন।

(অবকাশরঞ্জিনী, ১৮৭১-৭৭)

শ্মশান-দর্শনে

নবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর

দিবসের অবসান ঘোষিছে আরতি,
হাম্বারবে ধীরে গাভী ফিরিছে প্রান্তরে,
কৃষক আবাস-মুখে যায় শ্রান্তগতি
সমর্পিয়া এ জগৎ মোরে ও আঁধারে।

প্রকৃতির ম্লান দৃশ্য পাইতেছে লয়,
রয়েছে সমীর শান্ত সুগভীর ভাবে,
কেবল ঘুরিছে উড়ি বেগে ঝিল্লিচয়,
বিরামিছে দূর গোষ্ঠ কিঙ্কিণীর রবে।

বসি লতা-পরিবৃত দেউল-চূড়ায়,
উলূকী বিরস মুখে কহে শশধরে,
কেহ যদি আসি কুঞ্জে বিঘ্ন জনমায়
নির্জন রাজত্বে তার বহুকাল পরে!

ও রুক্ষ বটের তলে, তমাল-ছায়ায়,
যথা-জীর্ণ তৃণ-স্তূপে বন্ধুর ভূতল,
রয়েছে বিলীন সবে সংকীর্ণ শয্যায়
এ পল্লীর পিতৃগণ স্বভাব-সরল।

উষার সুরভি মুখে বায়ুর সুস্বরে,
চাতকের কলরবে তৃণময় নীড়ে,
প্রতিধ্বনিময় শিঙ্গা, কুক্কুটের রবে,
দীনশয্যা হ'তে আর জাগাবে না সবে!

গৃহাগ্নি তাদের তরে জ্বলিবে না আর,
গৃহিণী হবে না ব্যস্ত কাজে সন্ধ্যার,
শিশু না আসিবে ছুটি "বাবা এল" ব'লে,
সাধের চুম্বন লোভে উঠিবে না কোলে!

কাটিয়াছে শস্য তারা বহু কাল ধ'রে,
সুকঠিন কত মাটি ভাঙ্গিয়াছে হলে,
তাড়াইত যুগ-পশু হরষে প্রান্তরে,
কঠোর আঘাতে তরু ফেলিত ভূতলে।

হে উন্নতি-অভিমানি, হাসিও না হেরি
তাদের সামান্য সুখ, শ্রম হিতকারী—
কিম্বা ভাগ্য অকিঞ্চন ; হাসিও না, ধনি,
শুনি দরিদ্রের স্বল্প সরল জীবনী।

বংশের গরিমা কিম্বা দম্ভ ক্ষমতার—
রূপে বা ধনেতে যাহা দেয় এ জগতে—
অপেক্ষিছে সবে শেষ দিন দুর্নিবার—
মৃত্যুই চরম গতি গৌরবের পথে।

হে গর্বিত, দোষিও না তাহাদের তরে
নাহি যদি কীর্তিস্তম্ভ দেউল প্রাঙ্গণে,
বিচিত্র খিলানে কিম্বা মণ্ডপ ভিতরে
নহে যদি যশোগান উচ্চ সংকীর্তনে !

জীবনী-অঙ্কিত স্তম্ভ, জীবন্ত মূরতি
ফিরাতে কি পারে দেহে বিগত জীবন ?
জাগে কি নির্জীব ধূলি শুনিয়া সুখ্যাতি ?
স্তবেতে দ্রবে কি হিম মৃতের শ্রবণ ?

দেব-তেজে তেজীয়ান্ কোন মহাজন
হ'তে পারে, অনাদরে নিহিত হেথায়,
সক্ষম যে রাজ্য-ভার করিতে বহন
কিম্বা জাগাইতে রাগে জীবন্ত বীণায়।

চির-সুসঞ্চিত নিজ রতন-ভাণ্ডার
ভারতী তাদের তরে না খুলিলা হায়,
সে উষ্ণ প্রতিভা আর আবেগ আত্মার
বিষম দারিদ্র্য-হিমে হ'ল মৃতপ্রায় !

অসংখ্য রতনরাজি বিমল উজ্জ্বল
অগাধ সাগর-গর্ভে রয়েছে তিমিরে,
বিজনে ফুটিয়া কত কুসুমের দল
বিফলে সৌরভ ঢালে মরুর সমীরে।

[Gray's Elegy অনুসরণে]

(শোকগীতি, ১৯০০)

কোথায় যাই !

গোবিন্দচন্দ্র দাস

১

আর ত পারিনা আমি নিতে !
করুণার মমতার, এত বোঝা—এত ভার
আর আমি পারিনা বহিতে।
এত দয়া অনুগ্রহ, কেমনে সহিব কহ,
আর না কুলায় শকতিতে !
হৃদয় গিয়েছে ভরে, নয়ন উছলে পড়ে,
ধরেনা ধরেনা অঞ্জলিতে।
ভাসিয়া যেতেছি হায়, করুণায় মমতায়,
অলস অবশ সাঁতারিতে।

২

আমারে দিওনা কেহ, আর এ মমতা স্নেহ,
আর অশ্রু পারিনা মুছিতে !
এত স্নেহ মমতায়, কত যে যাতনা হায়,
যে না পায়, পারেনা বুঝিতে !
জীবনে করেছি শিক্ষা, শুধু ভিক্ষা শুধু ভিক্ষা,
একটু শিখিনি কারে দিতে।
কত ভাবি দিব যেযে, দিতে যেয়ে বসি চেয়ে,
সে ত গো জানেনা ফিরাইতে।

সে জানেনা কণাবিন্দু, সে দেয় ঢালিয়া সিন্ধু,
ছোট বুকে পারিনা রাখিতে।
আরো বলে দিবে কত, জন্ম জন্ম অবিরত,
রয়েছে অনন্ত আরো দিতে।
শুনিয়া লেগেছে ত্রাস, সর্বনাশ সর্বনাশ,
এত দিলে পারি কি বাঁচিতে?
চাহিনা তাহার প্রেম, হোক হীরা, হোক হেম,
হউক অমৃত পৃথিবীতে।
কিন্তু গো তুমিও যদি, ভালবাস নিরবধি,
তবেই ত হইবে ঠেকিতে।
সে ত আছে দেবভুমি, জগৎ ঘুড়িয়া তুমি,
কোথা আমি যাব পলাইতে!

(প্রেম ও ফুল, ১৮৮৮)

আমার চিতায় দিবে মঠ

গোবিন্দচন্দ্র দাস

১

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে,
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ!
আজ যে আমি উপাস করি,
না খেয়ে শুকায়ে মরি,
হাহাকারে দিবানিশি
ক্ষুধায় করি ছট্‌ফট্‌।
সে দিকেতে নাইক' দৃষ্টি,
কেবল তোমাদের কথা মিষ্টি,
নির্জলা এ স্নেহ-বৃষ্টি,
শিল পড়িছে পট্‌পট্‌।

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে,
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ !

২

দুধটুকু নাই নারীর বুকে,
মাড়টুকু নাই দিতে মুখে,
ক্ষুধায় কাতর শিশু ছেলে
ধূলায় লুটে চট্‌পট্‌ !
শুষ্ক চোখ কণ্ঠতল,
এক বিন্দু নাইক জল,
লোল-রসনা, ভীম-লোচনা
চাহিছে নারী কট্‌মট্‌ !
শতছিন্ন বসন গায়,
শত চক্ষে লজ্জা চায়,
এমনি দৈন্য এমনি দুঃখ,
যোটে না মোটে ছালার চট্‌
নীলগিরি নাহি সে খোপা
শুক্‌না মরা বিন্নাঃ* ছোপা,
তৈল বিনা রুক্ষ কেশ
অযতনে শিবের জট্‌ !
শুষ্ক জীর্ণ শ্মশানকালী
সারিন্দার† খোল পেট্‌টি খালি,
আকাল ভারে বাঁচান দেহ
কাঁকাল-ভাঙ্গা কটিতট !
আমি মর্লে,
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ,
ও ভাই বঙ্গবাসী !

---

* উলুখড়।

† পাকা লাউ হইতে নির্মিত একতারা।

৩

পাখীও ত গাছের ডালে,
আপন বাসায় শাবক পালে
আমার নাই সে আশা, নাই সে বাসা,
কেমন বিপদ, কি সংকট।
আমি থাকি পরের বাড়ী,
নিয়ে ছেলেপুলে নারী,
নাই যে ডালা কুলা হাঁড়ি
বাপ-দাদার সে ভাঙ্গা ঘট!
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ!

৪

আমি আজ
স্বদেশ-চ্যুত বিদেশবাসী
পরদেশ পর-প্রত্যাশী,
না জানিয়া মর্লেম আমি,
ব্যাস-কাশী—এ পদ্মার তট!
দেখিনি এমন দারুণ জা'গা,
লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা
তিন পয়সা এক বেতের আগা,—
কি মহার্ঘ, কি দুর্ঘট!
আমি মর্লে, তোমরা আমার চিতায়
দিবে মঠ।

৫

হেথা, ছলনা বঞ্চনা খালি,
কে কার তোগে দিবে বালি।
এ কিষ্কিন্ধ্যায় সবাই 'বালী'
আত্মম্ভরী মর্কট!

জানেনা এরা সত্য বাক্য,
ব্যবসা এদের মিথ্যা সাক্ষ্য,
চোর গেরস্থ দু'জনারি পক্ষ,
উভচর সব কর্কট !
এরা, শিকড়ে শিকড়ে বাঁশি বাঁধা,
সকল কলার এক ছড়া—কাঁধা,
এদের, অসাধ্য নাই,—স্বার্থে আঁধা,
আকাশে 'ব' নামায় বট,
কুক্ষণে হেথা আসিয়াছি,
এখন, পলাতে পার্লে প্রাণে বাঁচি !
এরা জন্তুর চেয়ে অধম পশু
আত্মগুপ্ত কূর্ম কর্মঠ !
আমি মর্লে, তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ !

৬

কথার বন্ধু অনেক আছে,
কথায় তুলে দিবে গাছে,
বিপদ-কালে পাইনা কাছে
কেমন স্নেহ অকপট.
অভাব দুঃখ শুনলে পরে,
পাছে কিছু চাইব ডরে,
স্বভাব-দোষে স'রে পড়ে
চোরের মত দেয় চম্পট !
কত বন্ধু দেশের নেতা,
মুখবন্ধ স্বাধীন-চেতা,
কাজের বেলায় আরেক কেতা
হৃদ্‌ভরা ঘোর কপট,
লেখক মেরে অনাহারে ,
লুঠবে টাকা উপহারে,

সাহিত্যের যে কসাই বন্ধু

বিষম ধূর্ত, বিষম শঠ।

আমি মর্লে, তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ,

ও ভাই বঙ্গবাসী।

৭

যা হোক, আমি শত ধন্য,

কৃতজ্ঞ কৃতার্থম্মন্য

তোমাদের এ স্নেহের জন্য

আজ তোমাদের সন্নিকট।

চিতায় মঠ বা দিবে কেহ,

গড়বে 'স্ট্যাচু' অর্ধ-দেহ,

ছায়া-চিত্র রাখবে কেহ

কেউ বা তৈল-চিত্রপট!

করবে তোমরা শোক-সভা,

চোখে চস্‌মা শ্বেতজবা,

ওষ্ঠে চুরুট ধূম্রপ্রভা,

করতালি চট্‌পট্‌,

স্বর্গ কিম্বা নরক হ'তে,

আসব তখন আকাশ-পথে,

দেখতে আমার শোকসভা,

সঙ্গে নিয়ে অলকট!

সত্যই কি লজ্জা শরম

বাঙালীরে করেছে বয়কট্‌?

(১৯১১)

ভাব

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

বৃথা তোরে ভালবাসা, বৃথা তোর আরাধনা।
নিয়ত নির্জনে বসি,
তোর ওই মুখ-শশী
বৃথায় দিবস-নিশি করিলাম উপাসনা!
একটু একটু করি জীবন করিয়া চুরি,
অনন্তে মিলায়ে গেল কত দিবা-বিভাবরী!
ফুটিল, ঝরিল কত সুখের কুসুম-কলি,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধ কত উঠিল, ডুবিল ছলি!
আসিয়াছি কি করিতে, কিবা সে করিনু, ওরে?
মুকুলে জীবন হায় শুকায়ে পড়িছে ঝরে!
শীতের কাননে মোর সবি শুষ্ক তরুলতা।
ভেবেছিনু তোরে ল'য়ে ভুলিব সকল ব্যথা!
ওই গলা ধ'রে তোর, জোড়া দিয়ে ভাঙা প্রাণ,
জীবনের কুজ্ঝটিকা, গান হবে অবসান।
জানি না তোরেও ধরে শেষেতে পড়িব ফাঁকি!
বলিব যা' মনে ছিল, কই তা? সকলি বাকী!
গেছে সুখ, যায় দুখ, নীরবে যেতেছে প্রাণ;
বুঝাবারে পারিনু না একটি প্রাণের গান!
এ জনমে কিছু তবে বলা হইল না কথা!
মরমে রহিল ভাব, হৃদয়ে রহিল ব্যথা!

প্রেম-পিপাসা

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

আয় রে, আয় রে, প্রেম-পিপাসা,
মরম-বিজনে লুকায়ে রাখি!
আমি চির তো'র
তুই চির মোর,
তোরে ল'য়ে আমি মুদি এ আঁখি!

শুখায়েছে প্রাণ, আরো সে শুখাক্ !
ফাটিতেছে হৃদি, আরো ফেটে যাক্ !
থাক্ মুখে মুখে,
থাক্ বুকে বুকে,
হাসিতে অশ্রুতে হয়ে মাখামাখি !
নিরাশা আসিছে আশায় মিশিতে,
জগত আসিছে আড়াল দিতে ;—
আয়, আয়, তোরে লুকায়ে রাখি !
আমি চির তোর,
তুই চির মোর,
তোরে হৃদে ধ'রে মুদি এ আঁখি ।

(অশ্রুকণা, ১৮৮৭)

ব'সে ব'সে

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে ঢেউ গণি !
আঁধার রজনী ঘোরা,
আকাশ চন্দ্রমা-হারা,
শিরোপরে মিটি মিটি
জ্বলিতেছে তারাগুলি,
দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে ঢেউ গণি !
চারিদিক্ পানে চাই,
কূল না দেখিতে পাই,
ধীরি ধীরি মৃদু বেয়ে
আসিছে তরণীখানি,
দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে ঢেউ গণি !

মধুর সঙ্গীত ভায়,
তরী বুঝি বয়ে যায়,
কে তুমি তরীর মাঝে
দেখি দেখি মুখখানি ?
দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে ঢেউ গণি !
একি—আঁধার এ উপকূলে
কেন গো নামিয়া এলে,
কিনিতে কি সুখ-মূলে
দুঃখের বাণিজ বিণী ?
দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে ঢেউ গণি !

(আষাঢ়, ১৮৯০)

স্রোতে

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

তাঙ্গা শোকের চেয়ে কাল,
ঘন দুঃখ হ'তে গভীর,
একি আঁধার তুমি ঢাল
ওগো জরার বাড়া স্থবির ?

এযে কঠিনতম বেড়া
অতি নিবিড় হ'তে নিবিড় ;
সারা পাতালপুরী-ঘেরা
এযে যমের জয়-শিবির ।

হেথা রোদন ব্যথা-ভীতির
নহে আর্ত্তনাদে অধীর,
দূরে কর্ণ দুটি বধির
দৃঢ় পাষাণসম বধির !

লোভী আশার মত তরল
নব প্রেমের মত রাঙা,
বহে রুধির-ধারে গরল
ছেয়ে বুকের নীচু ডাঙা।
কেন তুষার-বাঁধা নদীর
তলে স্রোতের খর গতি ?
মৃত জড়ের মাঝে অধীর
কেন ব্যথার জ্বালা অতি ?
যাক্ তৃণের মত পুড়ে
যত শুষ্ক ব্যথা আমার ;
থাক ভস্মরাশি জুড়ে
এই বিশ্বগ্রাসী আঁধার।
ওগো শবের বাড়া শীতল !
ওগো জীর্ণ, ওগো কাল !
গাঢ় পাতাল হ'তে অতল
ঘন আঁধার-রাশি ঢাল !

(চৈতালি, ১৯১৫)

অন্ধের গান

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

পাখী আমার সাক্ষী আছে, উষা-অরুণ এসেছিল।
কুঞ্জতলে, দীঘির জলে হাসির দীপ্তি ভেসেছিল।
আঁধার ঘরে আমি একা ! আমাকে না দিলে দেখা !
ভুলে গেছে, আগে আমায় কত ভাল বেসেছিল।

শিশির-ধোয়া কুসুমরাশির গাল-ভরা সেই শুভ্র হাসির
মধুটুকু লুটে নিতে এই কাননের দেশে ছিল।
তখন আমি দুয়ার খুলে ছুটে গেলাম তরুর মূলে,
আমার দুঃখে গাইল পাখী, বাতাস খানিক শ্বসেছিল।
জানত তারা আগে মোরে কত ভাল বেসেছিল।

(হেয়ালি, ১৯১৫)

নিবেদন

মুন্সী কায়কোবাদ

১

আঁধারে এসেছি আমি
আঁধারেই যেতে চাই।
তোরা কেন পিছু পিছু
আমারে ডাকিস্ ভাই!
আমি ত ভিখারী বেশে, ফিরিতেছি দেশে দেশে
নাহি বিদ্যা, নাহি বুদ্ধি
গুণ ত কিছুই নাই।

২

আলো ত' লাগে না ভাল
আঁধারি যে ভালবাসি!
আমি ত' পাগল প্রাণে
কভু কাঁদি, কভু হাসি!
চাইনে ঐশ্বর্য-ভাতি, চাইনে যশের খ্যাতি
আমি যে আমারি ভাবে
মুগ্ধ আছি দিবানিশি!

৩

অনাদর—অবজ্ঞায়
সদা তুষ্ট মম প্রাণ,
সংসার-বিরাগী আমি
আমার কিসের মান ?
চাইনে আদর স্নেহ, চাইনে সুখের গেহ
ফল মূল খাদ্য মোর,
তরুতলে বাসস্থান !

৪

কে তোরা ডাকিস্ মোরে
আয় দেখি কাছে আয়
কি চাস আমার কাছে
আমি যে ভিখারী হায় !
ধন নাই, জন নাই, কি দিব তোদেরে ভাই,
আছে শুধু অশ্রু-জল
তোরা কি তা নিবি হায় ! —

৫

মিলনের মধুরতা
পাবিনে পাবিনে তোরা !
হা হুতাশ, দীর্ঘশ্বাস
পাবি হেথা বুক-ভরা !
কেউ ত' না ভালবাসে, কেউ ত'
না কাছে আসে
তোরা কেন রাতদিন
ডেকে ডেকে হলি সারা ?

৬

শোকে তাপে এ হৃদয়
হ'য়ে গেছে ঘোর কালো !

আঁধারে থাকিতে চাই
ভাল যে বাসিনে আলো!
আমি যে পাগল কবি,
দীনতার পূর্ণ ছবি,
সবি ক'রে 'দূর দূর'
তোরা কি বাসিস্ ভালো?

(অশ্রুমালা, ১৮৯৪)

এ জীবনে পূরিল না সাধ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালবাসি—
এ ক্ষুদ্র হৃদয় হায়! ধরে না ধরে না তায়—
আকুল অসীম প্রেমরাশি।
তোমার হৃদয়খানি আমার হৃদয়ে আনি,
রাখি না কেনই যত কাছে;
যুগল হৃদয়-মাঝে, কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে?
এ ক্ষুদ্র জীবন মোর, এ ক্ষুদ্র ভুবন মোর,
হেথা কি দিব এ ভালবাসা।
যত ভালবাসি তাই, আরও বাসিতে চাই,
দিয়া প্রেম মিটে না ক' আশা।
হউক অসীম স্থান, হউক অমর প্রাণ,
ঘুচে যাক্ সব অবরোধ,
তখন মিটাব আশা, দিব ঢালি ভালবাসা,
জন্ম-ঋণ করি পরিশোধ।

(গান, ১৯১৫)

সুখের কথা বোলো না আর

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সুখের কথা বোলো না আর, বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি,
দুঃখে আছি, আছি ভাল, দুঃখেই আমি ভাল থাকি।
দুঃখ আমার প্রাণের সখা, সুখ দিয়ে যা'ন চোখের দেখা,
দু'দণ্ডের হাসি হেসে, মৌখিক ভদ্রতা রাখি।
দয়া করে মোর ঘরে সুখ পায়ের ধূলা ঝাড়েন যবে,
চোখের বারি চেপে রেখে সুখের হাসি হাস্‌তে হবে;
চোখে বারি দেখ্‌লে পরে, সুখ চলে যান বিরাগভরে;
দুঃখ তখন কোলে ধরে আদর করে মুছায় আঁখি।

(গান, ১৯১৫)

সাধ

মানকুমারী বসু

১

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
দু'টো কথা না কহিতে,
দু'টী বার না চাহিতে,
আপনি পোহায়ে যায় যামিনী সাধের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের।

২

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
শৈশবের সরলতা,
যৌবনের মধুরতা,
দু'দিনে ফুরায়ে যায় পোড়া মানবের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের।

৩

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
সুখ, সাধ, শান্তিগুলি
অকস্মাৎ পড়ে খুলি,
নিভে যায় আশা-বাতি চির-আদরের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের !

৪

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
বুকচেরা ধন নিয়া,
পোড়ায় আগুন দিয়া,
শ্মশানে সমাধি করে স্নেহ-প্রণয়ের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের !

৫

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
দয়া-মায়া-মমতায়,
ঢাকিয়া রাখিতে যায়,
পরের চোখের জল উপেখা পরের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের !

৬

মানব দানব বুঝি বিশ্ব-জগতের—
কুটিল কটাক্ষে চায়,
দুর্বলের রক্ত খায়,
পদাঘাতে ভাঙে বুক দীনকাঙালের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের !

৭

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
হৃদয়ের পবিত্রতা,
বিশ্বময় বিশালতা,
তাই ঢালি করে পূজা হীন অধমের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের !

৮

কে জানে কি দিয়ে প্রাণ গড়া মানবে
জরা-মৃত্যু-স্বার্থ-ভরা
শোক-তাপে বেঁচে মরা,
পোড়া কপালের ভোগ ভুগিলাম ঢের
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের !

৯

এবার তো কর্মভোগ ভুগিলাম ঢের—
কালের তরঙ্গে ভাসি,
ফিরে যদি ভবে আসি,
তুমি স্রোত আমি ঢেউ হব সাগরের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের !

১০

ফুল হ'য়ে ফুটে থাক সুখ-সোহাগের—
আমিও অনিল হব,
তোমারি সৌরভ ব'ব,
জুড়াব পরাণ-মন কত তাপিতের,
এ আমার বড় সাধ চির জনমের !

(কাব্যকুসুমাঞ্জলি, ১৮৯৩)

একা

মানকুমারী বসু

১

একা আমি, চিরদিন একা
সে কেন দুদিন দিল দেখা ?
আঁধারে ছিলাম ভাল
কেন বা জ্বলিল আলো ?
আঁধার বাড়ায় যথা বিজলীর রেখা !
ভুলে ভুলে ভালবাসা
ভুলে ভুলে সে দুরাশা
ভুলে মুছিল না শুধু কপালের লেখা ?

২

একা আমি এ অবনীতলে
কেহ নাই "আপনার" ব'লে,
একাই গাহিব গীতি
একাই ঢালিব প্রীতি
একাই ডুবিয়া যাব নয়নের জলে !
সে কেন পরাণে আসে
সে কেন মরমে ভাসে
কেন ছোটে তারি ঢেউ মরমের তলে !

৩

বসন্ত বরষা শীত যারা,
আমার কেহই নয় তা'রা,
ভাসিলে নয়ন-নীরে,
দেয় না মাথার কিরে,
হাসিলে আসেনা কাছে ঢেলে সুধাধারা

একা আমি একা রই
সুখ দুখ একা স'ই
সে কেন আমার তরে হ'ত দিশাহারা ?

৪

একা আমি—জগতের পর
এক পাশে বেঁধে আছি ঘর,
আমার উঠানে ভুলে
হাসে না কুসুমকুলে
ঢালে না কোকিলকণ্ঠ মধুমাখা স্বর ;
সে, হেন একার ঘরে
কেন অধিকার করে,
প্রাণে কেন তারি ছটা ভাসে নিরন্তর ?

৫

একা আমি আসিয়াছি ভবে,
আমার "দোসর" কেন হবে ?
শ্মশান-সৈকত-বুকে
একই ঘুমাব সুখে
জগৎ-সংসার মোর শত দূরে র'বে,
আমারে মমতা-স্নেহ
দেয়নি—দিবে না কেহ,
সে কেন আমারি শুধু হয়েছিল তবে ?

৬

একা আমি চিরদিন একা,
তবু সে দু'দিন দিল দেখা !
এখন বাসনা তাই
কোটি পরমায়ু পাই
তাহারি তপস্যা করি কপালের লেখা !

তারি লাগি বসুন্ধরা
হাসি-ভরা কান্না-ভরা,
জীবনের মূলতত্ত্ব তারি লাগি শেখা !
সে আলোকে আলো পথ
ত্রিদিবের পুষ্পরথ !
ওপারে অনন্তপুরী যায় যেন দেখা !
যে কদিন থাকে প্রাণ
এই ক'রো ভগবান্ !
গাই যেন তারি গান বসি' একা একা ।

(কাব্যকুসুমাঞ্জলি, ১৮৯৩)

হতাশে

মানকুমারী বসু

১

আশায় ছিলাম চেয়ে নীলিমের পানে,
উহুঃ ! প্রাণে ছাইল হতাশ !
সে সাধের কুঞ্জখানি ছিল যেইখানে
আজি সেথা পোড়া ছাই পাঁশ !

২

সহসা তপন-তাপে পড়িল শুকিয়ে,
বসন্তের কুসুম-মুকুল,
হায় রে ! সুখের ঘর পড়িল লুটিয়ে,
ভেঙ্গে গেল স্বপনের ভুল !

৩

আর তো সে ফুল ক'টি সোনালী লতায়
দেখিব না কখনো ফুটিতে,
আর তো সে শ্যামা পাখী বকুল-পাতায়
আসিবে না সে গীতি ঢালিতে !

৪

আর দেখিবে না বুঝি সেই শুকতারা,
আমি তারে কত ভালবাসি !
আর খুঁজিবে না বুঝি—নিতি খোঁজে যারা
কেন আমি কাঁদি কেন হাসি ?

৫

সে সরলা আর বুঝি আসিবে না কাছে,
কহিবে না পরাণের কথা,
এ মরমে সাধ আশা আছে কি না আছে,
শুধিবে না সে সব বারতা ?

৬

ডুবিছে ও রাঙা রবি পশ্চিম সাগরে,
কালি পুন আসিবে ঘুরিয়া,
আমাদের যাহা যায়—জনমের তরে,
আসে নাকো কখনো ফিরিয়া ।

৭

পলে পলে ক্ষ'য়ে যায় মানব-জীবন,
সাধিলেও একটু রহে না,
কেন রেখে যায় স্মৃতি—হতাশা-দহন,
কাঁদিলেও খুলে তা' বলে না ।

৮

অশনি, ভুজঙ্গ, বাঘ—যত হলাহল
গড়ি' বিভো! ভালই করেছ,
আমার মনের খেদ একটি কেবল,
কেন নাথ! "হতাশা" গড়েছ?

৯

জীবন্ত শরীর দিলে জলন্ত অনলে
মরে নর যেই যাতনায়,
অসহ্য হতাশ-জ্বালা তারো চেয়ে জ্বলে
তারো চেয়ে আরো ব্যথা পায়!

১০

ছুটিছে শ্যামা সুন্দরী কপোতাক্ষী নদী
দু'কূল উছলি' ঢেউ বয়,
আমার এ হতাশার সীমা নাই যদি
ঝাঁপ দিয়ে পড়িলে কি হয়?

(কাব্যকুসুমাঞ্জলি, ১৮৯৩)

কবির শ্মশানে

মানকুমারী বসু

এখানে আসিছ যারা
নীরবে কহিও কথা,
দেখো যেন ভাঙে না কো
এ গভীর নীরবতা।

নীরব নির্জন এ যে
বড়ই নিরালা ঠাঁই।
সুখে দুখে বড় কথা
এখানে কহিতে নাই।

হেথা নিতি ধীরে আলো
দেন শশী দিবাকর,
সাবধানে শ্যাম ছায়া
করে নব জলধর;

চুপে চুপে ফুল ফোটে,
ধীরে ধীরে বহে বায়,
মায়ের আঁচলে হেথা
"যাদুমণি" ঘুম যায়।

সে বড় "দুরন্ত" ছিল,
মানিত না বাধা-রাশি,
ছুটিত ত্রিদিব-পথে
হাতে লয়ে সাধা বাঁশী

কত সে জানিত খেলা,
কত কি গাহিত গান,
পূরবী রাগিণী কত
কাঁদা'ত মানব-প্রাণ।

কখনো আকাশে উঠি
দাঁড়ায়ে মেঘের 'পরে
মেঘনাদ—বজ্রনাদে
কাঁপাইত চরাচরে;

শারদ জ্যোছনা-সম
কভু বা হাসিত হাসি,
নয়ন-দিঠিতে তার
বসন্ত আসিত ভাসি।

বড়ই "দুরন্তপনা"
করিত সে দিনে রেতে,
তাই মা রেখেছে ঢেকে
স্নেহের অঞ্চল পেতে।
দারুণ আতপ-তাপে
তাপিত কোমল প্রাণ,
শ্যামল সুন্দর ছটা
হয়েছিল কত ম্লান!
সকালে সকালে তাই
রেখেছে মা ঘুমাইয়ে,
শীতল কোমল কোল
দেছে তারে বিছাইয়ে।
সুখে দুখে গোলমাল
এখানে কোরোনা কেহ,
ঘুমায় মায়ের বাছা
আমারে ঘুমাতে দেহ।
যে খেলা খেলেছে শিশু
গেয়ে গেছে যেই গান,
জননীর বুকে বুকে
উঠিছে তাহারি তান;
সে গীতি যে সুধা-মাখা
অফুরন্ত চিরদিন,
জননী হারিয়ে গেছে
শুধিতে শিশুর ঋণ।
আকাশের দেবতা যক্ষ
গাহিছে সহস্র মুখে,
অমর অক্ষরে লেখা
রয়েছে বসুধা-বুকে—

ভারতীর বরপুত্র,
কাব্য-কমলের রবি
বঙ্গ-কবি-শিরোমণি
শ্রীমধুসূদন কবি ;

জনম সাগরদাঁড়ি
কপোতাক্ষী-নদী-তীরে
কেমনে বলিব আর
পোড়া আঁখি ভাসে নীরে ;

এখানে আসিবে যারা
নীরবে কহিও কথা,
ভুলে যেন ভেঙো না কো
এ মধুর নীরবতা।

নীরবে ফেলিও অশ্রু,
নীরবে মাগিও বর,
স্বরগে আরামে থা'ক্
শ্রান্ত বঙ্গ-কবিবর।

(কনকাঞ্জলি, ১৮৯৬)

(কবিবর মধুসূদন দত্তের স্মরণার্থ দ্বাবিংশ সাংবাৎসরিক বন্ধু-সমাগম উপলক্ষে সমাধি-স্থলে পঠিত।)

এই কি জীবন ?

মানকুমারী বসু

১

এই কি জীবন ?—
এই যে কঙ্কর-স্তূপ,
বিষাক্ত আগ্নেয় কূপ,
দরিদ্রের দীর্ঘশ্বাস, ভুজঙ্গ-দশন,

বিধবার শোক ক্লান্তি,
কলুষের শেষ শ্রান্তি,
বিরহীর হতাশ্বাস—একি এ জীবন ?

২

এই কি জীবন ?—
এই জীবনের তরে,
মানবেরা বাঁচে মরে
এত বাদ-বিসম্বাদ, এত কোলাহল ?
এই জীবনের লাগি
এত কাল ভিক্ষা মাগি,
এরি লাগি গর্জে সিন্ধু, বিস্তারে অনল ?

৩

আসুক বিশুভ্রা উষা—
পরিয়া কুসুম-ভূষা,
অথবা আসুক নিশা তিমির-বাসনা ;
বিশ্বকাব্য-পরিচ্ছেদে
নিত্য ছয় রিপু ভেদে,
প্রকৃতি জাগাক চিতে অভূত কামনা ;

৪

হোক সুখ হোক দুখ
হাসি বা বিষণ্ণ মুখ,
আলো বা আঁধার ঘোর থাকুক ঘিরিয়া ;
নিন্দা কিম্বা যশোগীতি
জগৎ শুনা'ক নিতি,
প্রীতি বা ঘৃণার রাশি দিক্‌না ঢালিয়া ;

৫

আমার "অদৃষ্ট-লেখা"
আমারে দিবেনা দেখা—
আমি না পড়িতে পারি জীবন-কাহিনী ;

এমনি পরাণ-পণে,
যুঝিব ভাগ্যের সনে,
বহিব অজ্ঞের আজ্ঞা দিবস-যামিনী।

৬

এমনি রহিব অন্ধ,—
জানিব না ভালমন্দ,
বুঝিব না কেন জন্ম শুভকর্ম কিসে।
না জানি কিসের তরে,
প্রাণ হাহাকার করে,
কোথা সে অমৃত-সুধা, কেন জ্বলি বিষে!

৭

সে শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ,
জীবনে না প্রয়োজন,
আমারে দিলেনা নাথ, কাঁদালে কেবল;
সে রহস্য নহে জ্ঞেয়,
তাই আমি হেন হেয়,
তাই মোরে পায়ে দলে মম "কর্মফল"।

৮

কোথা কোন সুপ্রভাতে
বসিয়া তোমার সাথে,
শিখিলাম ধর্মাধর্ম কোন্ তপোবনে;
কিবা শুভাশীষ দিয়া,
দিলে হেথা পাঠাইয়া,
আজি যে সে সব কিছু পড়ে নাক' মনে!

৯

ভুলিয়া সে মহামন্ত্র,
ছিঁড়িয়া নির্বাণ-তন্ত্র,
সংসার-বালুকারণ্যে বেড়াই কাঁদিয়া,

আর কি করুণা করে,
সে স্নেহ আদর ভরে,
জীবনের মহাতত্ত্ব দিবে গো বলিয়া ?

১০

আর কি কখন নাথ !
পাইব তোমার সাথ,
এ দীর্ঘ অচেনা পথে হবে কি মিলন ?
বিশ্বে মাখা মধুরতা
জনমের সার্থকতা,
বুঝিব সে শুভক্ষণে অমূল্য জীবন ?

(বিভূতি, ১৯২৪)

বেলাশেষে

মানকুমারী বসু

১

জগদীশ !
কত যুগ হল শেষ
আসিয়াছি এ বিদেশ,
কোথা হে স্বদেশী সখা হৃদয়ের ধন !
কোথা তুমি হে আত্মীয় !
চিরানন্দ চিরপ্রিয় ।
খুঁজিছ না—ডাকিছ না, এ আর কেমন ?

২

এ দেশে বিফল "স্নেহ"
দোসর হল না কেহ,
শুধুই তোমারে ভুলে পাতিলাম খেলা ;
আজি দেখিলাম সবি,
পশ্চিমে পড়িছে রবি,
অবনী জবাব দিল, "ফুরায়েছে বেলা" ।

৩

ফিরে দেখি আমি একা,
মুছিয়াছে সব রেখা,
সাধের বাঁধন যত গিয়াছে খসিয়া ;
শূন্যময় মরুভূমি,
তাই ডাকি কোথা তুমি,
কি সুখে ছিলাম বেঁচে তোমারে ভুলিয়া !

৪

বুঝিলাম এতদিনে,
সবি মিছা তোমা বিনে,
সংসারের স্নেহদয়া সকলি অসার,
সুহৃদের বেশ ধ'রে,
গোপনে শত্রুতা করে,
ধন, যশঃ, প্রাণশশী, নির্মম সংসার।

৫

শত শত ত্রুটি খোঁজে,
পরে স্বার্থপর বোঝে,
ধনীর শরণাগত, দরিদ্রে নিদয়,
শিখিয়া মহত্ত্বভাণ,
নাশিছে ক্ষুদ্রের প্রাণ,
এমনি দেখিনু নাথ, সংসার-হৃদয় !

৬

আর কাজ নাহি ভবে,
দেশে যদি যেতে হবে
কেন গো "করুণা-ভিক্ষা"—সেধে কেন মান ?
চোখে কেন অশ্রুধার,
বুকে কেন হাহাকার,
আমারি রয়েছ যদি বিশ্ব—ভগবান ?

৭

জগৎ ঠেলেছে পায়,
মা আমারে নাহি চায়,
তাই মনে হয় এটা বড় 'শুভদিন' ;
সবারি যে হেয় ঘৃণ্য,
কেহ নাহি তোমা ভিন্ন,
হোক্ সে অভাগা পাপী পঙ্কিল মলিন।

৮

স্নেহে মুছি মলা ধূলি,
তুমি নেবে কোলে তুলি,
তুমি ভেঙে দিবে তার ভ্রান্তিময়ী খেলা ;
গণিয়া সে ভাবী দিন,
রব আর কতদিন,
কখন ডাকিবে মোরে ফুরাল যে বেলা !

(বিভূতি, ১৯২৪)

স্মৃতি-পূজা

মানকুমারী বসু

মাইকেল মধুসূদনের সমাধি-স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে)

নব আষাঢ়ের আজি নব কাদম্বিনী
গরজিছে গুরু গুরু, পড়িছে উছলি
কার এ প্রাণের ব্যথা বারিধারা-রূপে ?
কার এ সুদীর্ঘ শ্বাস উঠিছে উচ্ছ্বসি
নীরবে শোকের ভরা আকুল পবনে ?
সুখের স্বপন কার ভাঙিয়া অকালে
আঁধার করিয়া দেছে ধরণী-মাধুরী ?
কি শুনিবে ভাই পান্থ ! প্রাণান্ত বেদনা ?

অভাগিনী বঙ্গমাতা হারাইল হেথা
ভারত-গৌরব পুত্র শ্রীমধুসূদনে !—
আসে তাই খুঁজিবারে বরষে বরষে
সে অমূল্য মহারত্ন—কাঙালের ধন !
—তারি অশ্রু, তারি ব্যথা, তারি হাহাকার,
তারি আকুলতা আজি আবরিছে ধরা ?
যেমতি পরশুরাম মাতৃবধ-পাপে
স্নানি তীর্থ ব্রহ্মপুত্রে পাইলা নিস্তার—
(লভিলা বিধির বর) আজিরে তেমতি
বঙ্গের সন্তান মোরা হৃদি-রক্ত দিয়া
কৃতঘ্নতা মহাপাপ ফেলিব প্রক্ষালি !
তুমি কি আসিবে ভাই, ভক্তি-অশ্রুজলে
অনাদৃত দেবে আজি করিতে তর্পণ ?
গাই তবে প্রাণ খুলে কাঁপায়ে গগন ;
"বঙ্গের গৌরব-রবি শ্রীমধুসূদন।"

(বিভূতি, ১৯২৪)

শোকগাথা

মানকুমারী বসু

(হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত)

১

অই ! অই ! অই !—
গরজে জীমূত-মন্দ্র,
"বাঙ্গালীর হেমচন্দ্র,—
অভাগীর হৃদিরত্ন অঞ্চলের ধন,
আর নাই ! আর নাই !"
কি আর শুনিবে ভাই,
জননীর সর্বনাশ করেছে শমন !

২

দেখিনু উষার রবি,
রুচির উজ্জ্বল ছবি,
ভূতলে ঢালিয়া দিল কনক-কিরণ ,
পরশ পরশি ধরা,
হইল সুবর্ণতরা,
গিরি নদী তরু ভরা কষিত-কাঞ্চন ।

৩

তারপরে দুপ্রহর
রাজবেশ প্রভাকর,
তারি আলো—তারি ছটা যেই দিকে চাই,
তারি রূপে বসুন্ধরা
হইল আনন্দভরা,
তারি আধিপত্য বিনা আর কিছু নাই ।

৪

হায় রে সায়াহ্নে এ কি,
সেই দিনমণি দেখি
শৌর্য বীর্য দীপ্তি ছটা দিয়াছে বিতরি ;
ভূপতি সাজিল যোগী
সুখ-ভোগে নহে ভোগী,
চলিল অনন্তধামে সব পরিহরি ।

৫

ভারতীর প্রিয় ছেলে !
তুমিও তেমতি এলে,
বঙ্গের হৃদয়াকাশে তরুণ-তপন ;
সোনার কিরণ লাগি,
সাহিত্য উঠিল জাগি,
হাসিল সোনালী ছটা জুড়াল নয়ন !

৬

যৌবনে সূর্যের মত,
উদ্যম উৎসাহ কত,
ভাগ্য, যশঃ, বিদ্যা, ধন করিলে অর্জন ;
অভাগিনী বঙ্গমা'য়ে,
সাজালে কবিতা-হারে,
শুনাইলে বৃত্র-বধে অশনি-গর্জন !

৭

"দশমহাবিদ্যা" রূপ,
দেখাইলে অপরূপ !
মায়াময়ী "ছায়াময়ী" দেখিল উল্লাসে ;
বিধবা, কুলীন, মেয়ে,
তাহাদের মুখ চেয়ে,
কাঁদিলে কতই ক্ষোভে মনের হুতাশে !

৮

"ভারত-সঙ্গীত" গাথা—
প্রাণের গভীর ব্যথা
ঢালিলে দীপক রাগে জ্বালায়ে অনল ;
জননীর সু-সন্তান,
সরল উদার প্রাণ,
স্বদেশ-প্রেমিক, চিত্ত সরল কোমল

৯

হায় ! তুমি ভাগ্য-শেষে,
সায়াহ্ন-সূর্যের বেশে,
পুণ্য বারাণসী ধামে করিলে প্রয়াণ,
তথাপি সৌভাগ্য মানি,
সম্মানিত বৃত্তি দানি,
রাখিলা বৃটিশরাজ, কবির সম্মান !

ধন, মান, ভাগ্য, যশঃ
চির দিন নহে বশ,
নেত্ররত্ন দৃষ্টি-শক্তি তাও হারাইয়া,
সন্ধ্যার তপন-বেশে,
গেলে চলি দেবদেশে,
রহিল ধরার সব ধরায় পড়িয়া !

১১

যাও যাও কবিবর !
আছে আনন্দের ঘর,
ব্যথিত তাপিত প্রাণ পাইবে সান্ত্বনা ;
ডাকিছে ত্রিদিববাসী,
ভুঞ্জিতে অমৃত-রাশি,
ডাকিছে স্নেহের কোলে শ্বেত-পদ্মাসনা।

যাও যাও কবিবর
সর্ব-শোক-রোগহর
অজয় অমরপুর, শান্তির সদন ;
ভূতলে যা রেখে গেলে,
সহস্র মরণ এলে,
মরিবে না, ভাঙিবে না, যাবে না কখন

(বিভূতি, ১৯২৪)

সুখ

কামিনী রায়

নাই কিরে সুখ? নাই কিরে সুখ?—
এ ধরা কি শুধু বিষাদময়?
যাতনে জ্বলিয়া কাঁদিয়া মরিতে
কেবলি কি নর জনম লয়?—
কাঁদাতেই শুধু বিশ্বরচয়িতা
সৃজেন কি নরে এমন করে'?
মায়ার ছলনে উঠিতে পড়িতে
মানবজীবন অবনী 'পরে?
বল্ ছিন্ন বীণে, বল উচ্চৈঃস্বরে,—
না,—না,—না,—মানবের তরে
আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর,
না সৃজিলা বিধি কাঁদাতে নরে।
কার্যক্ষেত্র ওই প্রশস্ত পড়িয়া,
সমর-অঙ্গন সংসার এই,
যাও বীরবেশে কর গিয়ে রণ;
যে জিনিবে সুখ লভিবে সেই।
পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ;
'সুখ' 'সুখ' করি কেঁদনা আর,
যতই কাঁদিবে, ততই ভাবিবে
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।
গেছে যাক্ ভেঙ্গে সুখের স্বপন
স্বপন অমন ভেঙ্গেই থাকে,
গেছে যাক্ নিবে আলেয়ার আলো
গৃহে এস আর ঘুর'না পাকে।

যাতনা যাতনা কিসের যাতনা ?
বিষাদ এতই কিসের তরে ?
যদিই বা থাকে, যখন তখন
কি কাজ জানায়ে জগৎ ভ'রে ?
লুকান বিষাদ আঁধার অমায়
মৃদুভাতি স্নিগ্ধ তারার মত,
সারাটি রজনী নীরবে নীরবে
ঢালে সুমধুর আলোক কত !
লুকান বিষাদ মানব-হৃদয়ে
গম্ভীর নৈশীথ শান্তির প্রায়,
দুরাশার ভেরী, নৈরাশ চীৎকার,
আকাঙ্ক্ষার রব ভাঙে না তায়।
বিষাদ—বিষাদ—বিষাদ বলিয়ে
কেনই কাঁদিবে জীবন ভরে' ?
মানবের মন এত কি অসার ?
এতই সহজে নুইয়া পড়ে ?
সকলের মুখ হাসি-ভরা দেখে
পারনা মুছিতে নয়ন-ধার ?
পরহিত-ব্রতে পারনা রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষাদভার ?
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

(আলো ও ছায়া, ১৮৮৯)

দিন চলে যায়

কামিনী রায়

একে একে একে হায়! দিনগুলি চলে যায়,
কালের প্রবাহ পরে প্রবাহ গড়ায়,
সাগরে বুদ্‌বুদ্‌ মত উন্মত্ত বাসনা যত
হৃদয়ের আশা শত হৃদয়ে মিলায়,
আর দিন চলে যায়।

জীবনে আঁধার করি, কৃতান্ত সে লয় হরি
প্রাণাধিক প্রিয়জনে, কে নিবারে তায়?
শিথিল হৃদয় নিয়ে, নর শূন্যালয়ে গিয়ে,
জীবনের বোঝা লয় তুলিয়া মাথায়,
আর দিন চলে যায়।

নিশ্বাস নয়নজল মানবের শোকানল
একটু একটু করি ক্রমশঃ নিবায়,
স্মৃতি শুধু জেগে রহে, অতীত কাহিনী কহে,
লাগে গত নিশীথের স্বপনের প্রায়,
আর দিন চলে যায়।

(আলো ও ছায়া, ১৮৮৯)

হৃদয়-শঙ্খ

অক্ষয়কুমার বড়াল

তুচ্ছ শঙ্খসম এ হৃদয়
পড়িয়া সংসার-তীরে একা—
প্রতি চক্রে আবর্তে রেখায়
কত জনমের স্মৃতি লেখা!
আসে যায়—কেহ নাহি চায়,
সবাই খুঁজিছে মুক্তামণি,

কে শুনিবে হৃদয় আমার
ধ্বনিছে কি অনন্তের ধ্বনি !
হে রমণী, লও—তুলে লও,
তোমাদের মঙ্গল-উৎসবে—
একবার ওই গীতি-গানে
বেজে' উঠি সুমঙ্গল রবে !
হে রথী, হে মহারথী, লও,
একবার ফুৎকার' সরোষে—
বল-দৃপ্ত, পরস্ব-লোলুপ
মরে' যাক্ এ বজ্র-নির্ঘোষে !
হে যোগী, হে ঋষি, হে পূজক,
তোমরা ফুৎকার' একবার—
আহুতি-প্রণতি-স্তুতি আগে
বহে' আনে আশীর্বাদ-ভার !

শঙ্খ, ১৯১০)

মৃত্যু

অক্ষয়কুমার বড়াল

এই কি জীবন ?
এত শ্রম—এত ভ্রম—এত সংঘর্ষণ।
কত-না কামনা করি'
আকাশ-কুসুম গড়ি ?
কত গর্ব—অহঙ্কার—কত আস্ফালন !
ধরা যেন পায়ে ঘুরে,
পড়ে থাকি বিশ্ব জুড়ে,
আপন মহিম্ন-স্তবে আপনি মগন।

তার পর, এ কি আজ ?—নির্মেঘ গগন
মধ্যাহ্ন মধুর অতি,
সমীরণ ধীর-গতি,
রচিতেছি নিজমনে দিবস-স্বপন ;
সহসা কি ভয়ঙ্কর
শত বজ্র কড় কড় !
প্রিয়জনে আগুলিতে কত প্রাণপণ।
নিমেষে নন্দন-বন শ্মশান ভীষণ !
বিশ্বাসিতে হয় ভয়,
তবু বিশ্বাসিতে হয় !
আঁখি হতে গেছে মুছে কুহক-অঞ্জন।
সুখ-স্বপ্ন গেছে টুটে,
হৃদয় ধূলায় লুটে,
মুখে নাহি কথা সরে—ঝরে না নয়ন।
অহো, কি মানব-ভাগ্য—কি পরিবর্তন ?
ধরা—জড় পরমাণু,
প্রাণ—বজ্রদগ্ধ স্থাণু,
বহি এক কি দুর্বহ নিরাশ্রয় মন—
মরিতে পারিলে বাঁচি
শ্বাসে শ্বাসে মৃত্যু যাচি,
দূরে—দূরে সরে যায় নির্দয় মরণ !
কাহার সৃজন এই নগণ্য জীবন ?
এ কি শুধু প্রহেলিকা ?
ওই আলেয়ার শিখা
জ্বলিতে—জ্বলিতে গেল নিবিয়া যেমন !
বাঁধিতে বাঁধিতে সুর
সপ্তস্বরা শতচুর !
মেলিতে—মেলিতে আঁখি মিলাল স্বপন।
এই প্রাণ !—এর লাগি কত-না যতন !

কামে ক্রোধে সদা অন্ধ,
লোভে মোহে কত দ্বন্দ্ব,
কত না মাৎসর্য-মদে জগত-মর্ষণ !

কত আধি ব্যাধি সহি,
কত দুঃখ ক্লেশ বহি,
সুখ-ভ্রমে করি কত অভাব সৃজন !
এই কি এ জগতের শুভ বিবর্তন ?
এই হাড়ে হাড়ে শোক
দেখাবে কি পুণ্যালোক ?
ভূমিকম্প—ঘূর্ণীবাত্যা কি করে সাধন ?

স্বর্ণমন্দিরের চূড়া
বজ্রাঘাতে করি' গুঁড়া,
পাতিব অঙ্গারে ভস্মে কোন্ দেবাসন ?
কোন্ অপরাধে এই কঠোর শাসন ?
কোন্ পিতা পুত্র প্রতি
এমন নির্দয় অতি ?
আমিও ত করিতেছি সন্তান পালন—
কত রাগি চোখে মুখে,
তখনি ত টানি বুকে,
মুছাতে নয়ন তার—মুছি ত আপন !
এ নহে দেবের দয়া—দৈত্যের পীড়ন।

গিয়াছে প্রাণের সার,
মর্মে মর্মে হাহাকার,
নিরাশার অন্ধকার ঘেরিয়া ভুবন !

মরণের পথে আজ,
দূরে ফেলি ঘৃণা লাজ—
কে দেবতা তার স্থান করিবে পূরণ ?
কই শোকে সমাশ্বাস—স্নেহ-নিদর্শন ?

কত শোভা বুকে ধরি'
অকালে সে গেল মরি'—
কে দেবতা স্মরি স্মরি'—করিল রোদন ?

বৃথা আসি, বৃথা যাই,
কিছুই উদ্দেশ্য নাই ;
ঊর্ম্মি-সম মৃত্যু-সিন্ধু করি সম্পূরণ।
এ যে অদৃষ্টের শুধু নির্ম্মম পেষণ।
যায় দিন পায় পায়,
সুখ যায়, দুখ যায় ;
কত আসে, কত যায়—কে করে গণন !

যায় দিন—যায় আশা,
যায় প্রীতি ভালবাসা,
ভাবনা, ধারণা, স্মৃতি, কল্পনা, স্বপন।
যায় দিন—যায় জীব, নি-স্তার গগন ;

শতধা বিদীর্ণ ভানু,
শ্লথ অণু পরমাণু ;
সুপ্ত শশী, সুপ্ত ধরা—উদ্দীপ্ত মরণ !
বিধাতা নিষ্কম্প-দৃষ্টি
হেরিছে তাহার সৃষ্টি
মরণের স্তরে স্তরে করে আরোহণ।
হৃদি-হীন বিধির কি দুর্বোধ সৃজন !

নাহি বুঝে নিজ শক্তি,
নাহি লক্ষ্য আত্মরক্তি,
নাহি অনুভব-তৃপ্তি—সূক্ষ্ম দরশন ;
উন্মত্ত কবির মত,
গড়ে ভাঙ্গে অবিরত
ল'য়ে এক অন্ধ শক্তি—কল্পনা ভীষণ !

(এষা, ১৯১২)

অশৌচ

অক্ষয়কুমার বড়াল

মৃত্যু ! — প্রতি-দিবস ঘটনা ;
তাহে কেন এত শোক ?
সবাই মরিবে, সবারি মরেছে,
চিরঞ্জীবী কোন্ লোক ?
পিতা ভাবে,—কবে অবসর ল'বে,
পুত্র তার হ'লো কৃতী ;
কর্মক্ষেত্রে ঘুরে আজো বৃদ্ধ পিতা
ল'য়ে শোক-দীর্ঘ স্মৃতি ।
স্থবিরা জননী, একই বাছনি
পূজা না হইতে শেষ,—
পথে পথে ওই ছুটে পাগলিনী,
আলুথালু, রুক্ষ কেশ ।
বিধবা ভগিনী পথ চেয়ে রবে
বুঝিবে না কোনমতে—
মাতাপিতৃহীন ক্ষুদ্র ভ্রাতা তার
সেই যে গিয়াছে পথে !
দেশে আসে পতি নবীনা যুবতী—
বুকে না আনন্দ ধরে ;
কূলে ডোবা তরী, ধরাধরি করি'
বিধবায় আনে ঘরে ।
বিব্রত জনক, মাতৃহীন শিশু
কিছুতে নাহি যে ভোলে—
পথে পথে যাবে, ঘোমটা দেখিবে—
কাঁদিবে 'মা—মা' বলে ।

ঘরে ঘরে মৃত্যু— শোক হাহাকার
আমার একেলা নয়!
সবাই সহিছে, আমিও সহিব,
সময়ে সকলি সয়।
কারা ছিল কাল? কে আমরা আজ?
পরশ্ব আসিবে কারা?
হাসিয়া কাঁদিয়া অন্ধ মৃত্যু মুখে
ছুটিছে জীবন-ধারা।
কোথায় মিলায়? কে জাগে কোথায়?
কোথায়—কোথায় প্রিয়া!
আকুলিয়া বায়ু চিতাভস্ম তার
দেয় দেহে মাখাইয়া।
কোথায় কোথায়? আসে প্রতিধ্বনি—
আবার শ্মশানযাত্রী।
মেঘে মেঘে মেঘে দিবস ফুরাল,
সম্মুখে আঁধার রাত্রি।

(এষা, ১৯১২)

শোক

অক্ষয়কুমার বড়াল

গোলাপের দলে দলে পড়িয়াছে হিমরাশি
আদরে দুলায় শাখা প্রভাত-পবন আসি;
ঝরিতেছে হিমভার, সরিতেছে অন্ধকার,
পাণ্ডুর অধরে তার ফুটেছে রক্তিম হাসি।
ওগো, তুমি এস—এস, শ্বসিয়া সে প্রেমশ্বাস!
কতদিন আছি বেঁচে—ক্রমে হয় অবিশ্বাস!

এস মৃত্যু-দ্বার ভাঙ্গি, আকাশ উঠুক রাঙ্গি,
পড়ুক হৃদয়ে মোর তোমার হৃদয়াভাষ।
আবার দাঁড়াও, দেবী, দৃষ্টি-মুগ্ধ করি হিয়া,
নারীসম ভালবেসে সুখে দুখে আলিঙ্গিয়া!
কৈশোর কল্পনা সম, জড়ায়ে জীবন মম,
আধ স্বপ্ন-জাগরণে—জগতে আড়াল দিয়া।

* * *

ওই বহ্নি—ওই ধূম—ওই অন্ধকার—
বিগত জীবন-স্বপ্ন, কিছু নাই আর!
জীবন প্রথম হ'তে ওই পথে ধাই—
কাহারো চরণচিহ্ন কূলে পড়ে নাই।
কি ঘন জলদে ঢাকা মৃত্যু-পরপার—
বায়ু না আনিতে পারে দূর সমাচার।
তপন কিরণে যায় সর্ব বিশ্ব দেখা,
কোথা চির-মিলনের উপকূল-রেখা!
দুর্ভেদ্য দুস্তর শূন্য, ক্ষুদ্রদৃষ্টি নর ;
ওই বহ্নি, ওই ধূম! কিবা তারপর ?

(এষা, ১৯১২)

সান্ত্বনা

অক্ষয়কুমার বড়াল

সে সময়ে দিও দেখা!
নয়নে যখন ঘনাবে মরণ,
ধরণী হইবে ধূসর-বরণ,
নয়নের জলে অতীত জীবন
স্বপনের সম লেখা!

পড়ে শ্বেতজাল শিব-নেত্র 'পর,
শিথিল শরীর, হিম পদ-কর,
আনাভি নিঃশ্বাস, কঠোর ঘর্ঘর—
সে সময়ে দিও দেখা !
পলাই—পলাই ভাঙ্গি' দেহ-কারা,
আছাড়ে হৃদয় উন্মদ-পারা,
ডাকে পরিজন নাহি পায় সাড়া—
গভীর নিশুতি যাম ।
ভয়ে ভীত প্রাণ কাঁদিয়া কাতরে
শিরা-উপশিরা আঁকড়িয়া ধরে ;
দীপ নিবে-নিবে, সময় না নড়ে,
সবে করে হরিনাম ।
অতি নিরুপায়, কোথা ছিল পড়ি'—
আজীবন-স্মৃতি আসে হা-হা করি' !
প্রতি দিনে দিনে রহিয়াছে ভরি'
কি গাঢ় কলঙ্ক-দাগ !
নিজ পাপে তাপে অদৃষ্ট গড়িয়া
দেহ হ'তে আমি যাই বাহিরিয়া—
সে সময়ে কাছে দাঁড়াবে কি, প্রিয়া,
ল'য়ে চির-অনুরাগ ?

(এষা, ১৯১২)

কাঙাল

রজনীকান্ত সেন

(মৃত্যুশয্যায় রচিত)

আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছে,
গর্ব করিতে চুর ;
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,
সকলি করেছে দূর।
ঐগুলো সব মায়াময় রূপে,
ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
করেছে দীন আতুর ;
আমায়, সকল রকমে কাঙাল করিয়া
গর্ব করিছে চুর।

যায়নি এখনো দেহাত্মিকা মতি,
এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি,
এই দেহটা যে আমি, সেই ধারণায় হয়ে
আছি ভরপূর,
তাই, সকল রকমে কাঙাল করিয়া,
গর্ব করিছে চুর।
ভাবিতাম, "আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ",
তাই, বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে,
বেদনা দিল প্রচুর ;
আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে,
গর্ব করিতে চুর!

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (আনন্দময়ী, ১৯১০)
২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭।১৯১০ খৃঃ

নয়ন-জল

প্রমীলা নাগ

নয়নের শুকাল না জল,
পূরিল না জীবনের আশা !
ঘুচিল না প্রাণের আঁধার
গেল না সে স্নেহের পিপাসা।
নিভৃত এ হৃদয়-মন্দিরে
দেখিল না কেহ এই প্রাণ !
এ গভীর নয়নের জলে
কেহ, দু'টি অশ্রু করিল না দান।
হৃদি-ফুল হরষে দলিয়া
চ'লে গেল প্রফুল্ল অন্তরে।
দেখিল না বারেক ফিরিয়া
দ'লে গেল জনমের তরে।
হায়, দু'টি কণা স্নেহে কভু কেহ
রাখিবারে স্মৃতির জীবন
বলিল না, দেখিল না চেয়ে
দু'টি আঁখি করিতে স্মরণ !

(তটিনী, ১৮৯২)

শেষ ভিক্ষা

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

যখন রব না আমি, রাখিও আমারে ধরে'
মায়ার মন্দিরে ;
তোমার করুণোচ্ছ্বাসে বিশ্ব যদি পরিহাসে,
নিশ্বাসিও ধীরে, অতি ধীরে।

যখন রব না আমি, রবে না আমার কিছু,
রাখিও আমারে ;
নবরঙ্গ নবোল্লাস অতীতেরে করে গ্রাস ;
তুমি জেগো মন্দির-দুয়ারে !
যখন রব না আমি, আমার সকলি হবে
বিকৃত বিস্মৃত ;
বিদায়ে কেঁদেছে যারা, বিয়োগে ত্যজিবে তারা,
তুমি মোরে ছেড়ো না, বাঞ্ছিত !
যখন রব না আমি, অখ্যাত এ নাম, তাও
লুটাবে ধূলায় ;
তাই ছাই-মুষ্টি নিয়া রেখো তারে জীয়াইয়া ;
স্মৃতি বাঁচে স্নেহ-শুশ্রূষায় ।
যখন রব না আমি, বসন্তের কুঞ্জে কুঞ্জে
গাবে শুক-সারী ;
তোমাদের বিশ্বময়, হবে পূর্ণচন্দ্রোদয়
এনো মোরে দিয়ে সিন্ধু পাড়ি ।
যখন রব না আমি, মৃতভার ব'য়ে ব'য়ে
পড়িবে নুইয়া ;
তারা-সখীগণে চাহি অনন্তের গান গাহি
দিও মোরে ঊর্ধ্বে উড়াইয়া !

(গীতিকা, ১৯১০)

রচনার তৃপ্তি

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

কে তোমরা স্নেহময়ী, বসি দূর অন্তঃপুরে
পড়িতেছ আমার কবিতা !
আঁখি দুটি ঢল্ ঢল্ স্বজিতেছে মুক্তাদল ;
এই তোরে সাজে ভাল, করুণা-ব্যথিতা !

কবিতা না ছেলেখেলা? বাতুলের মনোব্যাধি,
মিশা নাকি প্রলাপে স্বপনে?
কোন্ অনুভূতি নিয়া তোমাদের মুগ্ধ হিয়া
তারেই সঙ্গিনী করি চুম্বিছে যতনে!
কবির কামনা-স্বপ্ন ফিরে হাহাকার করি,
শুনি' বিশ্ব করে পরিহাস;
তারে, হেথা ম্লানমুখে, তুমি দুরু দুরু বুকে
টানিছ সোহাগভরে ফেলি দীর্ঘশ্বাস!
হৃদয় তোমারি রাজ্য; আমরা কাঙাল সেথা,
বাস করি ক্ষুদ্র-অধিকারে!
তোমাদেরি দিব্যচোখে সত্য ভাতে স্বর্গলোকে,
রূপ ধরা পড়ে শুধু রূপের মাঝারে।
যে তৃষা ফুটিছে গানে, কি অর্থ কি তত্ত্ব তার—
এই নিয়ে মোদের বিচার;
এই মর্মে রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সে গীতের রসে গন্ধে
হইতেছে পলে পলে পুলক-সঞ্চার!
যুগে যুগে তোমারেই কবিকুল ভারে ভারে
পাঠাইছে সঙ্গীত-সম্ভার;
তুমি শ্রোতা, ভালবেসে' লও, আরো চাও হেসে,
অশেষ অক্ষয় তাই কবির ভাণ্ডার!
কে তোমরা স্নেহময়ী, বসি দূর অন্তঃপুরে,
পড়িতেছ আমার কবিতা!
কবি সে কল্পনাজ্বরে, এই লাজে সুখে মরে,
লক্ষ্মী হেরিছেন তার বাসনার চিতা!

(গীতিকা, ১৯১৩)

কে বুঝিবে ?

বিনয়কুমারী ধর

নিরখি নয়ন-কোণে একবিন্দু অশ্রুবারি,
কে বুঝিবে বল ?
প্রাণের ভিতরে তব কি সিন্ধু লুকায়ে আছে
কত তার তরঙ্গ প্রবল !
একটি দীরঘ শ্বাসে, কে বুঝিবে এ জগতে
কি ভীম তুফান
হৃদয়ের মাঝে তব, বহিতেছে দিবানিশি
চূরমার করিছে পরাণ !
শুনিয়া ও ক্ষীণকণ্ঠে বিষাদের মৃদুতান,
কে বুঝিবে হায় ?
কি গভীর মর্ম্মোচ্ছ্বাসে কি গভীর হাহাকারে
বুক তব ভেঙ্গে নিতি যায় !
সজল নয়ন যুগে কাতর চাহনি আধ,
দেখে একবার !
কে বুঝিবে হৃদিমাঝে আকুল পিয়াস-ভরা
কি বাসনা, কি ভিক্ষা তোমার ?
বিন্দুমাত্র দেখাইয়া বুঝাইতে সব কথা,
কেন আকিঞ্চন ?
কে এত মরমগ্রাহী দেখিয়া বালুকাকণা
মরুদৃশ্য বুঝিবে কেমন ?

(নির্ঝর, ১৮৯১)

অতৃপ্তি

কুমারী লজ্জাবতী বসু

কেন এ অতৃপ্তি-ঊর্মি হৃদি-পারাবারে
উথলিয়া কূলে কূলে করিছে রোদন ?
কি অভাব আকুলতা, কোন্ তৃষা-তরে ?
চাহিছে সাধিতে সদা কোন্ সে সাধন ?
চারিদিকে উঠে মহা কর্ম্ম-কোলাহল ।—
কুসুম বিকশি উঠি বিতরিছে বাস,
গাহিছে কর্ম্মের গীত তারকাসকল,
সকলেরে প্রাণ দিতে বায়ু ফেলে শ্বাস ।
শুনিয়ে পরাণ এই কর্ম্মের কল্লোল,
চাহিছে মিশাইতে ইথে ক্ষুদ্র কণ্ঠ-তান,
আপনার পানে চেয়ে জাগিতে কেবল,
চাহেনা থাকিতে তার অধীর পরাণ,
তাই এ অতৃপ্তি-ঊর্মি হৃদি-পারাবারে,
উথলি উঠিছে কাঁদি কাঁদি তৃষাতরে ।

(১৯০২)

জীবন

সরলাবালা সরকার

বসিয়া নদীতীরে
চাহিয়া অপলকে
বালুকা গণি আমি শুধু রে
তটিনী কুলুকুলে
বহিছে কূলে কূলে,
শ্রবণে বাজে আসি মধু রে !

উপরে নীল মেঘে
তপন আছে জেগে,
দহিছে শির খর কিরণে।
খসিয়া পাতাগুলি
মাখিছে বনধূলি
লুটায়ে পড়ে তরু-চরণে।

কুসুম অবসিত,
কোকিল শ্রান্তচিত,
ভ্রমর আর নাহি গুঞ্জরে।
রয়েছে বন-ছায়ে
বিহগ লুকাইয়ে,
বকুল আর নাহি মুঞ্জরে!
ফুরায়ে যায় বেলা,
ভাঙ্গিছে খেলা-মেলা,
লুকায় পাখী নিজ আবাসে।

আকাশে রাঙ্গা রাঙ্গা
নীরদ ভাঙ্গা ভাঙ্গা
শতেক রঙ্গে কত শোভা সে :
বনের ছায়া মাঝে
আঁধার ভীম সাজে
প্রকাশে ক্রমে নিজ মূরতি।

সে আলো কোথা গেল,
আঁধার দেখা দিল,
না জানি ধরণীর কি রীতি।
জগৎ এলোকেশে
ঢাকিয়া ভীমা-বেশে
রহিল নিশা তম-বরণী।

কেহ না আসে কাছে,
কোথায় কেবা আছে,
সবারে ডাকি আয় আয় না।
আঁধার ঘোর এসে,
পড়েছে তট-দেশে,
বালুকা দেখা আর যায় না।
শুধুই মেঘ-শিরে
তারকা উঁকি মারে,
আলেয়া করে দূর ছলনা।
গভীর অন্ধকারে
রহিনু নদীতীরে,
বালুকা গণা মোর হল না!

(প্রদীপ, ১৮৯৮)

প্রভাতের কবি

সরলাবালা সরকার

আমি এক প্রভাতের কবি
এ জীবন শিশিরের মত,
প্রভাত ফুরায়ে গেছে হায়,
তাই বড় হয়েছি বিব্রত!
শিশির শুথায়ে গেছে বনে
প্রভাতের বিদায়ের সনে,
শুথায়েছি, তবু বেঁচে আছি
দগ্ধ হয়ে তপন-কিরণে।
শিশির শুথায়ে গেল বনে,
প্রভাত ফুরায়ে গেল হায়,

আমি এক প্রভাতের কবি
এ জীবন কেন না ফুরায় !
ফুল ফোটে কেমন করিয়া
তা' তো গেয়েছিনু একদিন,
গেয়েছিনু উষায় কেমনে
আঁধার আলোকে হয় লীন :
গেয়েছিনু বসি নিরজনে,
নদী বহে যায় কোথা বেগে,
রবি ওঠে পূরব গগনে,
পশ্চিমেতে শশী হয় ক্ষীণ।
এই কোলাহলে কি করিয়া
কি গাহিব বোঝেনা ত হিয়া,
তার যত তুলে বাঁধি আমি,
ক্ষীণ সুর তত পড়ে নামি।
কোথা সেই আলো-অন্ধকার
আধ-ঘুমে মগ্ন বিশ্ব-ছবি,
এ তরঙ্গে কোথা যাব ভাসি,
ক্ষুদ্র আমি প্রভাতের কবি !
অচেনা এ মধ্যাহ্ন-জগৎ
অচেনা এ জগতের জন,
প্রভাতের কবি তাই খুঁজে
কোথা তুমি মধুর মরণ !

(প্রবাহ, ১৯০৪

ধুতুরা ফুলের সহিত মনোদুঃখ-কথন

অন্নদাসুন্দরী দাসী

ধুতুরা সুন্দরী! কেন বিরসবদন?
কেন এ অরণ্য মাঝে কর গো রোদন?
বিনোদিনি! তুমিও কি কাঁদ একাকিনী?
অথবা আমার সমা চির-অনাথিনী।
করে বটে হতাদর এ মানবগণে,
শিব আদরিলা, কেন দুঃখ ভাব মনে?
যুগান্তের মুনি যার দেখা নাহি পায়।
কেন চিন্ত ধনি! তিনি তোমার সহায়?
তব শক্তিগুণে হর, না পরে অম্বর;
তোমাতে হইয়া মত্ত সদা দিগম্বর।
গলে অস্থি মত্ত ভোলা ভস্মমাখা অঙ্গ।
তব প্রেমে মগ্ন সদা ত্যেজে সতী-সঙ্গ।
তোমারি সম্ভোগে শিব ত্যজেন কৈলাস,
তোমারে যে এরা বলে শ্মশানেতে বাস।
দেখ! রে অনাথা আমি নাহি সুখলেশ,
নাথের বিয়োগে ধরি যোগিনীর বেশ।
পতন হইয়া আছি, শোক-পারাবারে,
যতন করিতে কেহ নাহি এ সংসারে।
একাকী ভবন-মাঝে করি হাহাকার,
হেনজন নাহি করে বিপদ-উদ্ধার,
যে দুঃখের জ্বালা মম হৃদয়-মাঝারে
অবলা অ-বলা, তাই বর্ণিতে না পারে।
পিতামাতা, ভাইবন্ধু ত্যজিল আমায়,
কে আছে সহায় বল, হায়! হায়! হায়!

(অবলাবিলাপ, ১৮৭১)

বিদায়

রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী

চিরতরে চলে গেছে হৃদয়ের রাজ,
অতল বিষাদে মোরে ডুবাইয়ে আজ!
নিয়ে গেছে সুখসাধ সুখের বাসনা,
রেখে গেছে জন্মশোধ হৃদয়-বেদনা!
সে মম পুষ্পিত শুভ্র বসন্ত-জীবন,
গেছে যবে, সাথে গেছে আমার ভুবন!
নিশীথের সুখময় জোছনা-মগন,
মধ্যাহ্নের আলোময় উজ্জ্বল গগন;
প্রভাতের মৃদুমন্দ মলয় বাতাস,
ধূসর রক্তিম চারু সন্ধ্যার আকাশ;
কুসুমিত সুবাসিত নিকুঞ্জ-কানন,
ভ্রমর-গুঞ্জিত সদা সুখের সদন!
এ সকলি গেছে চলে তারি সাথে সাথে
এবে নিশা দেখা দেয় জীবন-প্রভাতে!
নিবে গেছে নয়নের শুভ্র দীপ্তি আলো,
প্রাণে শুধু নেমে আসে ঘোর ছায়া কালো!
গিয়েছে সকলি মম কিছু নাহি আর,
রয়েছে কেবল স্মৃতি আর অশ্রুধার!

(শোকগাথা, ১৯০৬)

মরণ

রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী

এস ওগো, এস এস আমার মরণ!
এস হে সুন্দর সৌম্য, সুনীল-বরণ!
বাজিয়া উঠিছে শঙ্খ সন্ধ্যার আরতি!
তুমি এসো হৃদিতলে মৃদু মন্দগতি।

শ্যামস্নিগ্ধ গোধূলিতে করিব বরণ,
এসো সখা, বরবেশে মন্থর-চরণ।
আমরা দু'জন যাত্রী অনন্ত পথের,
বাজিছে অধীরে ভেরী তোমার রথের।

হৃদি-অন্তঃপুর হতে পরাণ-বধূরে
অলক্ষ্যে লইয়া যাও অনন্ত সুদূরে!
দেখিবে না, জানিবে না, কেহ কভু আর
পাবে না উদ্দেশ খুঁজি এ জগতে তার!

ফুটিয়া উঠিছে তারা রঙীন আকাশে,
পতাকা চঞ্চল তব সন্ধ্যার বাতাসে;
শিথিলিত হয়ে আসে জীবন-বন্ধন—
নিমীলিত হয়ে আসে অবশ নয়ন!

(প্রীতি, ১৯১০)

প্রেম-ভিখারী

যোগেন্দ্রনাথ সেন

(১)

সংসার-পাথার-মাঝে আমি যে ভিখারী গো
ভিক্ষা মোরে দাও!
আমার হৃদয়-নিধি হারায়েছি আমি গো
কি আর শুধাও?

এই ছিল কোথা গেল,
কোথা এবে লুকাইল,
আঁধারে করিল আলো পরশরতন,
হায় আমি সে রতন হারানু এখন!

(২)

আমারে এ রবিশশী, আমারে এ গ্রহতারা
না দেয় আলোক !
হায় আমি কোথা যাব ! বহিতে না পারি আর
এ বিষম শোক ।
কুজ্ঝটিকা অন্ধকার,
বেড়িয়াছে চারিধার,
শূন্য—শূন্য—সব শূন্য, অনন্ত গগন
অভাগারে নাহি করে কর বিতরণ ।

(৩)

আমার মাণিক যবে হৃদয়ে আছিল রে !
আলোকিয়া ঘর,
হয়েছিল ধরাধাম কি সুন্দর—কি সুন্দর
স্নেহের আকর !
রবি-করে স্নেহ ঝরে,
তরু-শিরে স্নেহ ক্ষরে,
স্নেহময়—স্নেহময়—ভূধর সাগর,
হয়েছিল চরাচর স্নেহের নির্ঝর !

(৪)

সংসার-পাথারে আমি প্রেমের ভিখারী গো
ভিক্ষা মোরে দাও !
প্রেম মন্ত্র—মহামন্ত্র তোমরা সকলে গো
আমারে শিখাও !
এস সবে এস এস,
আমার হৃদয়ে বস,
ডুবে যাই—ডুবে যাই—হারাই চেতন !
ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও—নরনারীগণ !

(৫)

হায় ও মৃগের সম,
অমূল্য জীবন মম
বৃথা কাটিলাম,
ভ্রান্ত হয়ে সুখ-আশে,
সংসার-অরণ্যে আমি
বৃথা ছুটিলাম !
আমার পরশমণি
হৃদয়ে রাজিছে আহা
নাহি দেখিলাম,
ভোগ-আশে মত্ত হয়ে
বাণবিদ্ধ মৃগ সম
বৃথা মরিলাম।

(ঊষা)

কবিবর হেমচন্দ্রের অন্ধত্ব উপলক্ষে লিখিত কবিতা

বরদাচরণ মিত্র

বৃত্রসংহারের কবি ! এ বৃদ্ধ বয়সে
আবৃত কি অন্ধকারে ও মুখ নয়ন ?
সে তিমিরব্যূহ ভেদি নাহি কি গো পশে
আলোকের শরজাল—শোভার প্লাবন ?
বিদারি' উদার গর্বে হৃদি-শতদল
কাঁপাইয়া তায় তীব্র সুখের বেদনে
উৎসারি শতেক রন্ধ্রে কবি-পরিমল
রকত উচ্ছ্বাস শত উষ্ণ প্রস্রবণে ?

কি কঠোর পরিতাপ! কিম্বা দেখ স্মরি
শ্বেতদ্বীপ-মহাকবি—জীবন-কাহিনী ;
বাহিরের সূর্য যবে আলো নিল হরি,
ভাতিল সে মহানিশা চিৎ-সৌদামিনী।
নয়ন সসীম দেখে মায়িক অসার,
আলোকের পূর্ণতাই মহান্ আঁধার।

(অবসর, ১৮৯৫)

হেসো না

প্রিয়নাথ মিত্র

I have not that alacrity of Spirit,
Nor cheer of mind that I was wont to have.
—Richard III

১

হেসো না চন্দ্রমা—বসি আকাশের কোলে,
ও হাসি তোমার লাগে না ভাল ;
হেসো না তারকা—বসি শশধর পাশে,
ও হাসি আমার লাগে না ভাল।

২

হেসো না প্রকৃতি—পরি' নব নব বেশ
মধু-সমাগমে ফুল-আভরণে ;
হেসো না কমল—বসি স্বচ্ছ সর-নীরে
ও হাসি এখন লাগে না ভাল!

৩

গেয়ো না হে পিক—বসি মঞ্জু-কুঞ্জ-মাঝে,
নিকুঞ্জ আঁধার শ্যামের বিরহে ;
গেয়ো না বাঁশরী—এবে রাধা রাধা বলে,
নাহিক' রাধিকা বৃন্দাবনধামে।

৪

বসন্ত, শরত, শীত, হিম, গ্রীষ্ম, বর্ষা
চাঁদের আলোক, অমার আঁধার,
অশনি-পতন, মৃদু বাঁশরীর গীত,
সকল(ই) তখন লাগিত ভাল।

৫

নাহিক' সেদিন, নাহি জীবনের সুখ,
কালের প্রবাহে ভাসিয়ে গেছে :
নাহি আশা, অভিলাষ, পিরীতি, প্রণয়,
জল-অক্ষসম শুকায়ে গেছে।

(হরিষে বিষাদ)

সীতার বিলাপ

হরিশ্চন্দ্র মিত্র

[লক্ষ্মণ কর্তৃক সীতা পরিত্যক্ত হইবার পর মূর্চ্ছান্তে নিজ চেতনাকে লক্ষ্য করিয়া সীতার বিলাপ]

'কেন গো চেতনা ছুঁলে অভাগীরে!
এ সীতা এখন সে সীতা নাই!
ছিল যে পতির হৃদয়-মন্দিরে,
তরুতলে তার এখন ঠাঁই!
বধিলেন নাথ যাহার জীবন
বিনা দোষে হানি বর্জন-বাণ,
তুমি কেন আর করিয়ে যতন,
বাঁচাইতে চাও তাহার প্রাণ?
যতন তোমার হবে না সফল,
অকারণ তব এ শ্রম করা!
বাঁচে কি সে লতা ঢালিলেই জল
যে লতা বজ্রের আগুনে মরা!

অচৈতন্য মম বড় সুখকর,
বড় সুখে ছিনু তাহার কোলে ;
কোন দুখে নাহি দহিত অন্তর,
তুমি তায় কেন বাদিনী হোলে ?
এখন যে দশা ঘটেছে সীতার,
অচেতনে তার স্বরগ-সুখ ;
যতক্ষণ রবে চেতনা তাহার,
ততক্ষণ ভোগ নিরয়-দুখ* ।
নী লতা বলি সমাদরে
দিতেন প্রাণেশ হৃদয়ে স্থান
গেলো সে সুদিন, এখন অন্তরে
বিষবল্লী বলি সীতায় জ্ঞান ।
পতি-সোহাগীর কোমল হৃদয়,
চেতনা, তোমার সুখের বাস ;
পতি-বিয়োগীর চিহ্ন বিষময়,
তাহে সাজে কি গো তোমার বাস ?
যাও, যাও ত্বরা করি পরিহার
দুখিনী সীতার হৃদয়পুরী :
নহিলে তোমার নাহি আর পার,
মরিলে—মরিলে—মরিলে পুড়ি ।
যে বিষম বহ্নি মনোবন মাঝে
দেখ, দেখ, দেখ উঠেছে জ্বলে
এখনো এ বাসে বাস কি গো সাজে,
যাও, নয় ভস্ম হোলে গো হোলে ;
জনম লভিলে যাহারে জননী,
পণ পূর্ণমাত্র যাহারে তাত,
অপবাদ-মাত্র শুনিয়ে অ নি
যারে পরিহার করেন নাথ ;

* নরক-দুঃখ।

তুমি কেন তারে এখনো চেতনা
পরিহার নাহি কর গো বল ?
বাড়াইয়ে দিলে সীতার যন্ত্রণা
তোমার তাহাতে হবে কি ফল ?

আমার হৃদয়-নিলয়ে থাকিলে,
অচিরে পুড়িয়ে হইবে ছাই।
একবারে কি গো একথা ভুলিলে
মরিতে কি ভয় তোমারো নাই !

সীতার হৃদয় সহিত চেতনা,
মোরো না—মোরো না—মোরো না পুড়ে !
পতি-সোহাগিনী যে সব অঙ্গনা,
থাক গে তাদের হৃদয় যুড়ে।

সীতার হৃদয় কর পরিহার
ধর, ধর, এই মিনতি ধর !
ছুঁও না, ছুঁও না তাহারে গো আর,
জনমের মত প্রয়াণ কর।

(নির্বাসিতা-সীতা, ১৮৭৩)

ষষ্ঠ খণ্ড

তত্ত্ব-কবিতা

তত্ত্ব-কবিতা

কবি

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

চিত্রকরে চিত্র করে, করে তুলি তুলি।
কবি সহ তাহার তুলনা, কিসে তুলি ?
চিত্রকর দেখে যত, বাহ্য অবয়ব।
তুলিতে তুলিয়া রঙ্গ, লেখে সেই সব ॥
ফলে সে বিচিত্র চিত্র, চিত্র অপরূপ।
কিন্তু তাহে নাহি দেখি, প্রকৃতির রূপ ॥
চারু-বিশ্ব করি দৃশ্য, চিত্রকর কবি।
স্বভাবের পটে লেখে, স্বভাবের ছবি ॥
কিবা দৃশ্য কি অদৃশ্য, সকলি প্রকট।
অলিখিত কিছু নাই, কবির নিকট ॥
ভাব, চিন্তা, প্রেম, রস আদি বহুতর।
সমুদয় চিত্র করে, কবি-চিত্রকর ॥
পটুয়ার চিত্র ক্রমে, রূপান্তর হয়।
কবি-চিত্র কিবা চিত্র, বিনাশের নয় ॥
পটুয়ায় লেখে কত, হাত, মুখ, পদ।
কবি-চিত্রকর লেখে, শুধু মাত্র পদ ॥
পদে পদে সেই পদে, কত হাতমুখ।
বিলোকনে বিয়োগির, দূর হয় দুখ ॥
কবির বর্ণনে দেখি, ঈশ্বরীয় লীলা।
ভাব-নীরে স্নান করি, দ্রব হয় শিলা ॥
তুল্যরূপে দৃষ্ট হয়, ধন আর বন।
ভাব-রসে মুগ্ধ করে, ভাবুকের মন ॥
রসিক জনের আর, নাহি থাকে ক্ষুধা।
প্রতিপদে বর্ণে বর্ণে, কর্ণে যায় সুধা ॥
জগতের মনোহর, ধন্য ভাই কবি।
ইচ্ছা হয় হৃদিপটে, লিখি তোর ছবি ॥

(কবিতাসংগ্রহ)

শনি

মধুসূদন দত্ত

কেন মন্দ গ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে
জ্যোতিষী ? গ্রহেন্দ্র তুমি, শনি মহামতি !
ছয় চন্দ্র রত্নরূপে সুবর্ণ-টোপরে
তোমার ; সুকটিদেশে পর, গ্রহ-পতি
হৈম সারসন, যেন আলোক-সাগরে !
সুনীল গগনপথে ধীরে তব গতি ।
বাখানে নক্ষত্রদল ও রাজমূরতি
সঙ্গীতে, হেমাঙ্গ বীণা বাজায়ে অম্বরে ।
হে চল-রশ্মির রাশি, সুধি কোন্‌জনে,—
কোন্ জীব তব রাজ্যে আনন্দে নিবাসে ?
জন-শূন্য নহ তুমি, জানি আমি মনে,
হেন রাজা প্রজা-শূন্য,—প্রত্যয়ে না আসে !
পাপ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কাননে,
তব দেশে, কীট-রূপে কুসুম কি নাশে ?

(চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৫)

কবি

মধুসূদন দত্ত

কে কবি—ক'বে কে মোরে ? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেইজন,
সেই কি সে যম-দমী ? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন ?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনাসুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ ।

আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ যার আজ্ঞা মানে ;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে ;
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে ;
মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে !

(চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৫)

মাণিকপীর

দীনবন্ধু মিত্র

মাণিকপীর, ভবপারের যাবার না,
জয়নাল ফকিরি নেলে ফেনি খাবে না ॥ ধ্রু ॥
আল্লা আল্লা বল রে ভাই, নবি কর সার,
মাজা দুলিয়ে চলে যাবা ভবনদী-পার ।

শুন রে ভাই বিবরণ, নবদ্বারে আছে জীবন,
কখন্ যে পালাবে বল্‌তে নাহি পারি ;
কোরাণেতে বয়েদ্ আছে, দুনিয়েটা ক্যাবল মিছে,
খোদার নাম বিনে জান্‌বা সকলি ঝক্‌মারি ।
ব্যানে বিকেলে দু'পহরে জরু ছাবাল সাতে ক'রে,
নামাজ পড়বা মনডা করে স্থির ;
মানী লোকের রাখবা মান, গরীব লোককে কর্‌বা দান,
দরগায় গিয়ে ফেয়তা দেবা ক্ষীর ।
আপন গোণ্ডা বুঝে লেবা, পরের গোণ্ডা পরকে দেবা,
বড়গোনা কেজিয়ে করা কাজিকো হয়রাণি ।
পীর-প্যাগম্বর মাথায় ধরা, অন্ধকারে দেখে তারা,
হুসিয়ারছে কাম করনা ছোড়্‌কে সয়তানি ।
ঝুটাবাৎমে না দেবা দেল্, সত্যছে বলিবা একেল,
ভক্তিভাবে করবা পুজো বাপ-মা'র চরণ ।
গোনা বরাবর নাইকো বিষ, ভণে দ্বিজ গোলামনবিস,
এই তো ধরম-শাস্ত্রের লিখন ।

সুবুদ্ধি গোয়ালার মেয়ের কুবুদ্ধি ঘটিল,
বেসালির ভিতর দুধ্‌ রেখে পীরকে ফাঁকি দিল।
কত কীর্তি আছে রে ভাই কওয়া নাইকো যায়।
দেখ সাদির সমে দোলায় বিবি ডুলি চেপে যায়।
ওরে কদুকুমড়ো রাখলে ফেলে, তুশ্চ জেরেল ব্যাল,
আজগুবী দুনিয়ার খেলা সর্বের মধ্যি ত্যাল!
মুসলমানের মোল্লা রে ভাই, হাঁদুর মধ্যি সাধু,
কদুকুমড়া ছেড়ে দিয়ে আকির মধ্যি মধু।
আসমানেতে ম্যাগে খেলা করে সিংহলাদ,
আর দিনের বেলায় সূর্য ওঠে রাত্তির বেলায় চাঁদ।
পাহাড়ের প্রকাণ্ড হাতী, শিক্‌লি বাঁধা পায়,
আর ঘরজামায়ে শ্বশুরবাড়ী মেগের নাতি খায়।
কত কেরামৎ জান রে বান্দা, কত কেরামৎ জান,
মাঝ-দরিয়ায় ফেলে জাল ডেঙ্গায় বসে টান।
দুর্গার ছাওয়াল কাত্তিক রে ভাই, মোরগ চেপে যায়,
আর পূজো পালি বাঁজাবিবির ছাওয়াল করে দেয়।
রাত্তির বেলায় ভূতির ডরে ডরিয়ে ওঠে ছেলে,
আর ছুড়কো মেয়ে ঝমকে ওঠে খসম কাছে এলে।
বিরহিণী বিবি আমার গো, বাঁদে নাকো চুল,
কলজেতে ফুট্‌চে কাঁটা পঞ্চবাণের হুল।
সায়েরে গিয়েচে স্বামী, হাবলী আঁধার করে,
পরাণ জ্বলে গেল বিবির কুকিলের ঠোকরে।
মুখ ঘামেচে বুক ঘামেচে বিবির ভাসে যাচ্চে হিয়ে,
খসম যদি থাকত কাছে রে পুঁচ্‌ত রুমাল দিয়ে।
পিঁড়ের বসে কাঁদছে বিবি ডুবি আঁখির জলে,
মোল্লারে ধরেছে ঠাসে, খসম খসম বলে।
ষাঁড়ের মাথায় শিং দিয়েছে, মানুষির মাথায় কেশ,
আল্লা আল্লা বলরে ভাই, পালা কল্লাম শেষ।

(জামাইদের গান. 'জামাইবারিক' প্রহসন)

ফিকিরচাঁদের বাউল-সঙ্গীত

কাঙাল হরিনাথ মজুমদার

১

ওহে, দিন ত গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্তা, শুনে বার্ত্তা, ডাক্‌ছি হে তোমারে ॥
আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে
(ওহে, আমায় কি পার করবে নাহে, আমায় অধম বলে)
যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে ॥

যাদের পথ-সম্বল, আছে সাধনার বল,
(তারা পারে গেল আপন আপন বলে হে)
(আমি সাধনহীন তাই রইলেম পড়ে হে)
তারা নিজ বলে গেল চলে, অকূল পারাবারে ॥

শুনি, কড়ি নাই যার, তুমি কর তারেও পার,
(আমি সেই কথা শুনে ঘাটে এলাম হে)
(দয়াময় ! নামে ভরসা বেঁধে হে)
আমি দীন ভিখারী, নাইক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে ॥

আমার পারের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল,
(তাই দয়াময় বলে ডাকি তোমায় হে)
(তাই অধমতারণ বলে ডাকি হে)
ফিকির কেঁদে আকুল, পড়ে অকূল সাঁতারে পাথারে ॥

২

দেখ ভাই জলের বুদ্‌বুদ্‌, কিবা, অদ্ভুত, দুনিয়ার সব আজব খেলা ॥
আজি কেউ পাদ্‌সা হয়ে, দোস্ত লয়ে, রংমহলে করছে খেলা ;
কাল আবার সব হারায়ে, ফকীর হয়ে, সার করেছে গাছের তলা।
আজি কেউ ধনগরিমায়, লোকের মাথায়, মারছে জুতা এরিষ্টতলা ;
কাল আবার কোপ্‌নী প'রে, টুক্‌নী ধরে, কাঁধে ঝোলে ভিক্ষার ঝোলা।

আজ রে যেখানে সহর, কত নহর বসিয়াছে বাজার মেলা ;
কাল আবার তথায় নদী, নিরবধি, করছে রে তরঙ্গ-খেলা।
কাঙ্গাল কয় পাদ্‌সা উজীর, কাঙ্গাল ফকীর, সকলি ভাই ভোজের খেলা ;
মন তুমি যখন যা হও, ঠিক পথে রও, ধর্মকে ক'র না হেলা।

৩

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাক্‌তে।
তবে কি মা, এমন করে, তুমি লুকায়ে থাক্‌তে পার্‌তে ॥
আমি নাম জানিনে, ডাক জানিনে
আবার পারি না মা, কোন কথা বল্‌তে ;
তোমায়, ডেকে দেখা পাইনে তাইতে, আমার জনম গেল কান্‌তে ॥
দুঃখ পেলে মা, তোমায় ডাকি,
আবার, সুখ পেলে চুপ করে থাকি ডাকতে ;
তুমি মনে বসে, মন দেখ মা, আমায় দেখা দাও না তাইতে।
ডাকার মত ডাকা শিখাও,
না হয়, দয়া করে দেখা দাও আমাকে ;
আমি, তোমার খাই মা, তোমার পরি, কেবল ভুলে যাই নাম করতে।
কাঙ্গাল যদি ছেলের মত,
মা তোর, ছেলে হ'ত তবে পার্‌তে জান্‌তে ;
কাঙ্গাল, জোর ক'রে কোল কেড়ে নিত, নাহি মর্‌ত বলে মর্‌তে ॥

৪

অরূপের রূপের ফাঁদে, পড়ে কাঁদে, প্রাণ আমার দিবানিশি
কাঁদলে নির্জনে বসে, আপনি এসে, দেখা দেয় সে রূপরাশি ;
সে যে কি অতুল্য রূপ, নয় অনুরূপ, শত শত সূর্য শশী ;
যদি রে যাই আকাশে, মেঘের পাশে, সে রূপ আবার বেড়ায় ভাসি ;
আবার রে তারায় তারায়, ঘুরে বেড়ায়, ঝলক লাগে হৃদে আসি।
হৃদয় প্রাণ ভরে দেখি, বেঁধে রাখি, চিরদিন সেই রূপশশী ;
ওরে, তায় থেকে থেকে, ফেলে ঢেকে, কুবাসনা-মেঘরাশি।
কাঙ্গাল কয় যে জন মোরে, দয়া করে দেখা দেয় রে ভালবাসি ;
আমি যে সংসার-মায়ায়, ভুলিয়ে তাঁয়, প্রাণ ভরে কৈ ভালবাসি।

৫

দিন ত ফুরায়ে গেল, সেদিন এল,
উপায় কি রে হবে এখন।
সেই মাতৃগর্ভ হতে তোর পশ্চাতে, ফিরিতেছে যে কাল শম ;
সে ত রে কাল পাইয়ে, পাছ ছাড়িয়ে,
সম্মুখে দিল দরশন। (পরমায়ু শেষ দেখিয়ে)
ওরে জীব ! তাই যে শুধাই, ও কার দোহাই, দিবি কাল
করিতে বারণ ;
শমন তোর পদ পদার্থ, ধন অর্থ,
কোন কথা করবে না শ্রবণ (জাতিকুল বিদ্যা যশের)
হরির চরণ-নির্মাল্য, নাই তার তুল্য, শমন করিতে দমন ;
ফিকির কয় সেই অমূল্য, সুনির্মাল্য
মাল্য কণ্ঠে কর ধারণ, (নইলে শমন-ভয় যাবে না)
কাঙ্গাল কয় রে নির্মাল্য, ছেড়ে মাল্য, অন্য মাল্য পরে যে জন ;
সে মাল্য শ্মশানতলে, ছিঁড়ে ফেলে,
তাতে হয় না শমন দমন। (নির্মাল্য-মাল্য বিনে) !

৬

বহে ভবনদীর নিরবধি খরধার।
দেখ, ক্ষণকাল বিরাম নাই এই দরিয়ার ॥

ডিঙ্গা ডেঙ্গি পিনাশ বজ্‌রা, মহাজনী নৌকায়,
পাপী তাপী সাধুভক্ত, চড়নদার তার সমুদায়।
ভাসিছে দরিয়ার জলে, ইচ্ছামত নৌকা চলে ;
হাল ধরে তার সুকৌশলে, বসে আছে কর্ণধার ॥ মন সবার,
কর্ণধারের ইচ্ছামত, কেহ চলে উজায়ে,
মনের সুখে জ্ঞান-মাস্তলে, ভক্তিপাল উড়ায়ে।
কেহ আবার মনের দোষে, ভেটে নেতে যাচ্ছে ভেসে
পাকে ফেলে অবশেষে, ডুবায় তরী কর্ণধার ॥ মন সবার,
কেহ আবার ক্রমাগত বলে বলে ভাটিয়ে,
অপার সাগরে, পড়ে নদীর মুখ ছাড়িয়ে।
সাগরের তরঙ্গ ভারি, স্থির নাহি থাকে তরী ;
লোনা জলে জীর্ণ করি, ডুবায় তরী কর্ণধার ॥ মন সবার,
সাধু মহাজন যত, বাদাম তুলে দরিয়ায়,
সুবাতাসে চলে তারা, মুখে নামের সারি গায়।
ঠিক না থাক্‌লে হালি, অমনি নৌকা করে গালি :
গুপ্ত চড়ায় চোরা বালি, ডুবায় তরী কর্ণধার ॥ মন সবার,
কাঙ্গাল বলে কাঙ্গালের পুঁজি পাটা যা ছিল,
বারে বারে ডুবে ভবে, সকলি ত খোয়াল।
খাবি খেয়ে অনেক কাল, আবার তুলে দিলাম পাল ;
সাবধানে ধর হাল, বিনয় করি কর্ণধার ॥
মন সবার ॥

৭

তাঁরে পাবিনে কখন ওরে ও মন, নাহি থিতালে
ওরে তোর হৃদয়-জল বড় ঘোলা,
ঢেউ উঠিয়া বাতাস তুলে ॥ (সংসার মেঘে)
দেখ দেখি মন সেই কথা মনে,
ওরে, নিজান জলে মুখ দেখা যায় সকলেই জানে :
আবার পাড়ি-ভাঙ্গা ঘোলা পাঙ্গা দেখা যায় কি সেই জলে
(আপনার মুখ)

স্থির ভাবে মন থাকরে বসিয়ে
যত কাদামাটী ক্রমেরে তোর যাবে নিজায়ে ;
তখন নিজের ঘরে সরোবরে দেখা পাবি ভাবিলে ॥
(নির্মল জলে)

নড়িস্ নে মন, টলিস্ নে আর,
ওরে, সংসার-মেঘে সদা আছে বাতাসের সঞ্চার ;
তুমি ঠিক না থাক্‌লে, চঞ্চল হলে, দেখ্‌বে আঁধার চোক বুজ্‌লে ॥
(ঘোলা জলে)

কাঙ্গাল কয় সংসার-বাসনা
আমার ঘোলা জল, ঘোলা করে, থিতাতে দেয় না ;
আমার ঘোলায় ঘোলায় দিন কেটে যায় হোলনা মোর কপালে
(জলে মুখ দেখা)।

৮

অনন্ত রূপের সিন্ধু উথলি উঠিল গো।
কিবা ভুবনমোহন, রূপের তরঙ্গে ভুবন ভুলাল গো।
হৃদে ছিল রূপবিন্দু ক্রমে সিন্ধু হ'ল গো ;
আহা নয়নে পশিয়ে, ধরণী ভাসায়ে হিমগিরি
ডুবিল গো।
রূপের তরঙ্গে আবার ভুবন ছাইল গো ;
আহা বিমল বাতাসে আকাশে আকাশে,
সে তরঙ্গ ছুটিল গো।
ভানু শশী সৌদামিনী সে রূপে ভাসিল গো ;
সংখ্যাশূন্য তারাদলে রূপস্রোতঃ চলে, রূপমদে
পাতাল গো।
অনন্ত এ রূপসিন্ধু, নাহি ইহার কূল গো।
রূপে সন্তরণ দিয়ে কূল নাহি পেয়ে
মাতিয়ে রহিল গো। (কাঙ্গাল)।

সুষুপ্তি

বলদেব পালিত

নিরমল, সুশীতল সুধাকর-করে,
দুগ্ধ-ফেন-নিভ সুখ-শয্যার উপরে,
স্বর্ণ-লতা-সমা প্রাণ-প্রেয়সীর পাশে,
সুপ্ত ছিলে এতক্ষণ বাঁধা ভুজ-পাশে ;
দিবসের ক্লেশলেশ ছিল না অন্তরে,
'চিন্তা'-নিশাচরী ছিল লুকায়ে অন্তরে,
অনঙ্গে অবশ অঙ্গ প্রিয়া-সমাবেশে
স্পন্দহীন হয়েছিল নিদ্রার আবেশে ;
শিথিল ইন্দ্রিয় সব ছিল যেন শব,
কেবল নিশ্বাসে হতো প্রাণ অনুভব ;
হেনকালে জলদের গভীর গরজে,
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর নয়ন-সরোজে।
সুষুপ্তির ভোগে ভাল তৃপ্তি পেলে, মন ;
মহানিদ্রা একবার কর রে স্মরণ।
কোথা রবে তখন এ শয্যা সুবিমল ?
যার কাছে হারিয়াছে কোমল কমল।
রূপে জিনি ক্ষণ-প্রভা, ক্ষীরোদ-সম্ভবে,
হৃদি-বিলাসিনী কান্তা বল কোথা রবে ?
একামাত্র রবে তুমি শ্মশানে শয়ান ;
ধূলায় মলিন হবে নলিন-বয়ান।
বিম্ব-প্রতিবিম্ব চারু নধর অধর
রক্তাভাবে পাণ্ডুবর্ণ হবে অতঃপর।
গোলাবেরে যে কপোল নিন্দিছে এখন,
কিরূপ বিরূপ হবে ভাব দেখি, মন ?

প্রেয়সীর প্রেম-পূর্ণ পীযূষ-বচন,
যে শ্রবণ অনুক্ষণ করিছে শ্রবণ ;
আহা ! তাহা একেবারে বধির হইবে,
কিছুতেই তারে পুনঃ জাগাতে নারিবে।
নিন্দি ইন্দীবর তব যে দুই নয়ন
প্রিয়া-চাঁদ-মুখ হেরি সুখী প্রতিক্ষণ,
সীমাহীন অন্ধকারে মুদিত রহিবে ;
সে সময় কিছু আর দৃশ্য না হইবে।
কদম্বকুসুম সম, উল্লাসের ভরে,
প্রিয়াঙ্গ-পরশমাত্র যে গাত্র শিহরে,—
যে কর প্রেয়সী বক্ষে করিয়া অর্পণ,
মদন রাজারে কর কর সমর্পণ,—
চিতার সহিত সব পুড়ে হবে ছার ;
কোন অংশ না থাকিবে পূর্বের আকার।
কিম্বা, ভাগ্যদোষে, থাকি শ্মশানে পতিত,
হবে জীর্ণ, কীটাকীর্ণ, পলিত, গলিত।
অনিত্য, অস্থায়ী এই শরীর তোমার
কি হেতু ইহাতে এত স্নেহ কর আর ?

(কাব্যমঞ্জরী, ১৮৬৮)

আশা, প্রমোদ ও প্রেম

বলদেব পালিত

অস্তাচলে যে সময় যান দিনকর,
নভো-দেশে কিবা শোভা ধরে জলধর !
রক্ত, পীত, নীল আদি বিবিধ বরণ—
অন্তরে থাকিয়া করে অন্তর হরণ !

কিন্তু সে সুচারু-শোভা শুধু বাষ্পময় ;
চিত্র-ভানু-করে চিত্র করা সমুদয় !
বারেক যদ্যপি বহে প্রবল বাতাস,
একেবারে সে সকল ছবি হয় নাশ।
তেমতি অসার এই আশার আশ্বাস ;
দূর হতে মনোমধ্যে কতই বিশ্বাস,
ভাবী-সুখ-ভাবনায় মোহিত হৃদয়
বর্ত্তমান ক্লেশ কিছু অনুভূত নয়।
ভাগ্যবলে বাঞ্ছা-ফল যদি কেহ পায় ,
তৃপ্তি নাহি হয় তার শ্রম কিন্তু যায় ;
দুর্ভাগ্য-সমীর যদি নিদারুণ বয়,
আশার মায়ার জাল ছিন্ন ভিন্ন হয় !

আমোদ কিসের মত ? জলবিম্বপ্রায়—
ক্ষণেকে উদ্ভব হয় ক্ষণেকেই যায় ,
লজ্জালু লতার ন্যায় অতি সুদর্শন,
পরশ করিবামাত্র ম্লান সেই ক্ষণ ,
কিম্বা পুষ্পমালা যথা সমাধি-মন্দিরে,
শোক-আবরণ-মাত্র, সুদৃশ্য বাহিরে।

পিরীতি জলধিবৎ দুস্তর বিষম ;
যুবক নাবিকদের অতি মনোরম।
সুচতুর সাবধানী যেই কর্ণধার,
রমণী-তরণী লয়ে হয় সেই পার।
বিশ্বাস-বাতাসে পালি দিয়া মনোমত,
রস-রঙ্গ-তরঙ্গে ভাসিতে হর্ষ কত !
মানের আবর্ত্ত হতে ফিরাইয়া তরী,
আপনারে ধন্য মান শ্লাঘা মনে করি ;
কিন্তু ছল মসিনায় পড় যদি ভুলে,
আক্ষেপের সীমা নাই পড়িয়া অকূলে ;

অথবা বিচ্ছেদ-শৈলে ঠেকি, একেবারে
ছাড়াছাড়ি যদি হয় তরি কর্ণধারে,
উভয়েই ভগ্নদশা মগ্ন শোক-নীরে ;
কিছু নাই উপায় আসিতে পুনঃ তীরে।

(কাব্যমঞ্জরী, ১৮৬৮)

প্রিয়-বিরহ

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

বিনা প্রিয়জন রম্য উপবন,
কণ্টক-কানন প্রায় ;
পুষ্প-বিরচন কোমল শয়ন,
তৃণশয্যা তুলনায় ;

সুভক্ষ্য নিশ্চয় বিষময় হয়,
লুকায় সুতার তার ;
নিরখি নয়নে দিবস তখনে
তমঃপূর্ণ ত্রিসংসার।

কিন্তু যে সময়, প্রিয়সঙ্গে রয়,
বন উপবন হয়।
দূর্বাদলচয় সুখ-শয্যা হয়,
পুষ্পশয্যা তুল্য নয় ;

পর্ণ-বিরচিত উটজ নিশ্চিত
সৌধসম শোভা ধরে ;
তিক্ত ফলচয় হয় সুধাময়
অহো কি তৃপ্তি বিতরে !

ঘোর তমস্বিনী সে অমা-যামিনী
সেই পৌর্ণমাসী হয় ;
দুঃখ ঘটে যায় সুখবোধ তায়,
অসুখ লেশ না রয়।

(সদ্ভাবশতক, ১৮৬১)

প্রণয়-কানন

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

অতিশয় ভয়ঙ্কর প্রণয়-কানন
অশেষ আতঙ্ক-তরু পরশে গগন।
শাখা-প্রশাখায় তারা গহন এমন,
প্রবেশে না মাঝে জ্ঞান-তপন-কিরণ।
হতাশা-কণ্টকীলতা বেষ্টিত তথায়,
পায় পায় বিদ্ধ হয় প্রেমিকের পায় ;
বিষম বিরহ-ব্যাঘ্র বিকট-বদন,
নিয়ত এ বনে করে ভীষণ গর্জন।
নিনাদে তাহার হায়! নিনাদে তাহার,
কত প্রেমিকের প্রাণ ত্যজে দেহাগার।
প্রিয়-প্রেম-সুখ-মৃগ, এ প্রেম গহনে,
হরে প্রেমাকাঙ্ক্ষি-মন মোহন নর্তনে।
করিতে গ্রহণ তারে অনেকেই ধায় ;
বিরহ-শার্দূল-গ্রাসে শেষে মারা যায়।
যে প্রেমিক সাহস-মাতঙ্গোপরি চড়ি
সহিষ্ণুতা দৃঢ়বর্মে সর্বাঙ্গ আবরি,
নির্ভয়ে প্রবেশে প্রেম-বিপিন মাঝার,
নিরাশা-কণ্টক নাহি ফুটে দেহে তার ;

বিরহ-শার্দূল নারে গ্রাসিবারে তায়,
প্রিয়-প্রেম-সুখ-মৃগ ধরিতে সে পায়।
হাফেজ! যগুপি পার এরূপ করিতে,
প্রিয়-প্রেম-সুখ-মৃগ পারিবে ধরিতে।

(সদ্ভাবশতক, ১৮৬১)

বিমুগ্ধের প্রতি

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

অল্পে অল্পে নিরন্তরে কাল-বিভাকর-করে
দ্রব হয় জীবন-তুষার;
যবে জ্ঞান-নেত্রে চাই তখনি দেখিতে পাই
অবশেষে অল্প আছে আর।

মরণ নিকট অতি তথাপি রে মূঢ়মতি,
মোহ-ঘুমে র'লি অচেতন;
জাগ জাগ একবার, কি হেতু বিলম্ব আর
গম্যস্থানে করহ গমন।

রঞ্জিত প্রভাতরাগ, তামসীর শেষভাগ
পান্থজন—গমন-সময়,
ঘুমে রয় যে তখন, গম্যস্থানে সে কখন
সময়ে উত্তীর্ণ নাহি হয়।

আয়ু-নিশি প্রায় ভোর, গমন-সময় তোর,
নিদ্রা ত্যজি উঠ পান্থমন!
এবে না শুনিলে ভাষ সে নিত্য-সুখদ বাস
যাইতে না পারিবে কখন।

(সদ্ভাবশতক, ১৮৬১)

সুচারু বিশ্ব

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

মরি কিবা শোভাময় এ ভব-ভবন,
যখন যেদিকে চাই জুড়ায় নয়ন।
দিবানিশি রবি শশী প্রকাশি গগনে,
ভুবন উজ্জ্বল করে বিমল কিরণে!
স্থলজ কুসুমজালে শোভা করে স্থল,
কমলে শোভিত কিবা সরসী-কমল।
শ্যামল বিটপিদল কিবা শোভা ধরে।
লতার ললিতরূপ আঁখি মুগ্ধ করে॥
বারিধির ভীমরূপ শোভার ভাণ্ডার।
হেরিয়া না হয় মন বিমোহিত কার?
যে করেছে কোন দিন গিরি আরোহণ,
সে জানে ভূধর-শোভা বিচিত্র কেমন!
কোন স্থানে বেগবতী স্রোতস্বতীগণ
অধোমুখে খরবেগে বহে প্রতিক্ষণ!
স্থানে স্থানে কত শত কন্দরনিকরে,
অহহ! স্বভাব কিবা চারু শোভা ধরে।
কোন স্থানে চরিতেছে মাতঙ্গের দল,
কোন স্থানে ক্রীড়া করে কুরঙ্গ সকল।
এইরূপ জগতের শোভা সমুদয়
ভাবি' ভাবরসে ভাসে ভাবুকনিচয়।
এ সব স্বভাব-শোভা, রচিত যাঁহার,
হাফেজ! মজ না কেন প্রেমরসে তাঁর!*

(সদ্ভাবশতক, ১৮৬১)

---

* দ্বিতীয় সংস্করণে পাঠান্তর—
বিচিত্র বিশ্বের চিত্র কে বুঝিবে তাঁর।

ঈশ্বর-প্রেম

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

যদ্যপি যতন করে শত জন,
জীবন হরিতে ছলে।
তুমি সখা যার, বল হে তাহার
কি ভয় জগতী-তলে ?

তব প্রেম-সুধা পিয়ে ক্ষোভ ক্ষুধা
যে জন হরিতে পারে।
বল প্রিয় ! বল জঠর-অনল,
কি দুখ দিবে তাহারে ॥

তব প্রেম-ধনে ধনী যে অধনে
কে দীন তাহারে বলে ?
প্রমত্ত সে নয় প্রমত্ত যে হয়
তব প্রেম-সুরা-বলে ॥

প্রণয়ের তানে প্রেমগুণ-গানে
মানস মোহিত যার।
কোকিল-নিস্বন, অখিল গুঞ্জন
হয় কি রঞ্জন তার ?

প্রেম-কুতূহলে তব প্রেম-জলে
যে জন দিয়েছে ঝাঁপ।
কহ প্রেমাধার ! কি করিবে তার,
বিরহ-তপন-তাপ ?

(সদ্ভাবশতক, ১৮৬১)

বিশ্বের শিল্পচাতুরী

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

হে নাথ। কি শিল্প-চাতুরী তব,
কার সাধ্য তবে বর্ণে সে সব।
যখন বিশ্বের যে দিকে চাই,
কতই কৌশল দেখিতে পাই।
প্রকৃতির মনোমোহন কায়
—যে শিল্পচাতুর্য প্রকাশে হায়,
এ জগতে নাই তুলনা তার;
তব সম শিল্পী কে আছে আর?
এই যে সুনীল গগনতল,
—শোভা পায় যায় জ্যোতিষ্কদল,
ফুল্ল-ইন্দীবর-নিকর-ময়,
নীলাম্বুধি-সম প্রতীত হয়;
এই যে বিধুর মোহন কায়,
নয়ন জুড়ায় হেরিলে যায়,
যাহার সুচারু বিমল ভাস,
করেছে উজ্জ্বল এ বিশ্ববাস:
এই যে বালার্ক আরক্তকায়,
প্রফুল্ল পঙ্কজ নিরখি যায়,
তিমির তরঙ্গ ঠেলিয়া করে,
উঠিছে ক্রমশঃ মস্তক পরে,
আলোকে পূরিল অখিল বিশ্ব,
প্রকাশিছে অতি বিচিত্র দৃশ্য;
এই যে শেখর প্রকাণ্ড অতি,
রোধ করিয়াছে ভাস্কর-ভাতি,
তুষার-মণ্ডিত শিখর যার,
কটিদেশে শোভে জলদহার;

বিবিধ প্রসূনে ভূষিত কায় ;
মুগ্ধ হয় মন হেরিলে যায় ;
এই যে নীরধি ভীষণতর,
গগন নমিত যাহার পর,
ফেনপুঞ্জে শোভে সুনীল জল,
শুভ্র অভ্রে যথা গগনতল,
কেলি করে তুঙ্গ তরঙ্গদলে,
ঝক্‌মক্‌ ভানু-কিরণে জলে ;
এই যে সুরম্য শস্যের ক্ষেত্র,
নিরীক্ষণে যাহা জুড়ায় নেত্র,
শ্যামল-বরণ বিটপিদল,
আরক্ত সুপক ধান্য সকল,
একত্র দ্বিবিধ-বরণ-ভাস,
মনোহর দৃশ্য করে প্রকাশ ;
এই যে ললিত লতিকাচয়,
প্রফুল্ল প্রসূনে সুশোভাময়,
আদরে দুলিছে অনিলভরে
দর্শকের অক্ষি বিমুগ্ধ করে।
হে নাথ! তোমারি রচিত সব,
ধন্য ধন্য! শিল্পচাতুরী তব,
তুমিই ময়ূর-কলাপচয়
করেছ এমন সুচিত্রময়,
তুমিই সুরম্য-কুসুম-কারু,
তুমিই গড়েছ নৃমুখ চারু,
নিরখি এসব হায়! যে জন,
তব প্রেমপাশে বাঁধেনা মন
বিফল জনম তার নিশ্চয়,
পশু বলি তারে, নর সে নয়!

(সদ্ভাবশতক, ১৮৬১)

অর্থ

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

অরে অর্থ! কিবা তোর মোহ চমৎকার!
করেছিস মুগ্ধ তুই অখিল সংসার।
কি বালক—কি যুবক কিবা বৃদ্ধগণ,
মোহিত মায়ায় তোর সকলেরি মন।
এই যে কৃষক করে ভূমি করষণ,
সহন করিছে খর তপন-কিরণ;
এই যে বণিক জন্মভূমি পরিহরি,
পরিজন-স্নেহের বন্ধন ছেদ করি,
বাণিজ্য-তরণী 'পরে করি আরোহণ,
গভীর-সাগর-নীরে হতেছে মগন;
এই যে কিঙ্করগণ সভয় অন্তরে,
অনুক্ষণ পালন প্রভুর আজ্ঞা করে;
এই যে নৃশংসচিত্ত দস্যু দুরাচার,
করিছে নৃ-শোণিতাক্ত অসি আপনার;
এই যে ভীষণতর সমর-সাগর,
বহিছে রক্তের স্রোত যাহে খরতর;
এ সকল অরে অর্থ! শুধু তোর তরে,
আর কে এমন আছে এরূপ যে করে?
উপেক্ষিয়া সুখময় পরমার্থ-ধন,
তোর তরে দেয় নরে আয়ু বিসর্জন।
সহস্র দাসের প্রভু কিঙ্কর তোমার,
আছে আর এমন প্রভুত্ব-পদ কার?
ত্রিভুবন-মোহিনীর হর তুমি মন,
মোহন মূরতি আর কাহার এমন?

বাজাইয়া মধুর মুরলী কুঞ্জে কালা,
ভুলাইত গোকুলের যত কুলবালা।
কুহুরব মধুকালে কুহু কুহু স্বরে,
প্রণয়ী জনের মন বিমোহিত করে।

কুরঙ্গ বাঁশীর রবে মাতোয়ারা হয়,
শঙ্খনাদে উল্লসিত শঙ্কর-হৃদয় ;
কিন্তু সুমধুর রবে রে অর্থ! তোমার,
একেবারে মুগ্ধ হয় অখিল সংসার।

কি করিলা দাশরথি প্রিয়া-অন্বেষণ,—
প্রিয় অন্বেষিলা কিবা ব্রজগোপীগণ ;
করে লোকে অন্বেষণ তোমার যেমন ;
করে নাই কেহ কার তত অন্বেষণ।

গভীর সাগর-গর্ভে, ভূমির ভিতরে,
দুর্গম গহন বনে, শিখরে গহ্বরে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা আদি করি পরিহার,
অন্বেষণ তব লোকে করে অনিবার।

হয় হউক বিপদ যতই ভয়ঙ্কর,
তাদের নিকটে তাহা অতি তুচ্ছতর।
সাগরের তরঙ্গ হিংস্রক যাদোগণ,
ভূগর্ভের নানাবিধ উৎপাত-ঘটন,
গিরিশৃঙ্গে শার্দুল কেশরী বিষধর,
শঙ্কিত করিতে নারে তাদের অন্তর!
হেলে সর্ব বিপদ সহিত করে রণ,
এমনি উৎসুক তারা তোমার কারণ!
বটে বটে বটে অতি প্রিয় পুত্র-প্রাণ!
কিন্তু প্রিয়তর তুমি, নহে নহে আন্।
নতুবা কি হেতু সেই তনয়ের সহ,
বিনিময় করে তব দেখি অহরহ!

কেন কেন সৈন্যগণ, উৎসাহিত মনে,
জীবন আহুতি দেয়, সমর-দহনে ;
পুত্র-প্রাণ হতে তোরে প্রিয় ভাবে ভাই.
দেখিতেছি এমন অদ্ভুত ভাব তাই।
হায় ! যে পরম ধন সংসারের সার,
তার চেয়ে করে লোকে আদর তোমার !

ধর্মার্জনে পলেক অনেকে রত নয়,
করিছে তোমার তরে পরমায়ু ক্ষয় !
যদিও বা ধর্ম ধর্ম বলে কোন জনে,
সেই শুধু তাহে অর্থ ! তোমার কারণে !
তোমারে উপেক্ষা করি আদরে ধরম,
এ জগতে তেমন ধার্মিক আছে কম।

এই যে পথিক, মাখা ভস্ম কলেবর,
গলায় হাড়ের মালা ব্যাঘ্রচর্মাম্বর,
দীর্ঘ জটাভার শিরে ঊর্ধ্বনেত্রে চলে,
"বম্ বম্ মহাদেব" ঘন ঘন বলে,
সত্য সত্য তাহে অর্থ ! জানিবে নিশ্চয়,
তুমিই ইহার ইষ্ট, অন্য কেহ নয় !
শঙ্করের ভক্ত এরে ভ্রান্ত লোকে কয়,
ফলে এ তোমার ভক্ত নাহিক সংশয়।

বাহ্য ধার্মিকতা হেন দেখায়ে অনেকে,
ঘুরিতেছে তব তরে নানারূপ ভেকে !
হায় রে ! যে দয়া নর-হৃদয়-ভূষণ,
সেও উপেক্ষিত অর্থ ! তোমার কারণ !
তোমার দুর্দম লোভে নিদয় অন্তরে,
কত না প্রবলে হায় ! ব্যভিচার করে,
বলে দুর্বলের ভগ্ন কুটীরে পশিয়া,
হাসিয়া মুখের গ্রাস লইছে কাড়িয়া।

কতজনে প্রলোভনে ভুলিয়া তোমার,
রঞ্জিতেছে নর-রক্তে অসি আপনার !
তিলেক গৌরব তারা না রাখে দয়ার ;
রে অর্থ ! সাবাসি তোরে শত শত বার !
বটে বটে স্বাধীনতা প্রিয় অতিশয় ;
সেও এবে তোর কাছে কিন্তু কিছু নয়।
যেমন দুর্দশা তার হয়েছে এখন,
যখন স্মরণ করি কেঁদে ওঠে মন।
প্রাণদানে পূর্বে যারে রাখিত গৌরবে,
হাটে ঘাটে এবে তারে বেচিতেছে সবে।

এই যে প্রবাসীগণ প্রবাসে রহিয়া,
স্বজন-বিরহে মরে দহিয়া দহিয়া,
শোণিত-শোষিণী নানা যাতনা সহিয়া
শুকায় শরীর আজ্ঞা' বহিয়া বহিয়া,
রে অর্থ ! কাহার তরে ? কার তরে আর,
কেবল তোমারি তরে, অহো চমৎকার !
ভাল—ভাল ভাল তোর মায়ার কৌশল,
ভাল করেছিস তুই সংসার পাগল !
কিন্তু লোভ-পরিশূন্য আমার এ মন ;
তোমার ও মোহে মুগ্ধ নহে কদাচন।
যে পরম-অর্থ-প্রেমে মুগ্ধ মমান্তর
তাহায় তোমায় আছে—অনেক অন্তর।
কিঞ্চিৎ ঐহিক সুখ কর তুমি দান,
সে অর্থেতে নিত্য সুখ করে সংবিধান ;
মরণ পর্যন্ত রহে সম্বন্ধ তোমার,
মরিলেও নাহি ঘুচে সম্বন্ধ তাহার।
হতে পারে তব লাভ-যতন বিফল,
সে অর্থ-প্রলাভ-যত্ন সর্বদা সফল।

এ জগতে করে যেই তোমায় অর্জন,
পারে বটে সৌধে বাস করিতে সে জন ;
কিন্তু যে সঞ্চয় সেই পরমার্থ করে
দেব-প্রার্থনীয় ধাম লভে মৃত্যুপরে।
যে ভৃঙ্গ স্বর্গীয় পুষ্পে করিছে বিহার,
মর্ত্ত্য ফুলে কি গুণে ভুলাবে মন তার ?
যে মরাল কেলি করে মানসসাগরে,
কূপজলে কেলির বাসনা সেকি করে ?
যে চাতক নাহি জানে বিনা জলধর,
কে কবে দেখেছে তারে পুকুর ভিতর ?
পরম অর্থের প্রেমে মুগ্ধ যার মন,
মজিবে সে তোর প্রেমে কিসের কারণ ?
প্রভেদ সে অর্থ সনে বিস্তর তোমার,
উপমার স্থল নহে স্বর্গ মর্ত্ত্য তার।
কিন্তু সেই পরমার্থ লাভ যেই করে,
দেবতার প্রিয়ধাম লভে মৃত্যুপরে।

(সদ্ভাবশতক, ১৮৬১)

জীবের প্রতি উপদেশ

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

যাঁহার সমীর জীব! তালবৃন্ত প্রায়
সুশীতল করে তব সন্তাপিত কায়।
যাঁহার করুণা নীররূপে অনুক্ষণ
নির্বাণ করিছে তব তৃষা-হুতাশন ;

যাঁহার আদেশক্রমে কাদম্বিনীগণ
দান করি পয়োধরা ধাত্রীর মতন,
ধরণীর শস্যরূপ সুসন্তানগণে
পালন করিছে শুধু তোমার কারণে ;
যাঁর কৃপা বিরচিত মহীরুহদল
সহ্য করি শীতাতপ যাতনা সকল,
প্রসবিছে নানারূপ ফল প্রতিক্ষণ,
শুধু তব রসনার তৃপ্তির কারণ !

বিনোদ-বিপিনরূপে নাট্যশালে যাঁর,
অভিনেতা কোকিল কুরঙ্গ অনিবার,
গায়ক নর্তক সম গায় নৃত্য করে,
তোমার শ্রবণ আঁখি তুষিবার তরে ;
যাঁহার আদেশ করি মস্তকে ধারণ,
ঋতু শ্রেণী সৈরিন্ধ্রীর সম অনুক্ষণ,
সাজাইছে প্রকৃতির অঙ্গ সুশোভন,
কেবল করিতে তব লোচন-রঞ্জন ;
ভুল না ভুল না তাঁরে ভুল না কখন,
প্রেম পুষ্পে কর তাঁরে সতত অর্চন।

হে জীব ! সামান্য ধন দেয় যেই জন,
তার প্রতি এমন কৃতজ্ঞ তব মন।
কিন্তু যে করিল দান অমূল্য জীবন,
কৃতজ্ঞ তাঁহার প্রতি নহ কি কারণ।

কিঞ্চিৎ দুঃখের নাম সুখের বর্দ্ধন,
করে যারা করিয়া করুণা বিতরণ ;
তাহাদের ভক্তিভাবে গদগদ মন,
রসনায় কর কত গুণানুকীর্তন।

কিন্তু যাঁর নিরপেক্ষ করুণার তরে
জীবন রয়েছে তব জননী জঠরে।

পরম আনন্দে যাঁর করুণা কারণ
করিয়াছ সুকুমার শৈশব যাপন।
যাঁহার করুণা হেতু যৌবনে এখন
করিছ বিবিধ সুখ-রস আস্বাদন।
দেহপুর পরিহরি করিলে প্রয়াণ,
দয়া করি করে যেই নিত্য সুখদান
কেন তাঁর ভক্তিভাবে মগ্ন নয় মন,
কেন তাঁর গুণগানে বিমুখ এমন।

(সদ্ভাবশতক, ১৭৬১)

ঈশ্বরই আমার একমাত্র লক্ষ্য

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

যেই ফুলে নিরন্তর মম মন মধুকর
মধুপানে উৎসুক হৃদয় ;
ফুল্ল যেই সর্বক্ষণে সময়ের বিবর্তনে
পরিম্লান কভু নাহি হয়।
সেই ধন অন্বেষণে ভ্রমি আমি বনে বনে
সজল নয়নে অনুক্ষণ ;
সম্বন্ধ বন্ধন যার বদ্ধ রহে অনিবার,
নাহি ঘুচে হলেও নিধন।
সেই সুখময় পথে চড়িয়া মানসরথে
নিয়ত হতেছি অগ্রসর ;
যার প্রান্তে সুনিশ্চিত সর্বক্ষণ বিরাজিত
নিত্য সুখধাম মনোহর।
সেই প্রেমসিন্ধু জলে আত্মমন কুতূহলে
সত্য সত্য করেছি মগন,
সদা সেই স্থির রয় বিচ্ছেদ তরঙ্গ ভয়
যার মাঝে নাহি কদাচন।

সেই সর্ব বরণীয় ত্রিজগত স্মরণীয়
সম্রাটের আমি হে কিঙ্কর।
যাঁহার চরণতলে নিখিল নৃপতিদলে
নোয়ায় মুকুট নিরন্তর।

(সদ্ভাবশতক, ১৮৬১)

তাজমহল

গোবিন্দচন্দ্র রায়

১

একি সেই চিরশ্রুত ভারত-কৌস্তুভ
তাজগৃহ, সাজিহান যবন-গৌরব।
দম্পতি প্রণয় পুষ্প, নয়ন দুর্লভ,
পৃথিবী ব্যাপিয়া যার প্রশংসা সৌরভ॥

২

সেকি এই! মনোহর সুশুভ্র গঠন
তুষার ফলকনিভ মর্মর রচিত।
জড়িত উপলে গাত্র বিবিধ বরণ,
মোগল সুন্দরী যেন রতনে খচিত॥

৩

অহ! কি অমল শান্ত মধুর দর্শন,
কার্পাস কোমল কান্তি কঠোর মর্মরে!
তুলিতে আঁকিয়া যেন তুলেছে গড়ন
ধন্য রে কল্পনা, যে এ ধরিল উদরে॥

৪

যতনে মাপিয়া স্বর্ণ, গড়ে স্বর্ণকার
তবু হয় অলঙ্কারে ভাগ অসমান।
কি তুলে স্থপতি তৌলি শরীর ইহার
গড়িল নির্ভুল হয়ে অজভাগমান॥

৫

মরি কতকাল বসি মানস উদ্যানে
সৌন্দর্য কুসুমসারে শিল্পকারগণ।
গাঁথিল ইহার দেহ ; দেহপ্রাণ-পণে
রূপভরে ভুলাইতে ভবজনমন ॥

৬

কঙ্কাল কপাল স্থান ভীষণ শ্মশানে
এ গৃহ কুসুম তনু দেখায় কি ভাল ?
ফুটিত যদি এ কোন বিলাস উদ্যানে
শচিপতি কেলি গৃহ লাজে হতো কাল ॥

৭

অনতি উন্নত মঞ্চ সুন্দর বিস্তৃত
চতুষ্কোণ, গাঁথা শ্বেত রক্তিম শিলায়।
স্থাপিত তাহাতে তাজ সুচারু-নির্মিত
অবনীর গৃহশিরে শিরতাজ প্রায় ॥

৮

চারি কোণে চারিস্তম্ভ, সুদীর্ঘ সুসম
শরীর রক্ষক বীর পুরুষের মত।
দণ্ডায়িত কাল সঙ্গে করি পরাক্রম
তনু শুক্লে নভ নীল করিয়া লাঞ্ছিত।

৯

সুনীল যমুনা নীল মেখলা হইয়া
বহিছে রজতনিভ গৃহ কটিতটে।
উপরে গুম্বজ যেন দেখায় ভাসিয়া
নীর-নিধি-বিম্ব নীল নভ-তল-পটে ॥

১০

সম্মুখে উদ্যান যেন মরকত বন
তরুশ্রেণী দুই পাশে সখিশ্রেণী প্রায়
শোভে মাঝে জলযন্ত্রে শীত প্রস্রবণ
মোগল-মহিষী-যোগ্য ভোগ্য সমুদায় ॥

১১

দেখায়ে বিরাগ, মরি। বিভূতি বিভবে
কোরাণ অক্ষর মালা পরি গলদেশে।
মাঝে স্পন্দহীন গৃহ বসিয়া নীরবে
যেন কোন বিলাসিনী তপস্বিনী বেশে॥

১২

নির্মেঘ শরদে কিম্বা মধু সুধাকরে
যেকালে এ তনুকান্তি ঝলসে বিজনে॥
কি ছার! মনুজ মন, দেব মন হরে
নিরখিলে সেকালে এ রূপের কাননে॥

১৩

একে শুক্ল তনু রাজ্যে শুক্ল শশিকর।
তায় ঋতুফুলে শুক্ল উদ্যানের হাস।
নাচায়ে ফিরিঙ্গীবালা দেহ শুক্লতর
চারিদিকে রচে শুধু শুক্লেরি আবাস॥

১৪

ইতিহাসে পড়ি যুবা কৌতূহলানলে
জ্বলিয়া যে কালে ধায় দূরদেশ হতে।
আসিয়া দেখিয়া ভাসে তৃপ্তি সুখ জলে
সার্থক গণনা করে পথ ব্যয় শতে॥

১৫

শিল্প দেখি কেহ প্রশংসয়ে শিল্পিগণে
লুপ্ত যারা দূরগত কালের কবলে।
কেহবা অর্থের ব্যয় গণি মনে মনে
বিস্ময় বিস্তার করে নয়ন যুগলে॥

১৬

আসি কত ইয়ুরোপী বিজ্ঞান-কুশল
আঁকি তোলে যন্ত্রবলে গৃহ বরতনু।
নানাভাবে স্থিতিভেদে আঁকে অবিকল
আকাশে সহায় করি চিত্রকর ভানু॥

১৭

তুলি ছবি অবশেষে লয় নিজ দেশে
পরায় প্রাসাদ-কণ্ঠে আভরণ করি।
বসি বন্ধু পরিজনে দেখে অনিমেষে
প্রশংসে ভারতভূত শিল্পকারিকরি॥

১৮

গড়ি ক্ষুদ্র অনুরূপ অনুকারগণ
বেচে বিদেশীর কাছে স্বর্ণমুদ্রা পণে।
নিয়ে কতজন সেই রূপানুকরণ
রাখে গৃহে শোভা হেতু পরম যতনে॥

১৯

আসি কত রাজা দেশান্তর হতে
জালিয়া বিবিধরঙ্গে আলোকের মালা।
নিরখে রূপের ছটা ঘটার সহিতে
দেখাইয়া লোকে লোল চঞ্চলার খেলা

২০

সংসার সন্তপ্ত কত নগর নিবাসী
আসে নিত্য জুড়াইতে এ শান্তিভবনে।
দেখিয়া ইহার ছবি শোকতাপরাশি
পাসরে অমনি যেন মায়া মন্ত্রগুণে॥

২১

ইহার মধুরাকৃতি শান্তিরসাশ্রয়ে
সিঞ্চয়ে অপূর্ব, চিত্তে সান্ত্বনা সলিল।
আকাঙ্ক্ষার উত্তেজনা ভোগসুখাশয়ে
দেখি এর দশা হয় অমনি শিথিল॥

২২

কোন দিন এইস্থানে এর জনকেরে
প্রণমিত লোকরাজ্য লুটিয়া ভূতল।
কিবা না সম্ভবে দেখ এমন জনেরে
সুখে তার মুখ আজি লোটে ধরাতল

২৩

কাহার প্রাঙ্গণে বসি কে করে বিহার
কাহার কুসুমবন কে করে চয়ন !
কাহার প্রস্তুত অন্ন কাহার আহার
নির্মম কালের হা ! কি অন্ধ বিতরণ ।

২৪

এই রে গৌরব, আশা, এ গৃহ উদ্যানে
এজন্য সংসারে চির অস্ত্রের বিপ্লব ।
সোদর শোণিত বর্ষে এ তৃষ্ণা নির্বাণে
এ ফল আশায় হয় নৃমুণ্ডে আহব ॥

২৫

গৃহকর ! যদি এত আকাঙ্ক্ষা বিপ্লবে
রহিয়াছ অতিক্রমি আজিও জীবিত ।
কোনদিন কোন লোক এমন আসিবে
পাইবেনা খুঁজি তুমি কোথা ছিলে স্থিত ॥

২৬

হয়ত এমন হবে, এ দেহ-পিঞ্জরে
রচিবে আবার কেহ আকাঙ্ক্ষা বিমান
প্রবৃত্তির এই খেলা সংসার-চত্বরে
শ্মশানে উদ্যান গড়ে, উদ্যানে শ্মশান ॥

গীতিকবিতা, ১৮৮২)

স্মৃতি

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বহুদিন পরে কি দেখি আবার,
সে দু'টি নয়ন সোহাগে মাখা :
সাথে সমীরণ খেলে ধীরে ধীরে,
অলকায় আধ বদন ঢাকা ।

সেই তো গোলাপ সলাজ কপোলে,
সেই গো গোলাপ অধর-রাগে,—
মৃদু হাসি সনে বিষাদ মিলিত,
কেন হেন এ তো দেখিনি আগে।

সেই তো তটিনী সাগরগামিনী
শশী-হাসি-ছবি হৃদয়ে ধরে;
সেই তো কলিকা ঈষৎ দুলিয়া,
শিহরিছে ধীর সমীর-করে।

বাহু-পাশে বাঁধি নয়নে নয়ন,
যতনে দেখিছি বদনখানি;
আজ ধরি ধরি ধরিতে তো নারি,
আমার আমার—আমি তো জানি।

এলো এলো এলো, আবার ফুরা'লো,
চলে গেল কেন, কি অভিমানে,—
ছিল তো বেদনা মরমে লুকা'য়ে,
কেন বারি-ধারা নয়নে আনে!

এসেছিল সে কি দেখে গেল এসে,
প্রাণে প্রাণ আজ কাঁদে না কাঁদে,—
কেঁদে গেছে সে তো দেখেছে কেঁদেছি,
কাঁদিতে কাঁদাতে এলো কি সাধে!

দিয়েছি আহুতি হৃদয় সুসার,
দু'জনে যে ব্রতে ছিলাম ব্রতী,
নীরস জীবনে গেছে তো সকলি,
তবু কেন পুনঃ জাগিছে স্মৃতি।

(প্রতিধ্বনি, ১৯১১)

বিগত-যৌবনা

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১

গেছে দিন আছে তার স্মরণ কেবল,—
আছিল ললিত কায়, কেশজাল মেঘপ্রায়,
বিভাগী সীমন্ত-রেখা ধবল সরল,
অধরে আরক্ত রাগ, ভ্রমরার অনুরাগ,
ফুটিত ঈষৎ হাসে মুকুতার দল,
উথলিত যৌবন তরঙ্গ ঢল্ ঢল্,—
আছে তার স্মরণ কেবল।

২

তখন আসিত আর না দেখি এখন,
ধনী-মানী যুবা কত, বেশ করি নানা মত,
গুণগ্রাম-বিকশিত সুঠাম বদন ;
কেহ বাঁধা কেশ-পাশে, কেহ বা হাসির ফাঁসে,
কাহার হৃদয়ে বিদ্ধ কটাক্ষ ঈক্ষণ,
ইঙ্গিতে প্রস্তুত দিতে জীবন-যৌবন,—
কারে আর না দেখি এখন।

৩

সহিয়ে নিদাঘ রবি, মেঘ-বরিষণ,
কুজ্ঝটিকা-ঢাকা দিশা, হেমন্তের তীব্র নিশা,
ঝটিকা, করকা ঘোর তরঙ্গ নর্তন,
উপেক্ষিত তৃণজ্ঞানে, আসিত আমার ধ্যানে,
প্রাচীর পর্বত সম করিত লঙ্ঘন,
দেখে যেত ব্যগ্র তত যত অযতন,—
সহি রবি, মেঘ-বরিষণ।

৪

কেন এলো কেন গেলো সুখের স্বপন,
এবে যদি দেখি কারে, ফিরে নাহি চাহে বারে,
ডাকিলে চিনিতে নারে ফিরায় বদন ;
বেণীতে নাহিক ফাঁস, অধরে কুহকী হাস,
বেঁধে না নয়ন, গেছে চপল যৌবন,
করি নাই আবাহন, করিনি বর্জন,—
এলো গেলো সুখের স্বপন।

৫

কাচ বাঁধি অঞ্চলে কাঞ্চনে অবহেলা,
কেন দিব দেহ দান, প্রাণ দিয়ে নেব প্রাণ,
প্রণয় বন্ধন প'রে হবে কিনা খেলা ;
চাহিতাম উপাসনা, কাঁদাইব—কাঁদিব না,
না বুঝে বেদনা সহি বেদনা একেলা,
দান-প্রতিদানে ধরা আনন্দের মেলা,—
কাঞ্চনে করেছি অবহেলা !

(প্রতিধ্বনি, ১৯১১)

বাঁশরী

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

সন্ধ্যার বরণ-ঘটা ধূসর অঞ্চলে
ক্রমে ক্রমে ঢাকিলে তিমির,
সোহাগিনী প্রবাহিণী কলনাদে চলে
মন্দ মন্দ আন্দোলি শরীর ;

মধুর তোমার তান, শুনিলে উথলে প্রাণ,
হ'লে দিবা অবসান গৃহে ফিরে আসি,
এ হ'তে মধুর স্বর, শুনিতাম বাঁশী ॥
স্বভাব নীরবে যবে গভীরা যামিনী,
শিশু হেরে সোনার স্বপন,
চন্দ্রমা চকোরে কথা শুনে বিরহিণী,
ঢুলু ঢুলু তারার নয়ন—

উঠিলে তোমার তান, প্রাণে মম হানে বাণ,
এ হ'তে মধুর স্বরে করিলে চুম্বন,
ছিঃ ছিঃ বলি সে আমার ফিরাত বদন ॥
ফুল-ভূষা হাসে উষা দুকূল-বসনা,
সরোবরে সম্ভাষে নলিনী,
বিদায় চুম্বন নাহি পূরিল বাসনা,
পতি-মুখ নেহারে কামিনী।

তব তান উঠে যত, আকুল অন্তর তত,
উথলিত প্রাণে শত সুধার লহরী,
যবে ধীরে সে আমারে জাগাত বাঁশরী ॥
প্রখর নিদাঘ-তাপে তাপিতা-মেদিনী,
ক্ষিপ্ত বায়ু ধূলা মাখে গায়,
কুলায় লুকায় নাহি গায় বিহঙ্গিনী,
জাগি যামি যুবতী ঘুমায় ;

আচম্বিতে তব তান, প্রাণে করে সুধাদান,
মোহিত হইয়া মনে করি আন্দোলন,
বহুদিন পরে মোরে কে করে স্মরণ ?
প্রবাসে প্রবাসী বসি সন্ধ্যার সময়,
প্রিয় মুখ মনে কত উঠে,
অনিমেষ নেত্রে হেরে চন্দ্রমা উদয়,
একে একে দেখে তারা ফুটে ;

বিরহ বিধুর গান, শুনে আন্দোলিত প্রাণ,
মৃদু পূর্বস্মৃতি জাগে শীতল মাধুরী,
আশে আঁখিনীরে ভাসে প্রিয়জনে স্মরি ॥

(প্রতিধ্বনি, ১৯১১)

জুড়াইতে চাই

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

জুড়াইতে চাই—কোথায় জুড়াই ?
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই !
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই ।
কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন ?
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন !
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর,
অধীর-অধীর-যেমতি সমীর, অবিরাম গতি নিয়ত ধাই ।
জানিনা কেবা, এসেছি কোথায়
কেন বা এসেছি, কে বা নিয়ে যায় ।
যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে,
চারিদিকে গোল, উঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়, এই
আছে আর তখনি নাই ।
কি কাজে এসেছি—কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন, কি খেলা হল ;—
প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি,
যাই—যাই কোথা ?—কূল কি নাই ?
কর হে চেতন,—কে আছ চেতন,
কত দিনে আর ভাঙিবে স্বপন ?—

যে আছ চেতন, ঘুমা'ও না আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার,
কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ,—
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়, তব পদে
তাই শরণ চাই ॥

(প্রতিধ্বনি, ১৯১১)

অপ্রত্যয়

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

প্রত্যয় বিলায়ে আমি কিনেছি তোমায়
সুধা ফেলে সুধা ব'লে পিই মদিরায় !
প্রাণ-বায়ু বিসর্জনে, হৃদে রাখি সযতনে,
ক্রমে এ হৃদয় মগ্ন তামসী নিশায়,
ক্ষীণচন্দ্র প্রত্যয়ের লুকা'ল কোথায় ?
যে আদরে তোরে—তার সুচতুর নাম,
বারাঙ্গনা সম তব বিমোহিনী ঠাম ;
জ্বালায়-জ্বলিয়ে মরে, তবু তোরে যত্ন করে,
নির্বোধ বলিয়ে খ্যাতি তুমি যারে বাম,
নর-হৃদি বিনা তব আছে কি হে ধাম ?
লীলায় বিহর তুমি কামিনী-কাঞ্চনে,
হেলায় করহে পর অতি প্রিয়জনে :
তুমি নারী-হৃদি-বাসী, তাই তোরে ভালবাসি,
ফণিনী জানিয়ে নহি কাতর দংশনে,
চতুরা-বদন হেরি তৃষিত নয়নে !
কে পায় তোমায় হায় কাঞ্চন যথায়,
ঝন্ ঝন্ শব্দে পর করে বাপ-মায় ;
সতী নিজ পতি ডরে, পুত্র হ'য়ে প্রাণ হরে,
ভালবাসা প্রেম-আশা বাসা ছেড়ে যায়,
ব্যাকুল মানব তব চরণে লোটায় ।

অপ্রত্যয়, প্রত্যয় কি করি তোরে আর,
পুড়ায়ে করেছ মম জীবন অঙ্গার,
প্রত্যয় করিয়ে র'ব, প্রত্যয় করিয়ে স'ব,
প্রত্যয় করিয়ে যাবে মনের আঁধার,
সুখে-দুখে হে প্রত্যয়, হব হে তোমার।
বালক-নয়নে পুন হেরিব ধরণী,
কাচ ফেলে পাব পুন নীলকান্ত মণি
প্রফুল্ল নয়নে চাব, প্রেম-পণে প্রেম পাব,
হৃদয়-নিকুঞ্জে পুন হবে পিক-ধ্বনি
কুটিল কটাক্ষে নাহি বিন্ধিবে রমণী।

(প্রতিধ্বনি, ১৯১১)

বাসনা

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

আজন্ম বাসনা, কত স'য়েছ যন্ত্রণা,
তবু কেন ওঠো বার বার!—
শুননা, করিছে মানা, আশার মন্ত্রণা,
মুখে শুধু কপট আশার।
অবিরত কত মত, শৈশবে কহিল কত,
মুগ্ধপ্রায় শুনেছ, আশ্বাস ভাষ তার,
জ্বলিল কলিকা-হৃদি নিবিল না আর।

যত জ্বল' তত তুমি ব্যাকুল বাসনা,
বাড়ে তব ততই পিয়াস।
জ্বলে ত' বলনা, আশা এস না এস না,
জ্ব'লে জ্ব'লে তবু তার দাস।
যৌবনে আশার গান, বাজিল তন্ত্রিত প্রাণ,
সুখস্বপ্ন সুখ তান, সুখের বিলাস,—
বিঁধিল কণ্টক, আশা না ছাড়িল বাস।

বহে দিন, বহে বারি, বহে সমীরণ,
ব'য়ে যায় জীবন চঞ্চল !
কে চায় দেখিতে হায় কালের গমন,
মৃগতৃষা আশাই প্রবল।
মধুর মায়ার ফাঁদে, তৃষিত বাসনা বাঁধে,
দিশাহারা নিশা-মাঝে বাসনা বিকল,
অবোধ বাসনা নারে বুঝিবারে ছল।
আশৈশব ছায়াবাজী দেখিয়াছ কত—
রাজ্য, বীর্য, সুন্দরী ললনা,
হাস, কাঁদ, অবিরত বাতুলের মত,
স্বর্ণস্বপ্ন সাজায় কল্পনা !
শিথিল ইন্দ্রিয় ক্রমে, বোঝনা বাসনা ভ্রমে,
আশার বান্ধব তুমি আশার ছলনা,
অশান্ত অনন্ত ভব-অর্ণব তুলনা !

(প্রতিধ্বনি, ১৯১১)

শূন্য প্রাণ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

মা ব'লে কাঁদিয়ে শিশু কাছে যেতে চায়,
সবে মিলে করে নিবারণ,
কাঁদিছে, কেন মা নাহি কোলে নেয় তায়
ভাসে আঁখি না বুঝে কারণ :
যত্নে করে কত জন, কোলে নিতে আকিঞ্চন,
মাতৃহারা শূন্য ধরা কে তারে ভুলায়,
শূন্যপ্রাণ—শূন্যপানে চায় !
সুখের কৈশোর কাল সুখের সংসার,
না চাহিতে মিলে প্রয়োজন,

পাঠ করি পিতৃস্থানে স্নেহ পুরস্কার,
সবাকার আদর-ভাজন ;
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত, বহিছে শ্মশান বাত,
চিতায় পিতার মুখে অনল প্রদান,
শূন্যপ্রাণ—নেহারে শ্মশান !

আমোদিনী প্রমোদিনী জীবন-সঙ্গিনী
ক্ষুদ্র গৃহ নাট্যশালা প্রায়,
সোহাগ হৃদয়-রাগে রজনী রঙ্গিণী
সোনার স্বপন ব'য়ে যায় ;
কালের কুটিল রঙ্গ, চমাকয়া স্বপ্ন ভঙ্গ,
শূন্য গৃহ—নহে ত উজ্জ্বল নাট্যাগার,
শূন্যপ্রাণ—শূন্য এ সংসার !

কুলের তিলক কৃতী সুন্দর কুমার,
উচ্চস্থানে প্রাপ্ত উচ্চাসন,
শ্রদ্ধাবান, আজ্ঞাকারী নিয়ত পিতার,
শত-স্রোতে বহে উপার্জ্জন ;
শমন হরিল তায়, হৃদি বিদ্ধ শেল-ঘায়,
চিত্রপ্রায়, ব্যথা নাহি বুঝে বেদনায়,
শূন্যপ্রাণ—শূন্যেতে মিশায় !

একক বান্ধবহীন প্রবাসে নিবাস
কেহ আর নাহি আপনার,
বার্দ্ধক্যে অশক্ত দেহ—কৃপার প্রয়াস,
হৃদে সদা আতঙ্ক সঞ্চার ;
কাটে দিন নাহি রহে, স্মৃতিমাত্র কথা কহে,
গোধূলি আলোক পিছে, সম্মুখে আঁধার,
শূন্যপ্রাণ—কিছু নাহি আর !

(প্রতিধ্বনি, ১৯১১

পিতৃহীন যুবক

নবীনচন্দ্র সেন

১

আহা! কি বা সুগভীর নিবিড় রজনী,
নীরব প্রকৃতি দেবী অবিচল প্রায়
জীবন-প্রবাহ এবে, নির্জীব ধরণী;
অবিষাদে অন্ধকার বিরাজে ধরায়
না পায় শুনিতে কর্ণ, না দেখে নয়ন,
ঘোর নিদ্রা-অভিভূত বসুধা এখন।

২

যামিনীর সুমধুর নূপুর-নিক্কণ
ঝিল্লিরবে ভাসিতেছে দিগ্‌দিগন্তরে,
পাখার প্রহার শব্দ করিছে কখন
ভগ্ননিদ্র পক্ষিগণ বৃক্ষের উপর;
কলকল রবে গঙ্গা সাগর-সদন
যাইতেছে অন্ধকারে ঢাকিয়া বদন।

৩

পূরাইতে পাপ আশা যত দুরাচার
কম্পিত হৃদয়ে ভয়ে ভ্রমিছে এখন।
সাক্ষীর স্বরূপ নৈশ নিবিড় গগন,
চেয়ে আছে প্রকাশিয়া সহস্র নয়ন।

৪

জীবন পবন, এবে উভয়ে অচল,
নিদ্রিত ধরায় আর নাহি বহে শ্বাস,

একটী পল্লব নাহি করে টল মল,
একটী ফুলের নাহি সুরভি নিশ্বাস।
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে করিয়া শয়ন
দিবসের শ্রম নর জুড়ায় এখন।

৫

নাহি সে বিমল সুখ কপালে আমার,
অভাগার নাহি শান্তি যাবৎ জীবন,
রাবণের চিতাপ্রায় হৃদয় যাহার,
নিশীথে তেমনি জলে দিবসে যেমন।
কত করি অবিরত সাধিনু নিদ্রায়,
বাঁচাইতে শান্তিরূপ শীতল ছায়ায়।

৬

যেইদিন পিতৃশোক-ছুরিকা বিষম,
ফুটিয়াছে এ হৃদয়ে জেনেছি তখন,
শুকাইবে আশালতা শুকাবে মরম।
তড়িত-আহত-তরু শুকায় যেমন।
সেইদিন হ'তে নিদ্রা করে না বর্ষণ
শান্তির শয্যায় সুখ-কুসুমরতন।

৭

কণ্টক শয্যায় যদি রাখি কলেবর,
চিন্তানলে জ্বলি, ভাসি নয়নের নীরে ;
ঝরিয়াছে একবিন্দু ঝরিবে অপর,
এই অবসরে নিদ্রা নয়ন-মন্দিরে
প্রবেশেন যদি তবে আইসে সঙ্গিনী
যাতনিতে অভাগায় স্বপ্ন-কুহকিনী।

৮

মায়াবলে পাপীয়সী ফিরায়ে কখন
মানস-তরণী মম, জীবনের স্রোতে,
লয়ে যায়, যথা, আহা ! শৈশবে যখন
কেলিনু মনের সুখে, সাগর-কপোতে
খেলে যেই মতে শান্ত সুনীল সাগরে,
প্রসারিয়া পক্ষপুট জলধি উপরে ।

৯

সৌভাগ্যের পূর্ণ জ্যোতিঃ শৈশবে আমার
খেলাইত যেই মতে উর্মিমালা সনে,
নবজীবনের জলে, চুম্বি অনিবার
আশায় মুকুল শত সোনার কিরণে ;
দেখাইয়া গত সুখ চিত্ত-মনোহর,
হাসায় এ চিন্তাক্রান্ত বিষণ্ণ অন্তর ।

১০

অমনি চকিতমাত্র ছায়াবাজি প্রায়,
পলকে লুকায় সব চপলার গতি,
চিত্র করে পাপীয়সী প্রণয়-রেখায়,
জনকের চিন্তাদগ্ধ পবিত্র মূরতি ।
দিবানিশি অশ্রুজলে ভাসিতেছে বুক,
ঋণ দায় যাতনায় অবনত মুখ ।

১১

জনকের দীনভাব করিয়া দর্শন
উচ্ছ্বসিত হয় মম শোক-পারাবার,
বিদরে হৃদয় দুঃখে, সন্তরে নয়ন,
শোক-অশ্রুজলে ; আহা ! সহে নাকো আর ;

সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ জাগে এ স্বপন
ঝরে নয়নের জল মানে না বারণ।

১২

শুধু একা আমি নহি, কবিতা কাননে
পশিয়াছে যেইজন, বসিয়া বিরলে
কাঁদিয়াছে কত নর, জানে সেই জনে,
আমার মতন জ্বলি, চিন্তার অনলে
পশেছে—নিদ্রার নাহি পাইয়া দর্শন—
অনন্ত নিদ্রায়, আমি পশিব যেমন।

১৩

কিন্তু আহা! কি হইবে নিশীথ সময়
ভাসি নয়নের নীরে, ভাগীরথী তীরে
অশ্রুতে দ্রবিত যদি কালের হৃদয়,
যেতেন না পিতা মম শমন মন্দিরে
অশ্রুপাতে করি যদি ধরা বিদারণ,
জনকের তবু নাহি পাব দরশন।

১৪

কি জাগ্রতে, কি স্বপনে, কি নিশি দিবসে,
কাঁদি হিমাচল শৃঙ্গে, জলধির তলে
কিংবা যথা মেঘমাঝে বজ্রাগ্নি ঝলসে,
বাড়াই জলদরাশি নয়নের জলে;
ংবা মনোদুঃখে, জলপ্রপাত ভীষণ,
পরাভবি অশ্রুবেগে, করিয়া রোদন—

১৫

তথাপি সে শান্ত মূর্তি দেখিব না আর,
শুনিব না আর সেই মধুর বচন,

নাম ধরি অভাগারে ডাকিতে আবার,
শুনিব না আর আমি যাবৎ জীবন ;
মধুমাখা 'বাবা' কথা শুনিব না আর,
শ্রদ্ধায় আলয় মম হইল আঁধার !

১৬

নিরন্তর এই আশা জাগিত অন্তরে
ফিরিয়া স্বদেশে সুখে মন-কুতূহলে,
জুড়াব বিরহ জ্বালা পিয়ে প্রেমভরে,
পিতার পবিত্র প্রীতি অমৃত ভূতলে ।
অচির বিরহানল নিবিবে কি আর
ঘটিল কপালে চির বিরহ আমার ।

১৭

প্রেম বিগলিত অশ্রু দেখেছিনু যাহা
আসিবার কালে আমি, এখনও ভাসে
যেন নয়নের কাছে ; শুনিয়াছি আহা !
সেই সুমধুর কথা প্রেমপূর্ণ ভাষে,
এখনো বাজে যেন শ্রবণে আমার ।
এই জন্মে ভুলিব না, শুনিব না আর ।

১৮

বৎসরেক ভারতীর সেবিয়া চরণ,
লভিয়াছি যেই ফল, আশা ছিল মনে,
পাসরিতে শ্রম গৃহে ফিরিব যখন,
উপহার প্রদানিব পিতার চরণে ।
কিন্তু বনবাস শেষে জানি নাই আর,
পিতৃশ্রাদ্ধ ছিল পাপ-কপালে আমার !

১৯

যে তরু আশ্রয় করি ছিনু এতকাল
কালের কুঠারে যদি হইল পতন,
কি কাজ সহিয়া এত সংসার জঞ্জাল ?
শুকাইব এইখানে ত্যজিব জীবন।
ছাড়ুক দীনতা এবে অনল-নিশ্বাস
কি ভয় মরিতে ? আমি জীবনে নিরাশ

২০

উত্তরীয় যেইদিন করিনু ছেদন
জাহ্নবি ! তোমার তীরে বিষাদিত মন,
ভেবেছিনু একবারে কাটিব তখন,
উত্তরীয় সহ এই সংসার-বন্ধন ;
সংসারের মায়া কিন্তু না জানি কেমন,
দুঃখিনী মায়েরে মনে পড়িল তখন।

২১

চিত্রিত রবির করে, পঞ্চ সহোদর
দেখিনু ভাসিছে যেন জাহ্নবী-জীবনে,
শৈশব সরল ভাবে প্রসারিয়া কর,
চেয়ে আছে অভাগারা কাতর নয়নে ;
দেখিয়া হৃদয় যেন হল বিদারণ,
ভূতলে মূর্ছিত হয়ে পড়িনু তখন।

২২

কিন্তু কি সুখের তরে, চিত্ত দ্রবকরী
গৃহরূপ রঙ্গভূমে ফিরিব আবার ?
দশমীতে ব্যোমকেশ, ত্রিদশ-ঈশ্বরী
সহ গেলে স্বর্গপুরে করিয়া আঁধার
ভকত-হৃদয়াকাশ, শূন্য গৃহে পড়ি
শুটি কত ভগ্ন ঘট যায় গড়াগড়ি।

২৩

তেমতি জনক মম, চিন্তার অনল
নিবাইতে পশিলেন অনন্ত জীবনে,
সৌভাগ্য গিয়াছে সঙ্গে হৃদয়মণ্ডল
আঁধারিয়া শোকরূপ ঘন আচ্ছাদনে।
ভগ্ন-ঘট-প্রায় চিত্ত-ভগ্ন-পরিবার,
বুকে হস্ত ভয়ে ত্রস্ত, করে হাহাকার।

২৪

এইখানে মা দুঃখিনী পড়ে ধরাতলে
বাতাহত স্বর্ণের প্রতিমূর্তি প্রায়,
স্থির নেত্রে, স্থির গাত্রে বদনমণ্ডলে
নাহি জীবনের চিহ্ন, অচেতন কায়,
দুগ্ধপোষ্য শিশু ভ্রাতা মুখে হাত দিয়া
কাঁদিছে আভাগা আহা! মা মা মা বলিয়া

২৫

সুকুমার ভ্রাতৃগণ বিনোদ, বিমল,
বালেন্দুবদনকান্তি, কোমল পরাণে
নাহি কোন চিন্তা আহা! অবোধ চঞ্চল,
কি ঘটেছে অভাগারা কিছুই না জানে;
তথাপি স্নেহের কিবা মহিমা অপার,
মার মুখ চেয়ে তারা কাঁদে অনিবার।

২৬

ভাসিতে ভাসিতে এই দুঃখের সাগরে,
যেইসব তৃণ লতা করিনু আশ্রয়,
ছিঁড়িয়াছে সব আহা! বাঁচিব কি ক'রে,
আসিতেছে জলোচ্ছ্বাস ডুবিব নিশ্চয়।

আশার অঙ্কুর যত করিনু রোপণ,
ফলবতী না হইতে হইল নিধন।

২৭

জীবনের তরি, বিদ্যা অনন্ত সাগরে
ভাসায়ে যাইব, বড় সাধ ছিল মনে,
যশের মন্দিরে, যথা আনন্দে বিহরে
অমর কবীশবৃন্দ কনক-আসনে।
কল্পনার সূত্রে গাঁথি কবিতার হার,
সাজাইব মাতৃভাষা দিব উপহার।

২৮

প্রকাশিলে জ্ঞানচন্দ্র ফুটিলে নয়ন,
প্রবেশিব ধর্মারণ্যে, পঙ্কিল হৃদয়
চৈতন্যের ভক্তিস্রোতে করি প্রক্ষালন
জুড়াইব অনুতাপ; বুঝিব নিশ্চয়
বিষয় বাসনা সহ, ত্যজিব জীবন,
ধর্মার্থে নিহত দীন ঈশার মতন।

২৯

তরণী যাইতেছিল, সহসা পবনে
বিস্তারি ধবল পাখা গগনমণ্ডলে,
আশারূপ দীপাবলী উজ্জ্বলি সঘনে,
দুরূহ, দুর্গম পথ; না জানি কি ছলে
দরিদ্রতা তুলি শিরঃ মৈনাকের প্রায়,
ডুবাইতে চাহে তরী কি করি উপায়?

৩০

অকস্মাৎ এ প্রশ্নের কে দিবে উত্তর?
কে বুঝিবে ভবিষ্যৎ? অদৃষ্ট দুর্জ্ঞেয়।

সময়ের যবনিকা করিয়া অন্তর
কে দেখাবে কি রয়েছে ? দেখেছে কি কেহ ?
স্থানভ্রষ্ট সৌভাগ্যের নক্ষত্র যাহার,
কার সাধ্য যথাস্থানে নিয়োগে আবার ?

৩১

দুঃখের আবর্তশ্রেণী আসিতেছে বেগে
ডুবাইতে জীর্ণ তরী ভীষণ প্রহারে,
ঢেকেছে হৃদয়, কাল চিন্তারূপ মেঘে,
নিশ্চয় উঠিবে ঝড় কে রাখিতে পারে ?
ডুবাবে নিশ্চয় যদি তবে—কেন আর ?
ডুবিব জাহ্নবি ! আজি সলিলে তোমার ।

৩২

কোথায় জননী মাগো র'লে এসময়ে,
তব ক্রোড়ে এ অভাগা ফিরিবে না আর,
চিত্রিবে না দূর দেশে তোমার হৃদয়ে,
মা মা বলে মা তোমারে ডাকিবে না আর ;
জননি ! জন্মের মত হইনু বিদায়,
হৃদয় কাঁদিলে আর কি হইবে হায় !

৩৩

নিবিড় তমস মাঝে নিরখি তোমায়
কাঁদিতেছ অয়ি মাতঃ ! লইয়া হৃদয়ে
কোমল কনিষ্ঠ শিশু, ভাবিতেছ হায !
কতদিনে বাছা তব ফিরিবে আলয়ে ;
এত যত্নে নারিলাম করিতে উপায়,
কি সুখে ফিরিব ঘরে ? আবার বিদায় ।

৩৪

প্রাণের প্রতিমা মম ভ্রাতা ভগ্নীগণ,
অভাগা তোদের কাছে লইল বিদায় ;
মরিতাম যদি হেরি তোদের বদন,
চুম্বি, হাসি "দাদা" বলে ডাকিতে আমায়,
কালের কবল হতো কুসুমের হার,
শমনভবন হতো সুখের আধার।

৩৫

দীননাথ ! তুমি মাত্র অনাথ-আশ্রয়
তব প্রেমক্রোড়ে নাথ করিনু অর্পণ,
পিতৃহীন, ভ্রাতৃহীন দীন নিরাশ্রয়,
প্রাণের অধিক মম ভ্রাতা ভগ্নীগণ।
বল নাথ ! ইহাদের কি হবে উপায়,
অভাগার পরকালে কি হইবে হায়।

৩৬

এই তো জীবনরবি অস্তমিত প্রায়,
অপ্রভাত বিভাবরী আসিছে এখন,
সংসারের শোভা যত তাহার ছায়ায়
লুকাইবে, ঠিক যেন মায়ায় স্বজন।
কিন্তু হায় ! কিছু মাত্র না জানি এখন
কিরূপ সে বিভাবরী অনন্ত জীবন।

৩৭

সেখানেও সহি যদি চিন্তার দংশন,
যদি এ দুঃখের নাহি হয় উপশম,
কি ফল তোমার আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন,
পাপে কলুষিত হয়ে ত্যজিয়ে জীবন ?

কিন্তু ভবিষ্যৎ হায় ভাবি মনে মনে,
সংসারের এত জ্বালা সহিব কেমনে ?

৩৮

কে আমার কানে কানে বলিল এখন
যুবক ! নিরাশ বল এত কি কারণ ?
জান নাকি সুখ দুঃখ নিরাশ স্বপন ?
সুখ চিরস্থায়ী কবে ? দুঃখ বা কখন ?
এই দেখ এই ছিল তিমিরা রজনী,
আবার এখন দেখ হাসিছে ধরণী।

৩৯

হাসিছে ধরণী ? আহা ! আমি কেন তবে,
মজিয়া মনের দুঃখে, বসি নদীতীরে
ভাবিতেছি এই দুঃখ চিরদিন রবে,
কাঁদিতেছি অনিবার ভাসি, নেত্রনীরে ?
আমার অপেক্ষা দুঃখী কত শত জন,
পর্ণকুটীরেতে সুখে করেছে শয়ন।

৪০

কেবল আমি ত নহি সকল সংসারে,
সুখ দুঃখ ক্রমাগত চক্রের মতন,
ঘুরিতেছে অনিবারে, কে রাখিতে পারে ?
কমলা অচলা হয়ে রয়েছে কখন ?
কি সুখ বিষয়ে ? কত নৃপতি বিরলে
এ ঘোর নিশীথে ভাসে নয়নের জলে।

৪১

বিবেক ! নিশ্চয় আমি জেনেছি তোমায়,
কহিয়াছ মম উপদেশ কানে কানে

তোমার গম্ভীর বাক্য করিয়া সহায়,
ফিরিব সংসারে পুনঃ পশিব সংগ্রামে।
কাপুরুষপ্রায় কেন ত্যজিয়া জীবন,
দয়াধর্ম একেবারে দিব বিসর্জন।

৪২

কি ছার বিষয়চিন্তা কি ছার সংসার,
কি ছার সম্ভোগলিপ্সা, অর্থই কি ছার,
মরিব কি তারি ভয়ে করি হাহাকার,
নিশ্চয় লঙ্ঘিব এই দুঃখ-পারাবার।
কি ভাবনা গেছে সুখ ফিরিবে আবার,
কিবা চিন্তা ? আছে দুঃখ রহিবে না আর।

৪৩

নাহি কি ধৈর্যের অস্ত্র হৃদয়-ভাণ্ডারে,
যুঝিব একাকী আমি ত্যজিব না রণ,
দেখিব নিষ্ঠুর বাক্য কি করিতে পারে ;
পাষাণে হৃদয় এই করিনু বন্ধন।
এই চলিলাম গৃহে করিলাম পণ,
"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।"

মহানিষ্ক্রমণ

নবীনচন্দ্র সেন

অতীত নিশার্দ্ধ ; মহা উৎসবের শেষে
পিতার চরণে বুদ্ধ হইয়া বিদায়
চলিলা আপন পুরে দেখিতে দেখিতে
সেই শান্ত নীলাকাশে লেখা নিয়তির ;

দাঁড়ায়ে অলিন্দে দেখিলেন, দেবগণ
নীলাকাশে শতকায় পূজিছে তাঁহায়
প্রীতি পুষ্পে, মেলি শত তারকানয়ন !
অপেক্ষিছে প্রীতিভরে তাঁর নিষ্ক্রমণ !
পুষ্যা নক্ষত্রের সহ মিশি সুধাকর
করিয়াছে মহাযোগে পুণ্য প্রীতিময়
গাইছে অনন্ত বিশ্ব প্রীতির সঙ্গীত,
কহিতেছে এককণ্ঠে "এই তো সময় !"
সুষুপ্ত "ছন্দক" ভৃত্যে করি জাগরিত,
কহিল,—"ছন্দক ! যাও আন ত্বরা করি
সজ্জিত করিয়া অশ্ব 'কণ্টক' আমার !
আগত সময় মম, সিদ্ধ মনোরথ ।"
স্বপ্নে যেন বজ্রাঘাত হইল মস্তকে,
বিস্ময়ে ছন্দক কহে, "কহ যুবরাজ !
কোথায় যাইবে এই নিশীথ সময়ে ?"
"ছন্দক !" সিদ্ধার্থ ধীরে কহিলা গম্ভীরে
"আজন্ম আমার প্রাণ যেই পিপাসায়
কাতর, জুড়াতে সেই পিপাসা আমার
জরা মরণের দুঃখ, করিতে সাধন
জগতের শিব শান্তি করিতে পূরণ
জীবনের স্বপ্ন, আজি ত্যজিব ভবন ।"
এইবার স্বপ্ন নহে, পড়িল জাগ্রতে
ছন্দকের শিরে বজ্র, কহিল কাতরে
"হেন নিদারুণ কথা আনিও না মুখে
যুবরাজ ! এই দেহ মৃণাল কোমল,—
একি যোগ্য তপস্যার ? শিরীষ কুসুম
সহিবে কি দাবানল ? কর পরিত্যাগ
এই দুরাকাঙ্ক্ষা ; হায় আশ্রিত আমরা
কর রক্ষা আমাদের, দয়াবান্ তুমি ।"

"ছন্দক !" সিদ্ধার্থ খেদে করিলা উত্তর—
"কে সাধে এমন পত্নী প্রেম নির্ঝরিণী,
সদ্যোজাত প্রাণ পুত্র, পিতা স্নেহময়,
মাতা প্রজাবতী, মাতৃপ্রেম ভাগীরথী,
পারে ত্যজিবারে ! ত্যজে প্রজা পুত্রোপম

কিন্তু পত্নী, পুত্র, পিতা, মাতা, প্রজাগণ,
অনন্ত মানব জাতি জন্ম জন্মান্তরে
সহে জরা-মরণের দুঃখ ঘোরতর
কেমনে সহিব বল ? নাহি অন্বেষিয়া
নরের উদ্ধার পথ, পুড়িব স্বজন
জ্বালি বিলাসের বহ্নি—এ ত নহে প্রেম ?

প্রেম শিব, প্রেম শান্তি, প্রেম নিরবাণ !
না ছন্দক ! ত্যজি গৃহ যাব তপস্যায় ।"
"ছন্দক ! ছন্দক !" যুবা কহিল উচ্ছ্বাসে—
"অসার সম্ভোগ-সুখ অনিত্য অধ্রুব ;
চঞ্চল চঞ্চলা মত, রিক্ত মুষ্টিসম
অসার অস্থায়ী জল বুদ্‌বুদের মত,
দুর্ভাগ্য স্বপনসম, অস্পৃশ্য সকল
সর্প মস্তকের মত পূর্ণ মহাবিষে ।

কে বল কখন, কাম্য বস্তু উপভোগে
—কামিনী, কাঞ্চনে, রাজ্যে—তৃপ্তি কামনায়
পাইয়াছে এ জগতে ? হায় ! এ সম্ভোগ
মৃগতৃষ্ণিকার মত বাড়ায় পিপাসা,
অতৃপ্ত কামনানলে দহে নিরবধি !

কই তৃপ্তি কোথা ? ভোগ পুষ্পে পুষ্প—
মত্ত মধুকর মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া
অতৃপ্ত কামনানলে মরিতে পুড়িয়া
এসেছি কি ধরাতলে ? মানব জীবনে

নাহি শান্তি? নাহি সুখ? মানব জীবন
কেবল কি মরীচিকা ভোগ-কামনার?
না ছন্দক ;—আছে শান্তি, আছে নিত্য সুখ,
ভোগ দাবানল হত্যা হইতে উদ্ধার,
জন্ম-জরা-মরণের দুঃখ পারাবার
হইতে উত্তীর্ণ হায়, আছে মুক্তি পথ!
খুঁজিব সে মুক্তিপথ খুঁজিব নির্বাণ
এই দাবাগ্নির ধারা করিব শীতল!
আন অশ্ব! হও তুমি সহায় আমার!
উড়িবে যে পাখী অনন্ত আকাশে,
সোণার পিঞ্জরে তার, সোণার শৃঙ্খলে
মিটিবে কি সাধ? দ্বার কর অনর্গল,
অনন্ত আকাশে আমি যাইব উড়িয়া!"
ছন্দক কাঁদিয়া কহে—"হায়! দেব! তবে
নিশ্চয় কি এ সংসার শোকে ডুবাইয়া
যাইবে ছাড়িয়া তুমি?"
"নিশ্চয় ছন্দক,"—
উত্তরিলা দৃঢ় কণ্ঠে কুমার—"নিশ্চয়!
সুমেরুর মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার।
মস্তক উপরে বজ্র, তপ্ত লৌহ পথে
প্রজ্বলিত শৈলশৃঙ্গ হয় নিপতিত,
তথাপি প্রতিজ্ঞা নাহি করিব লঙ্ঘন।
শত পত্নী শত পুত্র, শত মাতা-পিতা,
দাঁড়ায় সম্মুখে যদি, শত মায়া বলে
করে অবরুদ্ধ পথ, ছন্দক! প্লাবিত
করে নয়নের জলে, পূর্ণ হাহাকারে,
তথাপি প্রতিজ্ঞা আমি পালিব নিশ্চয়!"
আর না, আনিতে অশ্ব চলিল ছন্দক!
পশিলা সিদ্ধার্থ গৃহে জনমের মত

দেখিতে গোপায়, নব প্রসূনের মুখ !
সূতিকা আগারে ধীরে করিয়া প্রবেশ
দেখিলা জ্বলিছে মৃদুমন্দ দীপাবলী
মৃদু আলোকিয়া কক্ষ ! কুসুম শয্যায়
আলুলায়িত কুন্তলা, স্খলিত-বসনা,
নিদ্রা যাইতেছে গোপা, বক্ষে সদ্য শিশু,
সোণার প্রতিমা বক্ষে সোণার কুসুম—
লইয়া আদরে যেন ;—জিনি দীপদাম
করিয়াছে আলোকিত গৃহ দুই জন !
এবার সিদ্ধার্থ—বক্ষ কাঁপিল না আর ;
কেবল দুইটি বিন্দু অশ্রু দু'নয়নে
আসিল ; ভাসিল ধীরে,—মায়ার চরণে
সিদ্ধার্থের সুশীতল শেষ উপহার !

মেঘনা

নবীনচন্দ্র সেন

অমন করিয়া কেন বহিয়া না যায় রে
মানব জীবন ?
অমনি চাঁদনি তলে, অমনি নীলাভ জলে,
অমনি মধুর স্রোতে সঙ্গীত মতন,
বহিয়া না যায় কেন মানব জীবন ?
বাসন্তী চন্দ্রিমা মাখা চারু নীলাম্বর
মধুরে কেমন
মিশিয়াছ অস্ত তীরে, মিশিয়াছ নীল নীরে
বঙ্কিম রেখায় ; কেন মিশে না তেমন
অনন্তের সহ এই মানব জীবন ?

মানব জীবনে
এত আশা ভালবাসা, এতই নিরাশা,
এত দুঃখ কেন ?
প্রেমের প্রবাহ হায় ! কেন না বহিয়া যায়
এমন মধুরে, কেন আকাঙ্ক্ষা স্বপন,
নাহি হয় হায় ! শান্ত মধুর এমন !

(অবকাশরঞ্জিনী, ১৮৭১)

কে বলিতে পারে ?

নবীনচন্দ্র সেন

১

মানুষের অদৃষ্টের বিষম দুর্গমে
প্রবেশিয়া অনায়াসে কে বলিতে পারে
বিপদ ভুজঙ্গপ্রায়, গরলমণ্ডিত কায়
গরজিয়া আসিতেছে হায় ! অভাগারে
দহিতে জন্মের মত দংশিয়া মরমে ?

২

কিংবা অন্তরালে বসি সৌভাগ্য-সুন্দরী,
সাজিয়া মোহিনী সাজে, ফুলমালা করে,
আসিতেছে ধীরে ধীরে, কনকমুকুট শিরে,
বরিতে আদরে, বরে যথা স্বয়ংবরে
সলাজে কুসুমহারে নারীকুলেশ্বরী।

৩

কে বলিতে পারে এই জীবন-সাগরে
কখন উঠিবে ঝড় ভীম দুর্নিবার ;

বিপদ-নীলোর্মিকুল, কাঁপাইয়ে উপকূল,
উঠিবে গগন পথে, ভেদি পারাবার ;
মগনিবে দেহতরী জলধি অন্তরে ?

৪

অথবা কখন পূর্ণ সৌভাগ্যের শশী
বিরাজিবে উজ্জলিয়া জলধি-হৃদয়,
চন্দ্রের কিরণবলে, হাসিবে তরঙ্গদলে,
চুম্বিয়া শতেক চন্দ্র সুখ-সুধাময়,
বিনাশিবে দুঃখতম হৃদয়েতে পশি ?

৫

পাঠক !—
আজি তুমি অবনীর রাজরাজেশ্বর,
আসীন হীরকময় স্বর্ণসিংহাসনে,
ভাবিতেছ মনে মনে, সামান্য অভাব সনে,
হবে না সাক্ষাৎ তব এ মর জীবনে,
—প্রণয়, বিষয়, সুখে প্রফুল্ল অন্তর !

৬

জানিলাম মূঢ় তুমি আমার মতন
কি বিশ্বাস ভবিষ্যতে ? সম্পদে, সংসারে ?
এই স্তূপাকার প্রায়, একটি তরঙ্গ যায়,
কোথায় হইবে লয় কে বলিতে পারে ?
রাজার ভবন হবে বিজন কানন।

৭

কিংবা যদি নিরাশ্রয়, দীন অসহায়,—
কেন কাঁদিতেছ তুমি ভাসি অশ্রুনীরে ?
এই চিন্তা-বিষধরী, এই দুঃখ-বিভাবরী,
কতদিন রবে আর, পোহাবে অচিরে ;
দিবেন সুদিন, যিনি দিলেন আমায়।

(অবকাশরঞ্জিনী, ১৮৭১)

আশা

মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়

১

ওরে আশা, আছে তোর অপূর্ব ক্ষমতা !
তোমারে স্মরণ করে, ভবে লোক প্রাণ ধরে,
দুঃখেতেও হরষিত, ঘুচে বিকলতা ;
মনের মাঝারে আশা, না হলে তোমার বাসা,
বাঁচিত মানব, লয়ে কার সহায়তা ?
যদি না থাকিতে তুমি, শ্মশান হ'ত এ ভূমি,
না রহিত কেহ ভবে, পেত মর্মব্যথা ;
তব নিষ্ঠ সম্ভাষণে, কত সুখ পাই মনে
জগতে জীবিত, ধরি তব দেহলতা ;
তোমার প্রভাবে সুখী, নশ্বর ধরণী দুখী,
তাই বলি আছে তব অপূর্ব ক্ষমতা ।

২

ওরে আশা, কত তব ক্ষমতার বল !
পড়িয়া তোমার কুপে, নরে তালবৃক্ষ রোপে,
শত বর্ষ পরে তায় ফলিবে রে ফল,
সে ফল খাবার তরে, মনে অভিলাষ করে,
এ ভরসা দেও আশা, তুমিই কেবল ।
মৃত্তিকা কাটিয়া নর, করে পুরী মনোহর,
নানা সাজে সাজাইয়া বিরচে উজল ।
উদ্যান করিয়া কত রোপে তরু মনোমত,
ভোগ বাসনায় লোকে করহ বিকল ।
মৃতদেহ দাহ করি, ঘরেতে আসিয়া ফিরি',
তব সুমধুর বাক্যে, হয় সুশীতল,
নারী যদি গর্ভবতী, বিয়োগ হইলে পতি,
গর্ভের শিশুর তরে ভরসা প্রবল,
তাই বলি 'চিত্র তব ক্ষমতার বল ।

৩

ওরে আশা, এ জগতে তুমি না থাকিলে
হ'ত কি এত রহস্য, মনোহর যত দৃশ্য,
কভু ফিরে দেখা যেত এই ধরাতলে ?
হইত কি ফল, শস্য, গুরু শিখাইত শিষ্য,
সংসার রহিত কভু, হেন সুশৃঙ্খলে ?
করিত কে লীলা খেলা, রচি' নব নাট্যশালা,
মানব হৃদয়ে আশা তুমি না থাকিলে ?
যখন পলাশী বনে, ইংরাজ বঙ্গীয় রণে,
যখন সৌভাগ্য রবি গেল অস্তাচলে,
তখন (ও) নবাব মনে, আশা তুমি ক্ষণে ক্ষণে
প্রকাশি'—'জীবন রক্ষা হইবে' বলিলে।
আপনা প্রকাশি' তুমি, রেখেছ ভারত ভূমি,
তাই বলি—কি ঘটিত তুমি না থাকিলে !

৪

সিরাজের অত্যাচারে, যবে উৎপীড়িত নরে
তখন তোমায় ধরি' বাঁচিত জীবন ;
যখন নিষ্ঠুররূপে, হত্যা ঘটে অন্ধকূপে
ইংরাজ সহায় তুমি আছিলে তখন।
ইংরেজের প্রপীড়নে, কাবুল দলিত প্রাণে
তাহাদের সুখ-রবি মলিন-কিরণ ;
তথাপি তোমার বলে, বার বার শত্রু দলে,
তাহাদের (ও) মনে তুমি আছহ এখন ;
ফরাসির রণশেষে, নেপোলিয়নের কেশে
যখন ধরিল আসি দুর্দান্ত শমন,
রাজ্ঞীর মনোমাঝারে তুমি না থাকিলে পরে,
কে করিত সে সময় শিশুর পালন ?—
সঙ্কটে সান্ত্বনা কর মানবের মন।

৫

ওরে আশা, সর্ব লোকে তোরে ভালবাসে ;
মধুময় সম্ভাষণে, বাঁচাও অধীর জনে,
সবে তুষ্ট হয় তোর সুমধুর ভাষে।
যখন খেলিয়া পাশা, পাণ্ডবের দুরদশা,
দুষ্ট দুঃশাসন নিজ ভ্রাতার আদেশে,
পাঞ্চাল দুহিতা সতী, পাণ্ডব যাঁহার পতি,
সভামাঝে যবে আনে ধরি তাঁর কেশে,
তখন দেবীর মনে, ছিলে তুমি সঙ্গোপনে,
অন্য কোন বন্ধু নাহি ছিল তাঁর পাশে,
পুনরায় দুর্যোধন, করিয়া দারুণ পণ,
পাণ্ডবের সর্বধন চাতুরীতে গ্রাসে ;
হারাইয়া যবে পণে, পাঠায় সকলে বনে,
তখন আছিলে তুমি সাথে বনবাসে,
তোমার বচনে আশ, কাননে করিয়া বাস,
কাটাল জীবন তারা তোমার আশ্বাসে।
তাই বলি সর্বলোকে তোরে ভালবাসে।

৬

প্রাণ বাঁচে ওরে আশা, শুনি তব বাণী—
যখন অযোধ্যাপুরে, পিতৃসত্য পালিবারে,
বনবাসী হইলেন রাম-গুণমণি।
তখন কৌশল্যা দেবী, যেন বৎসহারা গাভী,
তোমার কৃপায় শুধু বাঁচিলেন রাণী।
যবে দুষ্ট লঙ্কেশ্বরে, জানকী হরণ কোরে,
রাখিল অশোকবনে রামের ঘরণী,
তখন তাঁহার মনে, উদেছিলে ক্ষণে ক্ষণে,
বাঁচালে অশোকবনে জনকনন্দিনী,
শ্রীরামের মনে ছিলে, সমুদ্রে সেতু বাঁধালে,
প্রবোধিলে রামচন্দ্রে শুনাইয়া বাণী।

আশা রে! তোমার বলে, মানব রয়েছে ভুলে,
বিপদে ভুলাও কহি মধুর কাহিনী;
পুত্র শোকাতুর মাতা, শোকেতে তোমার কথা,
তোমার প্রবোধে বুঝি' বাঁচয়ে জননী;
যে রোগী শয্যার 'পরে, ঔষধ সেবন করে,
কেবল তোমারে ধরে বাঁচে তার প্রাণী,
তাই বলি ওরে আশা, জগতে তুমি ভরসা,
বাঁচাও অখিল বিশ্বে কহি মধুবাণী।

(বনপ্রসূন, ১৮৮২)

নিরাশা

মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়

১

আশার বিষম শত্রু তুই রে নিরাশা।
মানবের হৃদে আসি' পশিলে সহসা,
বিপরীত গুণ ধর, সকল (ই) বিনাশ কর,
মন ব্যাকুলিত কর, ভাঙ্গিয়া ভরসা,
আশার বিষম শত্রু তুই রে নিরাশা।
মনে কত আশা করে, বাঁচে লোক এ সংসারে,
তুমি শত্রুরূপ ধরে ঘটাও দুর্দশা,
মুহূর্তে ঘুচাও আশ, সকল পিপাসা;
ক্ষীণপ্রাণে আশা হয়, এ জগতে একাশ্রয়,
তুমি সমাগত হয়ে নাশ সে ভরসা,
কাঁপয়ে হৃদয় যন্ত্র শুনি' তোর ভাষা।
শুনিয়ে আশার বাক্য, রোপয়ে শোকেতে বৃক্ষ,
সে বৃক্ষ কটাক্ষে তব নাশে রে হতাশা,
কাঁপয়ে হৃদয়যন্ত্র শুনি' তোর ভাষা।

২

তব কটুভাষ, শর সম অতি খর,
মানব-হৃদয়ে বিঁধি করে জর জর,
আশায় আকাশে তুলে, তুই রে ভাসাস জলে,
হেরিলে তোমায় সবে কাঁপে থর থর,
তব কটু ভাষ, শর সম অতি খর।
হৃদয়ে আনন্দ দেখে, উঁকি মার দূরে থেকে,
সদা ব্যস্ত কিসে সবে করিবে কাতর,
মনকে দুর্বল কর তুমি রে পামর।
আশার আলোকে যদি, আলোকিত হয় হৃদি,
তুমি রে হিংস্রক কভু, সহিতে না পার,
বিষম তিমিরে আনি কর অন্ধকার।
আশায় উচ্চেতে তুলে, ফেল তুমি অধস্তলে,
বল, বুদ্ধি রসাতলে দিস রে সত্বর,
সদা ব্যস্ত কিসে সবে করিবে কাতর।

৩

অতি নিরদয় তুই, নিরাশা দুরন্ত,
তোর ভয়ে বলহীন যত বলবন্ত ;
ফকীরের গৃহে যবে, বঙ্গের শেষ নবাবে,
ধরিল, নাশিব বলি' সৈনিক দুর্দান্ত ;
সবল সিরাজ হ'ল নিরাশায় ভ্রান্ত,
নবাবের হৃদি 'পরে, আঘাতিলি বারে বারে,
দহিলি তাহায় যেন অনল জ্বলন্ত
তুইরে নিষ্ঠুর অতি নিরাশা দুরন্ত।
যে সময়ে কারাগারে, বন্দী করি' রাখে বীরে,
নিরাশ ঝটিকা করে তাহাদের ক্লান্ত,
কিছুতে তোমার বেগ নাহি হয় ক্ষান্ত।
লয়ে তীক্ষ্ণ তরবার, সংঘাতক দুরাচার,
বধ তরে লয়ে যায় বধ্যভূমি-প্রান্ত,

পূরাও তাদের প্রাণ নিরাশে নিতান্ত ;
বলহীন কর তুমি যত বলবন্ত।

৪

নিরাশ পঙ্কেতে পড়ি' হাবুডুবু খাই,
নিরাশ অপেক্ষা রিপু আর কিছু নাই ;
ভাবে লোকে আশাভরে, পরকাল আছে পরে,
সৎকার্য করিলে, তথা সুখরাশি পাই,
নিরাশা সে আশে আসি' চাপা দেয় ছাই ;
নিরাশা নীরবে বলে, কেন ভাব পরকালে,
ধরা-ই নরক, স্বর্গ, পরকাল নাই ;
নিরাশে পড়িয়া তাই হাবুডুবু খাই।
যদি দংশে কালফণী, বিষজরে ক্ষীণপ্রাণী,
যতন করিলে তারও ঔষধ বা পাই,
শমন আনন হতে, তাহারে বাঁচাই ;
কিন্তু যদি একবার, দংশয় নিরাশা কাল,
কিছুতে তাহার বিশে, আর রক্ষা নাই,
ফণীর অধিক ভয়, নিরাশাতে পাই।
উচ্চ হব আশা করে, উঠি আশা খুঁটি ধরে,
নিরাশা প্রস্তরাঘাতে অমনি লুটাই,
নিরাশার চেয়ে শত্রু আর কেহ নাই।

(বনপ্রসূন, ১৮৮২)

কাল

দীনেশচরণ বসু

অনন্ত, অজেয়, কালের তরঙ্গ,
চলে সদা, যেন উন্মত্ত মাতঙ্গ,
কোন্ বীর রণে নাহি দেয় ভঙ্গ
ধরণীতলে ?
একমাত্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ আসিয়া,
শত শত দেশ ফেলে গরাসিয়া,
সহস্র ভূধর ফেলে উপাড়িয়া,
জলধি-জলে,
যেখানে ভূধর, সেখানে সাগর,
যেখানে সাগর, সেখানে ভূধর,
করিছে হেলে।
যেমন শিশুরা হাসিয়া হাসিয়া,
মাটির পুতলী স্বকরে গড়িয়া,
বসনভূষণে সবে সাজাইয়া,
ভাঙ্গিয়া ফেলে ;
সেইরূপ কাল নিয়ত নিয়ত,
গড়িছে ভাঙ্গিছে নিমিষেতে কত,
আপন মনের অভিরুচি মত
অবনীতলে ;
মহোচ্চ ভূধর, গভীর জলধি,
কাঁপে থর থর, পূজে নিরবধি, পদযুগলে !
তৃণপত্র যথা সাগর-সলিলে,
স্রোত-রজ্জু ধ'রে ভেসে যায় চলে,
নাহি সাধ্য কার যায় প্রতিকূলে
আপন বলে ;

ভালবাসা

দীনেশচরণ বসু

এ বিশ্বসংসারে হেন শক্তি কার,
তোমার মহিমা করিবে প্রচার ?
তুমি গো জীবের জীবন-আধার,
এ মহীতলে !

ফিরাই যে দিকে যুগল নয়ন,
নিরখি তোমার সুধাংশু বদন,
দৃঢ় পাশে তুমি করেছ বন্ধন
জীব সকলে !

আইলে বসন্ত বিজন কাননে,
অমনি তখনি সহাস্য বদনে,
তরুলতা যথা বিবিধ ভূষণে,
সাজায় কায় !

তুমিও যেখানে কর পদার্পণ,
সুখচন্দ্র তথা বিতরে কিরণ,
বিষাদ, হুতাশ, জনম মতন
চলিয়া যায় ।

তব আবির্ভাবে, ভুবনমোহিনি !
মরুভূমে বহে গম্ভীর বাহিনী,
ফোটে পারিজাত আসিয়া আপনি
ধরণী-তলে !

আঁধার আকাশে হিমাংশু-কিরণ,
হাসি হাসি করে কর বিতরণ,
ভাসে যেন মরি অখিল ভুবন,
সুখ-সলিলে !

কে বলে কেবল নন্দনকাননে
ফোটে পারিজাত ? ফোটে না এখানে ;-
দেখ চেয়ে এই সংসার-কাননে
ফুটেছে কত !
গৃহস্থের ঘরে, রাজার ভবনে,
রোগীর শিয়রে, বিজন কাননে,
কত শত ফুল প্রফুল্ল বদনে,
ফোটে নিয়ত !

যখন জননী হাসিয়া হাসিয়া,
স্নেহ-নীরে, মরি, ভাসিয়া ভাসিয়া
নবীন শিশুকে কোলেতে করিয়া
বসেন ঘরে ;
যখন পলকবিহীন নয়নে,
দেখেন জননী সে বিধু-বদনে,
যখন রাখেন হৃদয় আসনে
যতন ক'রে !
তখন মায়ের মোহিত অন্তরে,
অয়ি মধুময়ি ! হেরি গো তোমারে,
তুমি গো তাঁহারে আনন্দ-সাগরে
মগন কর ।
আশার আলোকে জ্বলিয়া অন্তরে,
কত সুস্বপন দেখাও তাঁহারে,
অন্তর হইতে, বিদায়ি চিন্তারে
স্নেহেতে ভর !

শিশুর হৃদয়ে, হে সুরসুন্দরি !
চিরদিন তুমি আনন্দলহরী ;
এ ভব-ভবনে সকলে তোমারি,
মহিমা গায় !

সতী রমণীর বিমল আননে,
প্রিয় ভগিনীর মধুর বচনে,
তোমারি প্রতিভা হে চারুলোচনে,
প্রকাশ পায়!

জয় জয় দেবি বিশদ-বসনে,
একবার আসি হৃদয়-আসনে,
বসো গো, বিমলে, কমললোচনে,
রূপের রাশি!

সেই সুবিমল কিরণে তোমার,
উজ্জল, বিমলে, হৃদয়-আগার,
আশার আলোক তুমি গো আমার,
সুখের হাসি!

(মানসবিকাশ, ১৮৭৩)

শৈশব স্বপন

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১

আজ কেন অকস্মাৎ
সুদূর শৈশবস্বপ্ন হইল স্মরণ?
দারিদ্র্য অনল যার, হৃদে জ্বলে অনিবার,
সংসারের কার্যশ্রমে ক্লান্ত অনুক্ষণ!
ভয়ঙ্কর ঋণদায় প্রতিবাসী শত্রু তায়
অস্থির উন্মত্ত প্রায় হয়েছে যে জন!
সে কেন দেখিল স্বর্গ সুখের স্বপন?

২

বহুদিন ঘন ঘটা,
দুর্যোগী গগন আর আঁধার ধরণী,—
যে জন দেখেছে হায়! ক্ষণস্থায়ী চপলায়
কি সুখ? তাহার মাত্র ধাঁধে আঁখিমণি;
যে পথিক্ দিক্ ভ্রমে, নিদারুণ পথশ্রমে
প্রান্তরেতে ক্লান্ত, তাহে তমিস্রা রজনী,
আলেয়া প্রতারে তারে কেন তা না জানি!

৩

হায়! সে সুখের দিন
সময় সাগর গর্ভে হয়েছে মগন।
নাই সে অবস্থা আর, সেই সঙ্গী খেলিবার,
নাই জননীর কোল—স্বর্গ-সিংহাসন!
বসন্ত কুসুমরাশি, শরতের পূর্ণশশী,
মলয়ার বায়ু, গঙ্গাজল সম মন
ছিল যে পবিত্র, এবে চিন্তার ভবন!

৪

দুঃখাঘাত প্রতিঘাতে—
নহে তা কোমল কিশলয় সম আর!
নহে ত পাষাণ মত, তা হলে ফাটিয়া যেত,
কি জানি কেমন তবে অন্তর আমার!
হৃদয়! কিসের তরে, বিষাদ সাগর নীরে,
ঢেলেছ পবিত্র মূর্তি তুমি আপনার?
ভোগতৃষ্ণা, অবিতৃপ্তি আছে কি তোমার?

৫

তাও নাই, তবে কেন—
যে সংসার ছিল মোর প্রমোদ উদ্যান,
ছিল শান্তি সুখ ধাম, এবে তার পরিণাম
শ্বাপদ সঙ্কুল ভীম গহন সমান?

হৃদয়ের প্রিয়তর, নয়নের প্রীতিকর,

কুসুমিত লতাকুঞ্জ ফলে নম্রমান

ছিল, তাও এবে বিষবল্লরী বিতান?

(ভুবনমোহিনী প্রতিভা, ১৮৭৫)

একদিন

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হৃদয়-মন্দিরে প্রাণ,
দেবীর চরণ তলে
ছিল ঘুমাইয়া।
বিজন-মন্দিরে সেই
প্রাণীমাত্র নাহি ছিল
দিতে জাগাইয়া॥
অতীত পূজার বেলা,
অনশনে ক্লান্ত প্রাণ
ঘুমে অচেতন।
ধূলায় পড়েছে ঢলি,
পাষাণে ললাট পড়ি
স্বেদ ঝরে ঘন॥
কাতর বদনখানি
মুদিত নয়ন দু'টি
গেছে কিছু খুলে।
দুই প্রান্তে অশ্রুজলে
ধারা দিয়ে পড়িতেছে
দেবী-পদমূলে॥

দেবীর প্রতিমাখানি
বিরাজিত সিংহাসনে
পাষাণ-মূরতি।

এক করে সুধাভাণ্ড,
আর করে বরাভয়
ওষ্ঠে ঝরে প্রীতি॥

সুগোল উন্নত গ্রীবা,
ঈষদ্ বঙ্কিমে নত,
তাহে দু'নয়ন।

পল্লবে আবৃত আধ,
আধ বিকসিত মৃদু
স্নেহে অচেতন॥

সেই দৃষ্টি বিগলিয়া
প্রাণের অধরে মম
পড়িতেছে ধীরে।

পূর্ণিমার আলো যেন
গিয়াছে মিলিয়া, শুষ্ক
সরসীর নীরে॥

অনাবৃত নেত্রপথে
পশিয়া সে ভাতি, মম
প্রাণের অন্তরে।

স্বপনের চন্দ্র মত
উজ্জলিয়া অন্তঃস্থল,
স্বপন বিতরে॥

অতীত পূজার বেলা,
তথাপি নীরবে প্রাণ
আজ কি কারণ?

একে তার ক্ষীণ দেহ,
তাহে ঘোর তপস্যায়
সদা নিমগন!

কি জানি কি হ'ল ভাবি,
মন্দিরের দ্বার ঠেলি
হেরিনু গোপনে

দেখিনু নিদ্রিত প্রাণ,
ওই ভাবে আছে পড়ি
দেবীর চরণে॥

অস্থির হইনু আমি,
প্রাণের সে দশা বুকে
সহিল না আর।

'প্রাণ—প্রাণ—প্রাণ' বলি,
বিষম-কাতর স্বরে
করিনু চীৎকার॥

শিহরি উঠিয়া বসি
উন্মাদের মত প্রাণ,
চৌদিকে হেরিল।

শিহরি উঠিলা দেবী,
পাষাণ-নয়নে তাঁর
স্নেহ মিলাইল॥

(চিন্তা, ১৮৮৭)

আমার প্রাণ

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্পনে !

বুকের পাষাণ মম, এ জ্যোৎস্নায় একবার,
দেও সরাইয়া—
প্রকৃতির প্রীতিমাখা, মধুর হৃদয়ে আমি,
যাই মিশাইয়া !
তুষার আবৃত ভূমে, তরুণ অরুণ ভাতি,
যেমতি বিভাত !
দিক্ হতে দিগন্তরে, বিমল কৌমুদী রাশি,
তেমতি সম্পাত !
জীবন্ত স্বপন যেন, অনন্ত গগন-বক্ষে,
পড়েছে ছড়ায়ে !
স্থাবর জঙ্গম জীব, সকলি মোহেতে যেন,
নয়ন মেলায়ে !
আশার মধুর স্মৃতি, যেন আজ বিশ্বখানি
আবেশে অচল।
বিধির প্রথম সৃষ্টি, মধুর আলোকে যেন,
ভুবন উজ্জ্বল।
কল্পনে ! বারেক আজ, বুকের পাষাণখানি,
দেও সরাইয়া।
শূন্য-পথ ভাসাইয়া, জনস্রোত মাতাইয়া,
এই জ্যোৎস্নার সনে যাই মিশাইয়া।
ইচ্ছা করে একবার, অনাদি অনন্ত ওই,
গগনের তলে।
কলেবর বিস্তারিয়া, হৃদয় বিদীর্ণ করি,
দিই প্রাণ ঢেলে।

ক্ষত মর্ম্মস্থান হ'তে, অজস্র প্রপাত পাতে,
পরাণ আমার।
জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নায়, ঝরিয়া পড়ুক ভূমে,
ভাসায়ে সংসার!
ভূতলে কঠিন যাহা, দ্রবীভূত করি তাহা,
প্রাণের অমৃতে।
ক্ষিতি, শিলা, নর, নারী, পাষাণ পরাণ আর,
যা কিছু মহীতে।
পরাণে পরাণে এই শূন্য পথ ভেসে যাক্,
আর—এ সংসার।
আত্মপর জ্ঞান ভুলে, মুহূর্ত্তেক মগ্ন হোক্,
পরাণে আমার।
প্রাণের নিভৃত ব্যথা, নর নারী হৃদে যাহা—
আমার মতন,
আমার পরাণ সনে, উথলি উঠুক তাহা,
আকুলি ভুবন।

(চিন্তা, ১৮৮৭)

অনন্ত পিপাসা

স্বর্ণকুমারী দেবী

হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা—
নিবার কেমনে, প্রভু, সংসারের বিন্দু ভালবাসা!
চাহি মান, চাহি ধন, চাহি প্রিয় পরিজন,
যত পাই আরো চাই, কেবলি দুরাশা!
কিছুতে মেলেনা শান্তি, বাসনার বাড়ে ভ্রান্তি,
অতৃপ্তির মরীচিকা, মোহ সর্বনাশা!

বুঝি গো প্রেমের সিন্ধু, হৃদি তোমারেই চাহে,
বুঝিয়া বুঝিতে নারি, ডুবিয়া অজ্ঞান মোহে।
এস নাথ, এস প্রাণে, আত্মার মিলন দানে
পূর্ণ কর এ অভাব এ অনন্ত তৃষা!

(কবিতা ও গান, ১৮৯৫)

দ্রৌপদী

দেবেন্দ্রনাথ সেন

(টিণ্ডাল., হাক্সলি, স্পেন্সার, ডারুইন প্রভৃতি জড়বাদীদিগের গ্রন্থ পাঠান্তে)

হে প্রকৃতি! যত তোমা নেহারি নেহারি,
তত্ত্ব নব নব শোভা চর্ম-চক্ষে ভায়!
হে দ্রৌপদি! যত তোমা উঘারি উঘারি,
নগ্ন করা দূরে থাক্, শাটী বেড়ে যায়!
অশোক, চম্পক, পদ্ম, অতসী, কাঞ্চন,
অনন্ত শাটীতে ঘেরা—অদ্ভুত ঘাগরি!
প্রকৃতি সতীর আহা লজ্জা-নিবারণ,
অন্তরীক্ষে, চুপে, চুপে, যোগান শ্রীহরি!
ক্ষম দেবি, অপরাধ, বিশ্বের জননি;
মোরা সবে দুঃশাসন, দাম্ভিক অজ্ঞান;
সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত, তপ্তরক্ত পান
করুক নৈরাশ্য-ভীম, করি' জয়ধ্বনি!
মোরা যত কুলাঙ্গার নির্বাক, নীরবে—
সভা-মাঝে অধোমুখে ব'সে আছি সবে।

(অশোকগুচ্ছ, ১৯০০)

হরিদ্বার

দেবেন্দ্রনাথ সেন

১

হেরিলাম হরিদ্বারে, ব্রহ্মকুণ্ড, হরির চরণ,
মায়াপুরী, মায়াদেবী, কনখল্, দক্ষ প্রজাপতি।
হেরিনু শ্রবণনাথে ভক্তিরসে রঞ্জিয়া নয়ন ;
চণ্ডী পাহাড়ের শিরে চণ্ডিকার অপূর্ব মূরতি।
শঙ্খধ্বনি, দেবার্চনা, ওম্ ধ্বনি, উদার ভারতী,
শুনিলাম পথে ঘাটে সুমধুর "নমোনারায়ণ"!
দেবকন্যা শান্তিহাসে। যোগিনেত্রে কি বিচিত্র জ্যোতি
মঠগুলি কি সুন্দর! কোথা লাগে দেবেন্দ্র-ভবন ?
কল কল তরতর যান গঙ্গা, বাজায়ে কিঙ্কিণী,—
এ সুন্দরা নগরীরে ভুজপাশে মেখলিত করি।
গিরিকুঞ্জে কি উৎসব! বিহঙ্গেরে বিহঙ্গিনী মরি,
শুনাইছে কলকণ্ঠে মনানন্দে, মোহিনী সোহিনী।
বসুধার চারু বক্ষে, হরিদ্বার স্বর্ণ-হারাবলী!
সৌন্দর্য-নির্ঝর আহা চারিধারে প'ড়িছে উছলি।

২

সৌন্দর্য বিভোর হয়ে—প্রাতে যবে দেবের অর্চন
হয় শত দেবালয়ে, চারিধারে শঙ্খঘণ্টা বাজে,
গঙ্গাতীরে বসি ধীরে, ভাবি আমি বিস্ময়ে মগন
একি রূপ মরি মরি! কোন্ র‍্যাফেলের বর্ণ-সাজে,
পুলকে জাগিল ছবি সুফলকে বিশ্বে অতুলন ?
লাজে হারে কাশী কাঞ্চী। দেবের মালঞ্চ যেন রাজে
এ তো গো নগরী নয়। কল্পনার কুঞ্জবন-মাঝে
সুকবি হেরেছে যেন অপরূপ সৌন্দর্য-স্বপন।
সৌন্দর্যের চির-উপাসক আমি। আঁখি মুদে আসে।

কেবা হরি ? কেবা হর ? নাহি থাকে নাম-রূপ-জ্ঞান
পলকে পলকে আসি, ঝলকিয়া, নেত্রপটে ভাসে
সুন্দরের শত মূর্তি ! শত নেত্রে করি আমি পান
সেই লাবণ্যের ধারা !—সুন্দরের চরণ-বাহিনী,
সৌন্দর্যের পূত গঙ্গা, হের, ধায় সাগরবাহিনী ।

(গোলাপগুচ্ছ, ১৯১২)

কবির প্রতি উপদেশ

দেবেন্দ্রনাথ সেন

১

তুমি কি ভেবেছ, বসি নিজ গৃহ-কোণে,
টবের কুসুমগুলি তুলি,
মন-সাধে, আনমনে, মুদ্রিত নয়নে,
কবিকুঞ্জে হইবে বুলবুলি ?
হে কবি সে মূল কথা গিয়াছ কি ভুলে ?
যশ-সোমরস শুধু হয় বনফুলে ।

২

তুমি কি ভেবেছ, মন করিবে হরণ,
ভাঙা ভাঙা আধা আধা স্বরে ?
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে, সঘনে জঘন
রূপ-ভারে ঢলে ঢলে পড়ে,
নয়ন কহিবে কথা, তবে সে বনিতা ?
যমক ভগিনী ওরা, বনিতা, কবিতা !

৩

শুদ্ধ চিত্তে, কায়মনে কবিতা রচিবে
দূর করি চিত্তহরা খেদ—
কবি প্রাণ-ধনুকেতে জ্যা-নির্ঘোষ হবে,
তবে গিয়া হবে লক্ষ্য ভেদ ।
ছুটিবে শব্দের তীরে ভেদি তমোজাল
দ্রৌপদী পশিবে রঙ্গে হাতে স্বর্ণথাল ।

৪

তোমার চিত্রশালায় থাকে যদি কবি,
দেব-দত্ত প্রতিভা তুলিকা,
হও কবি, ক্ষতি নাই ; চন্দ্র তারা রবি,
ফল, ফুল, তরু ও লতিকা,
নর-নারী-ময় এই বিশ্ব রঙ্গভূমি,
আঁকিতে, সাজিতে পার ; কামরূপী তুমি !

৫

তাহা যদি নাহি থাকে, বিয়োগিনী ছন্দে
গাও যদি মিলনের গীত,
কালের সহিত তবে মিছামিছি দ্বন্দ্বে
কেন কর মরম ব্যথিত ?
জাননা যে পারিজাত শোভে দেব-গলে
আরোহি-দৈত্যের গলে ফণী হয়ে দোলে ?

৬

তব সুখে সুখী হয়ে, তব দুঃখে দুঃখী,
সংসার বলিবে বারম্বার—
"হাসালে, কাঁদালে ; এ যে বিচিত্র কুহকী !
দেবতুল্য মূরতি ইহার।"
লয়ে পুষ্প রাশি রাশি, হে কবি, তখন আসি'
কাল দৌবারিক, চুম্বি চরণ তোমার,
খুলিবে তোমার লাগি অন্তরের দ্বার !

(গোলাপগুচ্ছ, ১৯১২

তাণ্ডব নৃত্যে

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

অঙ্গে বিভূতি অজিন-বসন—
হের গো সৃষ্টি মণ্ডপে,
সঙ্গে অযুত ভূত প্রেতগণ—
ভৈরব নাচে তাণ্ডবে।
গম্ভীর গুরু ডমরু বাজিছে,
ফণী দোলে তালে উল্লাসি,
নন্দীর করে পটহে নাদিছে:
"বোম্ বোম্ হর সন্ন্যাসী।"
অনল-দীপ্ত দ্বাদশ সূর্য
ঊর্ধ্ব গগনে স্তম্ভিত;
প্রবল ঝটিকা বাজায় তূর্য
শৈল সিন্ধু কম্পিত।
বিরচি গরলে অর্ঘ্য পাদ্য,
বাসুকি উঠিল নিঃশ্বাসি,
উপছি পাতাল উঠিল বাদ্য—
"জয় জয় হর সন্ন্যাসী।"
বক্ষে শঙ্কা জাগিল চকিতে,—
চমকে ইন্দ্র চন্দ্র;
যক্ষ রক্ষ বিহ্বল চিতে
ভুলিল রক্ষা মন্ত্র।
রচেরে স্তোত্র দেবতাবর্গ—
উচ্চে বাণী বিন্যাসি।
নাচেরে রুদ্র মাতায়ে স্বর্গ:
"বোম্ বোম্ হর সন্ন্যাসী।"

অগণিত লোকে বাজে বাদিত্র
গরজি অধিক গরবে ;
দ্বিগুণিত ভূত ফণীর নৃত্য,
ভীম তাণ্ডব পরবে।
তুলিল গঙ্গা ফেনিল লহরী
জটায় জটায় উচ্ছ্বাসি ;
ঘুরিল ত্রিশূল গগন উপরি :
"জয় জয় হর সন্ন্যাসী।"
আজি যে তোমার নৃত্য হেরিয়া
তোমারি চরণ প্রান্তে,
নাচিছে বিশ্ব, শূন্য ঘেরিয়া—
আলোক বিকাশি ধ্বান্তে।
অশিব মথিয়া মঙ্গল-গাথা
উঠিছে ; শুনিছে বিশ্বাসী।
হে শিব, সর্ব, বিশ্ব-বিধাতা
"বোম্ বোম্ হর সন্ন্যাসী।"

(পঙ্কমালা, ১৯১০)

স্বর্গ

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

১

ওগো ঊর্ধ্বলোকে স্বর্গ কোথা—
চির সুখের নাগরী—
কৈলাসের আকাশ করি দীপ্ত ?
যুক্তদেহে আসীন যথা
শঙ্কর ও শঙ্করী,
চরণ-তলে সিংহ বলদৃপ্ত ?

২

তথা নবীনা নাকি লতিকা যত
নব কোরকে পল্লবে ;
সুখের চাপে সঘনে কাঁপে পর্ণ ;
কুসুম ফোটে প্রেমের মত
মোহিয়া দেব-বল্লভে,
বিকাশ দলে আশার শত বর্ণ।
সুখ স্বপ্ন-মাখা আলোকে ভাতে
তটিনী চির রঙ্গিণী,
লহরী 'পরে বিহরে নব সুষমা।
কিন্নরীরা বিহগ সাথে
সঙ্গীতের সঙ্গিনী।
যামিনী তথা নিত্য রাকা-ভূষণা।

৩

যথা জীবন বাঁধে পুরুষ নারী
অটুট প্রেম-প্রতানে,
চরণ-তলে দলিত রিপুবর্গ ;
আলোক ভাতে, সুখ বিথারি,
ভবনে আর পরাণে,
বিরাজে সেথা চির সুখের স্বর্গ।
নাহি যৌবনেতে চঞ্চলতা ;
চিত্তে চির তুষ্টি ;
হাসির গায়ে চন্দ্র চির অঙ্কিত।
স্নিগ্ধ রসে আশার লতা—
নিত্য লভে পুষ্টি ;
প্রেমের ফলে মাধুরী চির সঞ্চিত

(পঙ্কজমালা, ১৯১০

মহাসিন্ধুর ওপার থেকে

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(ঐ) মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।
কে ডাকে মধুর তানে, কাতর প্রাণে, "আয় চলে আয়,
ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে ॥"
বলে, "আয় রে ছুটে আয় রে ত্বরা, হেথা নাই ক'
মৃত্যু, নাই ক' জরা,
হেথা বাতাস গীতিগন্ধভরা চিরস্নিগ্ধ মধুমাসে ;
হেথায় চির শ্যামল বসুন্ধরা চির জ্যোৎস্না নীলাকাশে ॥
কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে ;
দেখ ঐ সুধাসিন্ধু উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে,
আয় চলে আয় আমার পাশে।
কেন কারাগৃহে আছিস্ বন্ধ,
ওরে, ওরে মূঢ় ওরে অন্ধ !
ওরে, সেই সে পরমানন্দ যে আমারে ভালবাসে।
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে প'ড়ে
আছিস্ পরবাসে !"

(গান, ১৯১১)

সায়াহ্ন

মুন্সী কায়কোবাদ

হে পান্থ কোথায় যাও কোন্ দূর দেশে
কার আশে ? সে কি তোমা করিছে আহ্বান !
সম্মুখে তামসী নিশা রাক্ষসীর বেশে,
শোন নাকি চারিদিকে মরণের তান !

সে তোমারে—ওহে পান্থ হাসি মুখে এসে,
সে তোমারে ছলে বলে গ্রাসিবে এখনি !
যেওনা একাকী পান্থ সে দূর বিদেশে,
ফিরে এস, ওহে পান্থ ফিরে এস তুমি !
এ ক্ষুদ্র জীবন ল'য়ে কেন এত আশা,
জান না কি এ জগত নিশার স্বপন !
মায়া মরীচিকা প্রায় স্নেহ ভালবাসা,
জীবনের পাছে অই রয়েছে মরণ !
হে পান্থ হেথায় শুধু আঁধারের স্তর ;
মৃত্যুর উপরে মৃত্যু, মৃত্যু তারপর।

(অশ্রুমালা, ১৮৯৪)

অভিনন্দন

মানকুমারী বসু

("আলো ও ছায়া"র কবির প্রতি)

আধেক রয়েছে নিশা
আধেক জেগেছে ঊষা,
আধেক আঁধার-বাস
আধেকে কনক-ভূষা !
আধ গীতি গা'য় পাখী
আধ ফোটে বেলী ফুল,
স্বরগ মরত আধ
চিনিতে আঁখির ভুল

আকাশে অমরী-কণ্ঠ
আধ আধ শোনা যায়,
আধ সে আঁচলখানি
লুটিছে সুমেরু গায়।

জগত ভরিয়া গেছে
আধ আলো আধ ছায়া,
কে হেন মোহিনী মেয়ে
কার এ মোহিনী মায়া?

কার এ মধুর বীণে
মন্দাকিনী উথলিল,
কার এ পাপিয়া আসি
অকালে ঝঙ্কার দিল?

জানি না নারী কি দেবী
জানি না কাছে কি দূরে,
তবু ডাকি—একবার
এস এ আঁধার পুরে!

ভাসিছে পূরবাকাশে
তোমারি পূরবী তান,
মরমে পশিছে মোর
শিহরি উঠিছে প্রাণ!

জাগিয়া স্বপনে শুনি
তোমার অমিয় বাঁশি,
মনে মনে পূজি তাই
প্রাণে প্রাণে ভালবাসি

(কনকাঞ্জলি, ১৮৯০)

কবিতারাণী

মানকুমারী বসু

শীতের কুহেলি-ভরা
তমোময়ী বসুন্ধরা,
জ্বলে না একটী আলো গগন-প্রাঙ্গণে ;
নীল নভস্তলে থাকি
গাহে না একটী পাখি,
ফোটে না একটী ফুল কুসুম কাননে।

নদীর আকুল বুকে
বিধবা আনত মুখে
জীবনের পূর্বস্মৃতি করিছে স্মরণ ;
স্বপনে যে সুখরাশি
দেখা দিয়ে ছিল আসি,
এবে তা জ্বলিছে বুকে দীপ্ত হুতাশন !

কোলে শিশু আধ জেগে,
জননী উঠিছে রেগে,
আর নাহি লাগে ভাল "মাণিক রতন",
দারুণ রোগের ভরে
শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে,
আসে না আদর তারে আসে না যতন।

ধরাতল ফাঁকা ফাঁকা
কি এক অশান্তি-মাখা !
সব যেন কায়া-ছায়া—প্রাণ যেন নাই ;
দশ দিক্ শূন্য শূন্য,
মানব নৈরাশ্যপূর্ণ,
ধরে যদি সোনা-মুঠা হয়ে যায় ছাই !

সহসা নাশিয়া কালো
জাগিল ত্রিদিব-আলো
হাসিল সুমুখী উষা কনক-অচলে ;
সরায়ে আঁধার-খানি
উরিল কবিতা-রাণী,
নব পারিজাত-মালা শোভে বর গলে ।

যে দিকে ফিরিয়া চায়,
বসন্ত ছড়ায়ে যায়,
ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় মাটির ধরণী ;
দিগঙ্গনা খোলে আঁখি,
কল কণ্ঠে গাহে পাখী,
নীরস জগতে ছোটে প্রেম-মন্দাকিনী !

বসুধা অতৃপ্ত বক্ষে
নিরখে সহস্র চক্ষে,
আকাশ ভরিয়া ওঠে আগমনী গান ·
দেখি সে সোনার মুখ
আসে শান্তি আসে সুখ,
মর-নর-বুকে আসে অমর-পরাণ !

দেবতা স্বরগ থেকে
বলিছেন ডেকে ডেকে,—
"জ্বলিতে হবে না আর অশান্তি লাগিয়া ;
জুড়া'তে বিশ্বের জ্বালা
সৃজিনু কবিতা-বালা,
অমৃতে অমৃতে দিবে অবনী ছাইয়া ।"

(কনকাঞ্জলি, ১৮৯৬)

আসক্ত

মানকুমারী বসু

আমি যবে যাইব চলিয়া
কাছে সবে আসিয়া বসিও,
স্নেহসিক্ত স্নিগ্ধ কর দিয়া
মোর শির পরশ করিও।

একটুকু দিও ফুল্ল হাসি
ক্ষমিও সকল অপরাধ;
প্রফুল্লতা উঠে যেন ভাসি,
আমি নারি সহিতে বিষাদ।

যেখানে যাইতে হবে মম,
শুনাইও সেথাকার কথা,
কিবা সে কেমন মনোরম?—
বলে দিও সকল বারতা।

হেথা যাহা রহিবে আমার,
তোমরা তা সযতনে রেখো;
প্রিয় বন্ধু যত অভাগার,
চিরদিন প্রিয়ভাবে দেখো।

আকাশে ডুবিবে রাঙা রবি,
তার সাথে আমিও ডুবিব,
সবে মিলে গাহিও পূরবী,
শুনি আমি উৎসাহে ছুটিব।

সে দেশের ভাই বোন যারা
মোরে দেখি আসিবে ছুটিয়া?—
আমারে "আমার" ভেবে তারা,
রীতি নীতি দিবে শিখাইয়া?

আমি যাহা বড় ভালবাসি,
তারা আনি দিবে সে সকল ?
দিন রাত থেকে পাশাপাশি,
সাধিবে কি আমারি মঙ্গল ?

কিন্তু,
তোমাদের স্নেহমাখা কাছে,
তারা বুঝি দিবেনা আসিতে ?
তবে সেথা কিবা সুখ আছে,
কেন আমি চাহিব যাইতে ?
জানিনা কোথায় "স্বর্গ" আছে ;
মোর স্বর্গ তোমাদেরি কাছে !

(কনকাঞ্জলি, ১৮৯৬)

হৃদয়-নদী

মানকুমারী বসু

১

প্রাণভরা ব্যথারাশি সাশ্রু নেত্র, ম্লান হাসি,
এরূপে ক'দিন কাটাইব।
রমণী-হৃদয়-নদী, ক্ষুদ্র কেন নিরবধি ?
চল সখি ! সাগরে সঁপিব ;
নহে তো পঙ্কিল সর, কেন তবে ভেবে মর ?
নদী কেন বাঁধিয়া রাখিব ?
উদার বাতাস ব'বে, গগন বিম্বিত হ'বে,
চন্দ্র তারা তাতেই দেখিব।
ঢেউগুলি দুলে দুলে আছাড়ি পড়িয়ে কূলে,
হেরি কত আনন্দ লভিব !
মিছা ভয় ভাবনায় বৃথা দিন বয়ে যায়,
কবে সখি কর্তব্য পালিব ?

২

দেহটি রাখিব দূরে শান্তিময় অন্তঃপুরে,
প্রাণখানি বিশ্বে ঢেলে দিব ;
ক্ষুদ্র বুকে বল বাঁধি আগে ক্ষুদ্র কাজ সাধি
তারপরে ও পারে ফিরিব ;
এখনি—কেন গো ভুল হ'তে চাহি চিতা-ধূল,
কোন্ মুখে বিদায় মাগিব ?
যে দিল জীবন গড়ি, তার কাজ নাহি করি,
কোন্ লাজে ফিরিয়া যাইব ?
অনাহূত আসি নাই, অনাহূত যেতে চাই
কেন সখি ! গিয়া কি বলিব ?
যে নদী দিগন্তে বহে, কেন সে আবদ্ধা রহে ?
কেন তারে বাঁধিয়া রাখিব ?
যার তরে যাই আসি, তারি কাজ অভিলাষী,
চিরদিন-তাহাই করিব,
করিতে কর্তব্য কাজ আসে যে সঙ্কোচ লাজ,
তাদের যতনে তেয়াগিব ;
ক'দিনের নিন্দা যশ, কেন হ'ব তার বশ,
কোন্ লোভে এতটা ভুলিব ?
যাহা হয় হউক তাই, যা পারি করিয়া যাই,
মরি যদি আনন্দে মরিব,
নদী কেন বাঁধিয়া রাখিব ?
চল ! পারাবারে মিশাইব।

(কনকাঞ্জলি, ১৮৯৬)

অসময়ে

মানকুমারী বসু

অসময়ে, দীনবন্ধো!
সকলে ঠেলিছে পা'য়,
ঠেলিও না তুমি প্রভো!
দীন হীন অভাগায়!
নীরবে নিভিছে আশা
ভাঙ্গিছে খেলার ঘর,
এ সময়ে, দয়াময়!
তুমি হইও না "পর"।
অকৃতী অধমে আজি
কেহ নাহি ভালবাসে,
সাধিলে, না কথা কয়,
ডাকিলে, না কাছে আসে।
মরমে অনল-জ্বালা
কেবলি জ্বলিছে তাই,
বাসনা, বাঁধন খুলে
সব ফেলে চলে যাই।
না, না, আমি অণু রেণু
সিন্ধু-তীর-বালি-কণা
আমার এ মোহ কেন
কেন নাথ! এ যাতনা?
এমনি হাসুক শশী
নীলাকাশ আলোকিয়া
ভাসুক রজত-ছটা
দশ দিক উছলিয়া;

গাউক মধুর গীতি
কাননে পাপিয়াকুল,
আসুক বসন্ত ফিরে
ফুটুক সুরভি ফুল ;
জগৎ-সংসার যেন
চাহে না আমার পানে,
চলি যা'ক্ বহি যা'ক্
আপন আপন তানে ;
সংসারে "কুগ্রহ" আমি
চাহিয়া দেখিতে নাই,
হেন অভাজনে, বিভো !
দিবে কি চরণে ঠাঁই ?

(কনকাঞ্জলি, ১৮৯৬)

ছায়া

মানকুমারী বসু

আজি সব ছায়া ছায়া কেন ?
কিছুই ধরিতে নাহি পারি,
বিশ্বের অগণ্য ছায়া যেন
দাঁড়ায়ে রয়েছে সারি সারি।

কোথা হতে আসিছে ভাসিয়া
মৃদুকণ্ঠ বিহগের গান,
কোনখানে চলিছে ছুটিয়া
নির্ঝরের কুলু কুলু তান ?

কোথা থেকে বাতাসে ভাসিছে
কুসুমের মধুর নিশ্বাস,
প্রাণে কেন এমন লাগিছে,—
ছায়া ছায়া উদাস উদাস ?

কারে যেন খুঁজিছে প্রকৃতি,
তারে যেন নাহি যায় ধরা,
তাই শুধু পথ চেয়ে আছে,
নিয়ে ছুটী আঁখি জল-ভরা।

মেঘ-আড়ে চতুর্থীর চাঁদ
হাসিতেছে ম্লান ক্ষীণ হাসি,
লতা থেকে পড়িছে খসিয়া
চুপে চুপে ফুল রাশি রাশি।

বসন্তের আনন্দ-আননে
মেখে গেছে বিষাদের ছায়া,
জীবন্ত শ্যামল ছটাখানি
আজি যেন প্রাণহীন কায়া।

নৈশ নীলাকাশে দিগঙ্গনা
মগনা হয়েছে কোন্ শোকে ?
জগতের শোভা, মধুরতা
কার সাথে ভোগ করে লোকে ?

(কনকাঞ্জলি, ১৮৯৬

পতঙ্গের প্রতি

মানকুমারী বসু

১

কেন রে জ্বলন্তানলে, অবোধ পতঙ্গ !
পড়িছ উড়িয়া ?—
"রূপ" নহে ও যে কাল,
পাতিয়াছে মায়াজাল,
ছুঁইলে মরিবি পুড়ে—যা' রে যা' সরিয়া ।

২

আপনা বিকাবি হায় ! কি সুখের আশে
অনলের পায় ?
ও নহে কুসুম-বধূ
দিবে না সৌরভ মধু,
পোড়ায়ে মারিবে শুধু রূপের শিখায়

৩

কিসের কামনা তোর বল্ প্রকাশিয়া
শুনি একবার
আমি তো বুঝি না হায় !
ওই হৃদি কিবা চায়,
নীরস মরণ তোর কেন কণ্ঠ-হার ?

৪

যদি,

আলোক-পিপাসী তুমি, যাও মন-সুখে
চন্দ্র-কর-ছায়
সে যে সুধামাখা আলো,
যত পাই তত ভাল,
সকল সন্তাপ নাশি', জীবনী জাগায় ।

৫

যদি,

সৌন্দর্য-ভিখারী তুমি যাও তবে চলি
যথা উপবন—
সেখানে সবুজ গাছে
বেলা যুঁই ফুটে আছে,
রাখ গে গোলাপ-দলে অতৃপ্ত জীবন।

৬

অথবা—তোমার যদি মরণে পিয়াসা,
যাও সিন্ধু-তলে—
সে নীলিমা অপরূপ!
অনন্ত-বিস্তৃত রূপ!
শীতল মরণ পাবে ডুবি তার তলে।

৭

নিঠুর অনলে তোর সুখের পরাণ
কেনরে! সঁপিবি?—
ক্ষুধিত শার্দুল প্রায়
তোরে ও গ্রাসিবে হায়!
এ মরণে সুখ নাই—জ্বলিয়া মরিবি!

৮

ফুলে ফুলে মধু খেয়ে উল্লাসে নাচিয়ে,
সাধ না পূরিল!
সাধের সরল প্রাণ
আগুনে করিবি দান,
হা ধিক্! কেন রে! হেন কুমতি হইল?

৯

ফিরে যা' সরে যা' মূর্খ! এ নিয়তি-ফাঁদে
দিস্‌নে চরণ—
কপট সৌন্দর্যে ভুলে
জলন্ত জ্বালায় তুলে—
দিস্‌নে ও মধু-মাখা সোনার জীবন!

১০

হায়!

মিছা তোরে দিই গালি, আমরাও হেন
কত ভুল করি—
অমৃত ছাড়িয়া ভাই!
মৃত্যু-মুখে ছুটে যাই,
মরণের "রূপে" হায়! জীবন পাসরি।

১১

মরতের শ্রেষ্ঠ জীব মানব, পতঙ্গ!
তোমারো অধম—
তুমি শুধু ম'রে যাও,
দুঃখ, জ্বালা, নাহি পাও,
মানবের দুরদৃষ্ট যাতনা বিষম!
আমরা আগুনে পড়ি
জ্বলি, পুড়ি, নাহি মরি,
না পাই সে মহানিদ্রা—শান্ত মনোরম!
বড়ই নিঠুর, ভাই! আমাদের যম।

(কনকাঞ্জলি, ১৮৯৬)

অন্তিমে

মানকুমারী বসু

আসিল সায়াহ্নবেলা
ভাঙিল জীবন-খেলা,
আর কি ডাকিছ, সখে! পথ ছাড়ি দাও;
তামসী যামিনী ঘোর
ঘনায়ে আসিছে মোর
কি আর বলিব কথা, যাও—স'রে যাও;

ও মুখ হেরিলে হায়!
কে কবে মরিতে চায়!
অনন্ত জীবন পাই—সেই সাধ আসে,
আর দেখিব না সে কি!—
একটুকু থাক দেখি!
নিঠুর মরণ ডাকে বেঁধে মহাপাশে!

জানি না কোথায় যাই,
জানিতে শকতি নাই,
জনমের সাধ আশা এই হ'ল শেষ,
এস কাছে—আরো কাছে
সবি যে গো! বাকি আছে,
পোরে নি আমার আজো বাসনার লেশ।

সুখ-সাধ-সুখ-আশা,
দয়া, স্নেহ, ভালবাসা,
যাহা দিয়াছিলে, এবে সব ফিরে লও,
পারি না সহিতে আর
ও বিষাদ অশ্রুধার,
আমারে ভুলিয়া যেন তুমি সুখী হও।

সাধে কি যাইতে চাই,
থাকিতে শকতি নাই,
অনন্ত আঁধার প্রাণে ছাইয়া রয়েছে,
দেখিও দেখিও—খুলি
বুকের পাঁজরগুলি
কেমনে পুড়িয়া সব অঙ্গার হয়েছে।

এস কাছে! এস কাছে!
আঁখি মুদি আসে পাছে,
প্রাণ ভরে চন্দ্রানন বারেক নেহারি;
এখনো শকতি আছে,
আইস! আইস! কাছে,
যেন ও কোমল কোলে মাথা দিতে পারি।

অনন্ত কালের লাগি
আজি এ বিদায় মাগি
জানি না মরণ-পরে যাব কোন ঠাঁই;
বল দেখি বল তবে,
তুমি কি "আমারি" রবে?—
মৃত্যু ভুলি অমৃতের দেশে চলে যাই।

কনকাঞ্জলি, ১৮৯৬)

আশ্বস্ত

মানকুমারী বসু

১

জানি এ জীবন মম,
দীন, ম্লান, ক্ষুদ্রতম,
নীরব নিরাশা মেঘে রয়েছে ঢাকিয়া,
যুগ যুগান্তর সহ,
কত ব্যথা দুর্বিষহ,
বহিতেছে ভগ্ন বক্ষে সীমা না জানিয়া।

২

জানি তুমি স্বর্ণাচলে,
নব নীলাকাশ-তলে
তরুণ অরুণ-রাগে উদ্ভাসিত ধরা,
যখনি দাঁড়াও এসে,
তরু, গিরি চাহে হেসে,
এ মর ধরণী সাজে অলকা অমরা !

৩

তাই দেখি আসে মনে
বুঝি কোন্ শুভক্ষণে,
ঘুচি যাবে এ কুদিন ভীষণ আঁধার।
তুমি তো মঙ্গল-আলো
সকলেরই তরে ঢালো,
এ যাতনা কেন তবে রবে গো আমার ?

৪

আমি কিছু বুঝি না'ক,
আমি কিছু খুঁজি না'ক,
সকলের সাথে মিশি দেখি শুধু চেয়ে।
তবুও কেমন করে,
উদাস প্রাণের 'পরে
আশার সোনালী রেখা পড়িয়াছে ছেয়ে

(বিভূতি, ১৯২৭)

জিজ্ঞাসা

মানকুমারী বসু

১

সে এবে যথায়—
এ দেশের দিবা নিশা সেখানে কি যায় ?
এখানে যে সমীরণ,
জুড়াইছে জীবগণ,
এই বায়ু সেখানে কি লাগে তার গায় ?
সেও কি জ্যোছনা রেতে,
চাঁদের আলোক পেতে,
বসে থাকে সৌধ-শিরে কিম্বা জানালায় ?
আমাদের দিবানিশি সেখানে কি যায় ?

২

এ দেশের বসন্ত কি বিরাজে সেখানে ?
তার সে তমাল-শাখে,
আমাদের পক্ষী ডাকে,
আমাদের ফুল ফোটে চেয়ে তার পানে ?
সেথা কি জলধি জলে
আমাদের ঢেউ চলে,
সেখানে কি বীণা বাজে আমাদের তানে ?
আমাদের সুখ-সাধ পশে কি সেখানে ?

৩

এ দেশের ভালবাসা সেখানে কি রয় ?
অনুকূল সুখে দুখে,
তরঙ্গ উচ্ছ্বাস বুকে,
চিরদিন অনশ্বর চির মৃত্যুঞ্জয় ?
এমনি মমতা প্রীতি,
এমনি সুখের স্মৃতি,
সে দেশের প্রাণে প্রাণে জড়ায়ে কি রয় ?
এ দেশের ভালবাসা সেখানে কি হয় ?

৪

তাই যদি হয় তবে কিসের বেদন ?
মাঝখানে বৈতরণী ছুপারে ছুজন !
সাঁতারিয়া একবার,
চলি যাব পরপার.
মরণের পরে পাব সোনার জীবন ;
অমানী যামিনী গেলে,
ঊষা আসে হাসি ঢেলে,
বিধুরের তরে মিলে মধুর মিলন ?
ভয় কি, ক'দিন পরে পাব দরশন।

(বিভূতি, ১৯২৪)

শাপাবসান

মানকুমারী বসু

১

সেই শাপ অবসান—
অদৃষ্টের মহাপাপে,
ক্রুদ্ধ ছুর্বাসার শাপে,
ইন্দিরা স্বরগ ছাড়ি করিলা প্রস্থান।
ইন্দ্র চড়ি ঐরাবতে,
খুঁজিলা ত্রিদিব পথে,
খুঁজিলা বরুণ অগ্নি গণেশ গীর্বাণ।
স্বর্গ মর্ত্ত কোন ঠাঁই,
উজলা কমলা নাই,
সহসা জ্যোতিষ্ক-কুল হইল নির্বাণ ;
নিভিল চাঁদের হাসি
স্বর্গ-সৌর-কর-রাশি,
আঁধারে তারকা-কুল ঢাকিল বয়ান ;

নিখিল হইল শূন্য,
চলি গেল ধর্ম পুণ্য,
অন্ন বস্ত্র ধন ধান্য হ'ল অন্তর্ধান ;
দশদিক অন্ধকার,
প্রাণে প্রাণে হাহাকার,
অমঙ্গল দাঁড়াইল হ'য়ে মূর্তিমান !

২

সেই শাপ অবসান—
ইন্দ্র ছাড়ি পুষ্পরথ,
করে নিলা ভাগবত,
তপোরত অগ্নি সম কুবের ধীমান।
ব্রহ্মলোকে পদ্মাসন,
মহাতপে নিমগন,
কৈলাস কৈবল্যধামে তাপস ঈশান ;
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণ,
পাতিলেন যোগাসন,
সপ্ত ঋষি কণ্ঠে সদা সামবেদ গান ;
দানবের পুরীময়,
মহতী তপস্যা হয়,
হিংসা দ্বেষ মলিনতা করিল প্রস্থান ;
সবে ডাকে উভরায়,
"আয় মা কমলা আয়,
কাঁদে তোর দীন হীন অকৃতী সন্তান ;
শিশুরে অকৃতী বলি,
কভু কি মা যায় চলি,
মায়ের হৃদয় কবে এমন পাষাণ ?"

৩

আজি শাপ অবসান,
সেই তাপসের দল,
তপঃসিদ্ধ মহাবল
মন্থনার্থে অদ্রি নিলা দিয়ে এক টান,
মিশামিশি সুরাসুর
বৈরভাব শতদূর,
মথিল অতল সিন্ধু—মহাশক্তিমান!
সাধনা মঙ্গলময়ী
সাধক সর্বত্র জয়ী
তাই ধাতা সিদ্ধিদাতা দিলা বরদান;
স্বর্ণপদ্ম-শতদলে
রাখি রাঙা পদতলে,
উঠিল মা মহালক্ষ্মী জগতের প্রাণ!
আনন্দ উচ্ছ্বাস ছোটে,
অমৃত ফেনায়ে ওঠে,
পুনঃ পেলে অমরতা আকুল সন্তান,
সঘনে উল্লাস রোল,
শঙ্খধ্বনি, হরিবোল,
বিশ্বময় সার্থকতা দিলা ভগবান!

৪

আজি শাপ অবসান—
গেছে সে অশিব কালো,
জ্বলিল মঙ্গল আলো,
হাসিল শশাঙ্ক, তারা, তপন মহান;
ধন ধান্যে, পুণ্য ধর্মে,
ভক্তি প্রেমে, শুভকর্মে,

নিখিল, লভি' সে রাজ-সম্মান ;
দেব দৈত্য দুই ভাই
বিবাদ বিষাদ নাই,
দোঁহে যেন এক মা'র যমজ সন্তান,
মায়েরে পূজিলা সবে,
'বন্দে মাতরম্' স্তবে,
বৃহস্পতি ভার্গবের শিষ্য মতিমান ;
ঘুচিল সকল পাপ,
দূরে গেল মনস্তাপ,
অগ্নিময় ব্রহ্মশাপ আজি অবসান,
কমলা অচলা পুনঃ বিধাতার দান।

(বিভূতি, ১৯২০)

প্রতিভার উদ্বোধন

অক্ষয়কুমার বড়াল

বিধাতার নিষ্কাম হৃদয়ে
চমকিল প্রথম কামনা ;
চমকিল নব আশা-ভরে
আনন্দের পরমাণু-কণা !

অসহ্য এ নব জাগরণ—
আকুল ব্যাকুল চিত্তাকাশ !
স্পন্দন—কম্পন—আলোড়ন—
একি আশা, না এ অবিশ্বাস ?

কাঁপিতেছে ক্ষুব্ধ অন্ধকার,
অপেক্ষায় হৃদয় অস্থির ;
গড়িছে—ভাঙিছে বারবার—
একি খেলা মুগ্ধা প্রকৃতির !

বারবার মুছেন নয়ান,
ক্রমে ছায়া—ক্রমশঃ আভাস ;
নাহি জ্ঞান, নহেন অজ্ঞান—
সহসা জগৎ পরকাশ !

পড়িল গভীর দীর্ঘশ্বাস,
একি দুঃখ—না এ সুখ অতি !
বাস্তব—না কল্পনা-বিকাশ ?
কামনা-বাসনা মূর্তিমতী !

বিস্ময়-বিহ্বল মহাকবি
চাহিয়া আছেন অনিমিখে—
সম্মুখে ফুটিছে নব রবি,
তারকা ফুটিছে দশ দিকে !

মহাশূন্য পরিপূর্ণ আজি
সুকোমল তরল কিরণে !
ঘুরে গ্রহ-উপগ্রহরাজি
দূরে—দূরে—বিচিত্র চরণে !

গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে ছুটে
ওঙ্কার ঝঙ্কার অনাহত !
পঞ্চভূত উঠে ফুটে' ফুটে'
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে কত !

ছন্দে বন্ধে যতি-গরিমায়
চলে কাল ললিত-চরণে !
অঙ্কশক্তি পূর্ণ সুষমায়,
চেতনার প্রথম চুম্বনে !

নীলাবাসে ঢাকি' শ্যামদেহ
শশিকক্ষে ভ্রমে ধরা ধীরে ;
কত শোভা, কত প্রেম-স্নেহ,
জলে স্থলে প্রাসাদে কুটীরে !

চাহে ঊষা—চকিত নয়ন,
ফুলবাসে বায়ু সুবাসিত ;
উঠে ধীর বিহগ-কূজন—
সৃষ্টি 'পরে স্রষ্টা বিভাসিত !

সমাপ্ত বিধির সৃষ্টি-ক্রিয়া,
অসমাপ্ত সৃজন-কল্পনা—
এস তবে, এস বাহিরিয়া
চিত্ত হ'তে, চিন্ময়ী চেতনা !

এস, নিত্য-স্বরগ-স্বপন,
রূপ-রস-শব্দ-অসীমায়—
মর-জন্ম করিয়া লুণ্ঠন
অমর সৌন্দর্য-মহিমায় !

ল'য়ে এস—সে আদি-কল্পনা,
সুখে দুঃখে মরণে নির্ভয়,
সে অব্যক্ত আনন্দ-বেদনা,
সেই প্রেম—অনাদি অক্ষয় !

(শঙ্খ, ১৯১০)

কুহুরব

নিত্যকৃষ্ণ বসু

নবীন প্রভাতে আজি কানন ভবনে
শুনি তোরে, শুধু মোর পড়িছে স্মরণে
বিজন যমুনা-তটে তমালের ছায়
দ্বাপরের সে বিরহ-বিধুরা বালায় ;
শ্রাবণ-গগন সম নীল নবঘনে
আঁখি যার চেয়েছিলি প্রেমের স্বপনে ;
বরষি সুবাস সম বেদনা তরল
ঢেকে দিয়েছিলি যা'র মরমের তল ;
নিভৃতে হৃদয়-দাহী অনলের প্রায়
প্রাণ যা'র ভরেছিলি রভস-তৃষায় ;—
হায় কোথা সে কিশোরী ? কোথা সে কিশোর ?
কোথা বা ব্রজের কুঞ্জ, রজনী উজোর ?
শুধু সে বিরহ-ব্যথা ব্রজের সমান
পলে পলে হানে আজি জগতের প্রাণ !

('সাহিত্য' পত্রিকা, নবম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩০৫ সাল, ১৮৯৮)

আমি তো তোমারে

রজনীকান্ত সেন

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ ;
আমি না ডাকিতে, হৃদয় মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ।
চির আদরের বিনিময়ে, সখা, চির অবহেলা পেয়েছ ;
(আমি) দূরে ছুটে যেতে, দু'হাত পসারি, ধরে টেনে কোলে নিয়েছ।
"ও পথে যেওনা, ফিরে এস", ব'লে কানে কানে কত কয়েছ ;
(আমি) তবু চলে গেছি ; ফিরায়ে আনিতে পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ।
(এই) চির অপরাধী পাতকীর বোঝা হাসিমুখে তুমি বয়েছ ;
(আমার) নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে বুকে করে নিয়ে রয়েছ॥

(আনন্দময়ী, ১৯১০)

আমায় সকল রকমে

রজনীকান্ত সেন

আমায় সকল রকমে, কাঙ্গাল করেছ, গর্ব করিতে চূর ;

যশ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য, সকলি করেছ দূর।

ঐগুলি সব মায়াময়রূপে, ফেলেছিল মোরে অহমিকা কূপে

তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল, করেছ দীন, আতুর ॥

যায়নি এখনো দেহাত্মিকা-মতি, এখনও কি মায়া দেহটীর প্রতি !

এই দেহটা যে 'আমি', এই ধারণায় হয়ে আছি ভরপূর।

তাই সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া গর্ব করিছে চূর ॥

ভাবিতাম, "আমি লিখি বুঝি বেশ, আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ",

তাই বুঝিয়া দয়াল, ব্যাধি দিলে মোরে, বেদনা দিলে প্রচুর।

আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছ গর্ব করিতে চূর ॥

(আনন্দময়ী, ১৯১০)

পূজার প্রদীপ

রজনীকান্ত সেন

(তুই) পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখিস্ হৃদয়-দেউল মাঝে।

ভক্তি প্রেমের ধূপটি জ্বালাস্, নিত্য সকাল সাঁঝে।

পাবি যেদিন দুঃখ ব্যথা, দেবতারি পায় নোয়াস্ মাথা,

বলিস্ "তোমার ইচ্ছা ফলুক, আমার জীবন মাঝে" ॥

আপনাকে তাঁর ভৃত্য রাখিস্, তাঁরে করিস্ রাজা,

তাঁর তরে তুই আসন পাতি", ফুলের মালা সাজা।

তবু যদি দেখা না পাস্, চোখের জলে বেদন জানাস্

বলিস্ "প্রিয় ! তোমার তরে এ দেহে প্রাণ আছে ॥"

(আনন্দময়ী, ১৯১০)

তুমি নির্মল কর

রজনীকান্ত সেন

তুমি, নির্মল কর, মঙ্গল-করে মলিন মর্ম মুছায়ে ;
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক্ মোর, মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা, ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন, ডুবে যাবে কোন্ অকূল গরল পাথারে ;
প্রভু, বিশ্ব-বিপদ-হন্তা, তুমি, দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণতলে, নিয়ে এস মোর, মত্ত বাসনা গুছায়ে।
আছ, অনল অনিলে, চির নভোনীলে, ভূধর সলিলে, গহনে,
আছ, বিটপিলতায়, জলদের গায়, শশী, তারকায়, তপনে ;
আমি, নয়নে বসন বাঁধিয়া বসে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া ;
আমি, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে॥

(আনন্দময়ী, ১৯১০)

ব্যাকুলতা

রজনীকান্ত সেন

নিশীথে গোবৎস যখন বাঁধা থাকে মায়ের কাছে ;
কি পিপাসা ল'য়ে বুকে, পলে পলে মুক্তি যাচে !
কিবা অবারিত টানে, নদী ছোটে সিন্ধু পানে,
তারে নিবারিতে পারে কোথা হেন শক্তি আছে ?
প্রভাতে যখন পাখী, নীড়ে নিজ শিশু রাখি,
আহার সংগ্রহে ছোটে সুদূর নগর মাঝে,
কি তীব্র উৎকণ্ঠা ল'য়ে আশার আশ্বাসে বাঁচে !
সেই ব্যাকুলতা কোথায় পাব, তেমনি ক'রে মা'কে চা'ব,
সুখ দুঃখ ভুলে যাব, হায় রে সে দিন কোথা আছে !
হয়ে অন্ধ, হয়ে বধির, 'মা' 'মা' বলে হব অধীর,
দু'নয়নে বইবে রে নীর, দীনহীন কাঙ্গালের সাজে।

(অভয়া)

নূতন জীবন

হিরণ্ময়ী দেবী

দেখ চেয়ে একবার অসীম রহস্যময়
অনন্ত এ বিশ্ব ;
দেখ সেথা কিবা গায় কোন্ কথা বলে তোর
প্রতি নব দৃশ্য।
ওই শোন সমস্বরে বলিছে হেথায় নাহি
বিলাপের স্থান,
এক যায় এক আসে নব নব সুখ ভাসে
স্মৃতি অবসান!
যে গেছে সে যাক্ চলে চাহি না রাখিতে ধরে
হোক্ সে বিলীন ;
আবার তাহার ঠাঁই আসিবে নূতনরূপে
আনন্দ নবীন।
প্রতিদিন ফুল ফুটে প্রতিদিন ঝরে তারা
ফোটে নব ফুল ;
রবি অস্তাচলে যায় নূতন তপন আনে
আলোক অতুল।
একটী বিহঙ্গগীত চিরতরে থেকে যায়
শত পাখী গায় ;
একটী বসন্ত যায়, আবার দক্ষিণে ছুটে
বসন্তের বায়।
একটী তারকা খসে আকাশেতে শত তারা
ঢালে জ্যোতি-হাসি,
একটী জাহ্নবী ঢেউ সাগরে মিশায়ে যায়
আপনা বিনাশি।
হিমগিরি হতে পুন তটিনী বহিয়া আনে
নূতন জীবন,
বিরহের গীতিখানি না হইতে অবসান
গাহেরে মিলন।

(১৮৯৭)

আর কতকাল

অতুলপ্রসাদ সেন

আর কতকাল থাক্‌ব ব'সে দুয়ার খুলে,—বঁধু আমার,
তোমার বিশ্বকাজে আমারে কি রইলে ভুলে ? বঁধু—আমার।
বাহিরের উষ্ণ বায়ে, মালা যে যায় শুকায়ে
নয়নের জল বুঝি তাও, বঁধু মোর, যায় ফুরায়ে ;
শুধু ডোরখানি হায় কোন পরাণে তোমার গলায় দিব তুলে ?
হৃদয়ের শব্দ শুনে, চমকে ভাবি মনে,
ঐ বুঝি এল বঁধু ধীরে মৃদুল চরণে ;
পরাণে লাগ্‌লে ব্যথা, ভাবি বুঝি আমায় ছুঁলে।
বিরহে দিন কাটিল, কত যে কথা ছিল,
কত যে মনের আশ মন-মাঝে রহিল ;
কি লয়ে থাক্‌ব বল তুমি যদি রইলে ভুলে ?—বঁধু আমার॥

আমার পরাণ কোথা যায়

অতুলপ্রসাদ সেন

আমার পরাণ কোথা যায়, কোথা যায় উড়ে।
কে যেন ডাকিছে মোরে, দূর সাগর পারে, বিরহ-বিধুর সুরে।
বাতাসে তাহারই কথা, তরঙ্গে তারই বারতা,
জোছনা পথ তার দেখায়, দেখায় দূরে।
হে অধীর, হে উদাসী, হে মম অন্তরবাসী,
কাহার শুনিলে বাঁশী, কোন্ প্রেমের সুরে ?
যে দিগন্তে নীলাম্বরে, চুম্বিছে সে নীলাম্বরে,
সেথা মোর নীলকান্ত চায়, মোরে চায়, ওগো চায় কত মধুরে।

প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখী

অতুলপ্রসাদ সেন

প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখী, কেমনে বল তাঁরে ডাকি ?
কোন্ ভরসায় তাঁহারে মাগি ?
কুসুম লয়ে গন্ধ বরণ, নিতি নিতি যাঁরে করিছে বরণ,
এ কণ্টক-বনে কি করি চয়ন, কোন্ ফুলে বল সে পদ ঢাকি ?
নিশার আঁধারে ডাকিব তোমারে, যখন গাবে না পাখী ;
কণ্টক দিব চরণে, যবে কুসুম মুদিবে আঁখি ।
হেন পূজা যদি নাহি লাগে ভাল, কেন তুমি মোরে
করিলে কাঙাল ?
বল হে হরি ! আর কত কাল, সুদিনের লাগি রহিব জাগি ?

তোমায় ঠাকুর, বল্‌ব

অতুলপ্রসাদ সেন

তোমায় ঠাকুর বল্‌ব নিঠুর কোন মুখে ?
শাসন তোমার, যতই গুরু, ততই টেনে লও বুকে ।
সুখ পেলে দিই অবহেলা, শরণ মাগি দুখের বেলা ;
তবু ফেলে যাওনা চলে, সদাই থাক সম্মুখে ॥
প্রতি দিনের অশেষ যতন, ভুলায়ে দেয় ক্ষণিক বেদন,
নিত্য আছি ডুবিয়ে, তাই পাশরি' প্রেমসিন্ধুকে ।
সুখের পিছে মরি ঘুরে, তাই ত রে সুখ পালায় দূরে ;
সে আনন্দ, ওরে অন্ধ, বন্ধ মনের সিন্দুকে ॥
ভুলে যে যাই সবাই আমার নই ত ভিন্ন আমি সবার ;
দশের মুখে হাসি রেখে কাঁদব আমি কোন্ দুখে ?
ভবের পথে শূন্য থালি, বেড়াই ঘুরে দীন কাঙালী,
দৈন্য আমার ঘুচ্‌বে, যবে পাব দীনবন্ধুকে ॥

মনটারে তুই বাঁধ্

অতুলপ্রসাদ সেন

পাগলা! মনটারে তুই বাঁধ্;
কেনরে তুই যেথা সেথা পরিস্ প্রাণে ফাঁদ?
শীতল বায়ে আস্‌লে নিশি, তুই কেন রে হোস্ উদাসী?
(ওরে) নীল আকাশে অমন করে হেসেই থাকে চাঁদ!
শৈল-শিরে সোনার খেলা, দেখিস্ যবে প্রভাত বেলা,
তুই কেনরে হোস্ উতলা দেখে মোহন ছাঁদ!
করুণ সুরে গাইলে পাখী, তোর কেন রে ঝরে আঁখি?
কবে তুই মুছবি নয়ন, ঘুচবে মনের ধাঁদ?
সংসারেতে উঠলে তুই হাসি, শুনিস্ রে ব্রজের বাঁশী!
(ওরে) ভাবিস্ কিরে সবই গোকুল, সবই কালাচাঁদ?
কতই পেলি ভালবাসা, তবু না তোর মেটে আশা!
এবার তুই একলা ঘরে নয়ন ভরে কাঁদ!

বেলা যায়

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

একদা পল্লীতে কোন রজকের গেহে।
ডাকিছে বালিকা এক ব্যাকুলিত স্নেহে॥
নিদ্রিত পিতারে;—ওঠ বাবা, বেলা যায়!
—অস্তমান সন্ধ্যাসূর্য্য অন্তর্হিত প্রায়।
বালিকার কম্প্রকণ্ঠ চঞ্চল পবনে
সঞ্চরিল স্তব্ধতায়। শিবিকারোহণে
অদূরে গৃহের পথে ফিরিছেন যথা
লালাবাবু কর্ম্মস্থল হতে, দুটি কথা
চলে গেল সেথা। নিস্তব্ধ শিবিকা মাঝে
ধ্বনিল কম্পিতকণ্ঠ মর্ম্মাহত লাজে;—

ওরে বেলা যায় ! বিস্মিত বাহকগণ
নামাল শিবিকা ! লালা, কম্পিতচরণ
দাঁড়াইয়া জীবনের প্রশান্ত সন্ধ্যায়
আপনারে উঠিল ডাকিয়া,—বেলা যায় !
ফেলিলেন খুলি বসন ভূষণ যত ;
ভৃত্যগণে দিলেন বিদায় । স্বপ্নাহত ;
শুভক্ষণে আপনারে কুড়ায়ে লইলা
বন্ধনবিহীন ! অদোসর, বাহিরিলা
ধরণীর মুক্তক্রোড়ে । জলে বহ্নিকণ
ছল ছল নেত্রপ্রান্তে, কি জানি দাহন
অনুতপ্ত উচ্চহৃদয়ের ! উর্ধ্বে চাহি'
নিঃশ্বাসিলা । কোথা হতে উঠিলেক গাহি
সেই দুটি কথা, বেলা যায় বেলা যায়—
বিশাল অনন্ত ভরি গম্ভীর সন্ধ্যায় ।
সতর্ক ভর্ৎসনাভরা শাণিত শাসন
গর্জিল কি স্নেহ-রোষে উদার গগন ?
হু হু করি সন্ধ্যাবায়ু ফেলিয়া নিঃশ্বাস
ছুটে এল শূন্য হতে, ত্যজি দিবাবাস
মহাবেগে ব্যোমচর ধাইল আঁধারে ;
অকিঞ্চন রশ্মিলেশ কম্পিত পাথারে,
গেল অস্তে হারাইয়া ? কোথা গেল রবি
সুদূর দিগন্ত মাঝে ? মুছে গেছে ছবি
দৃপ্ত দিবসের ! ফিরে আসে গাভীগুলি
অর্ধভুক্ত তৃণ ফেলি ; হেরিয়া গোধূলি
কর্ম ব্যস্ত কৃষাণেরা লইল বিদায়
ধান্যপূর্ণ ক্ষেত্র পাশে রুদ্ধ-বেদনায় ?
হেরিলা অধীরে প্রৌঢ়, চারিদিক্ ভরা
কেবল বিদায়-যাত্রা, মুক্ত মায়াহারা,

মহান্ গমন?—ছুটিলা তৃষিত মনে,
কাঁর ছন্ন করুণার শুভ আকর্ষণে!
লক্ষকোটি নভ-আঁখি সাক্ষী হল তার,
নীরবে দেখাল পথ নাশি অন্ধকার?
সহজ সুপরিচিত, বহু উচ্চারিত
সেই ছুটি পুরাতন কথা, রোমাঞ্চিত
অন্তরের অন্তঃকর্ণে লাগিলা শুনিতে
শত শত মুগ্ধকণ্ঠে ধ্বনিত নিশিতে!

মরুভূমির স্বপ্ন

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

১

কি স্বপ্নে কাটাও কাল, হে বিরাট বালুকাউষর,
পড়ে আছে এক প্রান্তে, ধরণীর দুঃস্বপ্ন ধূসর।
বন্ধ্যা বলে' তব ছায়া কেহ বুঝি স্পর্শিতে না চায়,
তোমার নিশ্বাসে যেন উৎসবের উৎসটি শুকায়।
মিছে আসে তব গৃহে নিশি-শেষে মধুর প্রভাত,
রবি-শশী বৃথা নেমে তব দ্বারে করে করাঘাত!
তারা আর জ্যোৎস্না-বৃষ্টি হয় বটে আকাশে তোমার,
যায় যেন কোন মতে শুধি' তারা কর্তব্যের ধার।

২

সুন্দর সৃষ্টির বুঝি তুমি এক প্রকাণ্ড বিদ্রূপ,
তব সোহাগের শিশু কুব্জ-পৃষ্ঠ জীব অপরূপ!
সৃজন ও প্রলয়ের বীজ হতে তোমার জনম
জন্মকালে প্রকৃতি কি ক্ষোভে লাজে হইয়া নির্মম,
অক্লেশে করিয়া গেল শূন্যপ্রান্তে তোমারে বর্জন,
রূপসী শ্রী-অঙ্গ হতে ফেলে যথা সজ্জা অশোভন?
তবে বক্ষ ভেদি' সেই মাতৃ-ত্যক্ত সন্তানের 'রিষ',
দিকে দিকে দগ্ধ করি' ছড়াইছে অভিশাপ-বিষ।

৩

থৈ থৈ করিতেছে, বালুকার তপ্ত-পারাবার,
অন্ধকারে ঘনাইয়া উঠে যেন আরও অন্ধকার।
অদৃষ্টেরে ঘেরে যথা জীবনের শত অভিশাপ,
এক জ্বালা মাঝে আসি' অগ্নি দেয় আর এক সন্তাপ।
ধূসর ঊর্মির বক্ষে স্তব্ধ যত জীবন-কল্লোল,
নাই তরী, নাই তীর,—নাই তীরে হরিৎ-হিল্লোল।
জীবনের প্রান্ত হ'তে প্রেতাত্মার যেন সম্ভাষণ,
উঠিতেছে হাহা শুধু; কে জানে তা হাসি, না, ক্রন্দন?

৪

তোমা ঘিরে সর্বকাল জ্বলিতেছে কালের শ্মশান,
বিধবার বেশে সেথা ফেল' শ্বাস রাত্রি দিনমান!
জুড়াইতে তীব্রজ্বালা মুছাইতে তপ্ত অশ্রুধার,
আছে যেন সর্বনাশ, শ্মশানের বান্ধব তোমার!
মানুষের মতই কি প্রকৃতির পশুর অন্তর?
সভ্যসাজে অভিনয়! মনে-প্রাণে কুৎসিত বর্বর!
বীভৎস-পাশবলীলা!—একখানি পটের আড়াল!
জীবন-নেপথ্য হতে উঁকি মারে ভোগের কঙ্কাল!

৫

রিক্ত, তিক্ত আত্মাসম তুমি বিশ্ব-সুধায় বিমুখ,
পর-সুখে অন্তর্দাহ, পর-দুঃখে জীবনের সুখ!
মৃগতৃষ্ণিকার ফাঁস, সে মনেরই রাক্ষসী রচনা,
শ্রান্ত পান্থ বড় আশে আলিঙ্গন করে সে ছলনা।
দুরন্ত ঠগীর মত, কণ্ঠ তা'র চাপি' অকস্মাৎ,
মুহূর্তে পাঠায়ে দাও পিপাসীরে মৃত্যুর সাক্ষাৎ!
'কই বারি?' 'কই বারি?' হাহাকার কর যে তৃষ্ণায়,
ও ত প্রেতাত্মার তৃষ্ণা অভিশাপে দহিছে তোমায়!

৬

জননী প্রকৃতি আর চাহেনা ঘৃণায় তোমা পানে,
স্নেহ উপকার যত বিলাইছে আদৃত সন্তানে।
পান্থ-পাদপের সুধা বক্ষে যার সে যদি পাষাণী?
দয়া-ভ্রান্তি! স্নেহ-ব্যঙ্গ! ভিখারিণী তবে রাজরাণী!
মুহূর্তের উন্মাদনা, জানি ঐ ক্রুর হত্যা-নেশা;
সহসা জননী হ'য়ে কাঁদে—তব শোণিতের তৃষা।
জানি আমি এই দণ্ডে শ্মশানের ধূলি ধূসরিত,
রাজ্ঞী হ'তে পার তুমি, অকস্মাৎ মহিমা-মণ্ডিতা!

৭

সংসারে জীবন-যুদ্ধে সুধাপাত্রে মিশিল গরল,
সত্যে আর সত্য নাই, মঙ্গলে পশিল অমঙ্গল।
উন্নতি, না অধঃপাতে জগতের যাত্রারথ ধায়?
মানব কি অগ্রসর, না ক্রমশঃ হটে পরীক্ষায়?
পতিত কি উচ্চে তবে? উত্থানে কি আনিছে পতন?
পুণ্যে পাপ? পাপে পুণ্য? মোহ তবে প্রজ্ঞার বেতন?
—এ উদ্‌ভ্রান্তি শান্তি তবে, লোকালয় প্রান্তে বাঁধি বাসা,
'টলা'তে কি স্বর্গ, উর্ধ্বে উড়ায়েছ অগ্নিময় আশা?

৮

তাই তুমি বিবাগিনী, সন্ন্যাসিনী; গৈরিকবসনা
আপনা বঞ্চনা করি' করিতেছ যুগের সাধনা।
প্রকৃতি বাঁটিল সুধা যবে সেই সৃজন-প্রভাতে,
কেহ রূপ, কেহ গন্ধ, কেহ রস চেয়ে নিল সাথে;
প্রকৃতি সস্নেহে যবে শুধাইলা, 'তোমার কি চাই?'
নীলকণ্ঠ-সম শুধু মাগি' নিলে বিষ বিষ আর ছাই।
সংসারে সন্ন্যাসী সাজি' প্রতীক্ষিয়া আছ যুগান্তর,
জীব-রাজ্য যাবৎ না স্বর্গ-রাজ্যে হয় অগ্রসর!

৯

আবিষ্কারকারী বিশ্বে উপহার দিতে নব-দেশ
নিপাতের মহাগ্রাসে করে যবে নির্ভয়ে প্রবেশ ;
মজ্জমান পোত হতে অসহায়গণে করি' পার
দাঁড়ায়ে বীরের মত মৃত্যু যবে বরে কর্ণধার ;
আসন্ন বিনাশ হইতে বাহিনীরে করিতে রক্ষণ
সেনানী তোপের মুখে আপনারে উড়ায় যখন ;
তা হতেও, মনে হয়, তোমার ও আত্মা বলবান ;
তা হতেও শ্রেষ্ঠ বুঝি তোমার ও আত্মবলিদান !

১০

দেখেও দেখিনা মোরা ত্যাগের এ মহিমা উজ্জ্বল,
তুচ্ছ করে যাই সবে ভেবে তোমা নীরস, নিষ্ফল।
সেদিন চিনিব তোমা যেদিন আসিবে শুভদিন।
ভেদাভেদ হানাহানি শান্তিমন্ত্রে হইবে বিলীন ;
বক্ষে বক্ষে দেবালয়, কণ্ঠে কণ্ঠে বিশ্বাসের গান,
এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতি এক ভগবান।
হে ঊষর, সেই দিন হবে তুমি সহসা উর্বর ;
পুলকিত বালুস্তর খুলে দিবে আনন্দ নিঝর।

১১

সেদিন আসিবে বিশ্বে সত্য লাগি সত্যের সাধনা ;
কবিতার স্বর্ণযুগ, সৌন্দর্যের পূর্ণ আরাধনা।
ক্ষুদ্র প্রেম বিশ্বপ্রেমে, তুচ্ছ স্বার্থ পরার্থে বিলীন।
হবে জগতের নীতি, জীবনের গতি গ্লানিহীন।
আত্মগৌরবের কাছে সাম্রাজ্যের গর্ব তুচ্ছ হবে,
উচ্চাশা আদর্শ নব সাজাইবে স্বর্গের বৈভবে !
হোক্ লাভে ক্ষতি, নব-ন্যায় বন্যা ধরে র'বে রুখে',
হোক জয় পরাজয়, সত্য যোগাসনে র'বে বসে' !

১২

সেদিনের কল্পনায় মুগ্ধ কবি হেরে স্বপ্নভরে,
জন্মসূত্র যেন তা'র জড়াইয়া তব বালুস্তরে।
সংসার আবর্তে পড়ি' যত ঘূর্ণিবায়ু তার প্রাণ।
তোমার উষরকোল এক যোগ্য জুড়াবার স্থান।
বক্ষের আগ্নেয়গিরি নিভিয়াও নিভিতে না চায়,
আগুনেরে ডেকে নাও, শোয়াইতে তোমার চিতায়।
পিপাসায় শুষ্ক হিয়া, বেড়ায়েছি সুধা খুঁজি খুঁজি;
তাই মোরে, মরুভূমি, দেখা দিলে স্বপ্নে এসে বুঝি!

(গৈরিক

আদর্শ

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

প্রকৃতিরে হেরে যত, অবাক্ শিশুর মত
কবি তত ভাবে উতরোল;
দরশে পাগল-প্রায় ঝাঁপায়ে ধরিতে চায়
লাবণ্যের লীলাময় কোল!
হে মিথিল-আদি কবি সৃজিয়া অপূর্ব ছবি
অন্তর্যামী জানিলে তখন,—
নিরখি মোহিনী ভাতি মানব উঠিবে মাতি,
দেবত্বে করিবে আরোহণ।

উচ্ছল জলধি-জলে করে যবে ঝল্ মল্
গর্ভোত্থিত চাঁদের আলোকে,
উর্ধ্ব হতে নীলাম্বর নত্তনেত্রে নিরন্তর
চেয়ে থাকে পুলকে ভূলোকে;
তরঙ্গে তরঙ্গে বাঁধা, সুধা-ছন্দোবন্ধে সাধা,
মনে হয়, সন্ত সিন্ধু হতে
একটি অমর শ্লোক বিকিরিয়া দিব্যালোক
লক্ষ্মীসম উঠিবে জগতে!

এদিকে, তুলিয়া শির অচল রয়েছে স্থির,
মাঝে তার শোভে দরী কত ;
লতাকুঞ্জ-পদতলে নির্ঝরিণী বহি চলে
অজগর-নাগিনীর মত।
বিচরে নিঃশঙ্ক-মন অরণ্য-শ্বাপদগণ,
স্বভাবের লালিত দুলাল !
স্তব্ধ শান্তি চারিধারে ব্যাপ্ত করি আপনারে
মহাস্বপ্ন দেখে নিত্যকাল।
এ দৃশ্য, স্তম্ভিত প্রাণে উদার গম্ভীর গানে
জাগাইয়া তোলে সুপ্ত পণ,—
প্রশান্ত প্রসন্ন মুখে সংসারের দুখে সুখে
করে' যাব ব্রত উদ্‌যাপন।
ওদিকে, একত্রে সাজি বন্ধুসম তরুরাজি
করিতেছে মৃদু আলাপন ;
শ্যামল প্রচ্ছায়তলে মৃগী স্তনদান-ছলে
শাবকেরে করিছে লেহন।
চ্যুত-ফুল ধরি বুকে রয়েছে শুশ্রূষা-সুখে
শষ্পশয্যা করুণার ছবি !
দোয়েল পাপিয়া দূরে আনন্দ সৃজিছে সুরে ;
ওরা বুঝি প্রিয় বন-কবি ?
সদ্যস্নাত নদীজলে চক্রবাকী কুতূহলে
প্রিয়-চঞ্চু করিছে চুম্বন ;
গর্ভিণী কপোতী নীড়ে কপোত যতনে ধীরে
বিছাইছে তৃণের শয়ন।
হেরি সব, কবি-প্রাণ মহানন্দে কম্পমান,
গাহি উঠে প্রেমের মহিমা ;
লাবণ্য-রহস্যে পশি মৌনে গড়ি তোলে বসি
মানসের আদর্শ-প্রতিমা।

হতাশের সংকল্প

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

বড় দুঃখ, বড় দৈন্য, বড় অবিশ্বাস
এ সংসারে ফিরে সাথে রুধিয়া নিঃশ্বাস!
একদিন অতর্কিতে ত্যজি ছদ্মরূপ
অকস্মাৎ মাথা তুলি অশান্তির স্তূপ
আঘাতে' নির্ঘাত যবে, প্রাণের বৈভব,
গৌরব সৌরভ যত, চূর্ণ হয় সব,
থাকে শুধু স্মৃতিলেশ, কঙ্কাল যেমন,
প্রচারিতে আপনার অকাল পতন!
তাই বাঁধিতেছি বুক; যদি বক্রপথ
রোধিতে, গ্রাসিতে আসে মোর যাত্রারথ,
পড়ি না পশ্চাতে যেন! যাহাদের সাথে
জীবন-সংগ্রামব্রত লয়েছিনু মাথে,
যদি ছেড়ে যায় তারা, আপনার বলে
ঘন জনতার মাঝে একা যাব চলে'।

(গীতিকা, ১৯১৩)

পরশমণি

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

কার এ পরশখানি যুগান্ত বহিয়া,
স্মৃতি-নদস্রোতে ভাসি' মরমে ঠেকিল আসি,
স্বপনে শিহরি চে'নু রাখিতে ধরিয়া;
এই কি পরশমণি?—উঠিনু জাগিয়া।

নিম্নে, শাওনের নদী উপল-শয্যায়,
নিশীথে নিস্তব্ধ সব, দাহুরী করে না রব,
ঝিল্লীগীত বন্দনান্তে ধরণী ঘুমায়;
এই কি পরশমণি?—সুধিনু তাহায়।

আধ-ঘুমে ডাকে দেয়া, কাঁপি উঠে বায় ;
সুপ্ত শিখী মুদি' পুচ্ছ ; চাঁপা চামেলির গুচ্ছ
পড়ি কুঞ্জকোণে, নাহি মধুপে সাধায় ;
এই কি পরশমণি ?—সুধিনু তাহায় ।

খল খল হাস্ত শূন্যে শুনিনু উঠিল ;
চাহিনু আপন পানে সলজ্জ স্তম্ভিত প্রাণে,
সজল জলদ চিরি বিজলী চকিল ;
এই কি পরশমণি ?—ভরসা টুটিল ।

এই কি ? এই কি ? করি, অন্বেষ-কাতর !—
নৈশসুপ্তি, রাহুরূপে ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসিছে চুপে,
করাল মুখব্যাদানে লুপ্ত চরাচর ,
নদীবুকে ম্লানছায়া কাঁপে থর থর ।

—বিস্তারি' জলদ-জাল নীল নভ-নীরে,
চন্দ্র তারা ছাপি' বুকে টানিছে অনন্ত মুখে ,
—বন্ধন খসাতে বন্দী চাহিছে অধীরে !
প্রকৃতির মসীপটে কারে খুঁজি ফিরে ”

—হায়, সুপরশে কই রাঙিল হৃদয় ?
কু-আশা-সঞ্চিত ঘোর মুছে ত গেল না মোর,
এই কি সে মণি,—যার স্পর্শে হেম হয় ?
দারুণ কৃত্রিম বলি' বাড়িল সংশয় ।

বুঝিনু নিশ্চয় কোন মায়ার ছলনা !
এ কপট অভিজ্ঞান প্রেরিয়াছে মোর স্থান,
জাগাইতে নৈরাশ্যের পূর্ণাঙ্গ বেদনা ;
এ নহে সে মণি,—যার স্পর্শে হয় সোণা !

তদবধি ছন্নমনে বসিয়া একেলা,
ভাবিয়াছি কতবার, এ হেন চাতুরী কার,
কার এ বিষম রঙ্গ, প্রাণান্তক খেলা ?
ভঞ্জে নাই দুঃসন্দেহ, ব'য়ে গেছে বেলা।

সহসা সৌরভপূর্ণ হল দিশি দিশি ;
নভ-নহবৎ মাঝে জলদ-মল্লার বাজে ;
চকিতে বিদ্যুৎবাণী মর্মে গেল মিশি,—
"সারাখানি প্রাণ দিয়ে খোঁজ দিবানিশি।"

(পদ্মা, ১৮৯৮

দীনের মালা

কুমারী লজ্জাবতী বসু

অতি ক্ষুদ্র গন্ধহীন ছোট মালাগাছি,
দীন এল সঁপিবারে দেবের দুয়ারে।
সুবাসিত মালা কত, কত রত্নরাজি,
দেখিলেক পূর্বে যথা সজ্জীকৃত ঘরে,
স্থাপিতে তথায় তার হীন মালাগাছি
ভরি গেল চক্ষু দুটি নীরব বেদনে।
না বলি একটী কথা তারপর হায়!
চলে গেল দূর পথে আকুল সরমে।
সহসা মন্দির ধ্বনি উঠিল বিষাদে,
দেবতার দীর্ঘশ্বাস, কাঁদিল বাঁশরী
অধীর রাগিণী-গানে, হলো হীন জ্যোতি
আরতির দীপশিখা, পড়িলেক ঝরি
মঙ্গল মালতীমালা দুয়ার অজনে।

সমস্ত মন্দির ভরি নীরব বেদনে
ছোট মালাটির হায় অভাব কাহিনী
সারা বেলা দেবতার কাঁদিল চরণে।
উঠিল সমস্ত দিন একটি আহ্বান,
দীন যথা দূর পথে করেছে প্রয়াণ।

(১৯০২)

আশা অতি মায়াবিনী

প্রভাবতী রায়

১

মনের বিকারে
ছিলাম আঁধারে,
বিষাদ অন্তরে
দুঃখের কপাল জানি।

২

সহসা কেমন
ঘুচায়ে বেদন,
দিল দরশন,
আশা অতি মায়াবিনী।

৩

আশা আসি কানে
কহে সঙ্গোপনে,
কেন দুঃখী মনে,
দিব লো তাহারে আনি।

৪

বাক্য শুনে তা'র
সুখের সঞ্চার,
ভাবিনু আবার
আশা অতি মায়াবিনী।

৫

আশার আশ্বাস
করিয়ে বিশ্বাস,
সুখ পরকাশ,
মুছিনু নয়ন পানি।

৬

প্রাণ কিন্তু কয়,
কর' না প্রত্যয়,
সদা মোহময়,
আশা অতি মায়াবিনী।

৭

যথা সে মানুষে,
স্নেহ পরকাশে,
উঠায় আকাশে,
কহিয়ে মধুর বাণী।

৮

তেমতি আশার
কপট আচার,
খল ব্যবহার,
আশা অতি মায়াবিনী।

(চিত্রা, ১৮৯৭)

অশ্রু

প্রভাবতী রায়

১

বল অশ্রু বল তোর জনম কোথায়?
সকলে স্বার্থের শিশু বিস্তীর্ণ ধরায়।
এক বিন্দু কৃপা তরে,
ভ্রমে লোকে এ সংসারে,
কৃপা কোথা? নাহি পায় মরে হতাশায়;
একমাত্র স্বার্থহীন দেখি রে তোমায়।

২

যেখানে তোমার জন্ম অবশ্য সে লোকে,
দয়া মায়া স্নেহ প্রীতি আছে এক দিকে।
অন্য দিকে অভিশাপ,
রোগ শোক মনস্তাপ,
ক্রোধ হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা না যায় গণনা ;
একের সম্পত্তি কিছু নহ অশ্রু কণা ?

৩

বালকের বল তুমি নারীর সহায় ;
জ্বলিলে অভাগা হৃদি দারুণ জ্বালায়'
তুমি স্বার্থ পরিহরি,
হও নয়নের বারি,
প্রেমিকের হও তুমি প্রেমাশ্রু সম্বল ;
উপজিয়ে নয়নে প্লাবিয়ে বক্ষঃস্থল।

৪

তোমা সম আত্মত্যাগী আছে কোন্ জন ?
• পরের কারণে কর আপন বর্জন।
যদি কোন পতিব্রতা,
স্বামী সনে অনুমৃতা
হ'তে যায় অশ্রু তুমি তার সনে যাও ;
গিয়ে অশ্রু চিতানলে বেদনা জানাও।

৫

অন্তরূপে অশ্রু মোরে দিও দরশন ;
যখন পূজিব আমি রাম নারায়ণ।
বহুদিন দিনান্তরে,
যখন যাইব ঘরে,
যখন দেখিব পিতামহী পিতামহ ;
তখন প্রেমাশ্রু এসে মিল' চক্ষু সহ।

(চিত্রা, ১৮৯৭)

অচির বসন্ত

প্রিয়নাথ সেন

অচির বসন্ত হায় এল—গেল চলে
নিবে গেল কোকিলের দীপক-পঞ্চম,
ভঙ্গুর কুসুমশোভা ভেঙ্গে পড়ে ঢলে
প্রভঞ্জনে পরিণত—বিকৃতি বিষম—
অলস পরশ-মধু মলয়ার বায়!
যাবে যদি, যাক্ চলে ক্ষণিকের স্নেহ!
অফুরাণ ফুল-বীথি, কোথা তাহা হায়?
এযে শুধু ছলনার মরীচিকা গেহ!

যে মদিরা-পান তরে প্রাণ তৃষাতুর
কোথা তাহা? কোথা জলন্ত-যৌবনা তব
শোভনা প্রতিভা কবি? বিশাল চিকুর
আবরে প্রকাশে যার তনুর বিভব—
নগ্ন দেহ—কম্প্র-বক্ষ—মদির নয়ন—
ঢালুক অশেষ নেশা—পুলক-দহন!

শ্মশান

প্রিয়নাথ সেন

গ্রামের সুদূর প্রান্তে—ভগ্ন দেবালয়
তাহার চরণে লগ্ন—বিস্তীর্ণ শ্মশান
নীরব নির্জন।—যেন আপনারে লয়
করিয়াছে প্রেতভূমি সমর্পিয়া প্রাণ
শিয়রের দেবী-পদে—ধ্যান নিমগনা
ঊর্ধ্বে দেখে শুধু সেই এক নক্ষ—আর
মন্দিরের মহাভয়—লেলিহ রসনা—
মরণের ক্ষুদ্র ভয়ে করিছে সংহার।

আমার জীবন হোক শ্মশান প্রখর
দাঁড়াও পাবনী তাহে একা—একেশ্বরী
পুড়ুক নিয়ত তাহে যা কিছু নশ্বর
পাপ যাহা মৃত্যু যাহা—যাহা মৃত্যুকরী
তোমাতে নিমগ্ন—লুপ্ত—তুমি প্রাণময়
বিশ্বের সে চিরচিতা ধরিবে হৃদয়।

মায়া

নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী

হে সুরসুন্দরি! তুমি বল মানবের,—
কোন্ পুরাতন বন্ধু কত জনমের!
এড়াইতে তব কর,
চাহে যদি কোন নর,
অমনি যে বাঁধ তারে দিয়া শত ফের।

কেন গো নরের সনে এ খেলা তোমার?
তারা কি তোমার ওগো বড় আপনার!
তাই কি ক্ষণেক তরে
পার না ছাড়িতে নরে,
তাই নরে টান'—দিতে আত্ম-উপহার।

বল অয়ি বরাননে বাসনা তোমার!
মানবের মনে তুমি কেন একাকার?
স্বর্গীয় ললনা তুমি,
তোমার চরণ চুমি,
হতাশ জীবনে আশা জাগে শতবার।

কোন কার্য তরে বল মানসমোহিনি!
মরতে নরের সহ খেলিছ এমনি?
তুমি কি নরের মিত্র;
বুঝি না ও কোন্ চিত্র,
বুঝি না ও চোখে তব ভাসে কি চাহনি!

(অমিয়গাথা, ১৯০১)

মরণ

নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী

১

চিনি না মরণে আমি
কোথায় বসতি তা'র,
কে জানে তাহার আদি
কোথায় বা পরপার?

২

"মরণ মরণ" শুধু
শ্রবণে শুনেছি ভাই,
মরমে উদিলে ব্যথা
মরণ শরণ চাই।

৩

মরণের কোল বুঝি
দুখহরা শান্তিময়,
তার কোলে শুয়ে বুঝি
সব জ্বালা দূর হয়!

৪

কিন্তু তারে ভয় হয়
পাছে ল'য়ে গিয়া মোরে,
এ আলোক হ'তে ফেলে,
বিকট আঁধার ঘোরে

৫

যদিও জীবনে মোর
সুখশান্তি কিছু নাই,
যদিও প্রত্যেক পলে
মরণ শরণ চাই—

৬

তবু তার পাশে যেতে
মরমে উপজে ব্যথা,
কি জানি লইয়া যাবে
অজানা দেশেতে কোথা।

৭

সেই ভয়ে মরণেরে
চাহে না হৃদয় মম,
মরণ হইতে ভাল
জীবনের গাঢ় তমঃ।

৮

চাহি না মরণে আমি
কি হবে লইয়া তায়,
এ জীবন তবু ভাল
হেসে কেঁদে চ'লে যায়।

(মর্মগাথা, ১৮৯৬)

অরূপের রূপ

কুসুমকুমারী দাশ

রূপসিন্ধু মাঝে হেরি অরূপ তোমায়,
হৃদয় ভরিয়া গেল সুধার ধারায়!
কোন্ মৃত্তিকায় খুঁজি, কোন্ তীর্থ-নীরে,
স্ব-প্রকাশ, বিরাজিত বিশ্বের মন্দিরে—
উদার আকাশতল, সিন্ধুর সুনীল জল,
ওই গিরি নির্ঝরিণী অশ্রান্ত উচ্ছল।

প্রান্তর দিগন্ত-লীন শ্যামা মধুরিমা,
প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে কার এ সুষমা ?
হায়রে সম্বলহীন, কুণ্ঠা ছিল মনে—
তাঁর দেখা পাবি তুই কবে কোন্‌খানে ?
শত হস্ত বাড়ায়ে যে ধরিবারে চায়,
'পাই নাই' বলে তারে দিবি কি বিদায় ?
অন্তরে বাহিরে হের অপূর্ব আলোকে
তাঁরি জ্যোতির্ময় রূপ, দ্যুলোকে ভূলোকে !

(কবিতা-মুকুল, ১৮৯৬)

সাধন পথে

কুসুমকুমারী দাশ

এক বিন্দু অমৃতের লাগি
কি আকুল, পিপাসিত হিয়া,
একবিন্দু শান্তির লাগিয়া
কর্মক্লান্ত দুটি বাহু দিয়া—
কাজ শুধু করে যায়
অন্তরেতে দুরন্ত সাধনা,
তুমি তার দীর্ঘ পথে
হবে সাথী একান্ত ভাবনা।
সে জানে এ আরাধনা
কবে তার হইবে সফল,
তব বাণী যেই দিন তারি
ভাষা হয়ে ঘুচাবে সকল।

(কবিতা-মুকুল, ১৮৯৬)

রূপ-গর্ব

রমণীমোহন ঘোষ

গিরিমূলে সপ্তধারে বহে উষ্ণ বারি যেথা—
একদা প্রভাতে
মগধ-মহিষী ক্ষেমা স্নানে আসিলেন সেথা
সখীগণ সাথে।

বিম্বিসার-নৃপতির নয়নের মণি রাণী
রতনে মণ্ডিতা,
ঐশ্বর্যে বিলাসে মগ্না ভুবনদুর্লভ রূপ—
যৌবন-গর্বিতা।

সেদিন শরদাগমে বুদ্ধ ভগবান্ আসি'
গিরিব্রজপুরে
আলো করি গিরিশৃঙ্গ ভক্তবৃন্দ মাঝে ছিলা
আসীন অদূরে।

সখী-মুখে বার্তা শুনি' কহে রাণী,—"যাব আমি
বুদ্ধ দরশনে,
দেখিব—কি দেখি' তাঁর নরনারী ছুটে আসে
তাঁহার চরণে।"

নূপুরশিঞ্জিত পদে শিলাপথ বাহি' ক্ষেমা
উঠে সানুদেশে
যেথা প্রভু তথাগত—আসন-সম্মুখে তাঁর
দাঁড়াইল এসে।

দেখিল সে—দিব্যাসনে বসিয়া আছেন দেব
প্রশান্ত মূরতি,
নেত্রযুগ হ'তে ঝরে অনন্ত করুণাধারা
সর্বজীব প্রতি।

সম্ভ্রমে দাঁড়ায়ে পাশে ব্যজন করিছে তাঁরে
তরুণী সুন্দরী,
সৌন্দর্যের প্রভা যার ক্ষেমার অনিন্দ্যরূপ
দিল ম্লান করি।
দেখিতে দেখিতে সেই বরাঙ্গনা-দেহে ঘটে
কি পরিবর্তন !
কোথায় মিলায়ে গেল যৌবন-লাবণ্য তার
নয়ন-রঞ্জন।
বিগত-যৌবনা প্রৌঢ়া—বৃদ্ধা জরাকবলিতা
ক্রমে সে যুবতী,
বিস্ময়বিহ্বলা ক্ষেমা নারী-রূপ যৌবনের
হেরি' পরিণতি।
ছুটিল সকল গর্ব, আকুল হৃদয়ে ভাসি'
নয়নের জলে।
লুটিয়া পড়িল ক্ষেমা অমনি বুদ্ধের রাঙা
পাদপদ্ম তলে।

(দীপশিখা)

আলোক

বরদাচরণ মিত্র

১

সুন্দর আলোক ! জীবন বিধাতা
আঁধারের শিশু তুমি,
জনমে তোমার জনমিল প্রাণ,—
সকল মরত-ভূমি।
অসীমের কোলে সসীম যেমন,
নীরবতা-কোলে গান,
বিশালের কোলে সুষমা যেমন.
মরণের কোলে প্রাণ,

হিমাদ্রি-গহ্বরে ওষধি যেমন,
সমুদ্রে লহরী-ভঙ্গ,
অন্ধকার-কোলে তুমিও তেমতি,—
ভীষণে চারুতা-রঙ্গ।

২

শুদ্ধ আঁধার, অনন্ত, গভীর,
ছিল শুধু যেই দিন,
জননীর গর্ভে শিশুর মতন,
ছিলে তার মাঝে লীন ;—
ছিলে তুমি, ছিল সোদর তোমার
শব্দ নাম যে ধরে,
একই জঠরে যমজের মত
বেড়ি গলে পরস্পরে।
সৃষ্টি-মূল-মন্ত্রে গভীর স্পন্দিত
যবে প্রকৃতির কায়,
বিশ্ব বিলোড়ন-মাঝেতে যখন
এক বহু হতে চায়,
জনামি' ওঁকারে শব্দ-তরঙ্গ
কোটি বজ্রনাদে ছুটে,
অযুত-বিদ্যুত-স্ফুরণে সহসা
তিমিরে আলোক ফুটে।

৩

বীজ-অঙ্কুগণে আছিল যতেক
লয়-নিমীলিত প্রাণ,
প্রয়াস করিল বিকাশ লভিতে
ঝরিয়ে ত্রিদিব তান,
আকার-বিহীন ধরিতে আকার,

গঠন, গঠন-হীন

অগণন রূপে হইতে প্রকাশ

যা ছিল একেতে লীন ;—

টুটিয়ে অসীম, ফুটিতে সুষমা

সসীমের কলেবরে,

মরণ হইতে লভিতে জনম

পরাণ প্রয়াস করে।

তোমার প্রভাবে ভুবন উদয়,

কি মহিমা বলিহারি ;—

জীবন প্রদানে, তুমি হে আলোক,

অমৃতকুণ্ডের বারি।

(অবসর, ১৮৯৫)